সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

৬১ ভাগ, প্রথম সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

হইতে শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৬১ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

সূচি

বর্ষসূচী

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৬১ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

আধুনিক হিন্দী কাব্য-সাহিত্যে বাংলার প্রভাব

(১৮৬৮—১৯১৮)

শ্রীসুধাকর চট্টোপাধ্যায়

আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের গোড়া পত্তন হ'ল ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের হিন্দী সাহিত্য-ক্ষেত্রে আবির্ভাবের সময় থেকে। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নামে প্রচারিত বাংলা "বিদ্যাসুন্দর" নাটকের হিন্দী অনুবাদ নিয়ে সাহিত্য-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন। এই সময় থেকে আধুনিক হিন্দী সাহিত্যকে পঁচিশ বছরব্যাপী এক একটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। আমরা এই যুগবিভাগ অবলম্বনে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের প্রভাব হিন্দী কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে কি রকম পড়েছে, তাই দেখাবার চেষ্টা করব।

(১) আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের প্রথম পর্যায় (১৮৬৮—১৮৯৩)।

[ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র—নাগরীপ্রচারিণী সভা]

পণ্ডিত শুক্ল তাঁর 'হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস' নামক প্রামাণ্য গ্রন্থে এই যুগের কাব্যরীতির অভিনবত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন,—"ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র হিন্দী গদ্যের ক্ষেত্রে যেমন বিচিত্র আধুনিক বিষয়বস্তুর সন্নিবেশ করেছিলেন, কবিতার ক্ষেত্রেও তাই করেছিলেন" (ঐ, পৃষ্ঠা ৫৮৮)। অর্থাৎ লোক-হিত, সমাজ-সংস্কার, মাতৃভাষার উন্নতি আর দেশভক্তির কথায় যেমন ক'রে তিনি হিন্দী গদ্যকে আধুনিক সাজে সাজিয়েছিলেন, কবিতাকেও সেই ভাবে অলঙ্কৃত করেছিলেন। আর এ সমস্তই করেছিলেন বাংলার দেখাদেখি। পণ্ডিত শুক্লের কথায় :—

বাংলা সাহিত্যের আদর্শে হিন্দী সাহিত্যের আধুনিকীকরণ।

"নূতন শিক্ষার প্রভাবে লোকের চিন্তার ধারা যাচ্ছিল বদলে। কিন্তু দেশকালের উপযোগী সাহিত্য নির্মাণের কোনও ব্যাপক প্রচেষ্টা তখনও পর্যন্ত হয় নি। বঙ্গদেশে নূতন ঢংয়ের নাটক আর উপন্যাসের সূত্রপাত হয়েছিল, যাতে দেশ আর সমাজের নূতন রুচি আর ভাবনার প্রতিবিম্ব পড়ছিল। কিন্তু হিন্দী সাহিত্য পড়ে ছিল সেই পুরোনো রাস্তাতেই। ভারতেন্দু হিন্দী সাহিত্যকে অন্য দিকে মোড় ঘুরিয়ে আমাদের জীবনের সাথে যুক্ত ক'রে দিলেন।...সম্বৎ ১৯২০-এ (অর্থাৎ ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে) তিনি আপন পরিবারের সাথে পুরী গিয়েছিলেন। এই যাত্রাতে ওঁর পরিচিতি ঘটল বাংলা দেশের সাহিত্যিক প্রগতির সঙ্গে। তিনি বাংলা দেশের নূতন ধরণের সামাজিক, দেশ-দেশান্তর সম্বন্ধীয়, ঐতিহাসিক আর পৌরাণিক নাটক উপন্যাস দেখলেন আর হিন্দীতে এই ধরণের রচনার অভাব অনুভব করলেন। সম্বৎ ১৯২৫ (১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে) উনি বাংলা থেকে হিন্দীতে 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক অনুবাদ ক'রে প্রকাশ করলেন।" (হি. সা. ইতিহাস : পৃষ্ঠা ৪৫৯)।

কবিতার দিকে হিন্দীর কাব্য-সাহিত্য চলেছিল 'ব্রজভাষা'তে, পুরোনো দিনের কবিত্ত-সবৈয়া-দোহা ছন্দে, রাধাকৃষ্ণ বা রাম-সীতা-লীলার পথ ধ'রে। মাঝে মাঝে রচিত হচ্ছিল বিবাহ, ঋতুবর্ণনা, মৃগয়া, দোল প্রভৃতি বিষয়বস্তুর কবিতা। এই কবিতাকে জীবনের দিকে টেনে আনলেন ভারতেন্দু। কিন্তু গদ্যের ক্ষেত্রে যে আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছিলেন ভারতেন্দু, কবিতার ক্ষেত্রে তা পারেন নি। তার কারণ ছিল বোধ হয় এই যে, প্রাগাধুনিক কালে ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষায় (হিন্দীতে বা বাংলাতে) গদ্য-সাহিত্য মোটেই বিকশিত হয় নি।

এই আধুনিকীকরণের প্রকৃতি

তাই ইংরাজী সাহিত্যাদর্শে গঠিত বাংলা গদ্য নাটক উপন্যাসকে হিন্দীতে অনুবাদ অনুসরণ করতে কোনও ঐতিহ্যের বাধা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে নি। কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে উঠল। হিন্দী কবিতার ধারা চলে আসছিল প্রায় হাজার বছর ধরে। এই কবিতার ক্ষেত্রে ব্রজভাষাই প্রধান কাব্যভাষা হয়ে উঠেছিল। আর নানা যুগের নানা কবি-পরীক্ষিত হিন্দী-ছন্দের প্রতি আকর্ষণও ছিল প্রচুর। আর বাংলা দেশে নূতন ইংরাজী শিক্ষার প্রসার যত আগে হয়েছিল, হিন্দী-ভাষা অঞ্চলে তার দীর্ঘ দিন বাদে হয়েছিল। এ বিষয়ে একটি স্থূল বস্তু—বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা আলোচনা করলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। কলিকাতাতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হ'ল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। আর হিন্দী-ভাষা অঞ্চলে (বিহার থেকে পঞ্জাবের সীমান্তে) বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হ'ল দীর্ঘ দিন বাদে; পঞ্জাবে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে, এলাহাবাদে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে, বনারসে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে, পাটনাতে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে, লক্ষ্ণৌয়ে ১৯২০তে, আর আগ্রাতে ১৯২৭-এ। সুতরাং এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হ'তে অনুমান করা যায়, হিন্দী-ভাষা-অঞ্চলের প্রাণকেন্দ্রে ইংরাজী সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ বাংলার মত হ'তে দীর্ঘদিন লেগেছিল। তাই বাংলাতে যখন বিষয়বস্তুতে আর প্রকাশভঙ্গীতে (অমিত্রাক্ষর প্রভৃতি) সাহিত্যের নূতন যুগ সুরু হ'ল, তখন তার দেখাদেখি হিন্দী কাব্যধারার 'বিষয়বস্তু' আধুনিক হ'ল। কিন্তু কাব্যভাষা প্রধান হয়ে রইল 'ব্রজভাষা'। ছন্দও রইল প্রাচীন কালের। তবে মাঝে মাঝে ভারতেন্দুর সমসময়ে নূতন ছন্দের প্রতি আগ্রহও প্রকাশ পেয়েছে, যেমন পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাসের মিলহীন ছন্দে। কিন্তু সেই উদ্যমের ভিতর আন্তরিকতা ও শক্তির অভাববশতঃ এই নূতন ছন্দ পুরোনো কাব্যধারায় বুদ্‌বুদের মত চকিতে আবির্ভূত হয়ে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেল। আধুনিক কাব্যধারায় যাঁদের নাম করা যেতে পারে এই পর্যায়ের রচনায়, তাঁরা হলেন—ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র, প্রতাপনারায়ণ মিশ্র, অম্বিকাদত্ত ব্যাস, রাধাকৃষ্ণ দাস, উপাধ্যায় বদরীনারায়ণ চৌধুরী। এঁরা অভিনব বিষয়বস্তু দিয়ে হিন্দী কবিতার আধুনিকীকরণের সূত্রপাত করলেন। বাংলা এঁরা সকলেই ভালো ভাবেই জানতেন। এঁরা প্রায় সকলেই বাংলা হ'তে গদ্য-গ্রন্থ অনুবাদও করেছেন। প্রতাপনারায়ণ প্রায় বারোখানা বই অনুবাদ করেছিলেন (হিন্দী নাট্য-সাহিত্য : ব্রজরত্ন দাস); রাধাকৃষ্ণ দাস "স্বর্ণলতা" প্রভৃতি পুস্তকের অনুবাদ করেন। অম্বিকাদত্ত ব্যাস বাংলা ছন্দের মিলহীনতা হিন্দীতে অনুসরণ করতে গিয়ে সফল হন নি।

আর বাংলা সাহিত্যকে আদর্শ করা সম্বন্ধে "নাটক" প্রবন্ধে ভারতেন্দুর স্পষ্ট নির্দেশ ছিল :—

"অপনী সম্পত্তিশালিনী জ্ঞানবৃদ্ধা বড়ী বহন বঙ্গভাষা কে অক্ষয় রত্নভাণ্ডাগার কী সহায়তা সে হিন্দী ভাষা বড়ী উন্নতি করে।"

"হিন্দী সাহিত্য যেন নিজের সমৃদ্ধা জ্ঞানবৃদ্ধা বড় বোন বঙ্গভাষার অক্ষয় রত্নভাণ্ডারের সহায়তাতে উন্নতি করে।"

ভারতেন্দু ও তাঁর সঙ্গীদের দিক্ থেকে বাংলাকে বিষয়বস্তুর দিক্ থেকে কবিতার ক্ষেত্রে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা হ'ল। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বাংলার বিষয়বস্তুও হিন্দীতে অনুবাদের মধ্যে অনুবাদকের মৌলিকত্ব-মণ্ডিত নূতন শ্রী লাভ করেছে। আমরা এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ লেখক ভারতেন্দুর রচনা নিয়ে আলোচনা করছি। ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতমাতা' (১৮৭৩) নাটক অনুসরণে হিন্দীতে 'ভারতজননী' নাটক রচনা করেন। এখানে দেখা যায়, বাংলা নাটকে ধৃত "মলিনমুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি," ব্রজভাষাতে রূপান্তরিত হয়েছে "মলিনমুখ ভারতমাতা তেরো" ইত্যাদি সঙ্গীতে। মূলের "দেখ গো ভারতমাতা তোমারি সন্তান," হিন্দী নাটকে ব্রজভাষায় দাঁড়িয়েছে, "লখৌ কিল ভারতবাসিন কী গতি" সঙ্গীতে। এই দুই ক্ষেত্রেই অনুবাদে মূল যথাযথ অনুকৃত হয়েছে। আবার কবি ভারতেন্দু অনুবাদের ক্ষেত্রে মৌলিকত্বও দেখিয়েছেন কোনও কোনও জায়গায়। যেমন, 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের একাধিক স্থলে। ভারতেন্দুর 'বিদ্যাসুন্দর' যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের গদ্যাংশের অনুবাদ ও পদ্যাংশের ছায়ানুসরণ। আমরা পাশাপাশি দুটি কবিতা স্থাপন ক'রে নীচে দেখাচ্ছি যে, অনুবাদে বা অনুসরণে ভারতেন্দু হিন্দীর মধ্যে বাংলা থেকে কতখানি পার্থক্য প্রদর্শন করেছেন :—

ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রে বাংলা কবিতার প্রভাব

বিদ্যাসুন্দর (বাংলা)

গঙ্গাভাটের কবিতা :—

অরিদল সব শরণ আয় গর্ব্ব
খর্ব্ব মান কে।
নিরখ সুযশ মহিমা গুণ গঙ্গভাট
ইয়োঁ কহে।
হোয়ে সকল সম্পদ অর লছমী নিত
বঢ় রহে।

(ঐ. পৃষ্ঠা ৫)

বিদ্যাসুন্দর (হিন্দী)

গঙ্গাভাটের কবিতা :—

বীরসিংহ মহারাজ কো, দিন দিন হী
জয় হোয়।
তেজ বুদ্ধি বল নিত বঢ়ৈ, শত্রু
রহে নহী কোয়।

(ঐ. পৃষ্ঠা ৩)

ভারতেন্দুর কবিতার উপর বাংলার প্রভাব নিয়ে ভাসা ভাসা আলোচনা করেছেন পণ্ডিত শুক্ল। আর কেউ তাও করেন নি। কিন্তু একটু অনুধাবন করলেই দেখা যাবে যে, ভারতেন্দুর একাধিক মৌলিক কবিতার উৎস বাংলার হেমচন্দ্র। 'সত্যহরিশ্চন্দ্র' নাটকে গঙ্গার

বর্ণনা, 'চন্দ্রাবলী'তে যমুনার বর্ণনার সঙ্গে হেমচন্দ্রের তুলনামূলক আলোচনা করলেই স্পষ্ট হবে আমার কথা। ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র-বিরচিত নিম্নোদ্ধৃত দেশপ্রেমমূলক কবিতাটি পণ্ডিত শুক্লের 'হিন্দী সাহিত্যকা ইতিহাস' গ্রন্থে প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু এ অংশটির আসল সম্মান যে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাপ্য, তা বোধ হয় হিন্দী সাহিত্যের অনেক ঐতিহাসিক ঠিক জানেন না। আমরা এখানে ভারতেন্দুর রচনা ও তার মূল পাশাপাশি রেখে সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।—

ভারতেন্দু ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতেন্দু লিখছেন :—

"হায়! বহৈ ভারত-ভুব ভারী। সব হী বিধি সোঁ ভঈ দুখারী।
হায়! পঞ্চনদ, হা পানীপত। অজহুঁ রহে তুম ধরনি বিরাজত।
হায় চিতৌর। নিলজ তূ ভারী। অজহুঁ খরো ভারতহিঁ মঁঝারী।
তুম মেঁ জল নহিঁ জমুনা গঙ্গা। বঢ়হু বেগি কিন প্রবল তরঙ্গা?
বোরহু কিন ঝট মথুরা কাসী? ধোবহু য়হ কলঙ্ক কো রাসী।"

হেমচন্দ্র লিখছেন :—

হায় পানিপথ, দারুণ প্রান্তর / কেন ভাগ্য সনে হলিনে অন্তর।
কেন রে চিতোর তোর সুখ-নিশি / পোহাইল যবে, ধরণীতে মিশি
অচিহ্ন না হলি—কেন রে রহিলি /
জাগাতে ঘৃণিত ভারত নাম?
নিবিছে দেউটি বারাণসী তোর, / কেন তবে আর এ কলঙ্ক ঘোর
* * * *
নাহি কি সলিল, হে যমুনে গঙ্গে, / তোদের শরীরে—উথলিয়া রঙ্গে,
কর অপসৃত এ কলঙ্ক রাশি, / তরঙ্গে তরঙ্গে অঙ্গ বঙ্গ গ্রাসি,
ভারত ভুবন ভাসাও জলে?

লক্ষ্য করার বিষয়, ভারতেন্দুর এই অংশটিতে মৌলিকত্ব এসেছে 'অংগ বংগ'—এর স্থলে 'মথুরা কাসী'র সন্নিবেশে। ছন্দের দিকে হেমচন্দ্রের দ্বাদশ অক্ষরাত্মক 'চরণ' হিন্দীতে ১১শ-১৪শ অক্ষরের চরণে অনুকৃত হয়েছে।

'প্রিন্স অব ওয়েলস্'-এর আগমন উপলক্ষ্যে রচিত ভারতেন্দুর সঙ্গীত হেমচন্দ্রের অনুসরণ মাত্র।

২। আধুনিক হিন্দী কাব্যধারার দ্বিতীয় পর্যায় (১৮৯৩—১৯১৮)

[নাগরীপ্রচারিণী সভা—প্রথম বিশ্বযুদ্ধান্ত]

হিন্দী কাব্যশাখায় নূতন বিষয়বস্তু আনলে বটে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র, কিন্তু নূতন আঙ্গিক এল না। পেল না, 'খড়ীবোলী' কাব্য-ক্ষেত্রে সমাদর। মাঝে মাঝে ভারতেন্দুরা 'খড়ীবোলী' কবিতার প্রয়াস পেয়েছেন ফারসী-উর্দুর চালে, কিন্তু তাও অত্যন্ত অল্প সংখ্যায় এবং সাহিত্য-সৃষ্টির নূতন প্রেরণা থেকে সরে গিয়ে। এই পর্যায়ে (১৮৯৩—১৯১৮) হিন্দী-ভাষা

অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত হয়েছে ইংরাজী শিক্ষা, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কেন্দ্রে কেন্দ্রে ইংরাজী শিক্ষার পীঠস্থান 'বিশ্ববিদ্যালয়'; আর বাংলা ভাষার তখন কাব্যক্ষেত্রে অপরিসীম সমৃদ্ধির যুগ। মধুসূদন দত্ত (১৮২৪—১৮৭৩) মারা গিয়েছেন, কিন্তু তাঁর কল্যাণে অপরিসীম সাড়া জাগল সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে—বাংলাতে, ওড়িয়াতে, আসামীতে, হিন্দীতে। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৯০৩) এবং নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭—১৯০৯) নূতন ছন্দে আর নূতন ভাবধারায় 'কাহিনী কাব্য' এবং দেশাত্মবোধের নব রূপ দিচ্ছিলেন। বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫—১৮৯৪) রোমান্টিক গীতিকবিতার সূত্রপাত ক'রেছেন। রবীন্দ্রনাথে (১৮৬১—১৯৪১) তার পূর্ণ প্রকাশ চলেছে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ভিতরেই রবীন্দ্রনাথের একাধিক শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী," "কড়ি ও কোমল," "মানসী," "সোনার তরী" প্রভৃতি প্রকাশিত হয়েছে। আর এই স্তর-পর্যায়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই তাঁর 'বিশ্বকবি' স্বীকৃতি (১৯১৩) মিলল। দ্বিজেন্দ্রলালের (১৮৬৩—১৯১৩) গানে ও কবিতায় বাংলা-সাহিত্য উজ্জ্বল। [আর গদ্য-প্রসঙ্গে না গিয়ে বলতে পারি, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৮৯৪) ভারতীয় সাহিত্যের প্রতি কেন্দ্র হ'তে সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলেন।] সুতরাং এই পটভূমিকাতে হিন্দী কাব্যশাখায় নূতন ছন্দ ও আঙ্গিকের জন্য প্রয়োজন সাহিত্যসাধকেরা সকলের অপেক্ষা বেশী অনুভব করবেন, সে কথা বলাই বাহুল্য। তাই এই যুগে হিন্দী কবিতার ছন্দ ও ভাষার ক্ষেত্রে পুরাতন দিনের ঐতিহ্য থেকে মুক্তি ঘটল। আর এই মুক্তিসাধনাতে আদর্শ করা হ'ল বাংলা কাব্য-সাহিত্যকে। বিগত স্তরে হিন্দীতে আধুনিকীকরণের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র এবং তাঁর সহকর্মীরা। এই বার সেই ভিত্তি-ভূমিতে সৌধ নির্মাণের প্রয়াস পেলেন মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদী আর তাঁর পরিচালিত "সরস্বতী" পত্রিকার কবিগোষ্ঠী। এরই সাথে এগিয়ে এলেন "দ্বিবেদী মণ্ডলের" বাইরের কবিরাও কখনও কখনও নবীন উৎসাহে।

ভাষা ও ছন্দে হিন্দীর উপর বাংলার প্রভাব।

মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদীর নির্দেশে হিন্দী কবিতার আধুনিক-রূপায়ণ সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্বে দ্বিবেদী-মণ্ডলের পূর্বেরও একটি অত্যন্ত শক্তিশালী হিন্দী কবির কথা স্মরণ করা কর্তব্য। পণ্ডিত শ্রীধর পাঠকের মাঝখান দিয়ে একটা স্বচ্ছন্দ রোমান্টিসিজমের বিকাশ ঘটে। পণ্ডিত পাঠক হিন্দীতে অনুবাদও করেছিলেন ইংরাজী হ'তে। তিনি ইংরাজী **Hermit** হ'তে "একান্তবাসী যোগী" ও গোল্ডস্মিথের **Traveller** হ'তে "শ্রান্ত পথিক" খড়ীবোলীতে প্রকাশ করার পর, গোল্ডস্মিথের **Deserted Village** ব্রজভাষাতে "উজড়া গ্রাম" নামে অনুবাদ করেন। হিন্দী সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা এগুলিকে ইংরাজী হ'তে সরাসরি অনুবাদ মনে করেন। কিন্তু বাংলা কবিতার মাঝখান দিয়ে এই ইংরাজী কবিতার হিন্দী অনুবাদ হওয়ার সম্ভাবনাও যে না আছে, তা নয়। অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেনরচিত গ্রন্থ (**Western Influence in Bengali Literature : Edn. 1932 ; p. 183**)-তে আমরা দেখি,

পণ্ডিত শ্রীধর পাঠক ১৮৭৫—১৯২৭

বাংলা ১২৬৫ সন (১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ)-এর ভিতরেই বাংলাতে ইংরাজী হ'তে অসংখ্য কবিতা অনূদিত হয়েছে। তার মধ্যে গ্রে-রচিত "এলিজি," গোল্ডস্মিথ-রচিত "হার্মিট," পার্নেল-রচিত "হার্মিট," ক্যাম্পবেল-রচিত "প্লেজারস অব হোপ"-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য (ঐ : সেন : পৃষ্ঠা ১৮৩)। ডক্টর সুকুমার সেন রচিত "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃষ্ঠা ১৩৬) আমরা দেখি যে এই সময় পার্নেল-এর "হার্মিট" কবিতার অনুবাদ করেন বাংলাতে হরিমোহন গুপ্ত "সন্ন্যাসীর উপাখ্যান" নামে। আর যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় অনুবাদ করেন গোল্ডস্মিথের "Deserted Village" "পরিত্যক্ত গ্রাম" নামে। মৌলিক কবিতার মধ্যে রোমান্টিক কবি-প্রাণকে শ্রীধর পাঠক অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য ও মাধুর্য-ভরা ভাষায় ও ছন্দে প্রকাশ করেছেন। এ বিষয় তাঁর "স্বর্গীয় বীণা" কবিতাটি স্মরণযোগ্য। "বিশ্বের নিখিল সুষমার কেন্দ্রস্থলে কে যেন বাজিয়ে চলেছে বীণার তার। সুন্দর সুরধারাতে উচ্ছলিত হয়েছে কখনও প্রেম, কখনও ক্রোধ, কখনও বিনয়, কখনও দয়া, কখনও দাক্ষিণ্য। আকাশের তারায় তারায় লেগেছে ভাবের আবেশ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নেচে চলেছে সেই মঞ্জু অঙ্গুলির কম্পনে।" পণ্ডিত শুক্ল প্রভৃতি সমালোচকেরা এখানে কবীর-দাদূ প্রদর্শিত সহজ রোমান্টিসিজমের নব রূপায়ন লক্ষ্য করেছেন। নিঃসন্দেহে এখানে কবীর-দাদূর মরমী কাব্যানুসরণ হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে কি কবি বাংলার নব-জাগ্রত রোমান্টিক কাব্যসাধনা হ'তে কিছু উপাদান সংগ্রহ করেন নি। বাংলা সাহিত্যে এই রোমান্টিক গীতি কবিতার সূত্রপাত করেন বিহারীলাল চক্রবর্তী। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ "সারদামঙ্গল" (১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ) কবি শ্রীধর পাঠকের জন্মের (১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ) অব্যবহিত পরেই প্রকাশিত হয়। পণ্ডিত শ্রীধর পাঠকের পক্ষে কবিতা রচনাতে রোমান্টিক ভাবধারার পরিচয় দেবার পূর্বে (জন্ম ১৮৭৭ হ'তে অন্তত ১৬ বৎসরে কবিতার আরম্ভকাল ধরিলে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ, এবং বিকাশকাল ২০ করিলে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ) রবীন্দ্রনাথের "সোণার তরী" (১৮৯০), "চিত্রা" (১৮৯৫ খ্রীঃ অঃ) প্রভৃতি বিরচিত হয়েছে। এই সকল রচনাতে 'সর্বভূতে কান্তিরূপা' বিশ্ববিকাশিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মীর যে বন্দনা আছে, তার প্রভাব কি কিছুই পড়ে নি? বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫—১৮৯৪) বিরচিত "সারদামঙ্গল," "সাধের আসন," "দেবরাণী" প্রভৃতিতে সেই বিশ্ববিকাশিনী সুন্দরীর নানারূপে বন্দনা। "দেবরাণী"র ভিতর বিহারীলাল বলছেন :—

"না জানি কোথায় বাজে বেণু বীণা
উদাস—উদাস হৃদয় প্রাণ
না জানি কিসের সুরভি সৌরভ
তর কোরে দেয় মগজ ভ্রাণ!"

বাংলার রোমান্টিক কাব্যধারা ও পণ্ডিত শ্রীধর পাঠক

[কবি শ্রীধর পাঠকও বলেছেন :—"কহী পৈ স্বর্গীয় কোই বালা সুমঞ্জুবীণা বজা রহী হৈ।" এবং সেই সঙ্গীতে ঔদাসীন্য আছে, "বিয়োগতপ্তা সী ভোগমুক্তা হৃদয়কে উদ্গার গা রহী হৈ";]

বিহারীলালে সেই বীণাবাদিনী হাসিতে, স্নেহেতে ভরপুর হ'য়ে গান গাইছেন :—

অধরে উদার মৃদু মন্দ হাসি,
ভাসি ভাসি আসে স্নেহের তান,
দুলে দুলে কোলে বীণা বিনোদিনী
আধ আধ কিবে করিছে গান !

[কবি শ্রীধর পাঠকও বলছেন—"সেই বীণাবাদিনী যে সঙ্গীত ('হৃদয় কে উদগার গা রহী হৈ') গাইছেন তাতে "কভী নঈ তান প্রেমময় হৈ, কভী প্রকোপন, কভী বিনয় হৈ।"] বিহারীলালে সেই বীণাবাদিনীর সুর সঙ্গীতে মুগ্ধ "দিগঙ্গনাগণ", "দামিনী দানব বালারা।" "চারিদিকে বাজে মঙ্গল বাজনা"। "অনিল বায়ু ছুটিয়া" আসে। আকাশের তারা সপ্তর্ষি মণ্ডল তাঁর ধ্যানে মগ্ন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁর মহিমা গানে পূর্ণ—

তোমার শ্রীপদ পরম সম্পদ
সদাসপ্ত ঋষি করেন ধ্যান ;
ভূচর খেচর বিশ্ব চরাচর
গাহিছে তোমার মহিমা গান।

অনুরূপ ভাবনাকে অপরিসীম কাব্যশ্রীমণ্ডিত রূপে পণ্ডিত পাঠকের ভিতরেও পাই—

"ভরে গগন মেঁ হৈঁ জিতনে তারে, হুএ হৈঁ বদমস্ত গত পৈ সারে।
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ভর কো মানো দো উঁগলিয়োঁ পর নচা রহী হৈঁ।"

[গগনভরা তারা হয়েছে ভাবে মত্ত (বদমস্ত), নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে যেন দু-আঙ্গুলের উপর চলেছেন তিনি নাচিয়ে।]

'নাগরী প্রচারিণী সভা' প্রতিষ্ঠিত হলে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে, হিন্দীর সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রেরণার বাণী নিয়ে। আর তার কিছুদিন বাদে এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস হ'তে বেরোল বাংলা এবং হিন্দীর দুটি বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা সরস্বতী-প্রবাসী (১৮৯৯-১৯০১)। 'প্রবাসী'কে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রত্রিকা ক'রে তুলেছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আর 'প্রবাসী'র মাঝখান দিয়ে তিনি কেবল বাঙ্গালীরই সেবা করেন নি। হিন্দী সাহিত্যের সম্মুখে বিরাট আদর্শ স্থাপন ক'রেছিলেন। পরবর্তীকালে রামানন্দবাবু 'বিশাল ভারত' ও 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রিকার মাঝখান দিয়ে বাংলা সাহিত্যকে আরও সক্ষম ভাবে অবাঙ্গালীর কাছে তুলে ধরেছিলেন। হিন্দী সাহিত্য ক্ষেত্রে 'সরস্বতী' এক স্পষ্ট যুগান্তর ঘটাল। 'সরস্বতী' পত্রিকার পরিচালনার ভার পণ্ডিত মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদীর হাতে আসে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় থেকে। "এই সময় থেকে 'সরস্বতী' একটি শ্রেষ্ঠ পত্রিকা হয়ে উঠে। দ্বিবেদীজী "প্রবাসী, মডার্ণ রিভয়ু প্রভৃতি পত্রিকার আদর্শে 'সরস্বতী'কে গড়ে তুললেন।" (হিন্দী কী পত্র-পত্রিকাএঁ : বিনয়-বর্মা : পৃষ্ঠা ২৩)। অনেকগুলি ভাষা বিশেষ অধিগত ছিল মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদীর (হিন্দী সাহিত্য বীসবীঁ সদী : নন্দদুলারে বাজপেয়ী)। বিশেষ

"সরস্বতী" ও মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদী

ক'রে নূতন সাহিত্য সৃষ্টির জন্য তিনি মারাঠী ও বাংলা সাহিত্য হ'তে উপাদান সংগ্রহ ক'রে হিন্দী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে চাইলেন। পণ্ডিত মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদী-কে এবং 'সরস্বতী' পত্রিকাকে কেন্দ্র ক'রে একদল সাহিত্যিক জেগে উঠলেন, তাঁরা দ্বিবেদীজীর নির্দেশে নূতন ছন্দে ও ভাষায় হিন্দী কাব্যসাহিত্য গড়ে তুললেন। কাব্যক্ষেত্রে 'ব্রজভাষা' আর গদ্যক্ষেত্রে 'খড়ীবোলী'—এই ধারা চলেছিল পূর্বের পর্যায়ে। এবার 'খড়ীবোলী'কে কাব্যভাষা হিসাবে গ্রহণ করা হ'ল হিন্দী কবিতার ক্ষেত্রে। ছন্দ, উপমা, রূপকে যে প্রাচীনত্ব ছিল তারই অনুসরণ দ্বিবেদীজীকে বিহ্বল ক'রে তুলেছিল। তাই তিনি বললেন :—

"এই ধরণের কবিতা কত শত বছর ধরে চলে আসছে।…এই অবস্থাতে নূতন কবি আপনার কবিতায় নূতনত্ব আনবে কি প্রকারে? সেই মিল, সেই ছন্দ, সেই শব্দ, সেই উপমা, সেই রূপক। লোকে চলেছে পুরোণো চালে। কবিত্ত, সবৈয়া, দোহা, সোরঠা থেকে সরে আসছে না।" (*)

দ্বিবেদীজীর ভাবনাকে কাজের দ্বারা সফল ক'রে তুললেন দ্বিবেদী-মণ্ডলের কবিরা। এঁদের মধ্যে সর্বশ্রী মৈথিলীশরণের নাম সর্ব্বাগ্রে স্মরণযোগ্য। মৈথিলী শরণের মাঝখান দিয়ে বাংলার শ্রেষ্ঠ দুই কবি—মধুসূধন ও রবীন্দ্রনাথের বাণীসাধনা হিন্দী সাহিত্যের নূতন যুগের কাব্য-প্রেরণারূপে স্বীকৃত হ'ল। একের অমিত্রাক্ষর ও অপরের বিচিত্র মিত্রাক্ষর সম্প্রসারিত হ'ল হিন্দী ছন্দের ক্ষেত্রে। হিন্দী কাব্যের ক্ষেত্রে মৈথিলীশরণের আবির্ভাব হোলো সরস্বতী পত্রিকায় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে। সর্বশ্রী মৈথিলীশরণের কাব্যধারার আলোচনা ক'রে পণ্ডিত শুক্ল তাতে তিনটি স্তর লক্ষ্য ক'রেছেন। প্রথমে খড়ীবোলী পদ্যকে মহণ করার মৌলিক প্রচেষ্টার স্তর। দ্বিতীয় স্তরে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' 'ব্রজাঙ্গনা' প্রভৃতি অনুবাদ ও তারই অনুসরণে কাব্য রচনার স্তর। আর তৃতীয় স্তরে হোলো, রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে 'ছায়াবাদ' নিয়ে কবিতা রচনার স্তর। প্রথম স্তরের কবিতাতে মৈথিলীশরণ খড়ীবোলী ভাষাকে গ্রহণ করেছেন বটে, কিন্তু সংস্কৃত বা ফারসী-উর্দু হ'তে ছন্দকে আদর্শ করতে দ্বিধা করেন নি। এই সকল দিক দিয়ে তাঁকে ভারতেন্দু মণ্ডলের ছন্দের অনুকৃতি ক'রতে দেখা যায়।† পণ্ডিত শুক্ল 'ভারত-ভারতী' কবিতা পর্য্যন্ত এই মৌলিক স্তরের উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এই মৌলিক প্রচেষ্টার স্তর আমাদের বর্তমান আলোচনার বহির্ভূত। তবে কেবল একটি কথা বলব, 'ভারত-ভারতী'তে যে অতীত ভারতবর্ষের হিন্দু গৌরবের জন্য বিলাপ রয়েছে, সেটি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "ভারত-সঙ্গীত" প্রভৃতি কবিতার প্রতিধ্বনি মাত্র। "ভারত-ভারতী" থেকে "বৈতালিক" পর্যন্ত তাঁর কাব্যের দ্বিতীয় স্তর—মধুসূদনের অনুবাদ ও কাহিনীকাব্যের স্তর। পূর্বের স্তরের রচনাতে খড়ীবোলীতে যে

মৈথিলীশরণ গুপ্ত

(*) "ইস তরহ কী কবিতা সৈকড়োঁ বর্ষসে হোতী আরহী হৈ।…ইস দশামেঁ নয়ে কবি অপনী কবিতামেঁ নয়াপন কৈসে লা সকতে হৈঁ।" ইত্যাদি। এই অংশের আক্ষরিক অনুবাদ

† "গুপ্তজী কী কাব্যধারা" গ্রন্থে গিরিজা দত্ত শুক্ল এ বিষয়ে বেশ আলোচনা ক'রেছেন।

শ্রুতিকটুতা ছিল তা বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনে অনেক দূরীভূত হয়ে যায়।* বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত-শব্দ বা তৎসম শব্দের প্রাচুর্য যে মাধুর্য সৃষ্টি করেছিল কেবল তারই দিকে মৈথিলীশরণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নি, তিনি বঙ্গভাষা হোতে যথাযোগ্য শব্দগ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। এই যুগে বাংলা নাটক ও উপন্যাসের অনুবাদের মাঝখান দিয়ে "কাঁদনা", "সিহরনা", "ছল ছল অশ্রুপাত" প্রভৃতি শব্দ হিন্দীর মধ্যে প্রবিষ্ট হচ্ছিল।

'হিন্দী'তে বাংলা ভাষার শব্দগ্রহণে মৈথিলীশরণ

এই সকল শব্দগ্রহণে পরবর্তীকালে বিদগ্ধ সমালোচক শুক্লজী বিরূপ মন্তব্য ক'রেছেন। কিন্তু মৈথিলীশরণ তা করেন নি। তিনি এই সকল শব্দকে সাদর আহ্বান জানিয়ে 'গুরুকুল'-এ বলেছেন :—

'কবিতার শব্দ-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করার জন্য ব্রজ, বুন্দেলখণ্ডী, অবধী প্রভৃতি আমাদের ঘরের চলতি ভাষার কথা আর কি বলব ; এ ছাড়া "লেখক কী রায় মেঁ তো অন্য প্রান্তিক ভাষায়োঁ মেঁ সে ভী হমেঁ শব্দ "জোগাড়" করতে হুএ "সিহরনে" কে বদলে "বিভোর" হী হোনা চাহিএ।······জব হম অরবী, ফারসী ঔর অঙ্গরেজী কে শব্দ নিঃসঙ্কোচ ভাব সে স্বীকার করতে হৈঁ তব আবশ্যক হোনে পর অপনী প্রান্তীয় ভাষায়োঁ সে উপযুক্ত শব্দ গ্রহণ করনে মেঁ হমেঁ ক্যোঁ সঙ্কোচ হোনা চাহিএ।" মৈথিলীশরণের বলিষ্ঠ স্বীকৃতি আধুনিক কবি গোষ্ঠীর বঙ্গভাষাদর্শের মধ্যে রূপ পেয়েছে। বিশেষ ক'রে 'প্রসাদ' ও 'নিরালা'তে তার চমৎকার অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ : বঙ্গসাহিত্য হ'তে ভারতীয় সাহিত্যে

বাংলাতে অমিত্রাক্ষরের প্রবর্তন করেন মধুসূদন। তাঁর হাতে অমিত্রাক্ষর চতুর্দশ অক্ষরাত্মক পংক্তির ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। পরবর্ত্তীকালে বাংলাতে হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র এই চতুর্দশ অক্ষরের ভিত্তিভূমিতে অমিত্রাক্ষরের সাথে আবার মিত্রাক্ষরতাও যোজনা করেন। বাংলার আশ পাশের সাহিত্যে, ওড়িয়া ও আসামীতে চতুর্দশ অক্ষরের পংক্তির ভিত্তি-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয় অমিত্রাক্ষর। উদাহরণ-স্বরূপ আমরা ওড়িয়াতে প্রথম অমিত্রাক্ষরে সার্থক মহাকাব্য 'মহাযাত্রা' হ'তে নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি স্মরণ করতে পারি :—

পঙ্কজ বাসিনি দেবি, উৎকল ভারতি
সারিলে কি কলে কহ কুরুচূড়ামণি
শুনিলে যে কালে বীর বার্ত্তাহর মুখে
প্রভাসে যাদবকুর জ্ঞাতি ক্ষয়কারী
মহাহব।

—মহাযাত্রা : রাধানাথ রায়।

---

* "গুপ্তজী নে বঙ্গভাষা কী কবিতায়োঁ কা অনুশীলন তথা মধুসূদন দত্ত রচিত "ব্রজাঙ্গনা", 'মেঘনাদ বধ' আদি কা অনুবাদ ভী কিয়া। ইসমে ইন কী পদাবলী মেঁ বহুৎ কুছ সরসতা ঔর কোমলতা আঈ—" শুক্ল : হি, সা, ই : পৃষ্ঠা ৬১৬।

[ওড়িয়াতে 'ৎক' একটি যুক্তাক্ষর]

'আসামী'তে ভোলানাথ দাস, রঘুনাথ চৌধুরী চতুর্দশ অক্ষরাত্মক পংক্তির সাহায্য নিয়ে বাংলার আদর্শে অমিত্রাক্ষর গঠন করেছেন। মধুসূদনের ছন্দোরীতি ও মধুসূদনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে ভোলানাথ দাস বলেছেন :—

সে হি রামায়ণ গীত
গাইবে বাঞ্ছিহো আমি মূঢ় আকিঞ্চন
অমিত্র অক্ষর ছন্দে হে মাতঃ বাগ্‌দেবি
যে ছন্দে গাইলা—বহু মধুময় গীত
তব অনুগ্রহে—অতি প্রিয় পুত্র তব
শ্রীমধুস্থদন বঙ্গ কবি কুলমণি।

হিন্দীতে এই চতুর্দশ অক্ষরাত্মক পংক্তিতে অমিত্রাক্ষরের সামান্য চেষ্টা চলেছিল। পরে এই প্রচেষ্টা সফল হ'ল পঞ্চদশ অক্ষরাত্মক পংক্তির ভিত্তিভূমিতে। হিন্দীতে 'মেঘনাদবধ' অনুবাদ হয়েছে এই ছন্দে। আর অনুবাদ করে কবি বলেছেন :—

"মূল ছন্দ চৌদহ অক্ষর কা হোতা হৈ। যদি হিন্দী মেঁ উসীকা প্রয়োগ কিয়া জাতা তো ঠীক ন হোতা। দো এক কবিয়োঁ নে উসমেঁ হিন্দী কবিতা লিখী ভী পর বহ প্রচলিত ন হো সকা।"

'মেঘনাদবধ' 'বীরাঙ্গনা'র ছন্দ ও মৈথিলীশরণ

নিচে হিন্দীতে অনূদিত 'মেঘনাদবধ' এবং 'বীরাঙ্গনা' হ'তে কয়েকটি পংক্তি তুলে দিচ্ছি :—

"সম্মুখ সমর মেঁ অকাল মেঁ নিহত হো
শূর শিরোরত্ন বীরবাহু যমপুর কো
গয়া জব, কহো তব, দেবি, সুধাভাষিণি,
কিস পর বীর কো নিশাচর রক্ষেন্দ্র নে
কর কে বরণ নিজ সেনাপতি পদ বৌ
ভেজা রণমেঁ থা উস রাঘব কে বৈরী নে।'

—মেঘনাদবধ।

'বীরাঙ্গনা'তে জনা আক্ষেপ ক'রে বলছে :—

"জাও মহাবীর, চলে জাও কুরুপুর কো
নব্য মিত্র পার্থ সঙ্গ। ভাগ্য রহিতা জনা,
পুত্র কে সমীপ মহাযাত্রা কর কে চলী।"

মধুসূদনের পংক্তির চতুর্দশ অক্ষর অপেক্ষা পঞ্চদশ অক্ষর হিন্দীর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। কেন না, তুলসীদাসের মধ্যে পঞ্চদশ অক্ষরের মিত্রাক্ষর পংক্তির বহুল ব্যবহার ছিল। যেমন—

"দেখি ! ধৈ পথিক গোরে সাঁবরে সুভগ হৈঁ ।
সুতিয় সলোনী সঙ্গ সোহত সুভগ হৈঁ ।"—ইত্যাদি ।
[এই সম্বন্ধে "গুপ্তজী কী কাব্যধারা-"তে ভালো আলোচনা আছে ।]

তাই "পলাসী কা যুদ্ধ"—কাব্যানুবাদে মৈথিলীশরণ এই ছন্দকে আরও সুন্দরভাবে ব্যবহার করতে পেরেছেন, নবীনচন্দ্রের মূল রচনাতে মিত্রাক্ষরতার জন্য । যেমন—

"আধী রাত হো রহী হৈ মৌন মহীতল হৈ ।
সঘন ঘনোঁ সে ঘিরা ঘোর নভস্থল হৈ ।"—ইত্যাদি ।

এই পঞ্চদশ অক্ষরাত্মক অমিত্রাক্ষর পংক্তিকে মৈথিলীশরণ আপন মৌলিক রচনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন । যেমন—

সহসা বিজয়সিংহ রাজা জোধপুরকে
পোকরণবালে সরদার দেবী সিংহ সে
বোলে দরবার খাস মেঁ কি—দেবী সিংহজী
কোঈ যদি রুঠ জায় মুঝসে তো ক্যা করে ।

—বিকট ভট ।

'যশোধরা' কাব্যগ্রন্থেও এই ছন্দের ব্যবহার করেছেন মৈথিলীশরণ । মৈথিলীশরণ কেবল মধুসূদন-নবীনচন্দ্র প্রভৃতিকে হিন্দী অনুবাদের মাঝখান দিয়ে উপস্থিত করেন নি । বাংলাতে উনবিংশ শতাব্দীতে নূতন করে 'কাহিনী কাব্য' রচনার ধারা সুরু হয়েছিল । এই কাব্যরচনার জন্য বাঙ্গালী কবিরা রামায়ণ ('মেঘনাদবধ'), মহাভারত (রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস'), পুরাণ (বৃত্রসংহার), রাজপুত কাহিনী (পদ্মিনী উপাখ্যন), কিছুই বাদ দেন নি । মৈথিলীশরণ হিন্দী সাহিত্যে পুরাতন গ্রন্থাদি হ'তে উপাদান সংগ্রহ ক'রে হিন্দীতে নূতন করে কাহিনী কাব্যের ধারা যোগ করলেন । কবিবর মৈথিলীশরণ বিরচিত 'রঙ্গ মেঁ ভঙ্গ,' 'জয়দ্রথ বধ,' 'পঞ্চবটী,' 'যশোধরা,' 'সাকেত,' প্রভৃতি স্মরণযোগ্য । এগুলি হিন্দী সাহিত্যের ক্ষেত্রে নূতন কাহিনী-কাব্য রচনার সার্থক প্রচেষ্টা । 'জয়দ্রথ বধ'-এ মধুসূদন, 'যশোধরা'-তে নবীনচন্দ্র এবং 'সাকেত'-এ কাব্যের উপেক্ষিতা 'উর্মিলা'র বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের কথা নিশ্চয়ই মনে আসবে, কিন্তু মৌলিক রচনার ক্ষেত্রে মৈথিলীশরণ যে বিচিত্র সাফল্য অর্জন করেছেন তাতে বিন্দুমাত্র ঔজ্জ্বল্য হ্রাস হবে না । এ বিষয়ে আমরা সমালোচক নন্দ দুলারে বাজপেয়ীর সাথে একমত, যে মৈথিলীশরণকে 'কাহিনী কাব্য' রচনার ক্ষেত্র বাংলার হেম-নবীনের সাথে একাসন দিতে কোনও কাব্য-রসিকই সঙ্কুচিত হবেন না ।

দ্বিতীয় যুগের মৌলিক রচনার প্রকৃতি

মৈথিলীশরণের রচনার তৃতীয় স্তর

মৈথিলীশরণের রচনার প্রথম দুটি স্তরের উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে । প্রথম স্তরে, লক্ষ্য করেছি হেমচন্দ্রের ন্যায় বস্তু-কেন্দ্রিক ছোট কবিতা রচনার ধারা, যার মধ্যে দেশপ্রেম উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে । দ্বিতীয় স্তরে, লক্ষ্য করেছি মধু-নবীনের ন্যায় বস্তু-কেন্দ্রিক 'কাহিনী কাব্য' বিরচনা

করা। এর মধ্যে পুরাতন কাহিনীর পুনর্বিন্যাস, পুরাতন চরিত্রের নব-রূপায়ণ, দেশপ্রেম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দুই স্তরেই বস্তু-কেন্দ্রিক কবিতা। তৃতীয় স্তরে আমরা লক্ষ্য করি মৈথিলীশরণ বস্তু-কেন্দ্রিক (objective) কবিতা হ'তে আত্মকেন্দ্রিক (subjective) কবিতার ক্ষেত্রে সরে এসেছেন। এই মানস-পরিবর্তন ঘটল রবীন্দ্রনাথের আত্মকেন্দ্রিক ভগবদ্ভক্তি ও প্রেম-মূলক ইংরাজী 'গীতাঞ্জলি'র নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির (১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ) পর থেকে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনা বিশ্বের স্বীকৃতি পাওয়ার পর থেকে সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে নূতন সুরে সরস্বতীর বীণা বাঁধবার প্রয়াস সুরু হয়। বাংলার 'সবুজ পত্র'-গোষ্ঠি, আসামিতে 'জোনাকি'-দল, ওড়িয়াতে 'সবুজ-সাহিত্য-সমিতি,' হিন্দীতে 'ছায়াবাদ' প্রচারকেরা রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার ধারক ও বাহক। দক্ষিণভারতের সাহিত্যেও অনেক ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন সুরু হয় রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করে—(আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য : শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় : দ্রষ্টব্য)। আমরা এখানে বিশেষ ক'রে হিন্দীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ছায়ায় গড়ে ওঠা মৈথিলীশরণের ছায়াবাদী কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা করব। তবে একথা মনে রাখতে হবে মৈথিলীশরণ নিজে সম্পূর্ণ 'ছায়াবাদী' হয়ে ওঠেন নি। তাঁর কবিতাতে ছায়াবাদের ছায়া এসেছে, কায়া এসেছে পরবর্তী স্তরে আধুনিক হিন্দী কাব্য সাহিত্যের 'বৃহৎ-ত্রয়ী' (নন্দদুলারে বাজপেয়ীজীর ভাষায়) প্রসাদ-পন্ত-নিরালার মাঝখানে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার মূল কথা হ'ল সীমা-অসীমের মিলন লীলা। এই সীমা-অসীমের মিলন-লীলা নরনারীর মিলন-বিরহ-লীলার রূপকের মাঝখানে পরিব্যক্ত হয়েছে। 'জীবনদেবতা' কখনও 'প্রিয়তমা' কখনও 'প্রিয়তম'—তাঁরই সঙ্গে চলেছে জীবনে জীবনে লুকোচুরির খেলা—এই অনুভূতি রবীন্দ্রনাথ থেকে সংক্রামিত হয়েছে 'ছায়াবাদী' কবিদের মধ্যে। মৈথিলীশরণের মধ্যেও এই অনুভূতি এসেছে। দেবতা তাঁর কাছে 'সখা'। 'সখা'কে কি তিনি বলেন :—

"সখে মেরে বন্ধন মত খোল।"

আবার সখ্য থেকে 'মধুর'-এ এসেছে তাঁর অনুভূতি। দেবতা এখন প্রিয়তম, কবি এখানে প্রিয়া।—বলছেন তিনি, "কি চমৎকার লুকোচুরি চলেছে! বারে বারে লুকিয়ে চলেছো তুমি (পুং) ; আর আমি (নারী) তোমায় একেলা চলেছি খুঁজে।"

"অচ্ছী আঁখ-মিচৌনী খেলী
বারবার তুম ছিপো, ঔর মৈঁ
খোজুঁ তুম্হে অকেলী।"

আবার— ... ...

"দাঁড়িয়ে রয়েছি আমার দেহ-ঘট নিয়ে" চাতকের মত রসের প্রত্যাশায়।

লিরিক কাব্য : বাংলার আদর্শানুসরণ

এই আত্মকেন্দ্রিক কবিতা কিন্তু মৈথিলীশরণে সম্পূর্ণ 'ছায়াবাদে' রূপান্তরিত হয় নি। বাংলার আদর্শে গড়ে ওঠা 'লিরিক' কবিতা শাখার মধ্যেই এর পরিণতি হয়েছে। (পণ্ডিত শুক্ল : ঐ : পৃষ্ঠা ৬৪৮)। এই যুগের অন্যান্য কবিদের মধ্যে 'ছায়াবাদ' কম বেশী উচ্ছলিত

হয়েছে—ঠাকুর গোপালশরণ সিংহ, বদরীনাথ ভট্ট, মুকুটধর পাণ্ডেয় প্রভৃতির মধ্যে। 'সরস্বতী'র কবি গিরিধর শর্মা রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র হিন্দী অনুবাদ করেছিলেন। এই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি 'রামনরেশ ত্রিপাঠী'র মধ্যে 'ছায়াবাদে'র ছায়া লক্ষ্য করেছেন পণ্ডিত শুক্ল। 'সরস্বতী' প্রভৃতি পত্রিকার মাঝখান দিয়ে আর একজন হিন্দী কবি বাংলা কবিতাকে হিন্দীর ক্ষেত্রে উপস্থাপিত করার চেষ্টা ক'রে এসেছেন—তিনি হলেন পারশনাথ সিংহ। তিনি ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ হ'তে ধারাবাহিক ভাবে এ চেষ্টা ক'রে এসেছেন (শুক্ল : ঐ : পৃষ্ঠা ৬৪৭)। এই 'লিরিক' কাব্যধারায় বাংলার আদর্শানুসরণই হ'ল মৈথিলীশরণের তৃতীয়স্তরের ভাববৈশিষ্ঠ্য।

নূতন ছন্দ

বাংলার আদর্শে গড়ে উঠেছিল 'হিন্দী'তে অমিত্রাক্ষর। এবার বাংলার 'গীতিকবিতা'র আদর্শে গড়ে উঠল 'মিত্রাক্ষর'-এ নূতন ছন্দ। বাংলা-সাহিত্যে ছন্দ ছোট বড় পংক্তির মাঝখান দিয়ে ভরা আনন্দে অন্ধের মত ছুটে চলে এসেছে রবীন্দ্রনাথে। পরবর্তী কালে 'হিন্দী'তে নিরালাজীর হাতে ছোট বড় পংক্তির বিচিত্র মিত্রাক্ষর ('রবার ছন্দ' নামে প্রচলিত, পংক্তিকে টেনে ছোট বড় করা হয়েছে বলে) বিকশিত হয়ে উঠেছে। আমরা মৈথিলীশরণের মধ্যে তারই পূর্বাভাস লক্ষ্য করি! যেমন—

মেরে আঙ্গন কা এক ফুল।
সৌভাগ্য-ভাব সে মিলা হুআ, শ্বাসোচ্ছ্বাসন সে হিলা হুআ
সংসার বিটপ মেঁ খিলা হুআ,
ঝড় পড়া অচানক ঝুল ঝুল।

অথবা

সাখ, নিরখ নদী কী ধারা
ঢল মল ঢল মল চঞ্চল অঞ্চল, ঝলমল ঝলমল তারা।
নির্মল জল অন্তস্তল ভরকে উছল উছল কর ছল ছল করকে
বল বল তরকে কলকল ধরকে বিখরাতী হৈ পারা।

এমনি ক'রে তৎসম-শব্দ-প্রধান ভাষায়, নূতন ছন্দ, আর নূতন ভাবের গীতিকবিতাতে বাংলা কাব্য সাহিত্য আপনাকে প্রসারিত করল হিন্দীর ক্ষেত্রে। পরবর্তী কালে তা আরও গভীর এবং ব্যাপক অনুকৃতির মধ্যে 'ছায়াবাদী' কবিদের রচনাতে কি ভাবে সৌন্দর্য বিধান করেছে, তা বারান্তরে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

বৈদিক অসুর ও দেবতা

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

১। বৃত্র

আমরা সাধারণভাবে যে জগৎ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, বেদবিদ্যা ঠিক সেই জগতের বিদ্যা নহে। প্রথমে মনে হয়, উহা যেন শুধু অন্তর্জগতেরই বিদ্যা। কিন্তু অন্তর্জগৎ যতই উদ্ভাসিত হইতে থাকে, ততই বুঝা যায় যে, এ বিদ্যা মাত্র অন্তর্জগতের বিদ্যা নহে ; অন্তর্জগৎ উদ্ভাসিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বহির্জগৎ যে আকারে আকারিত হইয়া অভিনব জগৎমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করে, বেদবিদ্যা সেই জগতেরও বিদ্যা বটে। সুতরাং অন্তর্জগৎ এবং অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা উপলব্ধ বহির্জগৎ (যদিও তখন বহির্জগৎ বলা চলে না), এই উভয় জগতের বিদ্যার নাম বেদবিদ্যা। এই কথাটি মনে রাখিয়া বেদালোচনায় অগ্রসর হইতে হইবে।

অন্তর্জগতের নাম অনুভূতিময় জগৎ এবং অন্তর্দৃষ্টিতে উপলব্ধ বহির্জগতের নাম সম্ভূতিময় জগৎ। অনুভূতিময় জগতে বেদ ও দেবগণের তাৎপর্য্য ও মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয়। সম্ভূতিময় জগতে বেদ ও দেবগণ মূর্ত্ত হইয়া উঠেন। আত্মা বা ব্রহ্ম কি ভাবে নিজ সম্ভূতি-শক্তির দ্বারা জগন্মূর্ত্তি ধারণ করেন এবং ব্যষ্টি জীবরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অনুভূতিশক্তির দ্বারা কিরূপে জগদ্‌ভোগ করেন, এই দুই উপায়ে সাধকগণ তাহা অবগত হইয়া থাকেন।

সুতরাং অনুভূতি ও সম্ভূতি, এই দুই তত্ত্ব বেদবিদ্যার প্রধান বিষয়। এই জন্য ঈশোপনিষদে সম্ভূতি ও অনুভূতিকে একসঙ্গে অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত বিদিত হইবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

অন্তর্জগতে প্রবেশ করিয়া এক দিকে যেমন দেবগণের তাৎপর্য্য ও মাধুর্য্য ভোগ করা যায়, অন্য দিকে তেমনি অসুরগণের বিদ্যমানতা ও বলবত্তা উপলব্ধ হয়। এই জন্য ঋগ্‌বেদসংহিতা ঋষিবৃন্দকৃত ইন্দ্রাদি দেবগণের স্তুতিতে পরিপূর্ণ এবং সেই স্তুতিসমূহ আবার বৃত্রাদি অসুরবধের কাহিনীময়।

অসুর ও দেব, উভয়েই সাধারণ জ্ঞানের অতীত। ঋষিগণ অন্তর্দৃষ্টির সহায়ে তাঁহাদিগকে যে ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং মনুষ্যের ঊর্দ্ধ ও নিম্নগতি লাভের প্রতি তাঁহাদের প্রভাব যে ভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, বেদে তাহা বর্ণিত আছে। দেবগণ তুষ্ট হইলে মনুষ্যকে ঊর্দ্ধগতি দান করেন, আর অসুরগণ মানুষকে মর্ত্ত্য জগতে বাঁধিয়া রাখে, ঊর্দ্ধমুখী হইতে দেয় না, অবাধ আত্মবিজ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতে বাধা দেয়। সেই জন্য শ্রেয়স্কামী মনুষ্য যেমন দেবতত্ত্ব বুঝিবার জন্য যত্নশীল, অসুরগণের স্বরূপ বিজ্ঞাত হওয়াও তেমনই প্রয়োজনীয়। বর্ত্তমান আলোচনায় প্রথমতঃ বৃত্র অসুরের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে চেষ্টা করা যাইবে।

সৃষ্টিকে দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে ; এক, অচেতন বা ভৌতিক সৃষ্টি ; দুই,

সচেতন বা অধ্যাত্মবোধসম্পন্ন জীবসৃষ্টি। তন্মধ্যে ভৌতিক সৃষ্টি পঞ্চীকরণময় এবং জীবসৃষ্টি ত্রিবৃন্ময়। মূলতঃ যাহা মহদ্ভূত বা ভূতসূক্ষ্ম, তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। বিশুদ্ধ ভূতসমূহের একটির অর্ধাংশ এবং অপর চারিটির মধ্যে প্রত্যেকের এক এক অংশ, এই পঞ্চ অংশ মিলিত হইয়া যে স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল ভূত উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম পঞ্চীকরণময় ভৌতিক সৃষ্টি। ত্রিবৃন্ময় সৃষ্টি হইল মুখ্যতঃ অধ্যাত্মবোধসম্পন্ন মনুষ্যাদি জীবসৃষ্টি। এবং গৌণতঃ ত্রিবৃদ্ভাব ভৌতিক জগতেরও মূলীভূত বটে। এ বিষয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলেন,—

সৎ তু এব সৌম্য! ইদম্ অগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

হে সৌম্য! সৃষ্টির অগ্রে ইদংপদবাচ্য এই সকল এক এবং অদ্বিতীয় সৎস্বরূপে বিদ্যমান ছিল।

তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি তৎ তেজোঽসৃজত,
তত্তেজ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি তৎ অপঃ অসৃজত।
...তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাম প্রজায়েমহীতি তা অন্নম্
অসৃজত।...

সেই সৎস্বরূপ ঈক্ষণ করিলেন—আমি বহু হইয়া জাত হইব, এই বলিয়া তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন; তেজ ঈক্ষণ করিলেন—আমি বহু হইয়া জাত হইব, এই বলিয়া তিনি অপ সৃষ্টি করিলেন; অপ্ ঈক্ষণ করিলেন—আমি বহু হইয়া জাত হইব, এই বলিয়া তিনি অন্ন সৃষ্টি করিলেন।

সৎস্বরূপ আত্মা নিজেকে তেজ, অপ ও অন্ন, এই তিন রূপে সৃষ্টি বা বরণ করিলেন, এই জন্য ইহার নাম ত্রিবৃন্ময় সৃষ্টি। ইহা ভৌতিক তেজ, জল ও অন্নের সৃষ্টি এই জন্য নহে যে, সৎস্বরূপ আত্মার ন্যায় তেজ এবং অপ্ বা জলেরও ঈক্ষণকর্তৃত্ব ও নিজেকে বহুরূপে জাত করিবার ক্ষমতা দেখা যাইতেছে। বস্তুতঃ এই সৃষ্টি যে, সমস্ত জীবের মূলীভূত দৈবী সৃষ্টি, তাহা পরবর্তী শ্রুতির 'তেষাং খলু এষাং ভূতানাং ত্রীণি এব বীজানি ভবন্তি' এবং 'সেয়ং দেবতা ঐক্ষত হন্ত অহম্ ইমাস্তিস্রো দেবতাঃ' এই মন্ত্রাংশেই সুব্যক্ত রহিয়াছে।

ছান্দোগ্যে যাঁহাদিগকে তেজ, অপ ও অন্ন বলা হইয়াছে, বৃহদারণ্যকে তাঁহাদিগকেই বলা হইয়াছে বাক্, প্রাণ, মন।

ত্রীণি আত্মনে অকুরুত মনো বাচং প্রাণং।

আত্মা নিজের জন্য তিনটি অন্ন প্রস্তুত করিলেন; তাহার নাম বাক্, প্রাণ, মন্।

যাহা হউক, উপরে যে তেজ, অপ্, অন্ন বা বাক্, প্রাণ, মন, এই আদি ত্রিবৃৎ সৃষ্টির উল্লেখ দেখা গেল, ইহা হইল সমগ্র জীবসৃষ্টির মূলীভূত দৈবী সৃষ্টি। 'তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং একৈকাং অকরোৎ'—সেই তিন তিন দেবতাকে একত্র গ্রহণ করিয়া বা সেই তিন দেবতার সমাসে যাবতীয় জীবসৃষ্টি সম্পন্ন হইয়াছে, ইহাই বেদের সিদ্ধান্ত।

মূলে বা অন্তরে আত্মা নিজেকে যে ত্রিবৃৎ বা তিন ভাবে বরণ করিয়াছেন, তাহা দৈবী সৃষ্টি বলিয়া, সেখানে অনাত্মবোধের কোনরূপ প্রকাশ নাই। তেজ, জল, অন্ন বা বাক্, প্রাণ, মন আকারীয় আত্মার তিনটি বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিলেও এবং তাঁহাদের ক্রিয়া ভিন্ন

ভিন্ন হইলেও একই আত্মতত্ত্বের অন্তর্গত বলিয়া সকলেই পরস্পর আত্মবোধসম্পন্ন। সৎস্বরূপ আত্মা ত্রিবৃন্ময় হইলেন, ইহার অর্থ—তিনি 'মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ' (ছান্দোগ্য) হইলেন। 'মনোময়' অর্থ—আত্মা নিজে অন্ন বা দৃশ্যের আকার গ্রহণ করিলেন ; 'প্রাণশরীর' অর্থে—তিনি নিজে অপ্, জল বা প্রাণ আকারীয় আয়তন বিস্তৃত করিয়া, তাহাতে ভোগময় হইলেন ; আর 'ভারূপ' অর্থে—তিনি বাক্‌ময়, তেজোময় হইলেন বা নির্বেদ স্বরূপ হইতে উত্থিত হইয়া 'নিজেকে নিজে জানা'রূপ তেজোময় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিলেন। তিনি নিজেকে এই তিন আকারে বরণ করিলেন, এই জন্য বেদ ইহার নাম দিয়াছেন ত্রি-বৃৎ। পূর্বে বলা হইয়াছে, ইহা দৈবী বা বিদ্যাময় সৃষ্টি।

আর 'ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং একৈকাং অকরোৎ'—ঐ তিন তিনকে মূলতঃ একত্র গ্রহণ করিয়া বা ত্রিবৃতের সমাস রচনা করিয়া, আত্মা যখন জীবরূপে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন, তখন নাম, রূপ ও কর্ম্মময় তাঁহার জীবভাব বা মনুষ্যভাব ফুটিয়া উঠিল এবং তাহার স্থিতি হইল ঐ দেবভূমির বাহিরে। ইহা অবিদ্যা বা আত্মবিদ্যার বিপরীতভাবীয় সৃষ্টি বলিয়া, এখানে পূর্ব্বোক্ত ত্রি-বৃৎ উল্টাইয়া গিয়া, এবং আত্মবোধশূন্য হইয়া ফুটিয়া উঠিল বৃ-ত্র আকারে। সুতরাং দেবভূমিতে যাহা ত্রি-বৃৎ, অর্থাৎ আত্মার নিজেকে নিজে তিন আকারে বরণ করা, জীবভূমিতে তাহা উল্টাইয়া গিয়া এবং ত্রি অর্থাৎ বাক্ প্রাণ মন ইকারশূন্য বা দেবশক্তিহীন হইয়া বৃ-ত্র অসুরের জন্ম হইল। আর জীবভূমিতে 'নিজেকে তিন ভাবে বরণ করা' ভাবটিও রহিল না, তৎপরিবর্ত্তে আসিল বাধ্যতামূলক ভাব বা অধীনতা ; এই জন্য 'বৃৎ'এর 'ৎ' লুপ্ত হইয়া 'বৃত্র' অসুর জন্মিল।

তাহার ফলে হইল কি? বেদে যিনি একমাত্র বিজ্ঞাতা বলিয়া বর্ণিত,—'ন অতঃ অন্যঃ অস্তি বিজ্ঞাতা'—ইনি ভিন্ন অন্য কোথাও কেহ বিজ্ঞাতা নাই, এই বলিয়া ঋষি যে বিজ্ঞাতা আত্মার কথা ঘোষণা করিয়াছেন, মনুষ্যের নিকট তিনি হইলেন অজ্ঞাত। আর আমাদের ভোগ বা প্রাণ হইল জড়ীভূত এবং ভোগ্য বা অন্ন হইল জড় পদার্থ। ইহারই নাম অন্ধকার এবং এই অন্ধকাররূপ বৃ-ত্র আমাদিগকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

ঋক্‌সংহিতার ১ম মণ্ডল, ৩২ সূক্তের ৫ম ঋকে বৃত্রকে 'বৃত্রতরং' বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন—'বৃত্রতরং অতিশয়েন লোকানাং আবরকং অন্ধকাররূপং।' গীতার ভগবদুক্তিও এই কথারই সমর্থন করে—'যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥' প্রাণিগণ যে ভূমিতে জাগ্রত থাকে, আত্মদ্রষ্টা মুনির নিকট তাহা নিশা বা অন্ধকারস্বরূপ। সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ আত্মাকে জানিতে না পারা এবং তাহার ফলস্বরূপ জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের জড়াকৃতিতে পরিণতি, ইহারই নাম ত্রিবৃতের বিপরীত বৃত্র অসুর। আগামী বারে ইন্দ্র ও তৎকর্ত্তৃক বৃত্রহনন বিষয়ে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

বাংলা ভাষায় বিদ্যাসুন্দর-কাব্য

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

অধ্যাপক শ্রীত্রিদিবনাথ রায় এম.এ.

৫। গ। বিদ্যার বাসকসজ্জা ও উৎকণ্ঠাবস্থা

গোবিন্দদাস, কৃষ্ণরাম, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ও মধুসূদন চক্রবর্তীর বিদ্যাসুন্দর আখ্যানের 'প্লট' মোটামুটি একই প্রকার। তবে প্রত্যেক কবি তাহার মধ্যে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন। বলরাম ও দ্বিজ রাধাকান্ত তাঁহাদের কাব্যে প্রচলিত পন্থা হইতে একটু সরিয়া গিয়াছেন।

বলরাম স্নানব্যপদেশে বিদ্যা-সুন্দরের সাক্ষাৎ ও সেইখানে উভয়ের সঙ্কেতে আলাপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা সম্ভবতঃ তিনি সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর হইতে লইয়াছেন। এই আলাপের মধ্যেই সুন্দর বিদ্যাকে আশ্বাস দিয়াছেন—

"আজি মনোরথ মোর পূরিব নিশ্চয়। শুন মধুকরি তোর যাইব নিলয়॥"

সখীগণ যখন কৃষ্ণলীলা গীত গাহিতেছিল, বিদ্যা তখন তাহাদিগকে বলিলেন—

"শুন সখীগণ দেখিল স্বপন আজি রজনীর শেষে।
একই সুন্দর বহু গুণ ধর শুইয়াছিল মোর পাশে॥
আপনি স্বপনে হাসি তার সনে হার দিল তার গলে।
সেই হইতে মোর চিত্ত হইল চোর না জানি কি ফল ফলে॥"

ইহার পর বলরাম বিদ্যার বাসকসজ্জা বর্ণনা করিয়াছেন। সখীগণকে বিদ্যা কালীপূজার আয়োজন করিতে বলিলেন। তাহারা কুঙ্কুম, কস্তুরী, ধূপধুনা, চন্দন, মৃগমদ সংগ্রহ করিয়া, কুসুমমালা গাঁথিয়া বিদ্যার পূজার আয়োজন করিয়া দিল। তাহার পর—

"সখীগণ বসে বঞ্চেন দিবসে হইল রজনীমুখ।
আনিব সুন্দর আজি মোর ঘর বিদ্যার অন্তরে সুখ॥
তেয়াগিয়া লাজ বিদ্যা করে সাজ কালী-পূজিবার ছলে।"

ইহার পর কবি বিদ্যার সজ্জা বর্ণনা করিয়াছেন—নায়কের আগমনে রাজকুমারী অলঙ্কারে দেহ সজ্জিত করিয়া, নয়নে কজ্জল দিয়া, কবরীতে মালতীমালা ও তাহার মধ্যে গন্ধরাজ চাঁপা গুঁজিয়া প্রসাধনান্তে দর্পণে নিজরূপ দর্শন করলেন। এ দিকে সুন্দর কালীর আরাধনা করিলে দেবীবরে যে সুড়ঙ্গ হইল, সেই পথে বিদ্যার মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। ও দিকে বিদ্যা কুমারকে ভাবিয়া ঘন ঘন ঘর-বাহির করিতেছেন—বাসকসজ্জা করিয়া 'দুয়ারে কপাট দিয়া সখীগণে তেয়াগিয়া' বিরহে কাঁদিতেছেন, এমন সময় সুন্দর আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সুতরাং আগাগোড়াই বিদ্যা, সুন্দরের সহিত মিলনের ব্যাপারটি সখীগণের নিকট হইতে গোপন করিয়াছেন, এইটি বলরামের বৈশিষ্ট্য।

দ্বিজ রাধাকান্ত উভয় দিক্ বজায় রাখিয়াছেন। দেবীর বরে কজ্জল লাভ করিয়া, অদৃশ্য হইয়া সুন্দর কামপূজাকালে অশোকবনে বিদ্যাকে দেখিয়াছেন ও দর্শন দিয়াছেন—সেইখানেই বিদ্যাসুন্দরের বিচার হইয়াছে। বিদ্যা পুলকিতচিত্তে গৃহে ফিরিবার সময় সখীরা তাহার সাত্ত্বিক ভাব দেখিয়া পরিহাস করিয়াছে। তাহার পর কবি বিদ্যা সুন্দরের উৎকণ্ঠাবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। বিদ্যা সুন্দরের প্রতিকৃতি অঙ্কন করিলে, সখীগণ তাহার পার্শ্বে বিদ্যার চিত্র অঙ্কন করিয়াছে। মালিনী প্রভাতে ফুল জোগাইতে আসিয়া বিদ্যার বিরস বদন দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বিদ্যা—মনের দুঃখ হইয়াছে বলিয়া কাটাইয়া দিতে চাহিলেন। সখীগণ চিত্রপটটি আনিয়া মালিনীকে দেখাইলে মালিনী সুন্দরকে চিনিতে পারিল ও বলিল, সে ঐ যুবাকে তাহার গৃহে আশ্রয় দিয়াছে। সুতরাং রাধাকান্তের মালিনী বিমলা বিদ্যা ও সুন্দরের মিলনের দৌত্য করে নাই। ইহার পর সুন্দর পুনরায় অদৃশ্য হইয়া বিদ্যার ভবনে গিয়া তাহার সহিত দর্শন প্রভৃতি সম্বন্ধে বিচার করিয়া জয়লাভ করিলে বিদ্যা তাঁহাকে জয়পত্র লিখিয়া দিলেন।

পরে বিদ্যা-সুন্দর সন্ন্যাসিনী ও সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে রাজসভায় গিয়া রাজার নিকট হইতে ছলে বিদ্যাকে বাক্‌দত্তা করাইয়া লইলেন। তাহার পর বিদ্যা কজ্জল চুরি করিলে সুন্দর কালিকার কৃপায় সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া সেই পথে বিদ্যার গৃহে গমন করিলেন। সুতরাং দ্বিজ রাধাকান্তের কাব্যে বাসকসজ্জিতা বিদ্যার বর্ণনা নাই।*

ভারতচন্দ্র তাঁহার রসমঞ্জরীতে বাসকসজ্জিতা নায়িকার বর্ণনা করিয়াছেন,—

"পতি হেতু বাসঘরে যেই করে সাজ। বাসসজ্জা বলে তারে পণ্ডিতসমাজ ॥"

উদাহরণ দিয়াছেন—

"আঁচড়িয়া কেশপাশ পরিয়া উত্তম বাস সখীসঙ্গে পরিহাস গীতবাদ্যরটনা।
চামর চন্দন চূয়া ফুলমালা পান গুয়া হাতে লয়ে শারি শুয়া কামরস পঠনা ॥
কিঙ্কিণী কঙ্কন হার বাজুবন্দ সিঁতিতাড় নূপুরাদি অলঙ্কার নিত্য নব পরনা।
যোগী যেন যোগাসনে বসিযা ভাবয়ে মনে কত ক্ষণে বন্ধু সনে হইবেক ঘটনা ॥"

কৃষ্ণরাম লিখিয়াছেন,—বিদ্যা কালীর স্তব করিলে যখন দেবী আকাশবাণী করিলেন—

"আস্যাছে তোমার পতি সুন্দর সুন্দর অতি নিকটে আসিব সদ্য সেই ॥"

তখনই—

"শুনিয়া নিশ্চয়কথা ঘুচিল মনের ব্যথা পরম কৌতুকী সখীগণ।
বেশ কৈল সভে তার বিশেষ কি কব আর রূপবতী সুন্দর যেমন ॥
বুঝিয়া বিদ্যার মন সুলোচনা ততক্ষণ বিছানা করিল মনোহর।
সাতকুম্ভ বারি ঝারি রাখিল পূর্ণিত করি রাখে পূর‍্যা পান সুধাকর ॥

* বসুমতীর 'বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী'তে দ্বিজ রাধাকান্তের বিদ্যাসুন্দরে "বিদ্যার বাসর সজ্জা" বলিয়া যে প্রসঙ্গ আছে, তাহা আদৌ বাসকসজ্জার বর্ণনা নহে।

নানা কুসুমের হার　　অগৌর চন্দনসার　　গন্ধে হরে মুনির মানস।
রত্নসিংহাসন পাতে　　গিরিদাযুগল তাতে　　রম্য চারু উপরে রূপষ॥"

তার পর রজনীতে সুন্দরের জন্য প্রতীক্ষাকালে লিখিতেছেন—

"সাজায়ে কুসুমমালা　　বসিয়াছে নৃপবালা　　সখীসঙ্গে পরমকৌতুকী।
রূপে তার রতি জনু　　জড়িত করয়ে তনু　　পরবল মদন ধানুকী॥
সুলোচনা আদি আনি　　যুকত করিয়া পানি　　করে চারু চামর সমীরে।
নিশিদণ্ড করে খেলা　　কতক্ষণ হবে মেলা　　আসিব সে সুন্দর সুধীরে॥"*

রামপ্রসাদ বিদ্যার বাসসজ্জার বর্ণনায় বিদ্যার প্রসাধন বর্ণনা করেন নাই, কেবল সখীগণ-কর্তৃক গৃহসজ্জা বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে কৃষ্ণরামের বর্ণনার নিকৃষ্ট অনুকরণ প্রকাশ পাইতেছে—

"সুন্দরীর সহচরী ভালো জানে চর্য্যা।　　রতনমন্দিরে করে মনোহর শয্যা॥
দুই দুই তকিয়া খাটের দুই পাশে।　　রূপবতী বিদ্যাবতী মনে মনে হাসে॥
বড় এক গিরদা শিয়রে সখী রাখে।　　এই বটে দেখ এসে হেসে হেসে ডাকে॥
ঢৌল ভাঙ্গি টাঙ্গাইল চিকন মশারি।　　ভৃঙ্গারে পূরিত রাখে সুবাসিত বারি॥
ভক্ষ্য দ্রব্য নানা জাতি মণ্ডা মনোহরা।　　সরভাজা নিখতি বাতাসা রসকরা॥
অপূর্ব্ব সন্দেশ নামে এলাইচ দানা।　　ফুল চিনি লুচি দধি দুগ্ধ ক্ষীর ছানা॥
সাজাইল বাটাতে কর্পূর সাঁচি বিড়া।　　ভক্ষণে যুবকজনা সুখে করে ক্রীড়া॥
কৌটাভরা ছাঁকা চুণ কর্পূরের সঙ্গ।　　এলাইচ জায়ফল জইত্রি লবঙ্গ॥
কালাগুরু মৃগমদ কুঙ্কুম কস্তুরী।　　সুগন্ধ চন্দনগন্ধে আমোদিত পুরী॥
মল্লিকা মালতীমালা সুবর্ণের পাত্রে।　　যুবক যুবতী দেহ দহে ঘ্রাণ মাত্রে॥"

এ যেন কোন বিলাসিনী বারবনিতা লম্পট নাগরের আশায় গৃহসজ্জা করিতেছে; অনূঢ়া রাজকন্যার প্রেমাস্পদের জন্য প্রতীক্ষা নহে।

মধুসূদন চক্রবর্তী বিদ্যার বাসকসজ্জার বর্ণনা করেন নাই। ভারতচন্দ্র বিদ্যার বাসকসজ্জা বর্ণনা করেন নাই বটে, কিন্তু তাহার উৎকণ্ঠা বর্ণনায় বাসক-সজ্জার আভাস দিয়াছেন। উৎকণ্ঠিতা নায়িকা সম্বন্ধে ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন—

"স্বামীর বিলম্ব যেই ভাবে অনুক্ষণ।　　উৎকণ্ঠিতা তাহারে বলয় কবিগণ॥"

গোবিন্দদাস বা কৃষ্ণরাম উৎকণ্ঠিতা বিদ্যার বর্ণনা করেন নাই। রামপ্রসাদ তাহা সংক্ষেপে সারিয়াছেন—

"গগনেতে মেঘ দেখি　　আনন্দ অপার শিখী　　মন্দ মন্দ মলয় সমীর।
সুচারু কুসুমঘ্রাণ　　স্মরশরে দহে প্রাণ　　বিদ্যা বিনোদিনী নহে স্থির॥
রসমই কহে সই　　কই সে নাগর কই　　তাহা বই মনে নাহি ভায়।
নাহি সুখ একটুক　　মহাদুঃখে ফাটে বুক　　প্রায় বুঝি প্রাণ মোর যায়॥"

* পুথিদ্বয়ের পাঠ অত্যন্ত ভ্রমপূর্ণ।

বলরাম বিত্থার প্রসাধন বর্ণনা করিয়াছেন বটে এবং তাঁহার উৎকণ্ঠিতাবস্থা বর্ণনায় গৃহসজ্জাও কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়াছেন—

"এথা বিত্থা নিকেতনে কুমার ভাবিয়া মনে ঘন ঘন করে বারি ঘর ॥
গন্ধে কৈল আমোদিত নানা পুষ্পে সুশোভিত পালঙ্কের উপরে মশারি।
শোভে মুকুতার ঝারা হীরামাণিকের তারা তাহে একা আছয়ে সুন্দরী ॥
বিরহে ব্যাকুলী হৈয়া কুমারের নাম লৈয়া কান্দে বিদ্যা বিরহে আকুল।
কুঙ্কুম কস্তুরী যত অঙ্গে ভূষণ শত মলয়জ অঙ্গে লাগে শূল ॥
দুয়ারে কপাট দিয়া সখীগণে তেয়াগিয়া কান্দে বিত্থা বিরহে কাতর।
ছাড়িয়া আমার তরে গেল সে কুমারবরে নৃপতি সুন্দর নিজঘর ॥"

এইবার আমরা দেখাইতেছি, ভারতচন্দ্র এই উৎকণ্ঠিতা বিত্থার অবস্থা কেমন সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

"ওথায় সুন্দরী লয়ে সহচরী ভাবয়ে মন আকুল।
করিয়া কেমন আসিবে সে জন ঘুচিবে দুখের শূল ॥
দুয়ার যতেক দুয়ারী ততেক পাখি এড়াইতে নারে।
আকাশ-বিমানে যদি কেহ আনে কি জানি নারে কি পারে ॥
কি করি বল না আ লো সুলোচনা কেমনে আনিবে তারে।
তারে না দেখিয়া বিদরয়ে হিয়া যে দুখ তা কব কারে ॥
চাঁদের মণ্ডল বরিষে গরল চন্দন আগুনকণা।
কর্পূর তাম্বূল লাগে যেন শূল গীত নাট ঝনঝনা ॥
ফুলের মালায় সূচের জ্বালায় তনু হৈল জর জর।
মন্দ মন্দ বায় বজ্জরের ঘায় অঙ্গ কাঁপে থর থর ॥
কোকিল হুঙ্কারে ভ্রমর ঝঙ্কারে কানে হানে যেন তীর।
যত অলঙ্কার জ্বলন্ত অঙ্গার পোড়ায় মোর শরীর ॥
এ নীল কাপড় হানিছে কামড় যেমন কাল সাপিনী।
শয্যা হৈল শাল সজ্জা হৈল কাল কেমনে জীবে পাপিনী ॥
রজনী বাড়িছে যে পোড়া পুড়িছে কি ছার বিছার জ্বালা।
বৎসর তিলেকে প্রলয় পলকে কেমনে বাঁচিবে বালা ॥
ক্ষণেক শয্যায় ক্ষণেক ধরায় ক্ষণেক সখীর কোলে।
ক্ষণে মোহ যায় সখীরা জাগায় বঁধু এল এই বোলে ॥"

(ঘ) বিত্থার গৃহে সুন্দরের উপস্থিতি ও বিদ্যাসুন্দরের রহস্যালাপ

বিত্থা যখন উৎকণ্ঠিতা হইয়া সুন্দরের অপেক্ষা করিতেছিলেন, তখন সহসা ভূগর্ভ হইতে সুন্দরের আবির্ভাব কি ভাবে বিভিন্ন কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে, এইবার সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

গোবিন্দদাস লিখিতেছেন—

"কামদেব জিনি রূপ অতি মনোহর। সচকিত সখিগণ দেখিয়া সুন্দর॥
আচম্বিতে মন্দিরেতে চন্দ্রের উদয়। কৌতুকেতে বিদ্যাবতী লুকায় লজ্জায়॥"

কবি এখানে সুড়ঙ্গপথে সুন্দরের আবির্ভাবে বিদ্যার বা সখীগণের যে বিশেষ বিস্ময়ের কারণ হইয়াছিল তাহা প্রকাশ করেন নাই। বিদ্যা সুন্দরকে দেখিয়া লজ্জিতা হইয়া লুকাইয়াছিলেন, এ কেবল নবোঢ়াসুলভ লজ্জার বর্ণনা, বিস্ময়ের প্রকাশ ইহাতে কিছু নাই। কৃষ্ণরাম লিখিতেছেন—

"সহায় পরমদেবী সুন্দর সুন্দর কবি বিদ্যার মন্দিরে উপনীত।
চন্দ্রের উদয় কিবা রজনী হইল দিবা সখীসঙ্গে রামা চমকিত।"

ইহা গোবিন্দদাসের বর্ণনার প্রতিধ্বনি মাত্র। বরং গোবিন্দদাস যে বিদ্যার নবোঢ়াসুলভ লজ্জার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ইহাতে নাই। মধুসূদন বিস্ময়ের চিহ্ন মাত্র প্রকাশ করেন নাই। যেন পূর্ব হইতেই ঠিক ছিল, সুন্দর যথাকালে উপস্থিত হইবেন। রাধাকান্তের সুন্দর তো কজ্জল সাহায্যে পূর্ব হইতেই যাতায়াত করিতেছিলেন। কজ্জল চুরির পর যখন সুড়ঙ্গপথে বিদ্যার গৃহে উপস্থিত হইলেন, তখন—

"এথা চমৎকার দেখি বিদ্যার অন্তর। ধন্য ধন্য প্রাণনাথে বাখানে বিস্তর॥
সখী কহে তব নাথ চোরচূড়ামণি। এ নহে মানব কভু দেব অনুমানি॥
বিদ্যা বলে বহু রত্ন এ ভূমিমণ্ডলে। কি না করিবারে পারে মন্ত্র অনুবলে॥"

এখানেও বিশেষ বিস্ময়ের বর্ণনা নাই। যেন কোন চতুর যাদুকর তাহার ভেল্কী দেখাইল, দর্শকগণ বাহবা বলিয়া করতালি দিল।

রামপ্রসাদ সর্ব্বত্র কৃষ্ণরামেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন, এখানেও তাই। তিনি লিখিতেছেন—

"এই যুক্তি করে বসি শরদ-পূর্ণিমাশশী হেন কালে উপস্থিত কবি।
রূপতুল্য বটে নাম মহাকবি গুণধাম প্রচণ্ডপ্রতাপে যেন রবি॥"

বলরাম লিখিতেছেন—

"কুমারী ভাবেন ব্যথা হেন কালে গেল তথা সুন্দর (সে) নৃপতিকুমার।
কপাট নাহিক খসে বসিয়া বিদ্যার পাশে দেখি ত্রাস হইল বিদ্যার॥
কুমার পাশেতে দেখি কুমারী লজ্জিত সুখী চাঁদমুখ ঝাঁপয়ে বদনে।
হাসিয়া কুমার ধরে বিদ্যাবতীর অম্বরে শ্রীকবিশেখর সুবচনে॥"

বলরামের বর্ণনা যথেষ্ট স্বভাবিক হইয়াছে। হঠাৎ বদ্ধ ঘরের মধ্যে সুন্দরকে দেখিয়া বিদ্যার ত্রাস সঞ্চার হইবারই কথা। নিতান্ত প্রিয় বলিয়া বিদ্যা মূর্চ্ছিতা হন নাই, নচেৎ মূর্চ্ছিতা হইতেন। এইবার ভারতচন্দ্রের বর্ণনা দেখা যাউক—

"এরূপে কামিনী কাটিছে যামিনী সুন্দর হেন সময়।
সুড়ঙ্গ হইতে উঠিলা ত্বরিতে ভূমিতে চাঁদ উদয়॥

দেখি সখীগণ চমকিত মন বিদ্যার হইল ভয়।
হংসীর মণ্ডল যেমন চঞ্চল রাজহংস দেখি হয়॥
একি লো একি লো একি কি দেখি লো এ চাহে উহার পানে।
দেব কি দানব নাগ কি মানব কেমনে এল এখানে॥
কপাট না নড়ে গুঁড়াটি না পড়ে কেমনে আইল নর।
ভারত বুঝায় না চিন ইহায় সুন্দর বিদ্যার বর॥"

ইহাতে বিদ্যার ভয়, সখীগণের বিস্ময় ও চাঞ্চল্য ভারতচন্দ্র অল্প কথায় প্রকাশ করিয়াছেন।

গোবিন্দদাসের সুন্দর বিদ্যার গৃহে ঢুকিয়াই একেবারে পালঙ্কের উপর উঠিয়া বসিলেন, কাহারও অভ্যর্থনার অপেক্ষা করিলেন না। বিদ্যা ও সখীগণ ভাবিতে লাগিলেন—কি ভাবে আলাপ আরম্ভ করা যায়, এমন সময় ময়ূর ডাকিল। কৃষ্ণরাম লিখিয়াছেন—

"স্বর্ণঝারি করি পূর্ণ কিঙ্করী দিলেন অর্ঘ্য গুণ নীর-নিধির নন্দন।
পাখালিয়া পদদ্বন্দ্ব হৃদয় পরমানন্দ রাকা ইন্দু নিন্দিয়া বদন॥
অভিন্ন মদনকায়ে কসিল কনক প্রায়ে বসিলা রতনসিংহাসনে।
অপাঙ্গ লোচনে দেখি মোহযুতা বিধুমুখী প্রশংসা করয়ে রামাগণে॥"

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কৃষ্ণরাম বিদ্যাসুন্দরের দর্শনপ্রসঙ্গ বর্ণনা করেন নাই, মালিনীর মুখেই উভয়ের পরিচয়, কেহ কাহাকেও দেখেন নাই। কালীর দৈববাণীতে মাত্র জানিয়াছিলেন যে, সুন্দর আসিবেন। কিন্তু এই হঠাৎ আবির্ভাবে রাজকন্যার মনে হইল না, এ ব্যক্তিটি কে? কিরূপে আসিল? একেবারে পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়া বরণ করিয়া লইলেন! ইহা মোটেই সুসঙ্গত হয় নাই। তাহার পর সখীগণ সুন্দরকে দেখিয়া বিদ্যার উপযুক্ত বর হইয়াছে মনে করিয়া প্রশংসা করিল, আর বিদ্যা কি করিলেন?

"নৃপবালা কুতূহলী বলে শুন আমি বলি যদি নহে সুকবি পণ্ডিত।
অলংঘ্য দেবীর বর তবু প্রাণনাথ মোর বরিব কহিল সুনিশ্চিত॥"

রূপ দেখিয়া বিদ্যা প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গেলেন। ধন্য তুমি ফুলশরাসন! কৃষ্ণরাম যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হয় ত স্বাভাবিক, কিন্তু বিদ্যাকে অতটা বেহায়া না করিলেই ভাল হইত। যাহা হউক, সময়মত ময়ূর ডাকিয়া দুই দিক্ রক্ষা করিল।

রামপ্রসাদ কৃষ্ণরামের কাহিনীকেই অনুসরণ করিয়াছেন, বিদ্যার মুখ দিয়া পূর্ব্বোক্ত উক্তি করান নাই।

"কামদেব-ব্যাধতুল্য কুমার সুন্দর। ভুরুছলে ধৃত ধনু দৃষ্টি খরশর॥
কিঞ্চিৎ সন্ধানে হানে মানভঙ্গ-রঙ্গ। কি আর করিবে বিদ্যা বিদ্যার প্রসঙ্গ॥
জ্ঞানহারা গোমধ্যা গোযুগে জল ঝরে। ধূলায় ধূসর ধড় ধড়পড় করে॥
চমকিতা চঞ্চলাক্ষী চেতনা জন্মিল। সলজ্জিতা শশিমুখী সম্ভ্রমে বসিল॥"

শুধু শুধু অনুপ্রাসের ছটায় কাব্যকে ভারাক্রান্ত করা হইয়াছে।

ভারতচন্দ্র এখানে বিদ্যার সখী সুলোচনার সহিত এবং সুলোচনাকে উপলক্ষ্য করিয়া বিদ্যার

সহিত সুন্দরের যে কথার পাঁচাপাঁচি করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই উপভোগ্য এবং ইহার অনেক কথা আজও বাংলা প্রবাদে অমর হইয়া আছে। আমরা এই বাক্‌কলহের সম্পূর্ণ অংশটি উদ্ধৃত করিতেছি। সুলোচনা সুন্দরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সুন্দর তাঁহার সত্য পরিচয় দান করিলেন এবং বলিলেন—

"প্রতিজ্ঞার কথা লয়ে গিয়াছিল ভাট। সুত্রপাঠ শুনিয়া দেখিতে আইনু নাট ॥
বিচার হইবে কি প্রথমে অবিচার। আহূত অতিথি এলে নাহি পুরস্কার ॥
আসিয়াছি আশ্বাসে বিশ্বাস হৈলে বসি। শুনি সিংহাসন দিতে কহিলা রূপসী ॥
বসিয়া চতুর কহে চাতুরীর সার। অপরূপ দেখিনু বিদ্যার দরবার ॥
তড়িত ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে। তারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ণচাঁদে ॥
অঞ্চলে ঢাকিতে চাহে কমলের গন্ধ। মাণিকের ছটা কি কাপড়ে পায় বন্ধ ॥
দেখামাত্র জিনিয়াছি কহিতে ডরাই। দেশের বিচারে পাছে হারায়ে হারাই ॥
কথায় যে জিনে সুধা সুখে সুধাকর। হাসিতে তড়িত জিনে পয়োধরে হর ॥
জিনিলেক এত জনে যে জন বিচারে। দেখ লো লজ্জার হাতে সেই জন হারে ॥
হারিয়া লজ্জার হাতে কথা নাহি যার। সে কেন প্রতিজ্ঞা করে করিতে বিচার ॥
রতির সহিত দেখা হইবে যখন। কেবা হারে কেবা জিনে বুঝিব তখন ॥
অধোমুখী সুমুখী অধিক পেয়ে লাজ। 'সাক্ষী হৈও সখীগণ' কহে যুবরাজ ॥
সখী বলে, 'মহাশয় তুমি কবিবর। আমার কি সাধ্য দিতে তোমার উত্তর ॥
উত্তমে উত্তম মিলে অধম অধমে। কোথায় মিলন হয় অধম উত্তমে ॥
আমি যদি কথা কহি একে হবে আর। পড়িলে ভেড়ার শিঙ্গে ভাঙ্গে হীরাধার ॥
কি কব ঠাকুরঝিরে ধরিয়াছে লাজ। নহিলে উত্তর ভাল পেতে যুবরাজ ॥'
শুনিয়া ঈষদ হাসি কহিছে সুন্দর। 'বলহ ঠাকুরঝিরে কি দেন উত্তর ॥'
সখী সম্বোধনে বিদ্যা কহে মৃদুস্বরে। 'মন চুরি কৈল চোর সিঁদ দিয়া ঘরে ॥
চোরবিদ্যা বিচার আমার নহে পণ। চোর সহ বিচার কি করে সাধুজন ॥'
সুন্দর বলেন 'ভাল বিচার এদেশে। উলটিয়া চোর গৃহী বান্ধে বুঝি শেষে ॥
কটাক্ষেতে মন চুরি করিলেক যেই। মাটি কাটি তপাসিতে চোর বলে সেই ॥
চোর ধরি নিজ ধন নাহি লয় কেবা। আমি নিজ চোরে দিব বাকি আছে যেবা ॥'

ইহাতে বিদ্যা ও সুন্দরের সংযত বাক্‌চাতুরী ও বিদ্যার নবোঢ়াসুলভ লজ্জা চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে ,কোথাও বেহায়াপনার লেশমাত্র নাই।

মধুসূদনের বিদ্যা যখন সুন্দরের চিন্তা করিতেছেন, তখন সুন্দর আসিয়া উপস্থিত হইলে—

"তাহারে দেখিয়া মনে নৃপতিনন্দিনী। অপরূপ নিশি যোগে প্রভাত রজনী ॥
পুরিলে মনের আশা করিলেক পণ। কেমন পণ্ডিত এই কবি মহাজন ॥
দেখিব ইহার আগে কেমন শকতি। তবে সে আসন দিব মানিলা যুবতী ॥

ইহা পূর্ববর্তী বিদ্যাসুন্দর কাব্যগুলিতে বর্ণিত প্রসঙ্গগুলি আগে পাছে করিয়া নূতনত্ব সৃষ্টির

বৃথা প্রয়াস মাত্র। সুড়ঙ্গ হইতে সুন্দর আবির্ভূত হওয়ায় বিস্ময় প্রকাশ করা দূরে থাকুক, বিদ্যা যেন তাহার পাণ্ডিত্যের পরীক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, তাই শিষ্টজনোচিত অভ্যর্থনা ও আসনদানের পূর্বেই তাহাকে প্রশ্ন করা হইল ময়ূরনাদকে উপলক্ষ্য করিয়া। ইহা কিন্তু বিচারের অঙ্গ নহে, তাহার পূর্বাভাস মাত্র। ইহার পর সখী তাঁহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। সাধারণতঃ কোন অপরিচিত লোক গৃহে আসিলে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া, আসন দিয়া, তাহার পর আলাপ করিতে হয়। এ ক্ষেত্রে সবই বিপরীত হইয়াছে।

পরিচয়দান প্রসঙ্গে সুন্দর জানাইলেন যে, তিনি বিচারে বহু দেশের পণ্ডিতগণকে পরাজিত করিয়া বীরসিংহ মহারাজের রাজ্যে আসিয়াছেন। কিন্তু এখানে আসিয়া একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলেন; তাহাতে তাঁহার শ্রবণ জয়লাভ করিল, কিন্তু নয়ন হারিল। তিনি সখীর প্রশ্নের উত্তরে রূপকে বিদ্যার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

দ্বিজ রাধাকান্ত অশোকবনে উভয়ের দর্শনকালেই 'বসুনা' ইত্যাদি শ্লোকে সুন্দরের পরিচয় দান ও ময়ূরনাদের বর্ণনা দ্বারা এক দফা পাণ্ডিত্যের যাচাই করাইয়া লইয়াছেন। তাহার পর কজ্জল সাহায্যে সুন্দর বিদ্যার গৃহে আসিলে বিদ্যাসুন্দরের রহস্যালাপ বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে মধুসূদনের ন্যায় তিনিও রূপকে বিদ্যার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা এই দুইটি রূপবর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

মধুসূদন

"পুনরপি কহে সখী বিশেষ কথন। প্রথম উদয় মেঘ তেজিয়া গগন॥
অপরূপ তার তলে রবির উদয়। মাথায় ধরিল চন্দ্র বৃক্ষ সমুদয়॥
দেখিনু তাহার পাছে কামের কামান। খঞ্জন যুগল তথি মারে পঞ্চবাণ॥
তার মধ্যে তিলফুল লম্বিত সুন্দর। বান্ধুলি কুসুম জিনি তনু মনোহর॥
করি বিনে করিকর আছএ নির্মল। মৃণাল বিহনে দেখি কমল যুগল॥
পূর্ণিমার দশচন্দ্র তথি অপরূপ। শারদ রজনী কর জিনিয়া স্বরূপ॥"

রাধাকান্ত

"যুববর বলে সখী মুখ পঙ্কজের। চিকুর কর্যাছে চুরি চামরি কুলের॥
কোকিলের ভাষা নাসা কীরেরে গঞ্জিয়া। অক্ষটির ফাঁদ দেখে প্রবল চাহিয়া॥
কামের কামান ভুরু মৃগের নয়ন। করভের কুম্ভকুচ হংসের গমন॥
রমার লাবণ্য কোথা পাইল সুন্দরী। এইরূপে প্রতি অঙ্গে দেখাইল চুরি॥
নীল বাসে ঝাঁপি মুখ লজ্জিত কামিনী। গ্রহণ লাগিল বুঝি বলে গুণমণি॥"

এই প্রসঙ্গটি যে ভারতচন্দ্রের সুন্দর কর্তৃক সখীগণের নিকট বিদ্যার রূপবর্ণনারই অনুকরণ, তাহা বলাই বাহুল্য। মধুসূদনের বর্ণনায় কোন কবিত্ব নাই। রাধাকান্তের বর্ণনা অপেক্ষাকৃত কবিত্বপূর্ণ।

এইবার আমরা দেখাইব, এই প্রসঙ্গটী বলরাম কি ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে, বিদ্যা সখীগণকে সরাইয়া দিয়া একাকিনী রুদ্ধদ্বারকক্ষে সুন্দরের বিরহে কাঁদিতেছিলেন, এমন সময় সুন্দর সেখানে উপস্থিত হইলেন। বিদ্যার পাশে সুন্দর আসিয়া বসিলে—

কুমার বসিল পাশে দেখিল কুমারী। হরিষবিষাদ মনে হৈয়া চমৎকারী ॥
কপাট নাহিক লড়ে খিল নাহি খসে। অলক্ষিতে কুমার আইল মোর পাশে ॥
না জানি দেবতা কিবা না জানি মানুষ। অলক্ষিতে কোন্ পথে আসিল পুরুষ ॥
হাসিয়া কুমারী কিছু বলে ধীরে ধীরে। শুনহ পুরুষ কেন আইলে মোর পুরে ॥
ভাল নহে তোমার এ সব ব্যবহার। কি কারণে বসনেতে ধরিলে আমার ॥
বিভা নাহি হয় মোর সেবি হর গৌরী। পুরুষবিদ্বেষী বলি লোকে নাম ধরি ॥
দেবতা মানুষ কিবা হও কোন জন। আপন ইৎসায় আসি ধরিলে বসন ॥
মোর বাপ বীরসিংহ বড়ই দুর্ব্বার। দেখিলে অকার্য্য বড় হইব তোমার ॥
ছাড় ছাড় কুমার না ছোঁয় মোর অঙ্গ। না ধর বসন মোর ব্রত হইব ভঙ্গ ॥
এত বাক্য কুমারী বলিল যদি ছলে। হাসিয়া কুমার তার মন তুষি বলে ॥
বিভা নাহি [কর] তুমি পুরুষবিদ্বেষী। কালীর চরণপদ্ম কি লাগি সেবসি ॥
বিভা নাহি হয় যদি শুনহ সুন্দরি। না করিলে বিভা আমি নাহি পরিহরি
যেবা বল দুরবার বীরসিংহ রায়। কি করিতে পারে তুমি হইলে সহায় ॥
তুমি যদি সহপক্ষ জিনিব সংসার। এই হেতু বসনেতে ধরিল তোমার ॥
হাসিয়া চাহিল বিদ্যা বঙ্কিম নয়নে। গদ গদ বলে কিছু মধুর বচনে ॥
কি নাম তোমার তুমি বৈস কোন্ দেশে। কহ নিজ পরিচয় সকল বিশেষে ॥

এইরূপ একাকিনী বিদ্যার সহিত সুন্দরের মিলন কোন কাব্যেই নাই। বলরামের ইহা নূতনত্ব ও বৈশিষ্ট্য। তবে নবোঢ়া নায়িকার পক্ষে কোন বিশ্বস্তা সখার সাহায্য ব্যতিরেকে নায়কের সহিত মিলন সম্ভব নহে। সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরে বিদ্যা সখীর সাহায্যে সুন্দরকে নিজকক্ষে আনয়ন করিয়াছিলেন। বিশ্রব্ধ নায়কের সহিত নবোঢ়ার মিলন সখীর সাহায্য ব্যতীত সম্ভব। কিন্তু অবিশ্রব্ধ নায়কের সহিত সম্ভব নহে। যাহা হউক, বলরামের বর্ণনা কবিত্ববর্জিত নহে এবং সম্ভব অসম্ভবতার কথাবাদ দিলে প্রসঙ্গের অবতারণাটী সুন্দর হইয়াছে।

৬। বিদ্যাসুন্দরের বিচার

বিদ্যা ও সুন্দরের মধ্যে যখন রহস্যালাপ চলিতেছিল, এই সময়ে ময়ূরনাদকে উপলক্ষ্য করিয়া বিদ্যাসুন্দরের বিচার আরম্ভ হইল। এই ময়ূরনাদ প্রসঙ্গটী সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর কাব্য হইতে ধার করা। তাহাতে যখন নির্জন কক্ষে বিদ্যার নিকট সুন্দর রতি প্রার্থনা করিতেছিলেন এবং বিদ্যা অধীর সুন্দরকে ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে বলিতেছিলেন, তখন—

গিরৌ সমাকর্ণ্য ময়ূরনাদং জগাদ বিদ্যা বচসা কুমারম্।
পদ্যেন কোঽয়ং বদ রৌতি শৈলে মৃদুস্বরং প্রাজ্ঞবরো যদি স্যাৎ ॥

অর্থাৎ পর্ব্বতে ময়ূরনাদ শুনিয়া বিদ্যা কুমারকে বলিলেন, তুমি যদি পণ্ডিতপ্রবর হও, তাহা হইলে মৃদুস্বরে পদ্যে প্রকাশ কর তো পর্বতে কে ডাকিতেছে। ইহাকেই অনুসরণ করিয়া গোবিন্দদাস লিখিতেছেন—

"হেন কালে শিখরেতে ডাকিলা শিখিনী। চিত্ররেখা বলে তবে তুমি বল শুনি ॥"

কৃষ্ণরাম লিখিতেছেন—

"শুনহ সকল লোকে গিরি মাঝে দৈবযোগে
ময়ূর ডাকিল হেন কালে।
বুঝিয়া বিদ্যার মন সুলোচনা ততক্ষণ
কি ডাকিল কি ডাকিল বলে ॥"

রামপ্রসাদ লিখিতেছেন—

"ক্ষণেক রমণী চাহে মৌনভাবে থাকে। হেন কালে পর্ব্বতশিখরে শিখী ডাকে ॥
হাস্যযুতা সখীপ্রতি কহে কমলিনী। সুলোচনা শুধাও কিসের রব শুনি ॥"

মধুসূদনের বিদ্যা যখন সুন্দরের গৃহপ্রবেশমাত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় জানিতে উৎসুক হইয়াছিলেন, তখনই

"হেন কালে শুন ভাই দৈবের কারণ। সময় জানিয়া হৈল মেঘের গর্জন ॥
তাহা দেখি মত্ত শিখী শিখিনীর সঙ্গে। পর্বত উপরে নৃত্য করে মহারঙ্গে ॥
শুনিয়া তাহার ধ্বনি অতিমনোহর। অনঙ্গ পাইল অঙ্গ দুহার অন্তর ॥
ঘন দগদগি বাড় রমণীর মনে। হেন কালে কহে বিদ্যা সখীসম্বোধনে ॥
কি ডাকে কি ডাকে সখি শুনিয়া সুন্দর। ইঙ্গিতে কবীন্দ্র কহে কবিত্বকুঞ্জর ॥"

রাধাকান্ত লিখিতেছেন, যখন অশোকবনে বিদ্যা কামের পূজা সমাপ্ত করার পর সুন্দরের দর্শন পাইলেন, তখন সখীগণ সুন্দরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি "বসুনা" ইত্যাদি শ্লোকে নিজের নাম বলিয়া পরিচয় দিলে বিদ্যা তাঁহাকে গুণসাগর তনয় বুঝিয়া আশ্বস্ত হইলেন এবং তখন পিতার পণ স্মরণ করিয়া তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করিলেন।

সেই কালে শুন ভাই দৈবের কারণ। সময় জানিয়া হৈল মেঘের গর্জন ॥
হেনই সময়ে শুনি ময়ূরের ধ্বনি। কিবা কলরব বামা কহেন কামিনী ॥"

দ্বিজ রাধাকান্ত দুটি পংক্তি হুবহু মধুসূদনের কাব্য হইতে লইয়াছেন।

বলরামের বিদ্যা সুন্দরের পাণ্ডিত্যের কথা পূর্বে শুনিয়াছিলেন। এখন নিজকর্ণে তাহা শুনিতে ইচ্ছা করিলে—

"এমত সময় তথা ময়ূর ডাকিল। রহ রহ বলি বিদ্যা কুমারে বলিল।
না জানি কি ডাকে হোর শুন মন দিয়া। কুমার বলেন কিছু তারে বর্ণাইয়া ॥"

ভারতচন্দ্রের বিদ্যা ও সুন্দর যখন কথাকাটাকাটি করিতেছিলেন, তখন দুজনেই কি করিবেন, ইহা মনে 'আঁচা-আঁচি' করিতেছেন।

"হেন কালে ময়ূর ডাকিল গৃহপাশে। কি ডাকে বলিয়া বিদ্যা সখীরে জিজ্ঞাসে॥
শুনিয়া সুন্দর রায় ইঙ্গিতে বুঝিল। সখী উপলক্ষ্যমাত্র মোরে জিজ্ঞাসিল॥"

গোবিন্দদাস, কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও রাধাকান্তের বিদ্যার পিত্রালয় বঙ্গদেশে, অথচ তাঁহারা ভাবিয়া দেখিলেন না যে, গৌড়দেশে অথবা বর্ধমানে পর্বতশিশরে ময়ূরনাদ সম্ভব কি না। সংস্কৃত কাব্যের "গিরৌ সমাকর্ণ্য ময়ূরনাদং" তাঁহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। মধুসূদনের বিদ্যার পিত্রালয় কাঞ্চি, সুতরাং তাঁহার পক্ষে হয় ত ইহা সম্ভব। বলরাম পর্বতের কথা উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু কোথায় ময়ূর ডাকিল, তাহাও বলেন নাই। সংস্কৃত শ্লোকটীতে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে 'গোভৃংশিখরেষু' তাহা কাটাইবারও কোন চেষ্টা করেন নাই। ভারতচন্দ্র স্পষ্ট বলিয়াছেন—গৃহপাশে, সম্ভবতঃ গৃহপালিত ময়ূর ডাকিল। সুতরাং ভারতচন্দ্র যে বর্ধমানে বিদ্যার পিত্রালয়ের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

গোবিন্দদাস মাত্র "গোমধ্যমধ্যে" ইত্যাদি শ্লোকটীর উল্লেখ করিয়াছেন।* কৃষ্ণরাম লিখিয়াছেন, সুন্দর প্রথম শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করিলে—

"বুঝিয়া সখিরে বিদ্যা বলে এই ভাষা। শুনিতে না পাই পুনঃ করহ জিজ্ঞাসা॥
সুকবি পণ্ডিত যদি হয় গুণালয়। অবিলম্বে শ্লোক আর করিবে নিশ্চয়॥"

রামপ্রসাদ কোন কারণ না দেখাইয়াই লিখিয়াছেন—

"সখী সম্বোধিয়া কহে বুঝা নাহি যায়। পুনরপি হাসি কহে সুবিদগ্ধ রায়॥"

মধুসূদন ও রামপ্রসাদের বিদ্যার ন্যায় কোন কারণ না দেখাইয়াই সখীকে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছেন। রাধাকান্তের বিদ্যা পুনর্বার ময়ূর ডাকিলে তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া পুনর্বার প্রশ্ন করিতে বলিয়াছেন। ভারতচন্দ্র লিখিতেছেন—

"শুনিয়া আনন্দে ধনী নানার্থ ঘটায়। বুঝিলাম মহাকবি শ্লোকের ছটায়॥
কিন্তু এক সন্দেহ ভাঙ্গিতে হয় আশ। এখনি করিল কিবা আছিল অভ্যাস॥
পুন জিজ্ঞাসিলে যদি পুন ইহা পড়ে। তবে ত অভ্যাস ছিল এ কথা না নড়ে
এত ভাবি কহে বিদ্যা সখী সম্বোধনে। না শুনিনু না বুঝিনু ছিনু অন্যমনে॥
সুন্দর বলেন যদি তুমি দেহ মন। যত বল তত পারি নূতন রচন॥"

বলরামদাস ঠিক ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—

"এতেক কুমার যদি বলিল বিদ্যারে। তন্ময় হইয়া বিদ্যা ভাবিল অন্তরে॥
কিবা সে পরের কবি কুমার পড়িল। না জানি আপনি কিবা কবিতা করিল।
পুনরপি পড়ে যদি এই ত বচন। তবে সে জানিব মিথ্যা সকল কারণ॥
পুনরপি বিদ্যা সতী কুমারে জিজ্ঞাসে। কালীপদে শ্রীকবিশেখর রস ভাষে॥
শুনহ কুমার তুমি বলিলে যে কি। অন্য ছলে আছিলাম মন নাহি দি॥
হাসিয়া কুমার বলে দেহ তুমি মন। কবিতা কৌতুক রস কবির বর্ণন

* তবে সুন্দরকে দিয়া আর একবার বলাইয়াছেন—
"মন দিয়া শুন হে সখী চিত্ররেখা। কৌতুকে ডাকে ঐ ষবোনিভক্ষ্যা।"

বলরাম যে ভারতচন্দ্রের কাব্যের সহিত পরিচিত ছিলেন, ইহা তাহার আর একটী প্রমাণ।

গোবিন্দদাস আর বিচারের আড়ম্বর করেন নাই। ইহার পরেই বিদ্যাসুন্দরের গান্ধর্ববিবাহ দিয়াছেন। কৃষ্ণরাম কেবলমাত্র লিখিয়াছেন, বিদ্যা সখীকে দিয়া সুন্দরের নাম জিজ্ঞাসা করিলে "বসুনা" ইত্যাদি শ্লোকে সুন্দর নিজ নাম জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাহার পরেই গান্ধর্ববিবাহ।

বলরাম লিখিয়াছেন, সুন্দর শ্লোক দুইটী পাঠ করলে—

শুনিয়া কন্যার মনে লাগে চমৎকার। নিশ্চয় জানিল গুণসাগর কুমার॥
বিদ্যা বলে এক বাক্য করি নিবেদন। বিজয়ীর জয়পত্র দেহ নিদর্শন॥
হাসিয়া কুমার তারে জয়পত্র দিল। রাজার নন্দিনী তাহা পড়িতে লাগল॥
তিন দিক্ জিনিলাম করিয়া বিচার। জিনিল আমারে গুণসাগরকুমার॥
জয় মোর পরাজয় সুন্দর করিল। আপন ইৎসায় আনি জয়পত্র দিল॥
জয়পত্র পড়ি বিদ্যা ভাবে মনে মন। ইহা বই বর মোর নাহি অন্য জন॥

এখানে খুব সম্ভবতঃ কিছু লিপিকরপ্রমাদ ঘটিয়াছে। বিদ্যা কেন বিজয়ীর জয়পত্র চাহিবেন? সুন্দরই চাহিবেন এবং কুমার জয়পত্র দিবেন কেন? বিদ্যাই দিবেন। এই জয়পত্রের উল্লেখ দ্বিজ রাধাকান্তের কাব্যে আছে—বিদ্যা ও সুন্দরের বিচারান্তে বিদ্যা সুন্দরকে জয়পত্র লিখিয়া দিলেন। দ্বিজ রাধাকান্ত সম্ভবতঃ বলরামের কাব্যের সহিত পরিচিত ছিলেন।

ভারতচন্দ্রই সর্বপ্রথম বিদ্যা ও সুন্দরের মধ্যে শাস্ত্রালাপ ও বিচারের উল্লেখ করিয়াছেন এবং অপূর্ব কবিত্ব সহকারে সেই বিচারপ্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিজ রাধাকান্ত ও মধুসূদন এই বিচারপ্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভারতচন্দ্রের তুলনায় তাহা নিতান্তই কবিত্বশূন্য। ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন—

ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক। অলঙ্কার আদি সাধ্য সাধন সাধক॥
মধ্যবর্ত্তী হইলা মদন পঞ্চানন। যার সঙ্গে ছয় ঋতু ছয় দরশন॥

আত্মপক্ষে পূর্বপক্ষ করিলা সুন্দর। সিদ্ধান্ত করিতে বিদ্যা হইলা ফাঁকর॥
বিচারের কোটি মনে ছিল লক্ষ লক্ষ। কিছু স্ফূর্ত্তি না হয় সিদ্ধান্ত পূর্ব্বপক্ষ॥
... ...
শ্রুতির বিচারে বিদ্যা অবাক্ হইল। মধ্যবর্ত্তী ভট্টাচার্য্য হারি কয়ে দিল॥
দুই এক কথা যদি আনয়ে ভাবিয়া। মধ্যস্থ মুদ্দাই হয়ে দেয় ভুলাইয়া॥
সুন্দর কহেন রামা কি হইল সিদ্ধান্ত। বিদ্যা বলে সেই সত্য যে কহে বেদান্ত॥
অন্য শাস্ত্র যে সব সে সব কাঁটাবন তত্ত্বস্তু বাদরায়ণে প্রমাণ লিখন॥
রায় বলে এক আত্মা তবে তুমি আমি বিদ্যা বলে হারিলাম তুমি মোর স্বামী॥

(ক্রমশঃ)

মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত বা বাশুলীমঙ্গল

(পূর্বানুবৃত্তি)

॥ রামক্রি রাগ ॥

শুনিয়া দূতের বোল ঘামে হইল তোলবোল
ক্রোধে শুম্ভ চারি দিগে চায়।
অরুণ কমল মুখে ঘন পাক দেই গোঁফে
দিনমণি মুকুটে লুকায়॥
লেঙ্গা কাছে খাণ্ডা ছুরি পেলে লোকে তরোয়ারি
ঘন ঘন পরশে আকাশ।
দশনে অধর চাপে কোপে থর থর কাঁপে
ত্রিভুবনে লাগিল তরাস॥
বীর সাজিল রে নিবাতকবচসুত
অতি রোষে ধরিতে পদ্মিনী।
জীবনে থাকুক ধিক সীমন্তিনী প্রতিপক্ষ
অসুর বধিল একাকিনী॥
ধবল আসন ছাড়ে ক্রোধে আঁখি না পাছাড়ে
নিশুম্ভসোদর জ্যেষ্ঠ ভাই।
ঘন সিঙ্গা ঠাঞি ঠাঞি ডাকাডাকি ধাওয়াধাই
গুড় গুড় দগড়ে ঘন ঘাই॥
কিঙ্কিণী কটির মাঝে চ[৪৫]রণে নূপুর বাজে
কাছিল যুগল খর ছুরি।
বাজল ঘাঘর ঘাঁটি তোলপাড় করে মাটি
দড়মসা রণতুর ভেরী।
তরল তবকধ্বনি কানে কিছু নাঞি শুনি
দামার শবদ দুর দুর।
কাড়া পড়া মৃদঙ্গ কাহাল ফুকরে শঙ্খ
বাজে দণ্ডি মোহরি প্রচুর॥
মাদল কাঁসর বেণী বংশীর সুনাদ শুনি
বাজে অবিরত ঢাক ঢোল।
প্রলয়কালেতে যেন ঘোরতর গরজন
দাবাসিনি বরোঙ্গের রোল॥
কেবল সংহতি হরি হিমালয় একেশ্বরী
এক বুড়ী তার সহচরী।
ক্ষিতি ফাটে তার দম্ভে এ দুঃখ না সহে শুম্ভে
আপুনি সে দেখিব সুন্দরী॥
নানা বাদ্য কুতুহলে চতুরঙ্গ দলে চলে
রহি রহি করি কোলাহল।
চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচিল সরস মঙ্গল॥ ০॥

॥ শ্যামা রাগ ॥

ছত্রিশ আতর কাছিয়া বীরবর
ধনুকের গুণে দেই টঙ্ক।
ময়গল দিগ্‌গজ কাতর বহুতর
ত্রিজগতে পড়িল চমঙ্ক॥
রুষিল নিশুম্ভ শূলী রক্তবীজ পড়ে।
প্রলয়সমুদ্ভব হরিলা গজবর
তুরগ উপরে চড়ে॥
বন্ধুক ধরিয়া দশনে চাপিয়া
পেলিয়া লোফে কেহ খাণ্ডা।
লাখ লাখ ময়গল হাথী রথী মহব্বল
চড়িয়া কাসর গণ্ডা॥
তুহিনাচল গজ ধাইল সত্বর
দেখিতে রূপসী রামা।
চৌদিগে মহব্বল করিয়া কোলাহল
সমরে নাহি যার ক্ষমা॥
অশেষ প্রকার পাতিয়া অবতার
গিরিজা সংহতি যুঝে।
মুকুন্দ রচিল বাশুলীমঙ্গল
ত্রিপুরাচরণাম্বুজে॥ ০॥

॥ ঝাঁপা ॥

স্বরমত্ত গজ চাপি দনুজাদিনাথে।
রণভূমি চাপে শুম্ভ খর খড়্গ হাথে ॥ ধ্রু ॥
অধরান্ত রদ চাপি ঘন গোম্ফ মোড়ে।
করবাল বরঝিক্কি নিজ দুঃখ তোড়ে ॥
জয়শঙ্খ রণরঙ্গ মৃদঙ্গ ভেরী।
ঘন ঘোরতর শব্দ চমঙ্ক অরি ॥
চতুরঙ্গ দল মধ্যে তনু কম্পে কোপে।
রণরঙ্গে [৪৬ক] রিপুভঙ্গ তরোয়ারি লোফে
বরশব্দ শূর স্বন্ধ ধনু চর্ম্ম পাণি।
রথী পত্তিগণ ধায় করি উচ্চবাণী ॥
পরচণ্ড চলকাণ্ড রথ মাঝি মাঝে।
ঘন বজ্র সিনিশব্দ জয়ঢোল বাজে ॥
এক ঘায় দুই তিন জন্তু দেবী হানে।
গিরিবাসপতিদাস কবিচন্দ্র ভনে ॥ ০ ॥

॥ মালসী ॥

গগনে ফিরায় বীর ধনু চক্র বাণ।
বরিখে জলদ যেন ধবল পাষাণ ॥
জলধারা সম শর অবিরত খসে।
নিজবাণে ত্রিপুরা কাটিয়া পাড়ে রোষে ॥
নিশুম্ভ যোড়ে বাণ রে বাশুলী যোড়ে বাণ।
রুষিল সমরে শুম্ভ বলে হান হান ॥
শত শত শরে চণ্ডী বিন্ধে দুই জনে।
পাইল যাতনা রে নিশুম্ভ রোষে রণে ॥
স্বরুচি মহিষা চলে খর খড়্গ লৈয়া।
দেবীর বাহনে হানে হুহুঙ্কার দিয়া ॥
ক্ষত হইল অস্ত্র বীর নাহি নাড়ে কাঁদ।
ঈষত হাসিল যেন পূর্ণমিক চাঁদ ॥
ধাইল নিশুম্ভ রণে অচল ত্রিকূট।
রুষিল ত্রিপুরা লাগে গগনে মুকুট ॥
অষ্ট চাঁদে ঢলমল নিশুম্ভের চাল।
ক্ষুরুপায় কাটে চণ্ডী তার করবাল ॥
চর্ম্মকৃপাণহীনভুজ বীর ধায়।
শক্তি পেলিয়া মারে ত্রিপুরার গায় ॥
দেখিল ত্রিপুরা শক্তি অনল সমান।
চক্রে কাটিয়া চণ্ডী করে খান খান ॥
বিফল শক্তির বল শূল ক্ষেপে তূর্ণ।
মুটকির ঘায় চণ্ডী তারে কৈল চূর্ণ ॥
পাক দিয়া পেলে গদা নাহি যায় দূর।
ভস্ম করিল চণ্ডী ক্ষেপিয়া ত্রিশূল ॥
অনেক বিফল রণ করে রণরঙ্গি।
নিশুম্ভ ধাইল রণে হাথে করি টাঙ্গি ॥
আকর্ণ পূরিয়া দেবী ক্ষেপিলেক বাণ।
পড়িল নিশুম্ভ রণে নাঞি ছাড়ে প্রাণ ॥
ভাইয়ের সন্তাপে কোপে ধায় শুম্ভরায়।
[৪৬] শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাসহায় ॥ ০

॥ পঠমঞ্জরী ॥

শুম্ভ মহিপতি দেখিল নিজ আঁখি
সোদর পড়িল যুদ্ধে।
শাণিত কৃপাণে ধরিয়া নামে রণে
লাফ দেই অষ্ট হাথে ॥
উচ্চ রথে চড়ি মুকুট শিরে ধরি
ঘর্ম্মজলে তনু শোহে।
গগন যুড়িয়া ধাইল সত্বর
হানিল দেবীর দেহে ॥
আগল দানব রকতলোচন
দেখিয়া পূরিল শঙ্খ।
তৃতীয় নয়ন ধরি দনুজনাশিনী
ধনুকের গুণে দেই টঙ্ক ॥
দশ দিগ পূরে কনকরচিত
স্বকিত ঘণ্টার রবে।
ময়গল দিগ গজ আপন গরব
ছাড়িল সিংহের ডাকে ॥
চাপড় মারে ধরণীর পৃষ্ঠে
কালিকা হৃদয় গুণি।
তাহার শবদে ঢাকিল জগতি
আছিল পূরুব ধ্বনি ॥

হাসি মঙ্গলাই বলে সেই ঠাঞি
যার নাম শিবদূতী ।
সেই শবদে ঢাকিল জগত
রুষিল দনুজপতি ॥
বিকট দশন রকত লোচন
গগনে মুকুট লাগে ।
পাক দিয়া দুই বৃহদোস্ফ মোড়ে
পেলিয়া শকতি লোফে ॥
অরে দুরাশয় খানিক রহিয়
সমর মাঝে স্থির ।
যুদ্ধ কর যদি আমার সঙ্গে
তবে যে বুঝিব বীর ॥
দেবগণ কহে গগনমণ্ডলে
জয় জয় নারায়ণী ।
মিশ্র বিকর্ত্তন- তনয় মুকুন্দ
রচিল মঙ্গলবাণী ॥ ০ ॥

॥ দেশাগ রাগ ॥

লাফ দিয়া শুম্ভ তবে তেজিলেক রথ ।
সুরপুরে মুকুট পাতালে দুই পদ ॥
হুহুঙ্কার দিয়া শক্তি পেলে বীরবর ।
পবন সহায় যেন জ্বলে হুতানল ॥
সিংহবাহিনী যুঝে নাঞি করে ডর ।
দেবীর উপর ক্ষেপে শত শত শর ॥
অসুরদলনী জয়া উল্কা ফিরায় ।
অতি ভয়ঙ্কর শক্তি তরাসে পেলায় ॥
বিফল দেখিয়া শক্তি দনুজেন্দ্রনাথ ।
রুষিল সমরে শুম্ভ পূরে সিংহনাদ ॥
[৪৭ক] ব্যাপিল ত্রৈলোক্য শুম্ভের সিংহনাদ
প্রলয় পবনে ঘোরতর পরমাদ ॥
ক্রোধে শুম্ভ ক্ষেপে বাণ নাহি করে ভয় ।
ত্রিপুরা কাটিল বাণে বিশিখ দুর্জ্জয় ॥
ত্রিপুরা ক্ষেপিল শর শাণিত কৃপাণ ।
তারে শুম্ভ কাটিয়া করিল দুই খান ॥
ত্রিপুরা রুষিয়া শুম্ভে বিন্ধিলেক শূলে ।
মূর্চ্ছিত হইয়া শুম্ভ পড়িল ভূতলে ॥
নিশুম্ভ চেতন পায় হাথে ধনু ধরে ।
কালিকা চণ্ডিকা সিংহে বিন্ধে তিন শরে ॥
ধরিয়া অযুত ভুজ পুন যুদ্ধ করে ।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরার বরে ॥ ০ ॥

॥ কামোদ রাগ ॥

রুষিল ত্রিপুরা দুর্গা দুঃখবিনাশিনী ।
জলদ ভিতরে যেন প্রচণ্ড তরুণী ॥
নিজ শরে ছেদিল দৈত্যের চক্র শর ।
শূল হাথে ধায় কোপে পাছু দৈত্যবর ॥
বীর যুঝে রে হৃদয়ে নাহি ডর ।
দেবীর উপর ক্ষেপে শত চক্র শর ॥
তুহিনাচলের কন্যা চাপে সিংহযানে ।
দুই খান করে গদা শাণিত কৃপাণে ॥
শূল হাথে ধায় বীর হানে প্রতিপক্ষে ।
নিজ শূল ত্রিপুরা হানিল তার বক্ষে ॥
নিশুম্ভ দনুজ পড়ে ত্রিশূলের ঘায় ।
তার বুক হইতে এক দনুজ বার্যায় ॥
মহা তেজ ধরে সেই ছাড়ে বীরডাক ।
বিষম সমরে কন্যা আজি তুঞি থাক ॥
কৃপাণে হানিল চণ্ডী যেই মুণ্ড ডাকে ।
ক্ষিতিতলে পড়িল ভস্মিল পঞ্চমুখে ॥
নিশুম্ভ পড়িল রণে দেখে দৈত্যবল ।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরামঙ্গল ॥ ০ ॥

॥ ছন্দ ॥

বিকট দশনে কালী অসুরে চিবায় ।
অপার বিষম দৈত্য শিবদূতী খায় ॥
কৌমারীরূপিণী জয়া শক্তি ধরিয়া ।
মারিল দানব কথো ময়ুরে চাপিয়া ।
হংসবাহিনী কমণ্ডলু হাথে বুলে ।
মন্ত্র জপিয়া [৪৭] জল প্রসারিয়া পেলে ॥
যার গায় লাগে সেই হয় ত নির্ব্বল ।
চলিতে না পারে কেহ চাহে জল জল ॥

বৃষভে চাপিয়া বুলে হাথে করি শূল।
বিন্ধিয়া পাড়িল যত নিকটে অসুর ॥
কৌতুকিত ভগবতী শূকরশরীর।
দশনে বিন্ধিয়া কারে করে দুই চির।
গরুড়বাহিনী ঘন চক্র ফিরায়।
খান খান হইয়া দৈত্য ধরণী লোটায় ॥
সহস্র লোচনে চাহে চড়ি ঐরাবতে।
বজ্র পেলিয়া কথো মহাসুর বধে ॥
অবশেষে আছিল যতেক দৈত্যগণে।
ভক্ষিল কালিকা শিবদূতী পঞ্চাননে ॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥ ০ ॥

॥ ধানশ্রী ॥

জীবন দোসর মোর শঙ্কর দিল বর
রণে দশ শত বাহু।
দৈবের লিখন না যায় খণ্ডন
সো চাঁদ তুহুঁ ভেল রাহু ॥
পাপিনী দুর্গে বধিলি বিতর্কে
অপরজ ভাই হামারা।
শুম্ভ মহব্বল ধাইল সত্বর
সুরপথে খসে যেন তারা ॥
দেখিয়া অরিগণ করিল বহু রণ
কোপে কহই সুরবৈরী।
সংগ্রাম ভূতলে যুঝসি পরবলে
বিফল গরব করে নারী ॥
সুছাঁদ কবরি দশন ওষ্ঠ তেরি
দেখিয়া লাগিল ধাঁধা।
সহজ পঙ্কজিনী খঞ্জনলোচনী
বদন শারদ চাঁদা ॥
বন্ধুকী বেশ ধরি মৃগপতি সহচরী
হাসি হাসি বদন প্রকাশি।
কজ্জলে উজ্জ্বল নয়ন যুগল
অলক তিলক নব শশী ॥

রে শুন দুর্জ্জন হাম এক জন
দোসর নাহি হামারা।
পেখসি যে তুহুঁ নাগরি সে হাথ
যুদ্ধ কর অনিবারা ॥
যতেক যুবতী ছিল ত্রিপুরাননে গেল
একেলা রহিলা ত্রিনয়নী।
[৪৮ক] হরিল আপন গণে অস্থির নহিয় রণে
মুকুন্দ বিরচিল বাণী ॥ ০ ॥

॥ ঝাঁপা ॥

চড়িলেক খগরাজ সমবেগ ঘোড়ে।
বদ হেট অধ ওঠ দুই গোম্ফে মোড়ে ॥
ধনু বাণ খরশাণ তরোয়ারিধারী।
নৃপ শুম্ভ মহি দম্ভ দনুজাধিকারী ॥
বৃহদাদি ছিল অস্ত্র গিরিরাজ সঙ্গে।
অতি ঘোরতর পেখে সুর দৈত্য তঙ্কে ॥
সিত অস্ত্র খর অস্ত্র শর যুদ্ধ পাতে।
পুন যুদ্ধ পদরেণু লুকী লোকনাথে ॥
শুম্ভ দিব্য ছিল অস্ত্র ক্ষেপিলেক চণ্ডী।
নিজ বাণে অসুরেন্দ্র করিলেক গুণ্ডি ॥
ক্ষেপিলেক যত অস্ত্র অসুরেন্দ্র হাসি।
হুহুঙ্কার দিয়া কন্যা কৈল ভস্মরাশি ॥
ক্রোধে চাপ ধরি বীর শর দিয়া টানে।
গিরিবাসপতিদাস কবিচন্দ্র গানে ॥ ০ ॥

॥ মালসী ॥

আকর্ণ পূরিয়া দেবী ক্ষেপিলেক বাণ।
কাণ্ড ছুটিল যেন অনল সমান ॥
আংসন্ন হইল দেবী মেঘে যেন রবি।
রুষিয়া কাটিল বাণ পড়িল যে ভুবি ॥
দুই জনে যোড়ে শর রণে অনিবারা।
অবিরত খসে যেন নব জলধারা ॥
টুটিল ধনুক বীর পায় অপমান।
শক্তি ধরিয়া হাথে করে অনুমান ॥
পেলিলে বিফল নহে হেন অনুমানি।
চক্রে কাটিল শক্তি অচলনন্দিনী ॥

খাণ্ডা হাথে করি ধায় দৈত্য ভূপাল।
বাম হাথে শত চন্দ্র উজ্জ্বল করে ঢাল॥
নিকটস্থ দনুজেন্দ্র দেখিয়া কৃপাণ।
ধনুকে যুড়িল ভগবতী চারি বাণ॥
খাণ্ডা কাটে অসুরের গজবেন নাম।
কাটিল বিষম ঢাল অরুণ সমান॥
সারথি কাটিল আর পক্ষরাজ হয়।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরা[৪৮]বিজয়॥

॥ সিন্ধুড়া ॥

হেদে লো সুন্দরি স্বর্গবিদ্যাধরি
মদন মূর্চ্ছিত মোহে।
আশা দিয়া মোরে করিলে নৈরাশ
এ তোর উচিত নহে॥
পড়িল চড়ন তুঙ্গ তুরঙ্গম
যার নাম পক্ষরাজ।
প্রাণের দোসর সারথি পড়িল
আর জিয়া কোন কাজ॥
প্রথম সংগ্রামে ধনুক কাটিলে
ব্যর্থ কৈলে মোর বাণ।
তুষ্ট সীমন্তিনী জানিল হৃদয়
সর্ব্ব দেবতার প্রাণ॥
পূর্ব্বে সুরেশ্বর ধরিল মুদ্গর
ঘোরতর বহু কোপে।
ফিরাইয়া ঘন চাক লোচন
অরুণমণ্ডল কোপে॥
ত্রিপুরা ঝঠ্‌ঠলু সেই সমুদ্গর
কাটিল নিশিত শরে।
অস্ত্রহীন বীর ধাইল সত্বর
মুষ্টিক উঠাইল তাঁরে॥
দেবীর হৃদয় দারুণ মুষ্টিক
মারিল দনুজনাথ।
দেব যুগক্ষয় প্রলয় সময়
যেন হয় বজ্রপাত॥

হস্ততল দিয়া ঠেলিল পদ্মিনী
পড়িল ধরণীতলে।
হেট গড়াগড়ি অচিরাত পড়ি
পুন উঠে নিজ বলে॥
হাথাহাথি করি ধরিল শঙ্করী
লইলা গগনপথে।
মিশ্র বিকর্ত্তন- সম্ভব তনয়
মুকুন্দ রচে চণ্ডীপদে॥০॥

অবলম্ব নাহিক চণ্ডিকাসুর যুঝে।
হৃদয় নাহিক ডর আপনার তেজে॥
বিস্মিত হৃদয় দেব সিদ্ধ মুনিগণে।
চিরকাল মহাযুদ্ধ দেখে রাত্রি দিনে॥
উপাড়িয়া ভগবতী ভ্রমায় অসুরে।
পড়িল ভূধর রাকা বসুমতীতলে॥
ভ্রমিয়া পাড়িল বীর হেট করি কাঁধ।
উঠিয়া গগনে দেখে শত লক্ষ চাঁদ॥
সম্বিত পাইয়া বীর পুন মুষ্টি যোড়ে।
চণ্ডীকে বধিতে দুষ্ট ঘন উঠে পড়ে॥
রুষিল ত্রিপুরা শূলে দৃঢ়মুষ্টি হাথে।
বিন্ধিয়া পাড়িল বুকে অসুরের নাথে॥
[৪৯ক] পৃথিবী উপরে বীর অচেতনে পড়ে।
ত্রিশূল ··· শুম্ভ চরণ আছাড়ে॥
শুম্ভের চরণঘায় বসুমতী দোলে।
নড়িল পর্ব্বত সপ্ত সমুদ্র উথলে॥
ত্রৈলোক্য নির্ভয় হইল মৈল শুম্ভরায়।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাসহায়॥ ০ ॥

জগতের মুক্ত হইল গগনমণ্ডল।
নিরুৎপাত জলদ বরিষে ফুলজল॥
যত নদী নদ বহে আপনার মত।
হরিষ মানস দেবগণ পুণ্যবত॥
মৃদঙ্গ বাজায় কেহ কেহ ধরে তাল।
মধুর মুরলী বাজে ফুকরে কাহাল॥

গন্ধর্ব্ব গীত গায় মধুর নিস্বর।
অপ্সরাগণ নাচে কিন্নরী কিন্নর ॥
হরিল উৎপাত বাত দেখে সর্ব্বজন।
দিবসাধিপতি উরে প্রসন্ন কিরণ ॥
অশান্ত আনল নহে জ্বলে নিজ সুখে।
শান্ত তাহার ধ্বনি হইল দশ দিগে ॥
আনিঞা তীর্থের জল যত দেবগণ।
বিধিমতে পাখালিল চণ্ডীর চরণ ॥
শুন গ জননী তুমি সকল নিদান।
স্তুতি করে কবিচন্দ্র করিয়া প্রণাম ॥ ০ ॥

॥ কামোদ রাগ ॥

মাতা তারিহ ত্রিলোকে
মাতা তারিহ ত্রিলোকে।
উত্তম মধ্যমাধম প্রণত সেবকে ॥
তুমি স্থল শূন্য বন সলিল পাতাল।
ত্রিদেবতা সনমূর্ত্তি অষ্টলোকপাল ॥
পর্ব্বত ভুজগ তরু সিন্ধু নদ নদী।
স্ত্রী পুরুষাকৃতি সতী তুমি ভগবতী ॥
দণ্ড পল মুহূর্ত্ত করণ যোগ তিথি।
দিবস রজনী সন্ধ্যা কাল কলানিধি ॥
সুমতি কুমতি বিধি বিষ্ণু নিরঞ্জন।
প্রলয় উদয় নিদ্রা তুমি জাগরণ ॥
জন্ম শিশু যুবা জরা হেতু বেদমাতা।
ভারত পুরাণ শাস্ত্র ভাগবত গীতা ॥
ঋষাদি দশ অব[৪৯]তার অনন্তরূপিণী।
বিপত্যনাশিনী শূর শত্রুবিনাশিনী ॥
স্বাহা স্বধা তুমি পুষ্টি সদসদ্বিচার।
তুমি যোগ ভোগ লোহ মহা অহঙ্কার ॥
মাস ঋতু বৎসর ধর্ম্ম তপোধর্ম্ম।
তুমি পক্ষ গুণ দুঃখ লোভ সুখ মর্ম্ম ॥
গ্রহ বার তিথি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র।
সুরতি বৎসর তীর্থ তুমি মহাসত্ব ॥
ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুব্ধ মতি।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥ ০ ॥

॥ পয়ার ॥

করিলে অসুর বধ তুমি সর্ব্বমাতা।
ঘুচিল যতেক ছিল ভুবনের দ্বিধা ॥
দেবগণে দেহ বর সেবকবৎসলা।
শুনিয়া দেবের বাণী কথিল মঙ্গলা ॥
বর মাগ অরে শুন সকল দেবতা।
প্রসন্নহৃদয় আমি হইল বরদাতা ॥
দেবীর বচনে বলে যত দেবগণ।
মাতা এমান করিবে যত অসুর খণ্ডন ॥
করিবে সকল কাল বিপক্ষঘাতন।
স্মিতমুখে বলে দেবী শুন দেবগণ ॥
অষ্টাবিংশতি যুগ ইহার অন্তরে।
শুম্ভ নিশুম্ভ দুই জনম লভিলে ॥
নন্দঘোষ ঘরে গোপী যশোদাজঠরে।
জনম লভিব আমি পৃথিবীমণ্ডলে ॥
জনমিব তবে বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসিনী।
দুই মহাসুরে পুন বধিব আপুনি ॥
করিব অনেক মহাসুরের বিনাশ।
বর দিয়া বলে শুন ত্রিদেব নিবাস ॥
মধু কৈটভের বধ মহিষ ঘাতন।
পঠে শুনে যেবা শুম্ভ নিশুম্ভ মরণ ॥
ধবল পক্ষের দুই নবমী অষ্টমী।
চতুর্দ্দশী পাইয়া যেবা শুনে এই বাণী ॥
বিচারিয়া বিশেষে মঙ্গল শনিবারে।
প্রতিদিন পূজে যদি পঞ্চ উপচারে ॥
[৫০ক] দুরিত না থাকে তার দারিদ্র্যের যোগ।
কোন কালে নহে ইষ্ট কুটুম্বাবয়োগ ॥
নৃপ দস্যু রিপু খড়্গ দহে লঘু ভয়।
অশুভ তাহার কার কভু নাহি হয় ॥
বর দিয়া ভগবতী চলিল কৈলাস।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরার দাস ॥ ০ ॥

॥ সারেঙ্গ রাগ ॥

দেবীর মাহাত্ম্য এই ভুবনে উত্তম।
কথিল তোমারে সত্য নৃপতিনন্দন ॥

এমত প্রকারে দেবী কি বলিব আর।
প্রকাশে অনেক বিদ্যা ধরিয়া সংসার॥
মেধস মুনির বোলে সমাধি নৃপতি।
দুই জনে মনে ভাবে পূজিব ভারতী॥
চারিদশ লোকে জানে নাম তাঁর জয়া।
অশেষ রূপিণী সেই সতী বিষ্ণুমায়া॥
তুমি নরপতি এই বৈশ্যের পো।
নিবসে সংসারে যেবা কার নাহি মো॥
দেবাসুর সিদ্ধ মুনি যার পদ সেবে।
সেবিলে সে সুখ মোক্ষ দুই পদ লভে॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী॥ ০॥

॥ পয়ার ॥

সুগন্ধি চন্দন ফুল ধূপ দীপ লৈয়া।
নানা উপহারে যত নৈবেদ্য রচিয়া॥
করিয়া মৃন্ময়ী দেবী নদীর পুলিনে।
সুরথ সমাধি দুহেঁ পূজে প্রতিদিনে॥
ত্রিপুরাভৈরবী মন্ত্র জপে একমনে।
যজ্ঞ তপোবলে দেবী টলিল আসনে॥
নিরামিষ্য হবিষ্য করিয়া অনাহার।
ভগবতী বিনে মতি নাহি জানে আর॥
নিজ গাত্র ছেদিয়া রুধির দিয়া বলি।
দুজনে বৎসর তিনি সেবিল বাশুলী॥
ধেয়ানে জানিল পূজে সমাধি সুরথ।
আপুনি করিব সিদ্ধ তার মনোরথ॥
অমলা বিমলা মঙ্গলাবতী সুকোমলা।
[৫০] সংহতি সুমুখী সখী চাঁচরকুন্তলা॥
কুলুপ বাহন গলে নরমুণ্ডমালা।
মাথায় মুকুট চাঁদ নয়ান বিশালা॥
উজ্জ্বল দশন রাকা হিমকর মুখ।
দ্বিভুজে কর্পর কাতি উল্লসিত বুক॥
সেবকবৎসলা কালী উরিলা সাক্ষাত।
বর মাগ দুই জন ঘুচাব বিবাদ॥

শুনিঞা দেবীর বাণী বলে মহিপতি।
নিজ রাজ্য দেহ মোরে ঘুচুক দুর্গতি॥
সমাধি মাগিল বর বৈশ্যের সন্ততি।
মরিলে সুমতি মোর হইব মুকতি॥
শুন রে সুরথ নাহি জানিবে অভাব।
দিন পাঁচ সাত বই হব রাজ্য লাভ॥
শত্রুরে মারিয়া হবে রাজ্যের প্রধান।
সমাধিকে বর দিলা পাইবা গেয়ান॥
এতেক বলিয়া দেবী গেলেন কৈলাসে।
নানা সুখ পায় দুহেঁ দিবসে দিবসে॥
বনহস্তী আসিয়া সুরথ করে কাঁধে।
নিজ দেশ গেল যত লোক পদ বন্দে॥
মহামায়া ত্রিপুরার মহিমা অপার।
সমাধি পাইল মুক্তি রাজা রাজ্যভার॥
অষ্ট মন্বন্তর কথা কথিল সকল।
ঋষির নন্দন কথা শুনিল বিস্তর॥
সদয় হৃদয় মুনি নাহি কোন দোষ।
পক্ষের বচনে বড় পাইল সন্তোষ॥
হেনকালে ভগবতী সুরলোকে আছে।
উপকথা কহে কেহ বসি তাঁর কাছে॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী॥ ০॥
॥ ইতি অষ্ট মন্বন্তর কথা যুদ্ধ সমাপ্ত॥

নরৈঃ কিং বর্ণ্যতে চণ্ডী জ্ঞায়তে ন স্বয়ম্ভুবা।
সদাস্তু মতিরস্মাকং ত্রিপুরাপদপঙ্কজে॥ ০॥
॥ সপ্তম পালা গীত সমাপ্ত॥

॥ মঙ্গল রাগ ॥

মঙ্গলা ষষ্ঠী বাণী কমলা নারায়ণী
মনসা মহেশের সুতা।
সকল দেবতা [৫১ক] পৃথিবী হয় পূজা
তেজিয়া বিশালাক্ষী মাতা॥
অমলাবতী সখী শুন লো শশিমুখী
আমারেধিক আছে কেবা।

বলহ ত্রিভুবনে বধিব সেই জনে
যে না করে মোর সেবা ॥
চল গ অম্বিকে পূজিব তিন লোকে
তোমাধিক কার গতি।
বচন যদি রহে নিবেদি তুয়া পায়ে
করিয়া কোটী প্রণতি ॥
উৎসাকরসুত সাধু ধুসদত্ত
নিবসে লক্ষ ঘর দ্বীপে।
না পূজে আন দেবে সতত শিবে সেবে
নৈবেদ্য দিয়া নানারূপে ॥
সত্যবতী রামা তাহার প্রাণসমা
সেই না পূজে ভগবতী।
বধিলে কোন ফল না পাবে পুষ্প জল
থাকিব বড় কুখেয়াতি ॥
যে নাহি পূজে মোহে বধিলে দোষ তাহে
কে দিব জল পুষ্প পাত ।
যদি বা নাহি বধি অল্পতা হয় তথি
উভয় দেখি পরমাদ ॥
অমলাবতী বাণী শুনিঞা ত্রিনয়নী
হৃদয় জিনিব গুণে।
ত্রিপুরাপদস্থল- কমল মধুকর
মুকুন্দ কবিচন্দ্র ভনে ॥ ০ ॥
॥ বারাড়ি ॥
মহামায়া বৃহদিন্দু পতিতপাবনী বনসিন্ধু
গুণসিন্ধু নরেন্দ্ররূপিণী।
কমলা অমলাবলা শিরে কলানিধি কলা
ভগবতী নৃমুণ্ডমালিনী ॥
ত্রিপুরে কহি শুন বিশাললোচনী।
তুমি দেবী ভগবতী ভকতজনের গতি
ভবনদী তরণে তরণী ॥
আমি তব প্রিয়দাসী নিবেদিতে ভয় বাসি
তব পূজা নহিল ভুবনে।
হৃদয় করিলে যত বিসরিলে অভিমত
এথাকারে আইলে কি কারণে ॥

অমলাবতীর বোলে বিশাললোচনী বলে
[৫১]কিরূপে লইব পুষ্প জল।
চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচিল সরস মঙ্গল ॥ ০ ॥

আছিলে নিরাকার পাতিলে অবতার
জন্মিঞা দেবতার তেজে।
কে জানে তব রূপ মহিষাসুর ভূপ
বধিলে সমরের মাঝে ॥
বর্দ্ধমানে বৈসে পরম পরিতোষে
সুরথ মহারথ রাজা।
স্বপনে অষ্টভুজ দেখাইয়া সিংহধ্বজ
ভুবনে লহ গিয়া পূজা ॥
নিবেদি বিদ্যমান কর গো অবধান
তুহিনমহীধরপুত্রী।
বিধাতা হরিহর তোমার কুর্পর
ত্রিলোক জনক উ ধাত্রী ॥
আইলে নিজ কাজে না বল কিছু লাজে
ত্রিপুরে শুন সুলোচনে।
নটিনী এক জনে মাগিয়া লহ দানে
নৃপতি পুরন্দর স্থানে ॥
জন্মাইয়া ক্ষিতিতলে বণিক নরকুলে
সুনারী পরমরূপসী।
তাহার অভিমত করহ তুমি সিদ্ধ
তোমার হব সেই দাসী ॥
উৎসাকরসুত সাধু ধুসদত্ত
তাহার করাইয়া বধূ।
পরম পরিতোষে পূজিব স্ত্রী পুরুষে
তোমার পদভৃঙ্গকেতু ॥
অমলাবতী সতী কথিল সুভারতী
শুনিয়া পরিতোষ মনে।
ডাকিল সুররাট দেখিব আজি নাট
মুকুন্দ কবিচন্দ্র ভনে ॥ ০ ॥

॥ ছন্দ ॥

ইন্দ্রের আদেশ পাইয়া মোহিনী নটিনী।
লইয়া লাসের পেড়ি ঘুচাল্য ঢাকুনি॥
রসের দর্পণ লইয়া নিরখয়ে মুখ।
কুন্তল মাজ্জিল বামা করিয়া কৌতুক॥
সিন্দুর পরে [৫২ক] ললাটে অধিক উজ্জ্বল।
চন্দন তাহার তলে নয়নে কজ্জল॥
গলায় তুলিয়া পরে হার মুক্তাবলী।
বক্ষে বান্ধিল রামা বিচিত্র কাঁচলি॥
রজতের তাড় হাথে ভুজের উপরে।
পিঠে দোলে পাটজাদ অতি মনোহরে॥
অঙ্গুরি পরিল বামা বাম করশাখে।
পাশুলি পরিল বামা ছয় পদযুগে॥
বাছিয়া বসন পরে শ্বেত অভিলাষ।
অত্যন্ত উজ্জ্বল রামা পরি সেই বাস॥
কটিদেশে রনুঝনু মুখর কিঙ্কিণী।
ঝনুঝনু করে পদে নূপুরের ধ্বনি॥
পঞ্চবাণ রূপবতী সংহতি করিয়া।
ইন্দ্রের সভায় রামা উত্তরিল গিয়া॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী॥ ০ ॥

॥ পাহিড়া ॥

কন্যা নাচে রে ইন্দ্রের নাটনী
স্থরগণ হরিষ অন্তরে।
তাথে তাথে থিক ঘন ডাকে স্থরসিক
ঠন ঠন কঙ্কণঝঙ্কারে॥
কুটিল কুন্তল ভালে কুণ্ডল শ্রবণমূলে
স্থরঙ্গ সিন্দূর শিথায়।
আতাঞ্চলি দিয়া চাহে দেবতার মন মোহে
হাসি হাসি বদন লুকায়॥
উরজ দাড়িম্বফল মুখশশিমণ্ডল
নিন্দিত বিম্ব অধরে।
গাইল পঞ্চমস্বরে অকালে বসন্ত উরে
মহীরুহ সকল মুঞ্জরে॥
পঠে পাটথোপ দোলে ধীরি ধীরি ফিরি বোলে
ঝনুঝনু চরণে নূপুর।
মকিত একতালে রহি রহি পাক মেলে
যেন চলে মত্ত ময়ূর॥
বাদ্য বাজে ঘোরতর যেন ডাকে জলধর
কিন্নরী মাধুরিম গায়।
ঘাঁটী বাজে দুই এক বিপরীত নাট দেখ
জমকিত কাঁচ সরায়॥
গালে হাথ দিয়া রহে লাফ[৫২]দিয়া পাছু আয়ে
পাক দিয়া ফিরে নিরন্তর।
ঘন উঠে বৈসে পায় ভুজলতা নড়ে বাহে
দেবতা ভেদিল পঞ্চশর॥
বলে দেবী বিশালাক্ষী ভাল নাচে শশিমুখী
হৃদয় ভেদিল বড় রঙ্গ।
চণ্ডীপদসরোরুহে শ্রীযুত মুকুন্দ কহে
নাটনীর হইল তালভঙ্গ॥ ০ ॥

॥ ধানশ্রী ॥

তালভঙ্গ দেখি হাসে যত দেবগণ।
লজ্জায় মলিন হইল নটিনীবদন॥
দাণ্ডাইতে নাহি জানে বুকে লাগে ডর।
সমীরণে কাঁপে যেন চলাচল দল॥
বলে ইন্দ্ররাজা হের শুন লো মোহিনী।
স্বর্গ তেজিয়া তুমি চলহ অবনী॥
ইন্দ্রের বচনে বজ্র নটিনীর মাথায়।
ত্রিদশনাথের পদে নটিনী লোটায়॥
পুনঃ পুনঃ উঠে পড়ে উঠিতে না পারে।
অপরাধ ক্ষম নাথ বারেক দোষীরে॥
নটিনীর বচন শুনি স্থরপতি বলে।
ভুঞ্জিবে স্বর্গের স্থখ পৃথিবীমণ্ডলে॥
কতদিনে আসিব করহ সন্নিধান।
আপুনি শাসন কর দেব মঘবান॥
ত্রিপুরা কথিল ইন্দ্র মোরে দেহ নটী।
ক্ষিতিতলে হয় যেন মোর ব্রতচেটী॥

আমার করিয়া সেবা ভুবি কথোদিনে।
আসিব তোমার ঠাঞি কবিচন্দ্র ভনে ॥০॥

॥ ছন্দ ॥

পুন বলে নটিনী ত্রিপুরা বিদ্যমান।
পৃথিবী যাইতে মা গো ডরে কাঁপে প্রাণ ॥
মোর হিত চিন্তিবে সতত নারায়ণী।
সত্য সত্য বলে চণ্ডী বিশাললোচনী ॥
অভিশপ্ত নটিনী তাহার কথা শুন।
রোগ সঞ্চারিতে যেন কাঠে বিন্ধে ঘুণ ॥
জরজর হইল দেহ কয়ে সকরুণ।
পড়িল পরমহংস হরে রূপগুণ ॥
হেনকালে নারায়ণ দত্ত বণিক।
[৫৩ক] যুবতী কনকাবতী তার প্রাণাধিক
ঋতুস্নান করে সে অন্তরে হয় শুচি।
জল পান করিতে তাহার বাঢ়ে রুচি ॥
নারিকেল জল রামা পিয়ে উর্দ্ধমুখে।
উদরে প্রবেশে নটী শ্বেত মাছিরূপে ॥
অস্ত গেল দিনমণি হইল অর্দ্ধরাতি।
গর্ত্তনিকেতনে দুহেঁ বঞ্চিল সুরতি ॥
সুমতি কনকাবতী ত্রিপুরার বরে।
পরম রূপসী কন্যা ধরিল উদরে ॥
এক মাস গর্ত্ত ধরে কনকা বান্যানী।
দুই মাস গর্ত্ত লোকে হইল জানাজানি ॥
তিন মাস গর্ত্ত মুখে ঘন উঠে হাই।
গায় বল নাহি নিন্দ নয়নে সদাই ॥
চারি মাস গর্ত্ত ভেল দেহ হই ভিন্ন।
দিনে দিনে গুণবতী ধরে গর্ত্তচিহ্ন ॥
পাঁচ মাস গর্ত্ত হইল খায় নানা সাধ।
নানা পিঠা দেই কেহ ব্যঞ্জন ভাত ॥
দিবস গণিতে তার গেল ছয় মাস।
পাত ঝিকটী অম্লে বাঢ়ে অভিলাষ ॥
সাত মাস গেল অষ্ট মাস পরবেশে।
নানা সাধ খায় রামা দিবসে দিবসে ॥
চণ্ডী পূজে নানা দ্রব্য তথি দিয়া ঘৃত।
অষ্ট মাস গেল রামা খায় পঞ্চামৃত ॥
সুখ দুঃখ যত সর্ব্ব কর্ম্ম অধীন।
দশ মাস গেল পূর্ণধিক দশ দিন ॥
আচম্বিতে জনমিল তার পেটে ব্যথা।
সুখে প্রসবিল রামা সুন্দরী দুহিতা ॥
রড় দিয়া চেটী গিয়া আনিলেক ধাই।
জয় দিয়া নাভিৎসেদ করিল তথাই ॥
সধবা বিধবা যত বুলে ধনি ধনি।
চন্দ্রবয়ানী কন্যা চকোরনয়ানী ॥
তৈল সিন্দূর কেহ লয় গুয়া পান।
যার যেবা ঘরে সভে করিল পয়ান ॥
আড়াই হানা বেনা আনে আর পাচ গেরে।
অগ্নি জালিয়া কোণে পাতিল আঁতুড়ে ॥
এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় যায়।
জাগরণ করে নিশি ষষ্ঠীপূজায় ॥
ষষ্ঠী পূজিয়া নিশি জাগরণ করে।
দেবীর বরেতে কন্যা বাড়ে বাপঘরে ॥
আসিয়া লিখিল বিধি ললাটে [৫৩]আপুনি।
ধুসদত্ত সাধুর নারী সুমুখী রুক্মিণী ॥
অল্প লিখিল দুঃখ প্রথম বয়েসে।
যশে গুণে যত কাল বরে অল্প দোষে ॥
ডালে ডাকে কোকিল সুগন্ধি বহে বায়ু।
অশীতি বৎসর বিধি লিখিলেক আয়ু ॥
মাঘ মাসে সিত পক্ষ তিথি ত্রয়োদশী।
পূজিয়া ত্রিপুরা স্বর্গ চলিব রূপসী ॥
লিখিয়া চলিল বিধি আপনার ঠাঞি।
আটকড়াইয়া করিলেক সাত দিন বই ॥
জগতবিখ্যাত যার সেই কুলাচার।
পাঁচ দিনে পাঁচটি নব মেলন্যা তার ॥
দিবস গণিতে গেল বিংশতি দিন।
ষষ্ঠী পূজিতে আইয় ডাকে সাত তিন ॥
লাখর দ্বীপের লোক হইয়া হরষিত।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে বাশুলীর গীত ॥ ০ ॥

॥ কামোদ রাগ ॥

ত্রিসর জালি খানি   পাতিনী কাল জিনি
ধবল পাট ভোট বাস।
সুরঙ্গ সুয়াঠুটী   পরিণত তেকাঁঠি
যাহার যেই অভিলাষ ॥
আসিয়া ডাকে চেড়ী   পরিয়া পাটশাড়ি
শঙ্খ সুবলিত ভুজা।
অঞ্জনে আঁখি রঞ্জে   গমনে হংস গঞ্জে
সাধুর ঘরে ষষ্ঠীপূজা ॥
ষষ্ঠী পূজিতে   চলিল কনকা
আপন কোলে কন্যাখানি।
যতেক আইয় মেলি   দেই হুলাহুলি
মৃদঙ্গ বাজে শঙ্খ বেণী ॥
অমূল্য আংসাদন   অনেক আভরণ
কনকা মৃগঙ্কগামিনী।
সঘনে জয় জয়   উল্লাস হৃদয়
আগে পাছে নিতম্বিনী ॥
যুগল বাজে সিঙ্গা   ধাইল রণচিঙ্গা
ছাওয়াল কত নাহি জানি।
তৈল সিন্দূর   হলদি প্রচুর
কুঙ্কুম মলয় গন্ধখানি ॥
ধবল কাল শত   ছাগল দশ বিশ
প্রবীণ মহিষ মেষে।
খড়্গ হাথে করি   ধাইল খাণ্ডারী
নগরে যত জন বৈসে ॥
কদলী কান্দি কান্দি   সন্দেশ নানা ভাঁতি
দুগ্ধে মিশাইয়া চিনি।
সুরঙ্গ ফল ফুল   বাঙল নারিকেল
হরিষে বটনিবাসিনী ॥
[৫৪ক] কলসে দধি পূরি   ধাইল কত ভারী
ধাইল হাথে অপঝারি।
ব্রাহ্মণ যায় আগে   ত্রিবিধি বেদ মুখে
কাঁসর বাজে শঙ্খ ভেরি ॥
সুগন্ধি ফুলঝারা   বিংশতি এক বারা
বটতলে হুলাহুলি।
ষড়ঙ্গ ধূপ দীপ   নৈবেদ্য নানারূপ
মোদক খই খিরপুলি ॥
কর্পূর তাম্বূল   মধুর শ্রীফল
লবঙ্গ নানা জাতিফল।
ব্রাহ্মণ পড়ে স্তব   সর্ব্বাদি পূজে দেব
পঞ্চোপচারে লম্বোদর ॥
ষষ্ঠীর দুই পদ   পূজিয়া বিধিমত
কল্যাণ করে দ্বিজ শেষে।
ত্রিপুরাপদস্থল-   কমল মধুকর
মুকুন্দ কবিচন্দ্র ভাষে ॥ ০ ॥

॥ ছন্দ ॥

বিলায় সাধুর নারী সরস সিন্দূর।
পতি পত্নী জনের ললাটে উইয়ে সুর ॥
মস্তক উপরে দেই তৈল পলা পলা।
গুয়া পান দেই একে একে খই কলা ॥
খিরপুলি দেই রামা করিয়া বিশেষ।
দধি মধু নারিকেল চিনির সন্দেশ ॥
ইক্ষু শসা দেই কারে পনসের ফল।
চিপট মুড়কি দেই বাঙল নারিকল ॥
সর্জ্জ বিলাইয়া রামা উল্লসিত বুক।
গীত নাটে উল্লসিত যত কুতভুক ॥
ব্রাহ্মণে গুবাক দেই কর্পূর পান।
পরিহার মাগিলেক করিতে কল্যাণ ॥
আনন্দে যুবতীগণের গায়ে বাঢ়ে বল।
আপনা আপুনি পাড়ে হরিষ কন্দল ॥
পরিহাস করে কেহ নাঞি করে হেলা।
হলদি কুঙ্কুম চুনে পাতে নানা খেলা ॥
আতাঞ্চলি দিয়া ঢাকে বদন কমল।
গালে হাথ দিয়া কেহ হাসে খল খল ॥
মাসাস পিসাস দেখ ননদ জাগর্ত্তি।
কোন না যাব ঘর কুৎসিত মূর্ত্তি ॥

মস্তকে কাপড় নাহি কুচ নাহি ঢাকে।
হিহি করিয়া হাসে লাজ নাহি মুখে ॥
গুড় গুড় দগড় বাজে মাদল কাঁসর।
[৫৪]যুবতীর আনন্দ ছাওয়াল দেই রড় ॥
সর্জ্জ বিলাইয়া রামা অবশেষ বেলা।
ছাওয়ালে ছাওয়ালে কাড়াকাড়ি খই কলা ॥
বিলাইল সর্জ্জ যত মঙ্গল বাধাই।
বিদাই করিল সভে বটতরু ঠাঞি ॥
পূজা সঙ্কলিয়া যায় যার যথা ঘর।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাকিঙ্কর ॥ ০ ॥

॥ শ্রী রাগ ॥

এক দুই তিন চারি গেল পঞ্চ মাসে।
পুরোহিত আনিঞা রুক্মিণী নাম ভাষে ॥
ছয় মাস গেল সাত মাস পরবেশে।
অন্নপ্রাশন করাইল সুদিবসে ॥
বাপের মন্দিরে কন্যা পরম রূপসী।
দিনে দিনে বাড়ে যেন দ্বিতীয়ার শশী ॥
অষ্ট মাস গেল রামা হয় অন্নরুচি।
নয় মাস পরবেশে দেই আলগছি ॥
দশ একাদশ মাস বারতে প্রবেশ।
পূর্ণ মাস বৎসর হইল অবশেষ ॥
স্বরখেলা নিকেতনে প্রথম বয়েস।
গণিতে বৎসর তার বারতে প্রবেশ ॥
স্নান করিতে সাধু নামে পুণ্য জলে।
রূপসী রুক্মিণী রামা দেখে হেন কালে ॥
স্মরশর জরজর দেহ তদবস্থ।
সম্বন্ধ করিল সাধু পাঠাইয়া মধ্যস্থ ॥
বিবাহ করিব শুভদিন শুভক্ষণে।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাচরণে ॥ ০ ॥

॥ পয়ার ॥

বিবাহ করিব মনে ভাবে সদাগর।
ডাক দিয়া আনিল পণ্ডিত গৌরীবর ॥
প্রণতি করিয়া বলে সাধু ধুসদত্ত।
অবধান কর দ্বিজ কহি নিজ তত্ত্ব ॥
উভয় করিব বিভা মনের বাসনা।
তোমার চরণে এই নিবেদি আপনা ॥
স্নান করিতে আমি দেখিল সুন্দরী।
সমতুল্য নহে তার স্বর্গবিদ্যাধরী ॥
ঘটনা করিয়া দেহ সেই সীমন্তিনী।
মনোরথ সিদ্ধি মোর কর দ্বিজমণি ॥
সাধুর বচনে দ্বিজ প্রকাশে ভারতী।
অনঙ্গ আবেশে কিবা বল মূঢ়মতি ॥
[৫৫ক] অকুমারী কুমারী বর্ণের নাহি দায়।
তত্ত্ব না জানিঞা কর ঘটক সহায় ॥
বিপ্রের বচনে বলে সাধু অধিকারী।
সত্যবতীর অনুজা ভগিনী সেই নারী ॥
সম্বন্ধে বিলম্ব না কর করহ গমন।
দ্বিজ প্রতি বলে সাধু বিনয় বচন ॥
সাধুর বচনে তথা চলে গৌরীবর।
ঘটাজি পুস্তক সঙ্গে করিলা সত্বর ॥
গিরিজা গণেশ পদে করিয়া প্রণাম।
অনুগত সঙ্গে করি চলিল ধীমান ॥
ধনলোভে ঘটক চলিলা রড়রড়ি।
উপনীত হইল দত্ত নারায়ণ বাড়ি ॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া বান্যা হরষিত চিত্তে।
সম্ভ্রমে চরণধূলি লইলেক মাথে ॥
সফল দিবস মোর তোমা দরশন।
পবিত্র করিলে তুমি আমার ভুবন ॥
মধুর বচনে তুষ্ট করিল দ্বিজেতে।
বিচিত্র আসন আন্যা দিলেক বসিতে ॥
রুক্মিণী প্রণাম করি দিল অপঝারি।
পুত্রবতী হইয় ভাষে বেদ অধিকারী ॥
নারায়ণ দত্ত বলে শুন মহাশয়।
এই ত আমার কন্যা বিভা নাহি হয় ॥
এ বোল শুনিয়া দ্বিজ করে উপহাস।
বিরচিল কবিচন্দ্র ত্রিপুরার দাস ॥ ০ ॥

॥ পঠমঞ্জরী ॥

বান্যা রে কেমতে তোমারে বাসে অন্ন।
এ হেন যুবতী ঘরে　চমকিত নাহি তোরে
কেন মতে পাইয়াছ প্রসন্ন ॥
নিকলঙ্ক তুমি সাধু　তোর ঘরে কোন হেতু
হেন কন্যা আছে অবস্থিতা।
করিয়া এ সব কাজ　বণিকে আনিল লাজ
বিভাকার্য্য না কর তুরিতা ॥
প্রৌঢ়া কন্যা তোর ঘরে তোরে নাহি লাজ করে
কোন পাকে হয় ঋতুবতী।
জ্ঞাতি নাহি খাব জল　পাপে নাহি পাবে স্থল
শুন রে অবোধ মূঢ়মতি ॥
জ্বলন্ত আনল সমা　তোর ঘরে হেন রামা
কেন এত কাল অবস্থিতা।
ব্যর্থ জীয়ে তোর নারী　হেন কন্যা গর্ভে ধরি
বিভাকার্য না কর তুরিতা ॥
শুন রে বণিকবর　কেন না গৌরব হর
লভ তুমি নবম বরিখে।
নব দশ কন্যা উর্দ্ধ　কত না লইবে বিত্ত
[৫৫] গৃহে নিবসতি কোন সুখে ॥
নাহি তোর কোন বিত্ত কেনি হইয়া পাপচিত্ত
যোগ্য কন্যা রাখ্যাছ আলয়।
কোটীশ্বর নাম ধর　কড়ির প্রত্যাশ কর
বিফল জনম ক্ষিতি হয় ॥
জেন যে কন্যার কড়ি　কেবল শমন দড়ি
লইলে খাইতে নাহি পাবে।
জ্ঞাতি গোত্র হব লাজ　বুঝহ এ সবের কাজ
অন্তকালে স্বর্গ নাহি যাবে ॥
হইয়া অবস্থিতা কন্যা　জল মোরে দিল আন্যা
বিপাকে জন্মিল মোর পাপ।
কোন মতে অন্ন খাও　কোন সুখে নিদ্রা যাও
হেন মূঢ়মতি তুঞি বাপ ॥
বিপ্রের বচন শুনি　পুন কহে ফরমানি
বিনি অপরাধে দেহ গালি।

কুলের পণ্ডিত তুমি　তোমা অগোচর আমি
সম্বন্ধ করিতে কিবা পারি ॥
দেখিয়া সুন্দর বর　সোলই সম্পূর্ণ ঘর
বিভাকার্য্য করহ তুরিত।
দ্বিজ কবিচন্দ্র কয়　যত্তপি মনেতে লয়
শুন বান্যা কহি সমুচিত ॥০॥

॥ চৌপদী ॥

কন্যা যবে জন্মে ঘরে　তখনি দাতব্য করে
প্রথমাংশে শোকসাগর।
ভাল মন্দ বিচারিতে　কথো কাল এই রীতে
বর চাহি বুলি দেশান্তর ॥
যদি বা বিবাহ দিয়া　শান্তি নাহি পড়ে হিয়া
তুষের দহনে তনু জ্বলে।
ভাল মন্দ নাহি জানি　অবিরত মনে গুণি
বুক ভিজে নয়নের জলে ॥
বঞ্চয়ে পরের ঘরে　পাছে কেহ মারে ধরে
ভাবিতে হৃদয় নাহি সুখ।
কোথা খায় কোথা শোয় ভোক পাছে লাগে পোয়
বাপের সতত মনে দুঃখ ॥
ঠাকুর হে নিবেদিনু তোমার চরণে।
কন্যার শোকেতে গায়　ঘুণে বিন্ধে বাপ পায়
এত কেন উঠে পড়ে মনে ॥ ধ্রু ॥
সাধুর বচন শুনি　বলে গৌরী দ্বিজমণি
উত্তম কথিলে মোর ভাই।
এ সব সংসারে যত　কন্যা ঘরে রাখে কত
মূঢ়ের সদৃশ তোমা পাই ॥
যদি দানে করে কর্ম্ম কন্যা[৫৬ক]হইতে বাড়ে ধর্ম্ম
অবশ্য অমরপুরে বাস।
না জান কন্যার মূল　কন্যা হইতে বাড়ে কুল
অকারণে কর মিথ্যা আশ ॥
ছাড়হ এ সব মায়া　অকারণে কর দয়া
বিপদ সম্পদ কার নহে।
একাএকি আসি যাই　যখন যে যোনি পাই
মায়ার নিগড়ে কাল যায়ে ॥

শুন রে বণিক জাতি মৃত্যু বিনে নাঞি গতি
যত দেখ সকলি অসার।
তাঁহা বিনু নাহি ধন ভজ প্রভু নারায়ণ
ভবসিন্ধু যদি হবে পার॥
বিপ্রের বচন শুন্যা হরষিত হইল বান্যা
বিবাহ কথায় দিল মন।
অম্বিকার পদাম্বুজে তথি মোর মন মজে
শ্রীযুত মুকুন্দ সুরচন ॥০॥

॥ পয়ার ॥

সম্বন্ধ করিব কোথা বলহ গোসাঞি।
তোমার কারণে আমি তত্ত্ব নাহি পাই॥
আমার অধিক কুলে দিব কন্যাদান।
বিচারিয়া আন তুমি কুলের প্রধান॥
এ বোলেতে ঘটক ঘটাঁজি ধরি ভুজে।
বিচারিল যত কুল বণিকের মাঝে॥
ভাল মন্দ মন্দ ভাল ঘটকের মুখে।
বিদ্রূপ করিয়া বলে সাধুর সমীপে॥
তোমার অধিক কুলে নাহি অন্য দেশে।
সভে মাত্র এক যে লাখর দ্বীপে বৈসে॥
দত্ত উৎসাকরসুত ধুসদত্ত নাম।
তবাগ্রজ ভাই যারে দিল কন্যাদান॥
তারে কন্যা দিয়া তোর ভাই হইল বান্যা।
কহিল কুলের তন্ত্র লহ ইহা জান্যা॥
তারে সম্প্রদান কর রুক্মিণী দুহিতা।
হইব কুলের মুখ্য নহিব অন্যথা॥
মাতঙ্গদশন তুমি বান্ধিবে কাঞ্চনে।
বণিকে প্রধান তুমি হইবে ভুবনে॥
নাটকী ভেজান মন্ত্র জপাইল কানে।
ভুলিল বণিকসুত ঘটকবচনে॥
লংঘিতে না পারি [৫৬] আমি তোমার বচন।
রুক্মিণীরে দিব বিভা করহ গমন॥
হরষিত ঘটক চলিল বড়াবড়ি।
মনে ভাবে পাব ঘটকালি কড়ি॥

উপনীত হইল বিপ্র ধুসদত্ত যথা।
ব্যপদেশে বসি দুহে কহে সর্বকথা॥
হাস্যবদনে কিছু কহে মন্দ মন্দ।
শুভক্ষণে সাধু তোমার করিল সম্বন্ধ॥
গলে পাটা দিয়া সাধু ধরিল চরণে।
তোমা বিনে বন্ধু মোর নাহি ত্রিভুবনে॥
নাটকী ভেজান মন্ত্র জপাইল কানে।
সত্যবতীর নিন্দা কর আন্ধর রন্ধনে॥
রন্ধন করিয়া অন্ন দিব সত্যবতী।
বিরচিল কবিচন্দ্র মধুর ভারতী ॥০॥

॥ সিন্ধুড়া ॥

ভোজন করেন সাধু নিন্দার কারণ হেতু
সত্যবতী পরিবেশে ভাত।
হৃদয়ে করিয়া কূট সকলি করিল নঠ
গণ্ডুষে স্মওরে ভোলানাথ॥
পাইয়া অন্নের বাস বলে কথ স্বরভাষ
ওদনেতে কহে দুগ্ধগন্ধ।
হৃদয়ে করিয়া রাগ প্রথমে বঞ্জিল শাক
লবণেতে করিয়াছে মন্দ॥
হংস মুগের সূপ দেখিতে অধিক রূপ
তাহাতে দিয়াছে চতুর্জ্জাত।
করয়ে উজ্জ্বল ঘন বলে বড় খর লোন
ঠেলিয়া পেলিল অচিরাত॥
ইলিশ পনসবীজ তাহে জিরা মরিচ
আনিঞা দিলেক সত্যবতী।
আমিষ্যের গন্ধ কহে বলে সাধু ভাল নহে
মার্জ্জারে দিলেক দুষ্টমতি॥
মনে সাত পাঁচ করি ভ্রষ্ট মৎস্য দিল নারী
আজি বিধি মোরে হৈল বাম।
আপ[৫৭ক]নার কর্ম্মফলে সাধু মোরে মন্দ বলে
ভোজন না করে গুণধাম॥
মনেতে অসুখ মানি ভাজা মৎস্য দিল আনি
অন্ন দিলেক শশিমুখী।

না ভুঞ্জিব মনে জানে　　মন্দ বলে রন্ধনে
রসনা পরশে হয় দুঃখী ॥
পূরিয়া কনক বাটী　　দুগ্ধ দেই পানি চেটী
খায় সাধু বিরস বদনে ।
শুন সত্যবতী সতী　　কহি দৃঢ় ভারতী
নিশ্চয় ভুলিলে রন্ধনে ॥
বিবাহ করিব আমি　　শুন তুমি সীমন্তিনী
বিষাদিত না ভাবহ মনে ।
বড় তুমি পাও দুঃখ　　করাইব আমি সুখ
আর যেন না যাহ রন্ধনে ॥
শুনিঞা প্রভুর কথা　　লাজে হেট করে মাথা
কি বলিব না নিঃসরে তুণ্ডে ।
হৃদয় জন্মিল শূল　　সচিন্তিত শোকাকুল
অম্বর ভাঙ্গিয়া পড়ে মুণ্ডে ॥
যুড়িয়া যুগল করে　　স্তুতি করে সদাগরে
সজল নয়ানে সত্যবতী ।
ত্রিপুরাচরণবর　　সরোরুহ মধুকর
কবিচন্দ্র কহে সুভারতী ॥০॥

॥ সুই রাগ ॥

প্রাণনাথ সতিনী না দিহ তুমি ।
বিভা কর দূর　　শুন হে ঠাকুর
নিবেদিল তোহে আমি ॥ ধ্রু ॥
গোকর্ণ নকুল　　সতীনে কন্দল
এ বোল অন্যথা নহে ।
ভোজন শয়নে　　দুঃখ পাবে মনে
নিবেদিল তুয়া পায়ে ॥
ছাড় অভিরোষ　　ক্ষেম মোর দোষ
শুন প্রভু গুণধাম ।
অল্প দোষে শাস্ত্য　　নহে ত উচিত
তোমা কি বুঝাব আন ॥
তুমি সতত প্রবাস　　ছাড় মোর পাশ
শুন প্রভু বিচক্ষণ ।
কহি বিলজ্জিত　　নহে সমুচিত
দোষ দেহ কি কারণ ॥

ভাল হয় নারী　　উভএতে তরি
আপনা রাখে যতনে ।
যে জন দুর্ম্মতি　　নরকেতে গতি
কহিল বেদ পুরাণে ॥
[৫৭] মুখ তোল পেখি　　শুন শশিমুখী
মনে না দুঃখ ভাবসি ।
সত্য বলি বাণী　　দিব্য করি আমি
আনি দিব তোরে দাসী ॥
বুঝি প্রভুমন　　করয়ে রোদন
নেত্রকোণে নীর খসে ।
আষাঢ় শ্রাবণ　　নব ঘন যেন
রজনী দিবা বরিষে ॥
হৃদয় আকুল　　হইল চঞ্চল
সইয়েরে পড়িল মনে ।
কবিচন্দ্র ভনে　　ত্রিপুরাচরণে
পানিরে ডাকিয়া আনে ॥০॥

॥ পয়ার ॥

আইস সুনাইয়রি বাছা বলি তোরে বাণী ।
অনেক দিবস তোরে পুষ্যাছি আপনি ॥
সভে ভিন্ন এই মাত্র গর্ব্ভে নাহি ধরি ।
বিধি বিড়ম্বিল মোরে কি করিতে পারি ॥
আমার দুঃখের কথা শুন লো দুহিতা ।
আর বিবাহের চেষ্টা কৈল তোর পিতা ॥
কি করিব শুন বাছা বল না উপায় ।
আকুল হইল মন ঘরে স্থির নয় ॥
যদি তুমি হও মোর ধর্ম্মের নন্দিনী ।
ঘুচাহ মনের দুঃখ নিবেদিল আমি ॥
হৃদয় জন্মিল মোর বড়ই যুকতি ।
আমার আরাত লৈয়া চল শীঘ্রগতি ॥
অবিলম্বে চল তুমি সই আছে যথা ।
সইয়েরে আনিবে তুমি শীঘ্রগতি এথা ॥
যুগল মাণিক লহ আর কেশ খড় ।
তাঁহারে জানাবে তুমি সহস্রেক গড় ॥

নিবেদি তুমি তাঁরে দুঃখের ভারতী।
বিভাভাঙ্গা মন্ত্র জানে সই গুণবতী॥
কাটা দ্রুম যোড়াইতে জানে মোর সই।
রাখিহ হৃদয়ে কথা তোমারে সে কই॥
তাঁহার প্রসাদে ঘর করে যত নারী।
কহিল সকল তত্ত্ব শুন লো সুন্দরী॥
সত্যবতীবচনে চলিল চেটী পানি।
উপনীত হইল যথা বল্লভা ব্রাহ্মণী॥
শুন শুন ঠাকুরাণী কি কর মন্দিরে।
[৫৮ক] সইয়েরে দেখিবে যদি চলহ সত্বরে॥
পানির বদনে শুনি সইয়ের সম্বাদ।
হৃদয় জানিল রামা বড় পরমাদ॥
রড় দিয়া আইল যথা সই সত্যবতী।
দুহেঁ দুহাঁ দরশনে বাঢ়িল পীরিতি॥
কি কারণে বিসম্বাদ কহ উপদেশ।
খণ্ডাব মনের দুঃখ কহিবে বিশেষ॥

তোমার সয়া বিভা করে শুন ঠাকুরাণী।
সতিনীর ভয় মোর বিদরে পরাণী॥
বুদ্ধি নাহি সই তোরে কি বলিব আর।
দশ বিভা করুক গিয়া সাধুর কুমার॥
আমার মন্ত্রিত তৈল মাখিহ বদনে।
তোমা বই সাধবের না পড়িব মনে॥
তাম্বুল পড়িয়া দিব খাইহ সতত।
তাহার প্রসাদে তুমি হবে নিরাপদ॥
সিন্দুর পড়িয়া দিব পরিহ ললাটে।
তোমা পরীক্ষিতে অরিষ্টের প্রাণ ফাটে॥
বিবাহ করিয়া সাধু আসুক মন্দিরে।
মর্কট করিয়া দিব দেখিবে গোচরে॥
সইয়ের বচন শুনি পরিতোষ মনে।
বিবাহ করিতে বলে সাধুর নন্দনে॥
আনন্দিত হইয়া চলিল সদাগর।
কবিচন্দ্র কহে শুন ত্রিপুরাকিঙ্কর॥০ ॥

(ক্রমশঃ)

৪০১। প্রসাদচরিত্র।

রচয়িতা—কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্ত্তী। পত্র ১-১০; অসম্পূর্ণ। দোভাঁজ-করা বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। ১০ম ও ৪র্থ পত্রের শেষ পৃষ্ঠায় যথাক্রমে ১২ ও ৭ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৩॥০ × ৪॥০ ইঞ্চি। তিন হাতের লেখা। শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥

প্রসাদচরিত্র মন শোন দিয়া সর্ব্বে।
ব্রহ্মার বরে দেবতা গন্ধর্ব্ব জিনে পূর্ব্বে ॥
শুনিঞা ভায়ের বধ মহাবীর কোপে।
ত্রাসে চমকিত দেব তিন লোক কাঁপে ॥
ভয়ে কাঁপে উভ··· জত দেবগণ।
ক্ষীরোদে কৃষ্ণেরে জায়্যা লইল শরণ ॥
হইল আকাশবাণী না ভাবিহ ক্লেশ।
যজ্ঞে বেদে দেবে বিপ্রে যবে করে দ্বেষ ॥
যবে দুস্খ দিব মোর ভক্ত প্রসাদেরে।
তবে জায়্যা ত্বরাপরে বধিব তাহারে ॥
এত শুনি দেব জত গেলা স্থানান্তরে।
মন দিয়া মহারাজা শুন তার পরে ॥
হিরণ্যকশিপুর হৈল চারিটি তনয়।
তার মধ্যে প্রসাদ হইল মহাশয় ॥
শিশুকাল হৈতে কৃষ্ণে হৈল দৃঢ় ভক্তি।
সাধুসঙ্গে সদা থাকে মনে মনে যুক্তি ॥

ভণিতা—

১। দ্বিজ কবিচন্দ্র গান ব্যাসের আদেশে।
স্বপ্নে কৃপা কৈল জারে ব্রাহ্মণের বেশে ॥
২। এত শুনি প্রসাদ রাজারে কিছু কয়।
ভাগবতামৃত দ্বিজ শঙ্কর রচয় ॥
৩। দৈত্য সব গেলা চল্যা ভূপতির পাশে।
কবিচন্দ্র চক্রবর্ত্তী একপদী ভাষে ॥

৪০২। গঙ্গার বন্দনা।

রচয়িতা—শঙ্কর। পত্র ১, সম্পূর্ণ। তুলোট কাগজ। ১ম পৃষ্ঠায় ১১ ও শেষ পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১২ × ৩৸০ ইঞ্চি। লিপিকরের নাম ও লিপিকাল নাই।

আরম্ভ—

অথ গঙ্গার বন্দনা লিখ্যতে ॥

বন্দ মাতা সুরধুনি পুরাণে মহিমা শুনি
পতিতপাবনী পুরাতনী।
বিষ্ণুপদে উপাদান দ্রবময়ী অভিধান
সুরাসুর নরের জননী ॥
ব্রহ্মকুমণ্ডলে বাস আছিলে ব্রহ্মার পাশ
পবিত্র করিয়া ব্রহ্মপুরী।
জীবে দেখি দুরাশয় নাশিবারে ভবভয়
অবনী আইলে সুরেশ্বরী ॥

শেষ—

শ্রীকবি শঙ্কর কয় রাখবে শমনভয়
এই বিবেদন তুয়া পায়।
মরণ সময়ে আসি তোমার নিকটে বসি
গঙ্গা গঙ্গা বল্যা প্রাণ জায় ॥
ইতি গঙ্গার বন্দনা সমাপ্ত ॥

৪০৩। রাধিকামঙ্গল।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ২—৬, অসম্পূর্ণ। দোভাঁজ-করা বাঙ্গালা তুলোট

কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১২৷৷০ × ৪৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৯৩ সাল। দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ—

দবন করিব তার মায়ের বিদ্যমানে॥
এত বলি জান রাধা অহঙ্কার করি।
অন্তরে জানিলা তবে দেবতা শ্রীহরি॥
শ্রীকৃষ্ণের স্থানে জে বা অহঙ্কার করে।
সেইখানে দর্প চূর্ণ করে গদাধরে॥
রাধা হইতে প্রিয়া আর নাহি ত্রিভুবনে।
অহঙ্কার চূর্ণ হবে কবিচন্দ্র ভনে॥

শেষ—

যশোদা বলেন গেছিলাঙ জটিলার ঘরে।
মুসক করিআ কোলে বস্যাছে মার্জ্জারে॥
কৃষ্ণ বলে কি বলিলে আমি দেখি নাঞি।
কালি সঙ্গে লয়্যা জাবে বলেন কানাঞি॥
মনে মনে হাসেন কৃষ্ণ মদনমোহন।
কালি রাধার করাইব কলঙ্কভঞ্জন॥
রাধিকামঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্রে কয়।
হরিধ্বনি কর সভে অধ্যা হইল সায়॥

পঠনার্থ শ্রীবলবন্ত সিংহ সা° জোতবিষ্ণু সন ১১৯৩ সাল তারিখ ২৯ চৈত্র রোজ সমবার॥

৪০৪। দাতা কর্ণের উপাখ্যান।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১—৮, সম্পূর্ণ। তুলোট কাগজ। অধিকাংশ পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি, কোন কোন পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৩ × ৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২৬ সাল।

আরম্ভ—

শ্রীরাধাকৃষ্ণচরণ সহায়॥
অথ দাতা কর্ণের উপাখ্যান লিখ্যতে॥
বৈশম্পায়ন আদি মুনি পূর্ব্বে কয়।
মহাভারথ রাজা শুন জন্মেজয়॥
এক দিন বাসুদেব ভাবিঞা অন্তরে।
কর্ণ কেমন দাতা বুঝিব তাহারে॥
জে জাহা মাগএ কর্ণ তাহা দেয় দান।
সভে বোলে দাতা নাহি কর্ণের সমান॥
একবার জাব আমি কর্ণের নিকটে।
বুঝিব সে কর্ণ বীর কেমন দাতা বটে॥

ভনিতা—

অনুমতি পাঞা কর্ণ হাসে খল খল।
দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় গোবিন্দমঙ্গল॥

শেষ—

বৈশম্পায়ন বোলেন শুন জন্মেজয়।
কর্ণের সমান দাতা কেহ নাহি হয়॥
পূর্ব্ব জর্ম্মে হরিশ্চন্দ্র জেমন দাতা ছিল।
তথোধিক দাতা কর্ণ তোমারে কহিল॥
জন্মেজয় বোলে গোসাঞি শুনিতে সুন্দর।
বিস্তার করিঞা কহ শুনি মুনিবর॥
... ...
দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ব্যাসের কৃপায়।
কর্ণ দাতার উপাখ্যান এত দূরে হইল সায়॥

দাতা কর্ণের পালা সমাপ্ত॥ জথা দিষ্টং তথা লিখিতং [ইত্যাদি]॥ লিখিত° শ্রীখুদিরাম দাস সাঃ গএষপুর মোঃ বালিয়া নারায়নপুর সন ১২২৬ বাড় সোও ছাবিষ সাল তারিখ ৪ মাঘ সম বাড় সোধাকালে সামাপ্ত॥

৪০৫। গুরুদক্ষিণা।

রচয়িতা—শঙ্কর দাস। পত্র ১১—১৩, অসম্পূর্ণ। তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮-৯ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১২৷৷০ × ৪ ইঞ্চি। লিপিকাল ১০৫৪ সাল।

প্রথম ও মধ্য অংশ অর্থাৎ ১-১০ পত্র নাই। শেষের ৩টি পত্রে নিম্নোক্ত বিষয় আছে,—যমপুরী হইতে কৃষ্ণ কর্তৃক গুরুপুত্রকে ফিরাইয়া আনা, পাপিগণের নরকযন্ত্রণাভোগ

বর্ণনা, গুরুকে পুত্র সমর্পণপূর্ব্বক গোকুলে রাধার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কৃষ্ণ ও বলরামের মথুরায় প্রত্যাগমন।

একাদশ পত্রের আরম্ভ—

……যম শুনহ উত্তর।
সত্বরে আনিয়া দেহ ঋষির কোঙর ॥
আজ্ঞা পায়্যা গেল যম আপনার পুরে।
ঋষির পুত্র আনি দিল গোবিন্দ গোচরে ॥
ঋষির পুত্র লঞা জান মুকুন্দ মুরারি।
পাপী লোক দেখি সব করএ গোহারি ॥

শেষ—

বসুদেব আনন্দিত দেখি দুই জনে।
দৈবকী বলেন রাত্রি পোহাল্য এত দিনে ॥
বাপ মায়ে নমস্কার কৈল দেবরাজ।
আপনি দৈবকী করে রন্ধনের সাজ ॥
সুবর্ণের থালে অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
হরি বলরাম সুখে করিল ভোজন ॥
কহেন শঙ্কর দাস গোবিন্দচরণে।
পড়িয়া দক্ষিণা দিহ গুরু মহাজনে ॥

ইতি গুরুদক্ষিণা সমাপ্ত ॥···লিখিতং শ্রীতিলকরাম দাস মিত্র তস্য পুত্র শ্রীরঘুনাথ দাস মিত্র ॥ সাং বাঁকাদহ ॥ সন ১০৫৪ সাল তারিখ ১৯ শ্রাবণ ॥

৪০৬। শিবরামের যুদ্ধ।

রচয়িতা—কবিচন্দ্র। পত্র—৩-৫ এবং ৭, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা কাগজে লিথো ছাপা জমিদারি ফর্ম্ম ভাঁজ করিয়া লেখা। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৩।০ × ৪৸০ ইঞ্চি। আদি অন্ত খণ্ডিত বলিয়া লিপিকাল আদি নাই।

শিবের বাগান হইতে ফল পাড়িতে গিয়া, বাগানের রক্ষক হনুমানের সহিত প্রথমে লক্ষ্মণের যুদ্ধ হয়। পরে শিব ও রাম উভয়ে যুদ্ধনিরত হইলে দুর্গা মধ্যস্থ হইয়া ব্যাপারটা মিটাইয়া দেন। ইহাই পুথির বিষয়।

ভনিতা—

রামায়ণে রামলীলা কবিচন্দ্রে কয়।
রাম রাম বল ভাই কাল বয়্যা জায় ॥

৪০৭। কণ্ব মুনির পালা।

রচয়িতা—দ্বিজ শঙ্কর কবিচন্দ্র। পত্র ১-৬, সম্পূর্ণ। তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৭ × ৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২৬ সাল।

একাদশীর পরদিন নন্দালয়ে ভোজন করিতে বসিয়া কণ্ব মুনি যেমন ভগবান্‌কে অন্ন নিবেদন করেন, তখনই বালক কৃষ্ণ আসিয়া সেই অন্ন ভক্ষণ করিতে থাকেন। এই ভাবে কয়েক বার অন্ন নষ্ট হইলে, শেষে কণ্ব মুনি কৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া চিনিয়া, তাঁহার প্রসাদ ভক্ষণ করেন, ইহাই পুথির বর্ণনীয় বিষয়।

আরম্ভ—

৺৭ শ্রীহরিঃ ॥
গুরু কহে সোনকাদি নিবেদি তোমারে।
বিহার করিল কৃষ্ণ নন্দের মন্দিরে ॥
নন্দ যশোদার ভাগ্য কি বলিতে জানি।
পুত্রভাবে বিহার করএ চক্রপাণি ॥

ভনিতা—

১। এতেক শুনিঞা দ্বিজবর গেল স্নানে।
　ভবিষ্য পুরাণ দ্বিজ কবিচন্দ্র ভনে ॥
২। শঙ্কর কহেন শান্ত হয় রে ব্রাহ্মণ।
　হেন কালে নন্দ ঘোষে যশোমতী কন ॥

শেষ—

কণ্ব মুনি কহে কৃষ্ণে দুই কর জুড়িঞা।
নন্দের মন্দিরে তুমি গোলোক ছাড়িঞা ॥
নিজ মূর্ত্তি ধর প্রভু দেখিব নয়ানে।
হাসিতে লাগিলা কৃষ্ণ মুনির বচনে ॥

বাল্যলীলা রচিলাম ভবিষ্যের মত।
শ্লোক অর্থ সংক্ষেপে বর্ণিলাম কথন ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় পালা হৈল সায়।

ইতি গোবিন্দমঙ্গলের কণ্ব মুনির পালা সমাপ্ত ॥ লিখিত° শ্রীবাবুরাম দাস বৈরাগ্য সা° বালিয়া সন ১২২৬ সাল তা° ১ আশ্বিন রোজ বৃহস্পতিবার বৈকালে।

৪০৮। উদ্ধবসংবাদ।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-১৩, সম্পূর্ণ। তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পংক্তি, কাঁচা হাতের লেখা এবং অশুদ্ধিপূর্ণ। পরিমাণ ১৩×৪.০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৫২ সাল।

পূর্ব্বে যে ৩০৬, ৩০৭ ও ৩০৮ সংখ্যক 'উদ্ধবসংবাদ' পুথির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার রচয়িতা দ্বিজ নরসিংহ দাস। আলোচ্য পুথি তাহার সহিত প্রায় অভিন্ন হইলেও, ইহার সর্ব্বত্র দ্বিজ কবিচন্দ্রের ভণিতা দেখা যায়।

আরম্ভ—

শ্রীশ্রীহরিঃ ॥

অথ উদ্ধবসম্বাদ লিখ্যতে ॥

বৃন্দাবন পাসরিতে নারিলা মাধবে।
বনান নিকুঞ্জবন বৃন্দাবন ভাবে ॥
তাহাতে বসিলা কৃষ্ণ উদ্ধব সহিত।
ভাবিতে লাগিল কিছু গোপী সভার হিত ॥
গোকুল গোপিনী সঙ্গে জত কৈল লীলা।
সে সব সঙরি কৃষ্ণ অবশ হইলা ॥

ভনিতা—

ব্যাসের ভাষিত দ্বিজ কবিচন্দ্র ভনে।
উথলিছে শোকনদী নহে নিবারণে ॥

শেষ—

ব্রজবাসী জত সব আর গোপীগণ।
পশু পক্ষী আদি করি করয়ে রোদন ॥
যমুনায় পড়ে আসি সেই অশ্রুজল।
তাহাতে যমুনা অতি হয়াছে প্রবল ॥
এতেক বচন যদি উদ্ধব কহিলা।
শুনিয়া গোপীর দুস্থ ভাবিতে লাগিলা ॥
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্র ভনে।
উদ্ধবসম্বাদ কথা হৈল সমাধানে ॥

ইতি উদ্ধবসম্বাদ সমাপ্ত ॥ এ পুস্তক শ্রীগুরুদাস খাঁএর সাঃ বিষ্ণুপুর নিজ সহর পটরাপাড়া ॥ সন ১২৫২ সাল তারিখ ১৮ চোত ॥

৪০৯। কলঙ্কভঞ্জন।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-১০, সম্পূর্ণ। দোভাঁজ-করা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি লেখা, উত্তম হস্তাক্ষর। পরিমাণ ১৩।০×৪।০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

আলোচ্য পুথির ১ হইতে ৫ পত্রের ২য় পৃষ্ঠার অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত ৪০৩ সংখ্যক 'রাধিকা-মঙ্গল' পুথিতে বর্ণিত বিষয়ের সহিত অভিন্ন। তাহার পর হইতে 'কলঙ্কভঞ্জন' আরম্ভ হইয়াছে। কলঙ্কভঞ্জনের আরম্ভ এই—

রাধিকামঙ্গল গীত করহ শ্রবণ।
রাধার কলঙ্ক কৃষ্ণ করিবেন ভঞ্জন ॥
বৃখভানুসুতা রাই বিরল মন্দিরে।
কেহো পাছে শুনে বল্যা কান্দে ধীরে ধীরে ॥
কান্দিয়া কান্দিয়া বলে জে করিলে শ্যাম।
তোমার লাগিয়া হইল কলঙ্কিনী নাম ॥
কলঙ্কিনী নাম হইল তার নাঞি দায়।
হেন অপযশ জেন যুগে যুগে গায় ॥
তোমার কলঙ্ক মোর অঙ্গে অভরণ।
ভাগ্য কর্য্যা পুণ্যতীর্থ কর্য্যাছি ভ্রমণ ॥

ভনিতা—

রাধাকৃষ্ণপাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
দ্বিজ কবিচন্দ্র গান ব্যাসের বর্ণন ॥

শেষ,—

আমি বৈদ্যমূর্ত্তি হল্যাও নারিলে চিনিতে।
সহস্র ঝারা কৈলাও তোমার কলঙ্ক ঘুচাতে॥
এত বলি রাধিকারে করিল বিদায়।
আপন গৃহেতে কৃষ্ণ চলিল ত্বরায় ॥
... ...
দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় পালা হইল সায়।
পূর্ণ কর্‌য়্যা হরি বল পাপ দূরে যায় ॥
ইতি কলঙ্কভঞ্জন সমাপ্ত। এ পুস্তক শ্রী

পুথিখানি বোধ হয়, বিক্রয়ার্থ লিখিত হইয়া থাকিবে। যিনি কিনিবেন, পুথির শেষে তাঁহার নাম পরে লিখিয়া দেওয়া হইবে, এই অভিপ্রায়ে 'এ পুস্তক শ্রী' এই পর্য্যন্তই লিখিয়া রাখা হইয়াছিল। যে কারণেই হউক, পরে তাহা আর লিখিত হয় নাই।

৪১০। কলঙ্কভঞ্জন।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-১১, সম্পূর্ণ। তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮-৯ পঙ্‌ক্তি লেখা। কয়েক পত্রের দক্ষিণাংশ গলিত। পরিমাণ ১৩×৪।০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৩৭ সাল।

আলোচ্য পুথিখানি ৪০৯ সংখ্যক পুথির সহিত অভিন্ন। অবশ্য কিছু কিছু পাঠভেদ ও বর্ণনায় পার্থক্য আছে, ইহা বলাই বাহুল্য।

শেষ—

এত শুনি সভাকার আনন্দিত মন।
আপনার ঘরে সভে করিলা গমন ॥
শুন শুন পরিক্ষিত অপূর্ব্ব কথন।
রাধার করিল কৃষ্ণ কলঙ্কভঞ্জন ॥
রাধার মঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায়।
হরি হরি বল সভে পালা হইল সায় ॥

ইতি কলঙ্কভঞ্জন সমাপ্ত॥ লিখিতং শ্রীরামলোচন কুণ্ডু মহাসঅ॥ সাং নিজ-গ্রাম॥ পুষ্টক শ্রীসুদন পদার সাং বিরসিংহপুর॥ ইতি সন ১২৩৭ সাল॥ ১৪ ভাদ্র তিথি একাদসি ॥

৪১১। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৮, অসম্পূর্ণ। কীটদষ্ট তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। হস্তাক্ষর কদর্য্য, সুতরাং দুষ্পাঠ্য। পরিমাণ ৯×৪।০ ইঞ্চি। শেষ অংশ অসম্পূর্ণ বলিয়া লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

আরম্ভ—

রাধা কৃষ্ণ দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ।
মন দিয়া সভে··· ... ... ॥
... ...
একদিন দুর্য্যোধন শকুনি লইয়া।
কি যুক্তি করিল রাজা বিরলে বসিয়া ॥
কি বুদ্ধি করি মামা বল না উপায়।
পাণ্ডবের কথা আর সহনে না জায় ॥
ধন অর্থ পাণ্ডব হইল বাহুবল।
এক লক্ষ রাজা জার থাকে ছত্রতল ॥

ভনিতা—

চল দেখি পঞ্চ ভাই জাব সেইখানে।
শ্লোকার্থ সঙ্গীত দ্বিজ কবিচন্দ্র ভনে ॥

শেষ,—

এইরূপে গোবিন্দের দয়া হইল তায়।
জত বস্ত্র টানে দুঃশা ততই ব্যারায় ॥
দ্রৌপদীর সতীত্ব কথা কহনে না জায়।
জত টানে তত বস্ত্র বাহির হইয়া যায় ॥
কুরুগণ বলে ধন্য২ গো দ্রৌপদি।
গোবিন্দের দয়া······ নিধি ॥

৪১২। শিবায়ন—মৎস্যধরা পালা।

রচয়িতা—দ্বিজ শঙ্কর কবিচন্দ্র। পত্র ১-২৯, সম্পূর্ণ। তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি লেখা। শেষ দুই পত্রের খানিক অংশ নাই। পরিমাণ ১৩৷৷০ × ৪৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৩৭ সাল।

ছয় মাস হইল, কৈলাস ত্যাগ করিয়া, ভাগিনেয় ভীমের সহিত শিব চাষবাস করিতেছেন। এ দিকে চণ্ডিকা এক দিন স্বপ্নে শিবকে দেখিয়া ব্যাকুল হইলেন এবং পদ্মার পরামর্শক্রমে বাগ্‌দিনী-বেশ ধারণ করিয়া, মৎস্য ধরার ছলে শিবের ধান্যক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক নানা কলাকৌশলে তাঁহাকে ভুলাইয়া কৈলাসে ফিরাইয়া আনিলেন, ইহাই পুথির বর্ণনীয় বিষয়। পুথির কয়েকটি ভনিতায় লিপিকর ভ্রমক্রমে 'শ্রীকবি শঙ্কর' স্থলে 'শ্রীকবিকঙ্কণ' লিখিয়া ফেলিয়াছেন মনে হয়।

আরম্ভ—

৺৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ।

শিবচরিত্র মর্ছ্যধরা পালা লিখ্যতে ॥
একদিন ভবানীর উপজিল রঙ্গ।
বসিএ পদ্মার সঙ্গে রসের প্রসঙ্গ ॥
মন দিয়া শুন দাসি কহি গো তোমাতে।
ইহার উত্তর তুমি দিবে ভাল মতে ॥
পুত্র কোলে করি নিদ্রা জাই নানা রঙ্গে।
স্বপ্ন দেখিল আজি প্রভু মোর সঙ্গে ॥
ছয় মাস ছাড়িএ গেছেন পশুপতি।
স্বপনে তাহার সঙ্গে হএছিল রতি ॥
... ...
সহাস্য বদনে হাসি পদ্মা কহে তবে ॥
ইহার উত্তর কথা দিতে পারি আমি।
আমার বচন মাতা যদি রাখ তুমি ॥
দণ্ড চারি মত মাতা হও বাগদিনি।
কালি ঘরে বসি তুমি পাবে শূলপাণি ॥
আজি ইচ্ছা করি হও বাগদিনিবেশ।
নিশ্চয় কহিল মাতা পাবে ব্যোমকেশ ॥
ধান্যভূমে মর্ছ্য গিয়া ধর নারায়ণি।
রূপ দেখি মুরছিত হবে শূলপাণি ॥

ভনিতা—

১। শিবের চরণ আশে শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে
জারে কৃপা কৈল শূলপাণি।
২। শ্রীকবি শঙ্কর গায় হরপদ আশে।
জারে কৃপা কৈলে প্রভু আসি যোগিবেশে ॥
৩। সুকবি শঙ্কর গান ভাবি ত্রিলোচন।
হরি হরি বল পাপ হোক্‌ বিমোচন ॥
৪। বাগদিনীর কথা শুনি প্রভু দিল সায়।
হরপদ আশে দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় ॥

শেষ—

সাক্ষাতে হইলা মাতা বাগদিনীবেশ।
সই সই বলি প্রভু হাসে ব্যোমকেশ ॥
বিরলে শিবের সঙ্গে বঞ্চিলেন নিশা।
দেখিতে ২ মূর্ত্তি হইলা সুবেশা ॥
শ্রুতিমূলে পিঠে দোলে দুই কানে সোনা।
কপালে সিন্দুর সাজে নাকে নাকচনা ॥
বাগদিনীবেশ করি উভ করি খোঁপা।
ফুলমালা তাথে শোভে সুবর্ণের ঝাঁপা ॥
কান্ধেতে ঘুনসিজাল ইসাদের বাড়ি।
পরিপাটি কান্ধে সাজে মছের চুপুড়ি ॥
ঠমক করি দাণ্ডাইল শিব পড়ে ভোলে।
সই সই বলি প্রভু করিলেন কোলে ॥
... ...
আনন্দিতে হর গৌরী রহিলা কৈলাসে।
মর্ছ্যধরা পালা সায় কবিচন্দ্রে ভাষে ॥

ইতি সন ১২ সও ৩৭ সাল বি তেরিখ ৬ বৈসাখ আখারি ॥ লিখিত° শ্রীহরিপ্রসাদ চট্টোপাদ্ধায় লিখিত° শ্রীদুর্গাচরণ মোলিক ॥ সঃ প্রেতাপুরিপ......

৪১৩। পারিজাতহরণ।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ৩-৫, অসম্পূর্ণ। দোভাঁজ-করা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১৩ হইতে ১৫ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৩×৪ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই। শেষ পৃষ্ঠায় পারিজাতহরণ সমাপ্ত হইয়া সুদামা উপাখ্যান আরম্ভ হইয়াছে

সত্যভামার মানভঞ্জন করার জন্য ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া কৃষ্ণের পারিজাত পুষ্পবৃক্ষ আনয়ন পুথির বর্ণনীয় বিষয়।

তৃতীয় পত্রের আরম্ভ—

বাসনা আমার পূর্ণ হৈল এত দিনে ॥
এত বলি চলে মুনি নাচিতে ২।
উপনীত হৈল গিয়া মৈনাক পর্ব্বতে ॥
রুক্মিণীর সহিত পাশা খেলে নারায়ণে।
হেন কালে নারদ গেলেন সেইখানে ॥
ধর ধর পারিজাত ধর নারায়ণ।
পাইলাঙ এই পুষ্প ইন্দ্রের ভুবন ॥
আনন্দ হইল প্রভু দেব যদুরায়।
সেই মালা দিল হরি রুক্মিণীর গলায় ॥

ভনিতা—

উপনীত হইলা প্রভু দ্বারকা ভুবনে।
ভাগবতামৃত দ্বিজ কবিচন্দ্রে ভনে ॥

শেষ—

এইরূপে সত্যভামা নানা বেশ করে।
সোনার চিরুনি দিয়া আচড়ে কুন্তলে ॥
...দেখিয়া সতী লজ্জান্ত হইল।
পৃথুবুকী সত্যভামা লক্ষ্মীসম হল ॥
জার তরে পারিজাত দিলেন যদুরায়।
ধন্য২ সত্যভামা বলি গো তোমায় ॥
এইরূপে ধন্য২ সর্ব্বলোকে কয়।
শুন রে ভগত ভাই সম্পন্ন হৃদয় ॥
পারিজাতহরণ কথা শুনে জেই জনে।
এত দূরে সমাপ্ত হইল পারিজাত হরণে ॥

এত দূরে পারিজাত পুষ্পক সমাপ্ত। জথা দিষ্ট তথা লিখিতং ইত্যাদি।

৪১৪। অঙ্গদের রায়বার।

রচয়িতা—কবিচন্দ্র। পত্র ২-১৩, অসম্পূর্ণ। তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১২॥০×৪ ইঞ্চি। দ্বিতীয় পত্রের কতক অংশ নাই। লিপিকাল ১২৪০ সাল।

বালির পুত্র অঙ্গদ রামচন্দ্রের দূতরূপে রাবণের সভায় উপস্থিত হইয়া রাবণকে ভৎর্সনাপূর্ব্বক তাহার রাজমুকুট কাড়িয়া লইয়া আসে, ইহাই পুথির বর্ণনীয় বিষয়।

দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ—

এবার কি বলে রাবণ তাহা এসো জান্যা ॥
সে জানকীর ভাব বুঝি বীর হনুমন্ত।
জেন সর্পমাঝে দর্প করি উঠিলা অনন্ত ॥
কোন অর্থে মহাশয় এত ভাবিছ মনে।
আজ্ঞা কর গালি দিয়া আসি গা রাবণে ॥
হেন বেলা জাম্বুবান্ জোড়হস্তে কয়।
গোসাঞি পুনু২ হনুমান্‌কে জাবা উচিত নয় ॥

শেষ—

শ্রীরাম বলেন বাছা বালির কুমার।
ভুবনে এ সব কীর্ত্তি রহিল তোমার ॥
শ্রদ্ধা করি ইহা শুনে জেই জন।
সেই মোর প্রিয় বটে লক্ষ্মণ সমান ॥
আদর করিয়া জে বা শুনে রায়বার।
শত্রুক্ষয় পরাজয় হইব তাহার ॥
রসিক জনার হয় পরম আনন্দ।
রায়বার রচিলা ইহা আপুনি কবিচন্দ্র ॥

জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]। লিখিতং শ্রীপিতাম্বর দাষ ॥ বাবাজি সাং ছান্দার ॥ পাটক শ্রীধর্ম্মদাস দত্ত ॥ সাং কোদালিয়া ॥ সন ১২৪০ সাল তারিখ ১২ বৈশাখ তিথি

চোতুদসি বার সোমবার। য়েই পুস্তক লিখিলাম সাং কোদালিয়ার শ্রীবিনন্দদাস বাবাজীর বাটীতে পশ্চিমদ্বারি মেকাতে বসিয়া উত্তর মুখেতে বসিয়া লিখিলাম ইতি।

৪১৫। অঙ্গদের রায়বার।

রচয়িতা—কবিচন্দ্র। পত্র ১-৯, সম্পূর্ণ। তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৩×৪৸৹ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪১ সাল।

আরম্ভ—

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥

অথ অঙ্গদের রায়বার লিখ্যতে ॥

বন্দ গেল সিন্ধু রামচন্দ্র হইল পার।
বানরে বেড়িল গিয়া লঙ্কার দুয়ার ॥
শ্রীরাম বলেন মিতা আর কেনে বিলম্ব।
করে কেন্না রাবণ রাজা যুদ্ধের আরম্ভ ॥
সাগরপার বল্যা তার বড় ছিল আটুনি।
সে বোল ফুরাল্য এখন কি বলে তা শুনি ॥
সুগ্রীব বলেন গোসাঞি দিন দুই তিন আর।
জনেক পাঠাইয়া দি বুঝি সমাচার ॥
শ্রীরাম বলেন মিতা এবার জাবেক কন জন।
সুগ্রীব বলেন গোসাঞি তাই ভাবিছি মনে ॥

শেষ—

বিভীষণ বলে গোসাঞি শুন রঘুমণি।
রাজার মকুট বটে ইহা আমি জানি ॥
আনন্দের অবধি নাঞি ঠাকুর রঘুমণি।
পদ্মহাত তুলি দিলেন অঙ্গদের মাথে ॥
শ্রীরাম বলেন বাছা বাল্যের কুমার।
ভুবনে এ কীর্ত্তি রহিল তোমার ॥
শ্রদ্ধা করি ইহা শুনে জেই জন।
সেই প্রিয় বটে লক্ষ্মণ যেমন ॥
রসিক জনার হয় পরম আনন্দ।
রায়বার আপনি রচিলা কবিচন্দ্র ॥

ইতি অঙ্গদের রায়বার সমাপ্ত ॥ ইতি সন ১২৪১ সাল তাং ২১ চৈইত্রি লিখিতং শ্রীতারাচান্দ গরাঞি লিখকে দোষ নাস্তি বেলা আন্দাজি এক পহরের সমএ সমাপ্ত হইল ইতি ॥

৪১৬। প্রহ্লাদচরিত্র।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১, ৭-১৪, অসম্পূর্ণ। তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮-৯ পঙ্‌ক্তি লেখা। পত্র ছিন্ন ও কীটদষ্ট। অনেক স্থলে অক্ষর মুছিয়া গিয়াছে, পড়া যায় না। পরিমাণ ১৩×৪॥৹ ইঞ্চি। শেষ খণ্ডিত বলিয়া লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

আরম্ভ—

৭ শ্রীশ্রীহরি।

অথ প্রহ্লাদচরিত্র লিখ্যতে ॥

হিরণ্যকশিপু হইল কশ্যপকুমার।
চারি পুত্র হইল তার পরম সুন্দর ॥
রূপের তুলনা নাহি গুণে অনুপাম ॥
প্রহ্লাদ অনুহ্লাদ তার থুইল এই নাম ॥
কয়াধু রমণী হইতে এ চারি নন্দন।
প্রহ্লাদ বালক হইল কৃষ্ণপরায়ণ ॥
... ...
পঞ্চম বৎসরের শিশু হইল চারি জন।
ডাক দিয়া ষণ্ডামার্কে বলিছে রাজন ॥
ষণ্ডামার্ক নামে মুনি শুক্রের নন্দন।
মুনিস্থানে সব কথা কহিল রাজন ॥
মোর চারি পুত্রে বিদ্যা করাহ পঠন।
এত বলি চারি পুত্র কৈল সমর্পণ ॥

ভনিতা—

১। প্রসাদ রহেন হোথা আনলের কোলে।
ভাগবতামৃত দ্বিজ কবিচন্দ্র বলে ॥
২। দ্বিজ কবিচন্দ্রে কয় প্রসাদ মরিবার নয়
বৈষ্ণবের কি করে অনলে।

শেষ—

ভূমেতে ফেলিল জবে পর্ব্বত হইতে।
ধরিয়া তুলিনু আমি তোর দুই হাতে ॥
আগ্নমধ্যে তোরে আমি ছিলাম কোলে করি।
বৈকুণ্ঠ তেজিয়া আমি তোমার সঙ্গে ফিরি ॥
তোর বাপ তোর সঙ্গে করিলেক কক্ষা।
জল স্থল সঙ্কটে করিলাম আমি রক্ষা ॥
এত শুনি প্রহ্লাদ প্রভুরে স্তুতি করে।
দ্বিজ কবিচন্দ্রে গান মধুর সুস্বরে ॥

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

একষষ্টিতম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ

আমাদের বার্ষিক মিলন-সভা সন্থ শোকের দ্বারা ম্লান হইয়াছে। আমরা পরিষদের পরম সুহৃদ্, দেশকর্মী ও সাহিত্যবন্ধু সুরেশচন্দ্র মজুমদারকে অকস্মাৎ হারাইয়াছি। তিনি একদিন আমাদের কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য ছিলেন বলিয়াই নয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারবিধানে আজীবন যত্নবান্ ছিলেন বলিয়াই আমাদের স্মরণীয়। বাংলা লাইনো ও টাইপ-রাইটার যন্ত্রকে ব্যবহারোপযোগী করিয়া ব্যাপক প্রচার করিবার গৌরব তাঁহার। ইহার দ্বারা তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দ্রুত উন্নতি সাধনে সহায়ক হইয়াছেন। তৎপ্রবর্তিত সংবাদপত্রসমূহে বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকদিগকে বিশিষ্ট স্থান দিয়া তিনিই প্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত করিয়াছেন। মধ্যবিত্ত দরিদ্র জাতিকে রবীন্দ্রনাথের প্রতি কর্তব্যপালনে আহ্বান করিয়াও তিনি ধন্য করিয়াছেন। ব্যক্তিগতভাবে কত দুঃস্থ ও দরিদ্র সাহিত্যিককে যে তিনি বিপদে আপদে সাহায্য করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার বিয়োগে বাংলা-সাহিত্য একজন একনিষ্ঠ সহায়ককে হারাইল। আমরা সর্বাগ্রে তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি।

এই ১৩৬১ বঙ্গাব্দকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাসে সন্ধিক্ষণ বলিতে পারি। কারণ, এই বৎসরে সর্বপ্রকারে পুরাতনের সংস্কার সাধিত না হইলে পরিষদের বিপদ্ অনিবার্য। পরিষদ্-মন্দিরের কথাই প্রথম আলোচ্য।

১৩০০ বঙ্গাব্দের ৮ শ্রাবণ, ১৮৯৩ সনের ২৩ জুলাই বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার প্রতিষ্ঠিত হয়। সভাপতি বিনয়কৃষ্ণ দেব, সহ-সভাপতি হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও এল. লিওটার্ড, সম্পাদক ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী। স্থান—বিনয়কৃষ্ণ দেবের ২।২ রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট ভবন। মুখপত্র ছিল 'দি বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার', প্রধানত ইংরেজী ভাষায়, বাংলা-ভাষাও সামান্য পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। কার্যবিবরণী লিখিত হইত ইংরেজীতে। উদ্দেশ্য ছিল—ইংরেজী-সাহিত্যের ও সংস্কৃত-সাহিত্যের সাহায্যে বাংলা-সাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তার সাধন।

১৩০১ সালে ১৭ বৈশাখ উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের প্রস্তাবে ইংরেজী নাম বদলাইয়া 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ' হয়। ১৩০৩ সালের ৫ জ্যৈষ্ঠ অকারান্ত "পরিষদ" হসন্ত "পরিষদ্" হয়। বর্তমানে ইহা "ৎ" অন্ত "পরিষৎ"। ১৩০১ বঙ্গাব্দে সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত, সহ-সভাপতি নবীনচন্দ্র সেন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সম্পাদক এল. লিওটার্ড ও দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। মুখপত্র 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, ; পত্রিকা ও কার্য-বিবরণীর ভাষা বাংলা। স্থান পূর্ববৎ ২।২ রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের ভবন।

১৩০৩ সালের ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি পরিষৎ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবেরই ২৯ গ্রে স্ট্রীট ভবনে স্থানান্তরিত হয়। অধিবেশনাদি রাজার ১০৬।১ গ্রে স্ট্রীট ভবনে হইতে থাকে।

১৩০৬ সালের শেষভাগে রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ সভ্যেরা, কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির আওতায় না রাখিয়া পরিষৎকে সাধারণ প্রকাশ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিশেষ জরুরি অধিবেশন

আহ্বান করেন। ৩ ফাল্গুন ১৩০৬, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯০০, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং পরদিনই অর্থাৎ ৪ ফাল্গুন, ১৫ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার পরিষৎ স্বাধীনভাবে ১৩৭।১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের ভাড়াটিয়া বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কাঁধে করিয়া পরিষৎ-গ্রন্থাগারের পুস্তক বহন করিয়াছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব গৃহনির্মাণের চেষ্টা আরম্ভ হয়। দানবীর মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর কর্ণগোচর হওয়া মাত্র জমির ব্যবস্থা হইয়া যায়; হালশিবাগান আপার সারকুলার রোডের উপর, যেখানে আমরা সমবেত হইয়াছি, সাত কাঠা জমি ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ২০ আগস্ট আজ ১৯৫৪, ২১ আগস্টের ঠিক তিপ্পান্ন বৎসর পূর্বে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র পরিষদের পাঁচজন সভ্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কুমার শরৎকুমার রায় (দীঘাপাতিয়া), প্রমথনাথ রায়চৌধুরী (সন্তোষ), যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (টাকি) ও হীরেন্দ্রনাথ দত্তকে ন্যাসরক্ষক বা ট্রাস্টি করিয়া তাঁহাদের অনুকূলে ন্যাসপত্র রেজিস্টারি করিয়া দেন। বহু সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তির সহৃদয়তায় প্রায় সাতাশ হাজার টাকা চাঁদা সংগৃহীত হয়। লালগোলার প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ যোগীন্দ্রনারায়ণ রাও একাই ১০,০৫৮ টাকা দান করেন। সাত বৎসরের চেষ্টার পরে ১৩১৫ সালের ১৯ অগ্রহায়ণ পরিষৎ নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়, গৃহ-প্রবেশের উৎসব হয় ২০ অগ্রহায়ণ ১৩১৫, ৬ ডিসেম্বর ১৯০৮ রবিবার। উৎসব-সভায় রবীন্দ্রনাথ বলেন, "সাহিত্য-পরিষদ্‌কেও তাহার বাহ্য শরীর পূর্ণ করিতে বিলম্ব সাধিতে হইয়াছে। অনেক দিন ধরিয়া নিজের প্রাণশক্তির পরিচয় দিয়া দেশের লোকের শ্রদ্ধা ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে স্থানলাভ করিয়া তবে তাহার এই স্থূলদেহটি আজ প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।"

মূল পরিষৎ-ভবনের এই স্থূলদেহপ্রাপ্তি ঠিক পঁয়তাল্লিশ বৎসর নয় মাস পূর্বে ঘটিয়াছিল। রমেশ-ভবন পরবর্তী সংযোজন; তাই ততখানি কালজীর্ণ হয় নাই যতখানি জীর্ণতা মূলদেহের ঘটিয়াছে। ইহা গুরুতর আশঙ্কা ও উদ্বেগের কারণ ঘটাইয়াছে। এঞ্জিনীয়ারগণ পরীক্ষান্তে মন্তব্য করিয়াছেন, অচিরাৎ পূর্ণ সংস্কার না করিলে মন্দির আর খাড়া রাখা যাইবে না। তাঁহারা প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার এক ফর্দ দাখিল করিয়াছেন। বর্তমানকালে কোনও এক বা একাধিক ব্যক্তি অথবা জনসাধারণের সম্মিলিত বদান্যতায় এই পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ দুরূহ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা ভারত সরকার ইচ্ছা করিলে সকল সমস্যার সমাধান করিয়া এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করিতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাদের প্রার্থনা বিবেচনা করিতেছেন।

মন্দিরের পরেই পাঠাগার, পুঁথিশালা, চিত্রশালা ও যাদুঘর। বহু লক্ষ টাকার সম্পত্তি এইগুলিতে আছে। মূল পরিষৎ-মন্দিরের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের সহিত এগুলিরও অস্তিত্ব অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমাদের গ্রন্থাগার বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম পাঠাগার; হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ব্যোমকেশ মুস্তফী, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ প্রভৃতি কর্মীদের সহায়তায় দীর্ঘকাল ধরিয়া বিচিত্রভাবে এই গ্রন্থাগার পুষ্ট হইয়াছে; বহু মূল্যবান দুর্লভ গ্রন্থ এখানে সংগৃহীত হইয়াছে। পরিষৎ বহু কষ্টে ইহার রক্ষণাবেক্ষণ

করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ সংগ্রহ সকলের ব্যবহারোপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য বিজ্ঞানসম্মত পুস্তকতালিকা একান্ত অর্থাভাবে প্রস্তুত করা সম্ভব হয় নাই। ফলে জ্ঞানের উপকরণের দিক দিয়া বিশেষভাবে সমৃদ্ধ ও সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ পাঠক ও গবেষকদের ক্ষুধার চাহিদা পরিষৎ মিটাইতে পারিতেছেন না। সংগ্রহের একটা আংশিক তালিকা এলোমেলোভাবে ছাপা হইয়াছে বটে, কিন্তু বর্তমান যুগ-প্রয়োজনের পক্ষে তাহা অচল। বিশেষজ্ঞদের দ্বারা আমরা সুষ্ঠু তালিকা-প্রণয়ন ব্যয়ের একটা খসড়া প্রস্তুত করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট দাখিল করিয়াছি—তাঁহাদের কৃপার উপর মন্দির-সংস্কারের মত এই তালিকা-সঙ্কলনের কাজও নির্ভর করিতেছে।

আমাদের পুথিশালায় বহু মূল্যবান পুথি আছে; বাংলা-ভাষাসাহিত্যের ইতিহাসে যুগান্তকারী কয়েকটি পুঁথির আমরা অধিকারী; এতকাল প্রাণপণে এগুলি রক্ষা করিয়া আসিয়া আজ জীর্ণ মন্দিরের তলায় দাঁড়াইয়া আমাদের আশঙ্কা হইতেছে, দৈব বা রাজ-অনুগ্রহ ব্যতীত এগুলি রক্ষা করা বুঝি আর সম্ভব হইবে না। পুথিগুলিরও সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক তালিকা প্রয়োজন।

পৃথিবীর প্রত্নতত্ত্ববিশেষজ্ঞেরা বলিয়াছেন, পরিষদের যাদুঘর ও চিত্রশালায় এমন কতকগুলি মূর্তি মুদ্রা ও চিত্র আছে যাহা বহুমূল্য এবং যাহা পৃথিবীর অন্য কুত্রাপি নাই। অথচ উপযুক্ত স্থান ও আধারের অভাবে আমরা সেগুলি গবেষকদের কাজে লাগাইতে পারিতেছি না। তালিকা-প্রণয়ন ও প্রকাশ এই বিভাগেও অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

মন্দির-সংস্কারের কাজ আগে করিয়া যথাযোগ্যভাবে সাজাইয়া আমাদের সংগ্রহগুলির সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক তালিকা সাধারণে প্রকাশ করিতে পারিলে পরিষৎ দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি-বিষয়ক ক্রমোন্নতিতে পূর্বাপেক্ষা আরও অনেক বেশি সাহায্য করিতে পারিবেন, এবং পরিষদের সহিত জনসাধারণের যোগাযোগ সহজ ও প্রাণবন্ত হইতে পারিবে। পরিষৎ তাঁহার একষট্টি বৎসরের জীবনে তাহাই একান্তভাবে প্রার্থনা করিয়া আসিতেছেন।

পরিষদের এই কামনা অংশত এই বৎসরেই পূর্ণ হইয়াছে। এই বৎসরে বহু তরুণ ও কৃতী সাহিত্যিক পরিষদের সেবা করিবার জন্য একযোগে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন। আমার বিশ্বাস, তাঁহারা সক্ষম সহযোগিতার দ্বারা পরিষদে নূতন প্রাণসঞ্চার করিবেন। জীর্ণ মন্দিরের সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে পরিষদের পুরাতন জীবনে নূতনের স্পর্শ লাগিয়া আবার নূতন করিয়া ইহা ফলেফুলে সুশোভিত হইয়া উঠিবে।

পরিষদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি একান্ত আশাবাদী। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অত্যন্ত সহৃদয়তার সহিত আমাদের আবেদন বিবেচনা করিতেছেন। যদি আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে আশানুরূপ ফললাভ নাও ঘটে, বাংলা দেশের মানুষ আজ দরিদ্র ও দুর্বল হইলেও এই জাতীয় মহৎ সম্পত্তি রক্ষার জন্য তাঁহারাই তৎপর হইয়া উঠিবেন। কয়েকজনের পক্ষে যে ভার একান্ত দুর্বহ, সকলের সহযোগিতায় তাহাই অনায়াসবহ হইয়া উঠিবে।

এই অবকাশে আমি আমার একান্ত সহায়ক কর্তব্যনিষ্ঠ সহকর্মীদের ও পরিষদের সকল সভ্যের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরিষৎ-মন্দির
৪ ভাদ্র ১৩৬১ । ২১ আগষ্ট ১৯৫৪

শ্রীসজনীকান্ত দাস
সভাপতি

পরিষৎ-সংবাদ

গ্রন্থাগার

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে নিম্নলিখিত সাময়িক পত্রিকাগুলি পাওয়া গিয়াছিল।

১। **দৈনিক**—(১) আনন্দবাজার পত্রিকা (২) যুগান্তর, (৩) দৈনিক বসুমতী, (৪) Amritabazar Patrika, (৫) Hindusthan Standard.

২। **সাপ্তাহিক**—(১) ত্রিপুরা, (২) দেশ, (৩) এশিয়া, (৪) বর্দ্ধমান, (৫) রূপাঞ্জলি, (৬) স্বস্তিকা, (৭) হিন্দু, (৮) হিমাদ্রী, (৯) হরিজন, (১০) Indian Messenger, (১১) Navavidhan,

৩। **মাসিক**—(১) অঙ্কুশ, (২) অর্চ্চনা, (৩) উজ্জ্বল ভারত, (৪) গৌড়ীয় পত্রিকা, (৫) জনশিক্ষা, (৬) উত্তরা, (৭) আর্থিক প্রসঙ্গ, (৮) উষা, (৯) মহিলা, (১০) মহিলামহল, (১১) মন্দিরা, (১২) শ্রীরামকৃষ্ণ, (১৩) বঙ্গশ্রী, (১৪) শিক্ষা, (১৫) বাংলার-শিক্ষক, (১৬) বসুন্ধরা, (১৭) মুখপত্র, (১৮) কথা-সাহিত্য, (১৯) ষষ্ঠিমধু, (২০) স্বাস্থ্যশ্রী, (২১) সংগঠন, (২২) সুদর্শন, (২৩) মধ্যবিত্ত, (২৪) সংহতি, (২৫) প্রবাসী, (২৬) ভারতবর্ষ, (২৭) মাসিক বসুমতী, (২৮) শনিবারের চিঠি, (২৯) হ্যানিম্যান, (৩০) Calcutta Review, (৩১) Modern Review.

১৩৬০ বঙ্গাব্দে উপহার প্রাপ্ত পুস্তকের নাম

(১) শ্রীকালিপ্রসাদ ঘোষ—কারপাপে ?, (২) শ্রীঅতুলানন্দ রায়—পাশুপত, যাদুকর, কৃষ্ণকুমারী, গদাধর, মানুষ হলেও দেবতা বলি, (৩) শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়—The new moon Light, (৪) শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য—ভারতের জাতিপরিচয়, (৫) কর্ম্মসচিব বিশ্বভারতী—স্বরবিতান ২৭শ ও ২৮শ খণ্ড, (৬) শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—করে দেখ, ১ম খণ্ড, (৭) শ্রীযদুনাথ সরকার—Bengal Nawab's, (৮) শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়—Benoy Kumar Sarkar, বন্দে মাতরম্ ও যুবক বাঙ্গালা, (৯) শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন—বাংলার বিস্মৃত কবি, (১০) শ্রীকুমারেশ ঘোষ—লাভের ব্যবসা, ১ম খণ্ড, ফ্যাশন ট্রেনিং স্কুল, ফাঁকিস্থান, কটাক্ষ, (১১) শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু—My days with Gandhi, (১২) কর্ম্মসচিব বিশ্বভারতী—কাহিনী, (১৩) শ্রীচারুকৃষ্ণ দর্শনাচার্য্য—শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতা, ১ম খণ্ড, (১৪) শ্রীযোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—স্মৃতির প্রলেপ, (১৫) শ্রীসত্যচরণ ঘোষ—জন্মান্তর, (১৬) শ্রীহরিপদ কেরাণি—শা-জাহান, (১৭) শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র—বাংলার সঙ্গীত, (১৮) স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী—পদচিহ্ন, সরল চণ্ডী, গ্রাম সংগঠন, অ-নামা, বাঁশরী, সরল গীতা, পথিকের গান, (১৯) কর্ম্মসচিব বিশ্বভারতী—ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা, তপতী, নৌকাডুবি, বাংলা সাহিত্যের কথা, অচলায়তন, গোরা, ডাকঘর, প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ, চোখের বালি,

নেহেরু ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব, রবীন্দ্র-জীবনী—৩য় খণ্ড, বসন্ত, বৈকালী, প্রবন্ধসংগ্রহ, **Twenty Portraits, Chitralipi, vol. II, Santiniketan 1901-51,** (২০) আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ—গৌড়ীয় ব্যাকরণ (অসম্পূর্ণ), হিতোপদেশ (অসম্পূর্ণ), (২১) শ্রীসুধীরকুমার মিত্র—ভারত ও বাংলা-১ম খণ্ড, (২২) শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন—বরেন্দ্রী কাহিনী, শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, (২৩) শ্রীমনীশ দাশগুপ্ত—কৃষিবিজ্ঞান-২য় খণ্ড, (২৪) শ্রীশরৎকুমার মিত্র—বিদ্যাপতির পদাবলী, (২৫) প্রাচী প্রকাশন—পরাভূত দেবতা, (২৬) কর্ম্মসচিব বিশ্বভারতী কুইনিন, (২৭) শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—দীপায়ন, (২৮) শ্রীমনোনীত সেন—ধর্ম্ম-বিজ্ঞান-১ম খণ্ড, (২৯) শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী—ভূতের পাঁচালি, (৩০) কর্ম্মসচিব বিশ্বভারতী—ধম্মপদ পরিচয়, স্বরবিতান-৩২শ খণ্ড, (৩১) শ্রীমানিকলাল মুখোপাধ্যায়—ভারতের ধূলি, (৩২) শ্রীকনকেন্দ্রনাথ দত্ত—বেদান্ত পরিচয়, উপনিষদ (জড় ও জীবতত্ত্ব), কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর, (৩৩) শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ মজুমদার—নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার-১ম ও ২য় খণ্ড, মানব সমাজ (৩৪) শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—বঙ্গের মহিলা কবি, (৩৫) শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ—শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের পরিশিষ্ট (৩৬) শ্রীধরণীধর চট্টোপাধ্যায়—জীবন খাতা, (৩৭) শ্রীসুবোধ-চন্দ্র মজুমদার—বসুধারা, (৩৮) শ্রীকল্যাণকুমার সেন—উপনিবেশ-৩য় খণ্ড, (৩৯) শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়—**On our prejudices pt.1,** (৪০) শ্রীঅসিতকুমার হালদার—মানস-মুকুর, (৪১) শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—বঙ্গে দাক্ষিণাত্য বৈদিক, (৪২) শ্রীসদানন্দ চক্রবর্ত্তী—স্তবকুসুমাঞ্জলি (৪৩) শ্রীকানু কর—তপনকুমার, (৪৪) শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়—নতুন কবিতা, (৪৫) শ্রীরাজ-বালা দেবী—শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতা প্রসঙ্গ, (৪৬) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ—বাংলা সাহিত্যের কথা-১ম খণ্ড, (৪৭) শ্রীবি, কে, দত্তগুপ্ত—অতীতের ছবি, স্বামী বিরজানন্দ, শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ পূজাপদ্ধতি, বিধবা বিবাহ, কুমারী কার্পেণ্টারের জীবন চরিত, গঠনকর্ম্ম-পন্থা, পদ্মাপুরাণ, **Florance Nightingale's Indian Letters, Select Chapters on Mymensingh,** (৪৮) শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র—বিশাল অন্ধ্র (৪৯) শ্রীকালীকিঙ্কর সেন গুপ্ত—ভাবরূপা (৫০) শ্রীইন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী—সামবেদীয় সন্ধ্যামন্ত্র, (৫১) কর্ম্মসচিব বিশ্বভারতী—বৈশেষিক দর্শন, (৫২) শ্রীত্রিদিবনাথ রায়—কুট্টনীমতম্, (৫৩) শ্রীসতীশচন্দ্র রায়—সর্ব্বধর্ম্মসম্মেলনের বীজমন্ত্র, ছেলেদের প্রার্থনা, গুরুগোবিন্দ সিংহের মহত্ব, শ্রীশ্রীহরি বাবা কা দিব্যোপদেশ, **The Bhagavad Gita and Modern Scholarship,** (৫৪) শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল—**Peasant revolution in Bengal,** (৫৫) শ্রীসুধাকান্ত দে—রহস্যময় চোর, (৫৬) শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার—**Ethics of the Mahavarat,** (৫৭) শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ, (৫৮) শ্রীতারক মুখোপাধ্যায়—রামপ্রসাদ, (৫৯) শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—**Rationalist annual 1939-40, Indian Art and Letters (12 copies), Nepal, Gwalior,** (৬০) শ্রীবিভা সরকার—এষণা, (৬১) শ্রীতিনকড়ি সুর—সঙ্গীতানন্দ লহরী, সুরাপানের ফল, কৃষিসংগ্রহ, (৬২) শ্রীঅমলেন্দু গুপ্ত—রঘুবংশ, ঋতুসংহার, মেঘদূত, গীতা, (৬৩) শ্রীকুমারেশ

ঘোষ—চক্র, সালোম, (৬৪) শ্রীবগলাপ্রসাদ নায়েক—রাজপুত্র, (৬৫) শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ—গৌড়ীয়ার তিনঠাকুর, গৌড়ীয় দর্শনের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য।

১৩৬০ বঙ্গাব্দে ক্রীত পুস্তকের তালিকা

হাসুবানু, বনহংসী—শ্রীপ্রবোধ সান্যাল, শ্রীকান্ত ২য় পর্ব্ব—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বৌরাণীর বিল, কালোছায়া—১ম-৪র্থ ভাগ—শ্রীনীহার গুপ্ত, দুইপক্ষ—শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল, অদ্ভুত হত্যা, হত্যাকারীর সন্ধানে—শ্রীরাধারমণ দাস, ডিটেকটিভ—শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রূপদর্শীর নকশা—রূপদর্শী, অগ্নিপরীক্ষা—শ্রীআশাপূর্ণা দেবী, রঞ্জন—শ্রীমনোজ বসু, ইতিকথার পরের কথা—শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদিশা, সূর্য্যসারথি, শিলালিপি—শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, জঙ্গম—১ম-৩য় খণ্ড—বনফুল, উত্তরায়ণ—বিভূতি মুখোপাধ্যায়, দুর্গরহস্য—শ্রীসরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, অ্যালবার্ট হল—শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, শিলাসন, আরোগ্যনিকেতন, বিচিত্র, আমার সাহিত্য জীবন—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কুরপালা—শ্রীরমেশচন্দ্র সেন, মহাজাতি সঙ্ঘ, অপরাজিতা, মণিলাল গ্রন্থাবলী ১ম-২য় খণ্ড—শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নিকৃষ্ট গল্প, নিকৃষ্টতর গল্প—শ্রীপ্রমথ বিশী, কালপেঁচার দুকলম, কালপেঁচার নকশা, কলকাতা কালচার—কালপেঁচা, কল্যাণ সঙ্ঘ, শেষ অধ্যায়, সরোজিনী—অমলা দেবী, ক্ষয়—১ম-২য় খণ্ড শ্রীশীতাংশু মৈত্র, কুলি—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, রাতজাগা, ভারতমঙ্গল—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মোগলপাঠান, জাহানআরা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস, রবীন্দ্র সঙ্গীতের ধারা—শ্রীশুভ গুহঠাকুরতা, সাহিত্য-সংগমে—শ্রীবিনায়ক সান্যাল, প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প—শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য, ভাদুড়ীমশায়—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শীতে উপেক্ষিতা—রঞ্জন, যোগবিয়োগ, গ্রন্থাবলী—শ্রীআশাপূর্ণা দেবী, আরোগ্য, গ্রন্থাবলী—১ম-২য় খণ্ড—শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গিনী, চেনামহল, গোধূলি—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র, মা, গরীবের মেয়ে—শ্রীঅনুরূপা দেবী, নন্দিনী, হোমানল, অনাথ-আশ্রম—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, পদিপিসীর বর্ম্মি-বাক্স—শ্রীলীলা মজুমদার, পাতালে এক ঋতু—শ্রীদীপক চৌধুরী, ত্রিধারা—হার্বার্ট এ ফিলব্রিক, জতুগৃহ—শ্রীসুবোধ ঘোষ, চিতাবহ্নিমান—শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, কটাভানারি—শ্রীগুণময় মান্না, ময়ূরপঙ্খী নাও—শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত, সাহেব বিবি গোলাম—শ্রীবিমল মিত্র, দিদি, অন্নপূর্ণার মন্দির—নিরুপমা দেবী, চারু গ্রন্থাবলী, জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী, হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী, বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি—শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, দিওয়ান-ই-হাফিজ—নরেন্দ্র দেব, ইন্দুমতী (রঘুবংশ), আহরণী—কালিদাস রায়, শরৎসাহিত্য-সংগ্রহ—২য় খণ্ড, বাংলা-চরিতগ্রন্থে শ্রীচৈতন্য—শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস—শ্রীকল্যাণী মল্লিক, হর্ষচরিত—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর, ভাব ও ছন্দ—শ্রীসজনীকান্ত দাস, কবিকঙ্কণ চণ্ডী ১ম—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, মনুসংহিতায় বিবাহ—শ্রীঅমলকুমার রায়, ইতিহাসের নাটক—শ্রীভূপেন্দ্রমোহন সরকার, Memoirs of my life & times vol.

II—Bipin Chandra Pal. শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ—কৃষ্ণদাস বাবাজী, বাঙ্গালা নাটক—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, পলাশীর যুদ্ধ—শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, জলাধারের অন্তরীক্ষ—শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাস সাধনা—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, প্রফুল্লচাকী—শ্রীহেমন্তচাকী, রামচরিত—শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক, চলার পথে—শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী, কোন পথে ?—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, পলাশীর যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্র—নবীনচন্দ্র সেন, আধুনিকতা—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়, সাবিত্রী, সতী, দেবাসুর, অশোক, মীরকাশিম—শ্রীমন্মথ রায়, হিমালয় অভিযান ও শেরপা তেনজিং—শ্রীসুবোধ ঘোষ ইত্যাদি, ধুস্তরী মায়া—পরশুরাম, শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু-সঙ্গ ১ম-৫ম খণ্ড—কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী, ছান্দোগ্য-উপনিষদ্, মীমাংসাদর্শন—বসুমতীসং, আত্ম-চরিত (প্রফুল্লচন্দ্র রায়), Indian Struggle,—Subhas Bose মঙ্গলচণ্ডীর গীত—শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য, David Hare—P. C. Mitra, বিংশশতকের বাঙ্গালা সাহিত্য—শ্রীঅরবিন্দ পোদ্দার, বঙ্কিম-সাহিত্যের ভূমিকা, কবি শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অবধূত ও যোগিসঙ্গ—শ্রীপ্রমোদ চট্টোপাধ্যায়, Catalogue of the Sanskrit & Prakrit Manuscripts in the India office Library. vol. II, pt. 1+II.

চিত্রশালা

দিল্লীর হিন্দুকলেজের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে সার্ জন শোরকে লিখিত লেবেডফের পত্রের একখানি ফোটো প্রতিলিপি পরিষদের চিত্রশালায় সংরক্ষণের জন্য দান করিয়াছেন।

ষষ্টিতম বার্ষিক কার্যবিবরণী

শোক-সংবাদ

আমাদের বিগত বার্ষিক অধিবেশন ১৬ শ্রাবণ ১৩৬০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সেই দিন হইতে আজ ৪ ভাদ্র ১৩৬১ পর্যন্ত আমরা যে সকল হিতৈষী বন্ধুবর্গকে হারাইয়াছি, সর্বপ্রথমে তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া, তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করা কর্তব্য।

সহায়ক-সদস্যগণের মধ্যে মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয় কর্মময় জীবনের অন্তে ৮৪ বৎসর বয়সে চট্টগ্রামে পরলোকগমন করিয়াছেন।

সাধারণ-সদস্যগণের মধ্যে আমরা কল্যাণকুমার বসু, কৃষ্ণচন্দ্র বসু, খগেন্দ্রনাথ মজুমদার, শৈলেশ্বর সেন এবং সুরেশচন্দ্র মজুমদারকে হারাইয়াছি। তন্মধ্যে সুরেশচন্দ্র মজুমদার ১৩৫১ সালে এবং কল্যাণকুমার বসু ১৩৬০ সালে পরিষদের কার্যনির্বাহক-সমিতির সদস্য ছিলেন।

সাহিত্যিক বন্ধু ও প্রাক্তন সদস্যগণের মধ্যে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণেশ্বর সিংহ, শ্রীনাথ শাস্ত্রী ও সুবোধচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

আনন্দ-সংবাদ

পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে ইংলণ্ডের এসিয়াটিক সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হইয়াছেন।

অতঃপর আমাদের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্যগণের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিতেছি।

বান্ধব ও সদস্য

১৩৬০ সালের ১ বৈশাখ হইতে ৩০ চৈত্র পর্যন্ত পরিষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্যগণের পরিচয় এবং সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বান্ধব ঃ একজন মাত্র বর্তমান আছেন, শ্রীনরসিংহ মল্লদেব।

বিশিষ্ট সদস্য ঃ (১) শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, (২) শ্রীযদুনাথ সরকার, (৩) শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজীবন সদস্য ঃ (১) শ্রীসতীশচন্দ্র বসু; (২) শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত; (৩) রাজা শ্রীগোপাললাল রায়; (৪) শ্রীগণপতি সরকার; (৫) শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা; (৬) শ্রীবিমলাচরণ লাহা; (৭) শ্রীহরিহর শেঠ; (৮) শ্রীমেঘনাদ সাহা; (৯) শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে; (১০) শ্রীসত্যচরণ লাহা; (১১) শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়; (১২) শ্রীপ্রশান্তকুমার সিংহ; (১৩) শ্রীরঘুবীর সিং; (১৪) শ্রীহিরণকুমার বসু; (১৫) শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী; (১৬) শ্রীমুরারিমোহন মাইতি; (১৭) শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়; (১৮) রাজা শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়; (১৯) শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়; (২০) শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়; (২১) শ্রীইন্দ্রভূষণ বিদ্; (২২) শ্রীত্রিদিবেশ বসু; (২৩) শ্রীজগন্নাথ কোলে; (২৪) শ্রীমহিমচন্দ্র

ঘোষ; (২৫) শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; (২৬) শ্রীসত্যপ্রসন্ন সেন; (২৭) শ্রীহরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; (২৮) শ্রীসজনীকান্ত দাস; (২৯) শ্রীনির্মলকুমার বসু।

অধ্যাপক সদস্য ঃ বর্ষশেষে ৫ জন।

সহায়ক সদস্য ঃ বর্ষশেষে ১৪ জন।

সাধারণ সদস্য ঃ কলিকাতাবাসী ৭২১ জন ও মফস্‌সলবাসী ৭৮, মোট ৭৯৯ জন।

সর্ববিধ সদস্য এবং বান্ধবের মিলিত সংখ্যা ৮৫১।

গত বর্ষে আমরা ১৭৪ জন নূতন সভ্য লাভ করিয়াছি। তদ্ভিন্ন মোট ১০৫ জনকে আমরা হারাইয়াছি। তন্মধ্যে ৫ জন মৃত, ৩৩ জনের চাঁদা দীর্ঘকাল বাকি থাকায় নিয়মানুসারে তাঁহাদের নাম সভ্যপদ হইতে অপসারিত করা হয়। ৬৭ জন পদত্যাগ করেন।

পদত্যাগকারিগণের মধ্যে স্থানত্যাগের জন্য ১৭ জন, যাতায়াতের অসুবিধার জন্য ২ জন, বিভিন্ন অসুবিধার জন্য ১৮ জন, কারণের উল্লেখ না করিয়া ১৬ জন পদত্যাগ করেন। দুই জন আজীবন সদস্য হইয়াছেন, একজন নূতন করিয়া সদস্য হন এবং একজন মনোমত লেখক-লেখিকার পুস্তক না পাওয়ার জন্য পদত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

কর্মাধিকারী

সভাপতি ঃ শ্রীসজনীকান্ত দাস; **সহকারী সভাপতি ঃ** শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়; শ্রীগণপতি সরকার, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুশীলকুমার দে; **সম্পাদক ঃ** শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল, ১৮ বৈশাখ ১৩৬১ তারিখে পদত্যাগ করিলে চিত্রশালাধ্যক্ষের পদত্যাগ করিয়া শ্রীনির্মলকুমার বসু; **সহকারী সম্পাদক ঃ** শ্রীইন্দ্রজিৎ রায় (ইনি ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১ পদত্যাগ করেন), শ্রীদীনেশচন্দ্র তপাদার, শ্রীমনোমোহন ঘোষ, শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; **পত্রিকাধ্যক্ষ ঃ** শ্রীত্রিদিবনাথ রায়; **কোষাধ্যক্ষ ঃ** শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়; **পুথিশালাধ্যক্ষ ঃ** শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য; **গ্রন্থাধ্যক্ষ ঃ** শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; **চিত্রশালাধ্যক্ষ ঃ** শ্রীনির্মলকুমার বসু, ১৮ বৈশাখ ১৩৬১ হইতে শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল।

কার্যনির্বাহক সমিতি ঃ (সদস্যগণের পক্ষে) (১) শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, (২) রেভারেণ্ড ফাদার এ দোঁতেন, (৩) শ্রীকল্যাণকুমার বসু, ৫ ভাদ্র ১৩৬০ পরলোক গমন করিলে তৎস্থানে শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, (৪) শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, (৫) শ্রীকুমারেশ ঘোষ, (৬) শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, (৭) শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, (৮) শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, (৯) শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, (১০) শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার, (১১) শ্রীপুলিনবিহারী সেন, (১২) শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, (১৩) শ্রীপ্রবোধকুমার ঘোষ, (১৪) বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, (১৫) শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ মজুমদার, (১৬) শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, (১৭) শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, (১৮) শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, (১৯) শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, (২০) শ্রীমতী প্রভাময়ী দেবী;

শাখাপরিষদসমূহের পক্ষ হইতে (২১) শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়, মেদিনীপুর শাখা; (২২) শ্রীপ্রভাসচন্দ্র রায়, শিলিগুড়ি শাখা; (২৩) শ্রীমাণিকলাল সিংহ, বিষ্ণুপুর শাখা, (২৪) শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া শাখা।

কার্য-নির্বাহক-সমিতির কার্যতালিকা

(ক) সুচারুরূপে বিভিন্ন কার্য পরিচালনার জন্য সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, আয়ব্যয়, পুস্তকাগার, চিত্রশালা ও ছাপাখানা উপ-সমিতি গঠিত হইয়াছিল।

(খ) ১৩৬১ সালের কার্য-নির্বাহক-সমিতিতে নির্বাচনের জন্য মতিগণনার জন্য শ্রীঅমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবোধকুমার দাস, শ্রীভোলানাথ চক্রবর্তী ও শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসুর উপরে ভার অর্পণ করা হয়।

(গ) ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কমিশনের অনুরোধ অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতীচ্য ভাষায় অনুবাদের জন্য দুইটি বাংলা পুস্তকের নাম নির্বাচন করা হয়। সুখের বিষয়, সমিতির দ্বারা নির্বাচিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এবং রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' ঐ উদ্দেশ্যে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে।

(ঘ) আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের সংশোধিত বাংলাভাষা (ব্যাকরণ ও শব্দকোষ) পুনর্মুদ্রণের জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে।

(ঙ) "লীলা দেবী" ও "স্বর্ণকুমারী দেবী" স্মৃতি-পুরস্কারের জন্য মৌলিক রচনা আহ্বানের যথোচিত ব্যবস্থা করা হইতেছে।

(চ) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাধিকারের অনুরোধে একজন লেখককে ইউনেস্কোর ফেলোশিপ প্রদানের জন্য মনোনয়ন করা হয়।

(ছ) কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ রায়ের 'শিবায়ন' মুদ্রণের জন্য সম্পাদনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(জ) আলোচ্য বর্ষে পরিষদের পক্ষ হইতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহে নিম্নলিখিত প্রতিনিধি প্রেরিত হন :

(১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় :
জগত্তারিণী-স্বর্ণপদক সমিতি : শ্রীসজনীকান্ত দাস।
ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক সমিতি : শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য।
লীলা পদক ও পুরস্কার : শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
সরোজিনী বসু পদক ও পুরস্কার : শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য।

(২) নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন, জয়পুর অধিবেশন : শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৩) ইতিহাস কংগ্রেস, ওয়াল্টেয়ার : শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

(৪) ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কমিশন : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

(৫) বঙ্কিমচন্দ্র সংগ্রহশালা শাখা কার্যকরী সমিতি, নৈহাটী : শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ।

অধিবেশন

আলোচ্যবর্ষে সর্বসমেত কুড়িটি মাসিক ও বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল ; নিম্নে তাহার তালিকা ও তারিখ প্রদত্ত হইল :

(১) উনষষ্টিতম বার্ষিক অধিবেশন, ১৬ শ্রাবণ ১৩৬০ ; (২) প্রথম মাসিক অধিবেশন, ৯ আশ্বিন ১৩৬০ ; (৩) দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন, ২১ কার্তিক ১৩৬০ ; (৪) মোহেন-জো-দড়োর সভ্যতা বিষয়ে বক্তৃতা : শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য, ৫ অগ্রহায়ণ ১৩৬০ ; (৫) মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের উদ্দেশে স্মৃতিসভা, ১২ অগ্রহায়ণ ১৩৬০ ; (৬) তৃতীয় মাসিক অধিবেশন, ২৫ পৌষ ১৩৬০ ; (৭) চতুর্থ মাসিক অধিবেশন, ২৩ মাঘ ১৩৬০ ; (৮) পঞ্চম মাসিক অধিবেশন, ২২ ফাল্গুন ১৩৬০ ; (৯) ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন, ২৭ চৈত্র ১৩৬০ ; (১০) সপ্তম মাসিক অধিবেশন, ১৮ বৈশাখ ১৩৬১ ; (১১) আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর উদ্দেশে স্মৃতিসভা, ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১ ; (১২) মধুসূদন দত্তের স্মৃতিতর্পণ উপলক্ষে সমাধি-স্তম্ভে সমবেত হইয়া মাল্যদান, ১৪ আষাঢ় ১৩৬১ ; (১৩) অষ্টম মাসিক অধিবেশন, ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১ ; (১৪) নবম মাসিক অধিবেশন, ২৫ আষাঢ় ১৩৬১ ; (১৫) ছায়াচিত্রযোগে 'দাক্ষিণাত্যের মন্দির' বিষয়ে বক্তৃতা : শ্রীনির্মলকুমার বসু, ১ শ্রাবণ ১৩৬১ ; (১৬) ছায়াচিত্রযোগে 'দাক্ষিণাত্যের মূর্তি' সম্বন্ধে বক্তৃতা : শ্রীনির্মলকুমার বসু, ৮ শ্রাবণ ১৩৬১ ; (১৭) হিন্দী সাহিত্যিক প্রেমচন্দের উদ্দেশে স্মৃতিসভা, ১৫ শ্রাবণ ১৩৬১ ; (১৮) দশম মাসিক অধিবেশন ২২ শ্রাবণ ১৩৬১ ; (১৯) 'ভারতীয় সংস্কৃতির এক দিক (নৃতত্ত্বের বিচারে)' বিষয়ে বক্তৃতা : শ্রীনির্মলকুমার বসু, ২২ শ্রাবণ ১৩৬১ ; (২০) 'ইতিহাসের উপাদান' সম্বন্ধে বক্তৃতা : শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ২৭ শ্রাবণ ১৩৬১ ।

গ্রন্থাগার

আলোচ্য বর্ষে ১৩২ খানি ক্রীত এবং ১৫৪ খানি উপহার প্রদত্ত হওয়ায় গ্রন্থাগারে মোট ২৮৬ খানি পুস্তক ও পত্রিকা সংযোজিত হইয়াছে।

বিগত আষাঢ় মাস হইতে গ্রন্থাগারে উপস্থিত পাঠকগণের সংখ্যা গণনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আষাঢ় মাসে মোট ২৩২৫ জন পাঠক, অর্থাৎ প্রত্যহ গড়ে ৭৫ জন, সংবাদ-পত্রাদি ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন ১০৬৮ দফে ২০৯৩, অর্থাৎ গড়ে প্রত্যহ ৬৭ খানি বই সদস্যগণের মধ্যে বিলি করা হইয়াছে। ১৩৬১ শ্রাবণ মাসে মোট পাঠকের সংখ্যা ২৪০১, অর্থাৎ গড়ে প্রত্যহ ৭৫ জন করিয়া ছিল এবং মোট ৯৬৮ দফে ১৯৫৩, অর্থাৎ গড়ে প্রত্যহ ৬১ খানি করিয়া বই বিলি করা হইয়াছে।

পুথিশালা

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের পুথিশালায় ৩৭ খানি পুথি সংযোজিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে বাংলা ১৮ খানি ও সংস্কৃত ১৯ খানি। শ্রীযোগীশচন্দ্র সিংহ ২১ খানি, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য ৯ খানি, শ্রীপাঁচুগোপাল রায় ১ খানি পুথি উপহার দিয়াছেন। ২ খানি পুথি কেনা হইয়াছে ও সঞ্চিত পত্ররাজি বাছিয়া ৪ খানি উদ্ধার করা হইয়াছে। এতন্মধ্যে সকলের চেয়ে প্রাচীন পুথি হইল শ্রীপাঁচুগোপাল রায় প্রদত্ত 'শিবায়ন'। উহার রচনাকাল বঙ্গাব্দ ১১৩৩, অর্থাৎ ২২৮ বৎসর পূর্বে।

উপরোক্ত ৩৭ খানি পুথি সমেত বর্ষশেষে মোট পুথির সংখ্যা ৮১৯৯। তাহার মধ্যে বাংলা ৩২৯৬, সংস্কৃত ২৪৪৯, তিব্বতী ২৪৪৩ ও ফারসী ১৩।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে অথবা স্বতন্ত্রভাবে পাঠকগণ আলোচ্য বর্ষে ১৪৭ খানি পুথি ব্যবহার করিয়াছেন।

গ্রন্থপ্রকাশ

সাধারণ তহবিলের অর্থে হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলীর নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি সভাপতির সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে। (১) বৃত্তসংহার কাব্য (১ম ও ২য় খণ্ড), (২) আশাকানন, (৩) বীরবাহু কাব্য, (৪) ছায়াময়ী কাব্য, (৫) দশমহাবিদ্যা, (৬) চিত্ত-বিকাশ, (৭) কবিতাবলী, (৮) রোমিও-জুলিয়েত, (৯) নলিনী-বসন্ত।

ঝাড়গ্রাম তহবিলের অর্থে বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা'র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

বিনয়কুমার সরকার তহবিলের অর্থে শ্রীসুধাকান্ত দে কর্তৃক অনূদিত 'রিকার্ডোর ধনবিজ্ঞান' প্রকাশিত হইয়াছে।

মুকুন্দ কবিচন্দ্রের 'বিশাললোচনীর গীত বা বাশুলীমঙ্গল' শ্রীশুভেন্দু সিংহ রায় ও শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় পরিষৎ-পত্রিকায় ছাপার সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে পত্রিকার চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল, মোট পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২২৬। বিষয়ভেদে যে প্রবন্ধগুলি বাহির হইয়াছিল তাহার তালিকা দেওয়া হইল। ইতিহাস ৪, বৈষ্ণব-পদাবলী ১, প্রাচীন ভূগোল ১, ব্যাকরণ ১, প্রাচীন সাহিত্য ৭, বিবিধ ৩। ইহার মধ্যে তিনটি প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

চিত্রশালা

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত চিত্রশালায় সংগৃহীত দ্রব্যাদির একটি নূতন তালিকা প্রস্তুত করিতেছেন।

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার

আলোচ্য বর্ষে উপরোক্ত ভাণ্ডার হইতে ৬ জনকে সারা বৎসর ও ১ জনকে ১০ মাস ধরিয়া মাসিক ৬৲ টাকা হারে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে ৫ জন সাহিত্যিকগণের বিধবা পত্নী, ১ জন মহিলা সাহিত্যিক ও ১ জন পুরুষ সাহিত্যিক।

রমেশ ভবন

আলোচ বর্ষেও রমেশ ভবনের দ্বিতলের সম্পূর্ণ রেশন-আপিসরূপে ও নীচের বারান্দার দক্ষিণাংশ 'সাহিত্য-পরিষৎ পোস্ট আপিসরূপে' ভাড়ায় বিলি ছিল।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে কোন নূতন শাখা স্থাপিত হয় নাই। মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর ও নৈহাটি শাখার অধিবেশন বা অনুষ্ঠানের সংবাদ যথাযথভাবে পাওয়া গিয়াছে। বিষ্ণুপুর শাখা স্বীয় সংগ্রহশালার নামকরণ করিয়াছেন, 'যোগেশচন্দ্র রায় পুরাতত্ত্বশালা'।

আর্থিক সহায়তা

(ক) পরিষদের পত্রিকা প্রকাশের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার আলোচ্য বর্ষে ২০০০৲ টাকা ও গ্রন্থ প্রকাশের জন্য ১২০০৲ টাকা সাহায্য দান করিয়াছেন।

(খ) কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান হইতে পুস্তক খরিদের জন্য ১৯৪৮-৪৯ ও ১৯৪৯-৫০ সনের দরুণ মোট ১০০০৲ টাকা আলোচ্য বর্ষে পাওয়া গিয়াছে।

উপসংহার

আয় ব্যয় সম্পর্কিত যে তালিকাটি ইতিমধ্যে প্রেরিত হইয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, পরিষদের বাৎসরিক আয় অনুমানিক বিশ হাজার টাকার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ টাকায় ।/১০ আনা চাঁদা হইতে সংগৃহীত হয়; বই বিক্রয় বাবদ ৴৫ লাভ হইয়া থাকে; সরকারী সাহায্য টাকায় ৵১০ এবং কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের সাহায্য ৻৭৷৹; বাড়িভাড়া ৴৹ ও বিবিধ খাতে আমাদের আয় ৻১৫।

উপস্থিত রমেশভবন আংশিকভাবে ভাড়া দেওয়ার জন্য চিত্রশালার মূর্তি এবং ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণের চিত্র, হস্তাক্ষর বা ব্যবহৃত জিনিসপত্র, গ্রন্থাদি রক্ষার আধার সাজাইয়া রাখিবার বিষয়ে বিশেষ অসুবিধা ঘটিতেছে। উপরন্তু সভামণ্ডপটি ব্যবহার করাও সম্ভব হইতেছে না। সভাপতি মহাশয় স্বীয় অভিভাষণে এ সকল বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। উপরের হিসাবটি পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, আমরা যদি সভ্যসংখ্যা দ্বিগুণ করিতে পারি তাহা হইলে আমাদিগকে আর ভাড়ার উপরে নির্ভর করিতে হয় না।

পরিষৎ-মন্দিরের জীর্ণ অবস্থার সংবাদ সভাপতি মহাশয় বিশেষভাবে আপনাদের গোচরে আনিয়াছেন। সাহিত্যিকবন্ধু ও সুযোগ্য ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত ভূপতি চৌধুরী যত্নসহকারে পরীক্ষান্তে জানাইয়াছেন যে, ভালভাবে মন্দিরের সংস্কারের জন্য ২৯ হইতে ৩০,০০০৲ টাকা ব্যয় করা কর্তব্য।

আমাদের তালিকাভুক্ত ছাপা পুস্তকের সংখ্যা ২০,১৭৮। তাহা ছাড়া মাসিকপত্র প্রায় ৬০০০, বাংলা ছাপা ও ইংরেজী বই আরও প্রায় ২৩০০০ সূচী না করা অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত প্রমীলচন্দ্র বসু পরিদর্শনের পর হিসাব দিয়াছেন যে, সর্বসমেত ৭০,০০০ বাংলা ও ইংরেজী বই, পুথি প্রভৃতি তালিকা প্রণয়নের পর কার্ডে বিভিন্নভাবে সূচীবদ্ধ করিতে এবং গ্রন্থপঞ্জী সাজাইতে প্রায় ৩০,০০০৲ টাকা ব্যয় হইবে। হয়ত স্বেচ্ছাকর্মীগণের আনুকূল্যে এবং পরিষদের বর্তমান কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের সহায়তায় এই খরচ অনেকাংশে কমানো যাইতে পারে। তাহা সত্ত্বেও মন্দির-সংস্কার এবং তালিকা-প্রণয়নের জন্য যে অন্তত ৪০।৪৫ হাজার টাকার প্রয়োজন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এতদ্ভিন্ন আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের রচিত বাংলা-ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধানখানি সংশোধিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। তাহা পুনঃপ্রকাশ পরিষদের পক্ষে একটি প্রধান কর্তব্য। ইহাতেও আনুমানিক ১০,০০০৲ ব্যয় হইবে।

পরিষদের পক্ষে সহানুভূতিশীল কর্মীর আজ পর্যন্ত কোনদিন অভাব ঘটে নাই। যখনই অর্থের অনটন ঘটিয়াছে, বাংলা দেশের ধনীসম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে অকুণ্ঠিতভাবে অর্থানুকূল্য ইহার উপরে বর্ষিত হইয়াছে। আজ নানা ঐতিহাসিক কারণে তাহা আর সম্ভব হইতেছে না। দেশের রাজশক্তি বিদেশীর অধিকার হইতে মুক্ত হইয়া স্বদেশবাসীর আয়ত্তে আসিয়াছে। জনগণের প্রতিনিধিস্বরূপ রাজশক্তিকে পরিষদের বিপুল ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও পরিপোষণের দায়িত্ব অনেকাংশে বহন করিতে হইবে, সভাপতি মহাশয় স্পষ্টভাবে তাহা আপনাদের নিকট জ্ঞাপন করিয়াছেন। এক দিকে জাগ্রত রাজশক্তি, অপর দিকে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগসম্পন্ন জনসাধারণের কর্মধারার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হইলে মন্দিরের সংস্কার, গ্রন্থভাণ্ডারের সম্যক্ ব্যবহার এবং বঙ্গদেশবাসী ভারতবাসীর প্রাণস্পন্দনের সহিত তাহার সাহিত্য ও সংস্কৃতির জীবন্ত সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে।

আগামী বাৎসরিক অধিবেশনের সময়ে কথঞ্চিৎ সাফল্যের সংবাদ আপনাদের নিকট জ্ঞাপন করিতে পারিব—এই আশা লইয়া ষষ্টিতম কার্যবিবরণ সমাপ্ত করিতছি।

৪ঠা ভাদ্র ১৩৬১

শ্রীনির্মলকুমার বসু
সম্পাদক

দ্রষ্টব্য—৬৪ পৃষ্ঠার ১ম পঙ্‌ক্তিতে 'মোট পুথির সংখ্যা ৮১৯৯' স্থলে 'মোট পুথির সংখ্যা ৬০০২' এবং ঐ পৃষ্ঠার ২য় পঙ্‌ক্তিতে 'তিব্বতী ২৪৪৩' স্থলে 'তিব্বতী ২৪৪' পাঠ করিতে হইবে। পৃষ্ঠা ৫৩, সভাপতির ভাষণে 'একষষ্টিতম' স্থলে 'ষষ্টিতম' পড়িতে হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৬১ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

শ্রীসজনীকান্ত দাস	৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭	লেখক

সহকারী সভাপতি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৪৬।৫বি, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১৯	লেখক
শ্রীগণপতি সরকার	৬৯, বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা-১০	জমিদার
রাজা শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	৪, মার্লিন পার্ক, কলিকাতা-১৯	জমিদার
শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়	গোলকুঠি, আদমপুর, ভাগলপুর	লেখক
শ্রীযদুনাথ সরকার	১০, লেক টেরেস, কলিকাতা-২৯	অধ্যাপক
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৩৭।এ, মহানির্বাণ রোড, কলিকাতা	লেখক
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৬, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯	অধ্যাপক
শ্রীসুশীলকুমার দে	১৯।এ, চৌধুরী লেন, কলিকাতা-৪	অধ্যাপক

সম্পাদক

শ্রীনির্মলকুমার বসু	৩৭, বসুপাড়া লেন, কলিকাতা-৩	অধ্যাপক

সহকারী সম্পাদক

শ্রীকুমারেশ ঘোষ	৪৫।বি, গড়পার রোড, কলিকাতা	ব্যবসায়ী
শ্রীজগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য	৩৫, স্কটস্ লেন, কলিকাতা	অধ্যাপক
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	পি৭০, সি.সি.ও.এস., কাশীপুর, কলিকাতা-২	ব্যবসায়ী
শ্রীমনোমোহন ঘোষ	৯২।এ, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, কলিকাতা-৪	চাকুরিজীবী

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়	১৯।এ, শ্রীনাথ মুখার্জী লেন, দমদম, কলিকাতা-২৮	অধ্যাপক

কোষাধ্যক্ষ

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ	৫৯, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কলিকাতা-২	জমিদার

পুথিশালাধ্যক্ষ

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য	প্রসাদদাস সেন রোড, চুঁচুড়া, হুগলী	অধ্যাপক

গ্রন্থাধ্যক্ষ

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য	৬৪।সি, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯	অধ্যাপক

চিত্রশালাধ্যক্ষ

শ্রীশুভেন্দু সিংহ রায়	১৫, ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা-২০	জমিদার

কার্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

শ্রীঅতুল সেন	২১।২এ, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা-৪	ভূতপূর্ব শিক্ষক
শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য	৪, পঞ্চাননতলা লেন, কলিকাতা-৩৪	অধ্যাপক
শ্রীকামিনীকুমার কর রায়	৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১৩	চাকুরিজীবী
শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত	৪৫।বি, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬	চিকিৎসক
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য	বসু-বিজ্ঞান-মন্দির, কলিকাতা-৯	বিজ্ঞান-গবেষক
শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৩১।এ, একডালিয়া প্লেস, কলিকাতা-১৯	অধ্যাপক
শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	পি ২৫৬, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা-২৯	প্রাক্তন জজ
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ	৩৫।১০, পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা-২০	ব্যবসায়ী
শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৩১।এ, একডালিয়া প্লেস, কলিকাতা-১৯	অধ্যাপক
শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু	৪৫, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯	ব্যবসায়ী
শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	৩০২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯	চাকুরিজীবী
শ্রীপুলিনবিহারী সেন	৫৪।বি, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯	চাকুরিজীবী
শ্রীপ্রবোধকুমার ঘোষ	১বি, রসা রোড, কলিকাতা-২৫	ব্যবসায়ী
শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর	১, দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্ট্রীট, কলিকাতা-৬	জমিদার
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	শান্তিনিকেতন, বীরভূম	গ্রন্থাগারিক, অধ্যাপক
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী	২৬।২, অশ্বিনী দত্ত রোড,কলিকাতা-২৯	অধ্যাপক
শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত	৯ই, ষোগোদ্যান লেন, কলিকাতা-১১	চাকুরিজীবী
শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৫।১ডি, শ্যামবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৪	চাকুরিজীবী
শ্রীসুশীল রায়	১৩।বি, কাঁকুলিয়া রোড, কলিকাতা-২৯	চাকুরিজীবী
শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী	৩০২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯	জমিদার

শাখা-পরিষৎ-সভ্যগণ

শ্রীঅতুল্যচরণ দে (নৈহাটী)	পঞ্চাননতলা, নৈহাটী, ২৪ পরগণা	শিক্ষক
শ্রীচিত্তরঞ্জন রায় (মেদিনীপুর)	পি ৮, বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা	উকিল (উপমন্ত্রী)
শ্রীমাণিকলাল সিংহ (বিষ্ণুপুর)	বিষ্ণুপুর-শাখা-সম্পাদক, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া	শিক্ষাব্রতী
শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া)	১৪৭।বি, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, উত্তরপাড়া	চাকুরিজীবী

৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা
শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

৬১ ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

হইতে শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৬১ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

সূচি

*

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা]
৬১ বর্ষ, ২য় সংখ্যা
১৩৬১

ভারতে সূর্যমূর্তির উৎপত্তি ও প্রাচীনত্ব

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

ভারতীয় ভাস্কর্যশিল্পের ইতিহাসে বুদ্ধমূর্তির উৎপত্তি ও প্রাচীনতা সম্পর্কে একটি বিতর্ক আছে। একদল পণ্ডিত (এঁদের মধ্যে অধিকাংশই উরোপীয়) বলেন, বুদ্ধের রূপকল্পনা ও মূর্তিগঠন প্রথম দেখা গিয়েছিল উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের গ্রীক-প্রভাবিত গান্ধার শিল্পে এবং এর জন্য দায়ী হচ্ছেন মূলতঃ ঐ অঞ্চলের গ্রীক-অধিবাসিগণ। এই মতের প্রতিবাদে আবার কেউ কেউ বলেছেন, বুদ্ধমূর্তিকে সম্পূর্ণরূপে গ্রীক-পরিকল্পিত বললে ভুল হবে, প্রায় একই সময়ে (খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতক বা খৃষ্টীয় প্রথম শতকে) উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বিদেশী প্রভাবপুষ্ট গান্ধার শিল্পে এবং উত্তর-ভারতের অভ্যন্তরস্থ মথুরা-শিল্পে বুদ্ধ-মূর্তিগঠনের দুটি স্বতন্ত্র ধারা গড়ে ওঠে। এর মধ্যে দ্বিতীয়টির পরিকল্পনা ও পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভারতীয়, তার উপর কোনও বিদেশী প্রভাব নেই। আধুনিক কালের পণ্ডিতসমাজে যেমন বুদ্ধমূর্তির আদিকল্পক ও নির্মাতৃবৃন্দকে বিদেশী প্রমাণ করবার একটা প্রচেষ্টা দেখা যায়, প্রাচীন যুগে ভারতীয় সূর্যমূর্তি সম্পর্কেও অনুরূপ একটি মতবাদ স্থাপন করবার প্রয়াস হয়েছিল। বর্তমান প্রবন্ধে তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ ও সত্যাসত্য বিচারের চেষ্টা করব।

পারস্য থেকে আগত মগ বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক সূর্যোপাসনার যে ধারা ভারতবর্ষে প্রবর্তিত হয়েছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় ভবিষ্যপুরাণে।[১] এই গ্রন্থের প্রথম পর্বে সাম্বকর্তৃক মিত্রবনে সূর্যমন্দির ও সূর্যমূর্তি প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, সাম্ব চন্দ্রভাগা নদীতে স্নান করতে গেলে, এক সূর্যমূর্তি জলে ভেসে তাঁর নিকট আসে; তিনি সেই মূর্তি জল থেকে তুলে যথোচিত বিধিসহকারে মিত্রবনে স্থাপন করেন; পরে সাম্বের প্রশ্নের উত্তরে সূর্যমূর্তি তাঁকে জানান যে, তাঁর জ্যোতি চরাচরের সর্বপ্রাণীর অসহ্য বোধ হওয়ায় তিনি বিশ্বকর্মাকে আদেশ করেন, তাঁর (সূর্যের) তেজ প্রশমন করতে। তখন বিশ্বকর্মা শাকদ্বীপে ভ্রমিযন্ত্রের সাহায্যে তাঁর তেজ শাতন ক'রে তাঁকে সাম্বদৃষ্ট মূর্তির রূপ দান করেন। ভবিষ্যপুরাণের যে অংশে এই চিত্তাকর্ষক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, ভারতীয় ভাস্কর্যশিল্পের ইতিহাসে তা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, উক্ত অংশটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃতির যোগ্য[২] :

১। ভারতীয় সূর্যোপাসনার অঙ্গস্বরূপ এই বিদেশী পারসীক সৌর ঐতিহ্য সম্পর্কে অন্যত্র আলোচনা করেছি; দ্রষ্টব্য, "ভারতের সৌরধর্ম"—ভারত-সংস্কৃতি (ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার-জয়ন্তীস্মারক গ্রন্থ), পৃঃ ২২২-৫৯; "ভারতীয় সূর্যপূজার একটি বৈশিষ্ট্য," সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫৭শ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা—পৃঃ ২৫-৪৩; "রেবন্ত"—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫৮শ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ৫৭-৮০।

২। ভবিষ্যপুরাণ ১. ১২৯. ১-১২ (বেঙ্কটেশ্বর প্রেস সং, পৃঃ ১১৫)।

"অথ লব্ধবরো সাম্বো রূপং প্রাপ্য পুরাতনম্
মন্যমানস্তদাশ্চর্যং প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥
পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব সার্ধমন্যৈস্তপস্বিভিঃ।
স্নাপনার্থং নাতিদূরং চন্দ্রভাগাং নদীং যযৌ
কৃতাশ্রমমণ্ডলাকারং শ্রদ্দধানো দিনে দিনে।
সম্নৌ সঞ্চিন্তয়ামাস কিং রূপং স্থাপয়াম্যহম্।
স স্নাতঃ সহসৈবাথ প্রণম্য তু প্রভাবতীম্।
উহ্যমানাং জলৌঘেন প্রতিমাং সম্মুখীং রবেঃ
তাং দৃষ্ট্বা তস্য বীরস্য সমুৎপন্নমিদং তথা।
দেবেন যত্তদাজপ্তং তদিদং নাত্র সংশয়ঃ ॥
স তামুত্থায় সলিলাদানীয় (চ) মহীপতে।
তস্মিন্মিত্রবনোদ্দেশে স্থাপয়ামাস তাং তদা ॥
নিধায় প্রতিমাঁল্লোকে সাম্বস্তস্য মহাত্মনঃ।
মিত্রং মিত্রবনে রম্যে স্থাপয়িত্বা বিধানতঃ ॥
ততস্তামেব পপ্রচ্ছ প্রণম্য প্রতিমাং রবেঃ।
কেনেয়ং নির্মিতা নাথ ভবতো হ্যাকৃতিঃ শুভা
প্রতিমা তামুবাচাথ শৃণু সাম্ব ব্রুবে স্বয়ম্।
নির্মিতা যেন চাপ্যেষা মদীয়া পুরুষাকৃতিঃ ॥
মমাতিতেজসাবিষ্টং রূপমাসীৎ পুরাতনম্।
অসহ্যং সর্বভূতানাং ততোঽস্ম্যভ্যর্চিতঃ সুরৈঃ ॥
সহ্যং ভবতু মে রূপং সর্বপ্রাণভৃতামিতি।
ততো ময়া সমাদিষ্টো বিশ্বকর্মা মহাতপাঃ।
তেজসাং শাতনং কুর্বন্ রূপং নির্বর্তয়স্ব মে ॥
ততস্তু মৎসমাদেশাত্তেনৈব নিপুণং তদা।
শাকদ্বীপে ভ্রমিং কৃত্বা রূপং নির্বর্তিতং মম ॥"

পৌরাণিক ঐতিহ্য অনুযায়ী কৃষ্ণপুত্র সাম্ব-কর্তৃক চন্দ্রভাগানদীতীরে মিত্রবনে স্থাপিত সূর্য-মন্দির এবং সূর্যমূর্তি ভারতবর্ষের *আদি সূর্যমন্দির ও প্রথম সূর্যমূর্তি*। ভবিষ্যপুরাণের উদ্ধৃত অংশে স্পষ্টই বলা হয়েছে, ভারতের আদি সৌর তীর্থ মিত্রবনে সাম্বপ্রতিষ্ঠিত প্রথম সূর্যমূর্তি শাকদ্বীপে বিশ্বকর্মা কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। পণ্ডিতেরা মনে করেন, এই শাকদ্বীপ বর্তমান পারস্যের অন্তর্গত সিস্তান অঞ্চলের প্রাচীন ভারতীয় নাম। ভবিষ্যপুরাণের প্রথম বা ব্রাহ্ম পর্বে এবং মহাভারতে ও অন্যান্য পুরাণে যে মগ বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাঁরা প্রাচীন কালে এই অঞ্চল থেকেই ভারতবর্ষে এসেছিলেন ব'লে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। এঁরা প্রধানতঃ সৌর পুরোহিতরূপে ভারতীয় ব্রাহ্মণসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। ভবিষ্যপুরাণের প্রথম পর্বে যে ভাবে বার বার এই মগ বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে, তাতে মনে হয়, উক্ত গ্রন্থের ঐ অংশ রচনায় ঐ বিশেষ ব্রাহ্মণ সমাজের যথেষ্ট হাত ছিল। সুতরাং, সাম্বকর্তৃক মিত্রবনে প্রতিষ্ঠিত আদি সূর্যমূর্তি শাকদ্বীপে নির্মিত হয়েছিল, ভবিষ্যপুরাণের এই উক্তির জন্য শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণই দায়ী, এমন কথা মনে করবারও যথেষ্ট হেতু আছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, আরও কয়েকটি পুরাণে বিশ্বকর্মা কর্তৃক সূর্যের ঔজ্জ্বল্য প্রশমনের স্থানরূপে শাকদ্বীপকেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যদিও শাকদ্বীপেই সূর্যের প্রথম মূর্তি গঠন করা হয়েছিল, এমন স্পষ্ট উক্তি সে সকল গ্রন্থে নেই।[৩]

ভারতবর্ষে এ যাবৎ আবিষ্কৃত প্রাচীন সূর্যমূর্তিসমূহকে মনোযোগপূর্বক নিরীক্ষণ করলে

৩। সাম্বপুরাণ, ১১. ৪১ (বেঙ্কটেশ্বর প্রেস সং, পৃঃ ১৪) ; মার্কণ্ডেয় পুরাণ ১০৩।৪১-৪২ (নিরপেক্ষ-ধর্মসভা সং, পৃঃ ১৫৯) ; স্কন্দপুরাণ ৭. ১. ১১, ৪২-৪৩ ; ৭. ১. ১৩, ৫-৬ (বঙ্গবাসী-সং, সপ্তম ভাগ, পৃঃ ৪৫৮৮, ৪৫৯৪)।

স্পষ্টই দেখা যায়, যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতে সূর্যমূর্তি গঠনের দুটি স্বতন্ত্র শৈলী শিল্পিগণ কর্তৃক অনুসৃত হত। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক বা খৃষ্টীয় প্রথম শতক থেকে মগ বা শাকদ্বীপী সূর্যোপাসক পুরোহিতসম্প্রদায় পারস্য থেকে এসে ব্যাপক ভাবে উত্তরভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে আরম্ভ করেন। ক্রমশঃ সূর্যের পূজারী ব্রাহ্মণ হিসাবে এঁরা উত্তরভারতীয় সমাজের সর্বত্র স্বীকৃত হন, এবং উত্তরভারতীয় সূর্যপূজা ও সৌরধর্মের ক্ষেত্রে এঁদের গভীর প্রভাব বিস্তারিত হয়। তার ফলে উত্তরভারতে নির্মিত সূর্যমূর্তিতে কয়েকটি পারসীক বৈশিষ্ট্য স্বভাবতঃই স্থান পেয়েছিল। ঐ বিদেশী লক্ষণগুলির মধ্যে তিনটি স্থায়ী ভাবে উত্তরভারতীয় সূর্যমূর্তির বিশেষত্বে পরিণত হয়, যথা—(১) সূর্যমূর্তির বক্ষঃস্থল কবচাবৃত করা; (২) সূর্যমূর্তির জানু পর্যন্ত পাদুকা (বা top-boot) দ্বারা আচ্ছাদিত করা; এবং (৩) সূর্যমূর্তির কটিদেশ অভ্যঙ্গ (পারসীক "আইওয়ান্‌হন্‌") নামক মূলতঃ পারসীক জরথুষ্ট্রীয় ধর্মানুষ্ঠানে ব্যবহৃত কোমরবন্ধে পরিবেষ্টিত করা। খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতক থেকে স্থরু করে মধ্যযুগের আরম্ভ পর্যন্ত এই জাতীয় বুটজুতা-পরিহিত, কবচমণ্ডিত ও অভ্যঙ্গ-বেষ্টিত সূর্যমূর্তির উত্তরভারতে খুবই বেশী প্রচলন ছিল। সূর্যমূর্তির এই জাতীয় সজ্জাকে প্রাচীন ভারতের শিল্পশাস্ত্রীরা নাম দিয়েছেন 'উদীচ্যবেশ' বা উত্তরাঞ্চলের পোষাক। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় সূর্যমূর্তির এই 'উদীচ্যবেশে'র সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে।[৪] দক্ষিণভারতে সম্ভবতঃ মগ বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের প্রভাব খুব বেশী ব্যাপ্ত হয় নি ব'লেই, প্রাচীন দক্ষিণভারতীয় সূর্যমূর্তিতে এই সকল বিদেশী লক্ষণ দেখা যায় না। এ ছাড়াও অবশ্য উত্তরভারতীয় এবং দক্ষিণভারতীয় সূর্যমূর্তির সংস্থান, বিন্যাস ইত্যাদিতে আরও প্রভেদ আছে, কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে সেগুলি আমাদের আলোচনা না করলেও চলবে। স্থতরাং দেখা গেল, সাধারণভাবে উত্তরভারতের প্রাচীন সূর্যমূর্তিসমূহ পারসীক লক্ষণ-যুক্ত এবং দক্ষিণভারতের মূর্তিগুলি এই বিদেশী প্রভাব-মুক্ত। যে সকল প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে মূর্তিশিল্পের তথ্য ও তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে, সে গ্রন্থসমূহের লেখকবৃন্দও এই ভেদ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই দেখা যায়, উত্তরভারতে রচিত শাস্ত্রাদিতে—যেমন বৃহৎসংহিতা, বিশ্বকর্মাবতার শাস্ত্র, বিষ্ণুধর্মোত্তর, মৎস্যপুরাণ, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতে সূর্যমূর্তির বর্ণনপ্রসঙ্গে কোথাও স্পষ্টতঃ, কোথাও বা প্রচ্ছন্নভাবে উপরিউক্ত বিদেশী লক্ষণগুলি উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু দক্ষিণভারতে রচিত অংশুমদ্ভেদাগম, স্থপ্রভেদাগম, শিল্পরত্ন প্রভৃতি গ্রন্থে একই প্রসঙ্গে বিদেশী লক্ষণগুলির কোনও উল্লেখ নেই।[৫]

এত ক্ষণ যে আলোচনা করা হয়েছে, তা থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ভারতবর্ষের আদি সূর্যমূর্তি হয় ত সত্যই বিদেশে বিদেশী কর্তৃক পরিকল্পিত ও নির্মিত। এই মতের সপক্ষে প্রথম প্রবল যুক্তি, ভবিষ্যপুরাণের উদ্ধৃত অংশের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য এবং অন্যান্য কয়েকটি পুরাণ কর্তৃক তার প্রচ্ছন্ন সমর্থন। দ্বিতীয়তঃ, উত্তরভারতে আবিষ্কৃত প্রাচীন সূর্যমূর্তি-

৪। বৃহৎসংহিতা, ৫৮. ৪৬ (কার্ন সম্পাদিত সং, পৃঃ ৩২০)।

৫। J. N. Bannerjea—Development of Hindu Iconography, p. 34.

সমূহের গঠনশৈলী পরীক্ষা ক'রেও দেখা গেছে, সেখানে বিদেশী পারসীক লক্ষণ অতি সুপরিস্ফুট। দক্ষিণভারতে অবশ্য সূর্যমূর্তি গঠনের একটি পারসীক প্রভাবহীন খাঁটি ভারতীয় পদ্ধতি বিকাশলাভ করেছিল বটে, কিন্তু দুটির মধ্যে তুলনায় দেখা যায়, সূর্যমূর্তিগঠনের উত্তরভারতীয় শৈলী প্রাচীনতর। খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের এই পদ্ধতিতে নির্মিত কিছু কিছু সূর্যমূর্তি উত্তরভারতের গান্ধার ও মথুরা অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে। দক্ষিণী খাঁটি ভারতীয় শৈলীর প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি এত প্রাচীনত্বের দাবী করতে পারে না। সুতরাং শাকদ্বীপী বা মগ পুরোহিতসম্প্রদায় প্রথম ভারতবর্ষের বাইরে শাকদ্বীপে সূর্যমূর্তি পরিকল্পনা ও গঠন ক'রে, ভারতবর্ষে (অন্ততঃ উত্তরভারতে) তার প্রচলন করেন,—এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপাতদৃষ্টিতে কোনও জোরালো যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। বৈদিক যুগে সূর্যপূজার যথেষ্ট প্রচলন থাকলেও সূর্যের (সম্ভবতঃ কোনও দেবতারই) মূর্তিগঠনের রেওয়াজ ছিল না।[৬] তাই উক্ত মতের অনুবর্তিগণ বলবেন, পৌরাণিক সাহিত্যের, শিল্পশাস্ত্রের এবং আবিষ্কৃত শিল্পদৃষ্টান্তের সাক্ষ্য মিলিয়ে দেখলে এ কথা মানতেই হবে, মগ ব্রাহ্মণগণই এদেশে সূর্যমূর্তির প্রবর্তক। হয় ত পরবর্তী কালে তাঁদের অনুসরণ ক'রেই ভারতীয়গণও সূর্যমূর্তি গঠন করতে আরম্ভ করেন এবং তার ফলে সূর্যমূর্তি নির্মাণের অবিমিশ্র ভারতীয় পদ্ধতির দক্ষিণভারতে উদ্ভব হয়।

এই মতবাদের সত্যাসত্য বিচার করতে হ'লে প্রথমেই অনুসন্ধান ক'রে দেখা প্রয়োজন, ভারতে সূর্যবিগ্রহ গঠনের পূর্বকথিত পারসীক প্রভাবযুক্ত রীতি অপেক্ষা প্রাচীনতর কোনও পদ্ধতির অস্তিত্ব ছিল কি না। এদেশে এ যাবৎ আবিষ্কৃত সূর্যমূর্তিগুলির মধ্যে বিশেষভাবে চারিটি মূর্তির বিচার এই প্রসঙ্গে করা যেতে পারে, যথা : (১) বুদ্ধগয়ার একটি প্রস্তরবেষ্টনীর (railing) গাত্রে ক্ষোদিত সূর্যমূর্তি (বিহারপ্রদেশ, কাল—আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক) ; (২) ভাজা বৌদ্ধগুহায় উৎকীর্ণ সূর্যমূর্তি (পুণা জেলা, বোম্বাই প্রদেশ, কাল—আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় কিংবা প্রথম শতক) ; (৩) ভুবনেশ্বরের অদূরবর্তী খণ্ডগিরির জৈন অনন্ত-গুম্ফার সূর্যমূর্তি (উড়িষ্যা প্রদেশ, কাল—আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক); এবং (৪) কানপুরের অন্তর্গত লালাভগতে প্রাপ্ত ধ্বজগাত্রে উৎকীর্ণ সূর্যমূর্তি (সংযুক্ত প্রদেশ, কাল—আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক)।[৭] বুদ্ধগয়ার মূর্তিটি এক চতুরশ্বযোজিত একচক্র রথে আরূঢ় ; তাঁর উভয় পার্শ্বে শরসন্ধাননিরতা দুই নারীমূর্তি (উষা ও প্রত্যুষা) ; তাঁরা অন্ধকারদৈত্যগণকে বিদূরিত করছেন। উক্ত দৈত্যগণের দুটি আবক্ষ প্রতিমূর্তি দুই দিকে বিদ্যমান। সূর্যদেবের পশ্চাদ্‌ভাগে তাঁর দেহনিঃসৃত দ্যুতি ও মস্তকোপরি ছত্র শোভমান।

৬। Ramaprasad Chanda—The Beginnings of Art in Eastern India (Memoirs of the Archaeological Survey of India,' pp. 1-3.

৭। অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত "Surya-adityas and the Navagrahas" শীর্ষক সূর্যমূর্তিতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধে এই মূর্তিচতুষ্টয় উত্তমরূপে আলোচিত হয়েছে ; দ্রষ্টব্য, *Journal of the Indian Society of Oriental Art*, Vol. xvi (1948) pp. 53-57.

ভাজা ভাস্কর্যেও অনুরূপ ভাবে সানুচর সূর্যকে দেখানো হয়েছে। সূর্য চতুরশ্ববাহিত রথারূঢ়; দুটি নারীমূর্তি যথাক্রমে ছত্রধারণ ও চামরবীজনে রত; কয়েক জন অনুচর ও অনুচরী অশ্বারোহণে ভগবান্ ভানুর অনুগমন করছেন; এবং রথচক্রতলে কতিপয় দানব ভাসমান, সম্ভবতঃ সূর্যোদয়ের ফলে অন্ধকারদৈত্যগণের অপসারণ বা বিনাশের চিত্র ফুটিয়ে তোলাই ভাস্করের উদ্দেশ্য। খণ্ডগিরির অনন্তগুম্ফায় অবস্থিত সূর্যমূর্তিও অনুরূপ পদ্ধতিতে গঠিত। কেন্দ্রীয় দেবমূর্তি চতুরশ্বযুক্ত রথে অবস্থিত; উভয় পার্শ্বে যথাক্রমে ছত্র ও চামরধারিণী নারীমূর্তি; সূর্যের দক্ষিণ হস্তে পদ্ম, বাম হস্তে অশ্ববল্গা; সূর্যমূর্তির দক্ষিণ দিকে একটি উড্ডীয়মান দৈত্য (সম্ভবতঃ অন্ধকার-দানব); এই ভাস্কর্যের বাম অংশের খানিকটা ভাঙা, সম্ভবতঃ সেখানেও আর একটি দৈত্যের মূর্তি বসানো ছিল। লালাভগতের সূর্যমূর্তিতেও পূর্বোক্ত তিনটির বৈশিষ্ট্যগুলি সবই বর্তমান। এখানেও সূর্যদেব একচক্র এবং চতুরশ্বযোজিত রথে সমারূঢ়; দুই অনুচরী ছত্র ও চামর ধারণ করছে; অশ্বপদতলে নিষ্পেষিত একটি মস্তক দেখা যায় (সম্ভবতঃ সূর্যশত্রু কোনও দৈত্যের মস্তক); নিম্নদেশে তিনটি নারীমূর্তি (সম্ভবতঃ সূর্যের তিন অনুচরী); এবং তাদের পদতলে তের জন নগ্নকায় কুৎসিতদর্শন দৈত্য (অন্ধকার-দানব)। ভারতীয় সৌর ভাস্কর্যের ইতিহাসে এই চারিটি মূর্তির স্থান নানা কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলির কোনটিই স্বতন্ত্র শিল্পকার্যনয়, বৃহত্তর স্থাপত্যের অঙ্গ হিসাবেই সব কয়টি নির্মিত হয়েছিল। ভাজা ও বুদ্ধগয়ার স্থাপত্য মূলতঃ বৌদ্ধ, অনন্তগুম্ফার স্থাপত্য জৈন এবং লালাভগতের উল্লিখিত স্তম্ভ সম্ভবতঃ কার্তিকেয়ের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও মূর্তিচতুষ্টয়ের নির্মাণশৈলীর মধ্যে আশ্চর্য ঐক্য লক্ষ্য করা যায়, উপরের বর্ণনা থেকেই তা প্রতীয়মান হবে। এগুলি যে একটি বিশিষ্ট গঠনরীতির নিদর্শন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আরও লক্ষ্য করবার বিষয়, মূর্তিগুলির প্রাপ্তিস্থান। ভারতের উত্তর (লালাভগত, বুদ্ধগয়া), পূর্ব (অনন্তগুম্ফা, উড়িষ্যা) এবং পশ্চিম (ভাজা, বোম্বাই প্রদেশ) অঞ্চল থেকে এগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে। সুতরাং এই গঠনপদ্ধতির ভিত্তি যে সর্বভারতীয় ছিল, এ অনুমান সহজেই করা যেতে পারে। বৌদ্ধ এবং জৈন স্থাপত্য এবং কার্তিকেয়ের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ধ্বজের সঙ্গে মূর্তিগুলির সংস্রব থেকে বোঝা যায়, তৎকালীন সম্ভবতঃ সকল সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে সূর্যমূর্তি নির্মাণের এই রীতি প্রচলিত ছিল। এই প্রসঙ্গে বক্তব্য, এই ভাস্কর্যচতুষ্টয় অকৃত্রিম ভারতীয়; এগুলির মধ্যে কবচ, পাদুকা, অব্যঙ্গ প্রভৃতি পূর্বোক্ত কোনও বিদেশী পারসীক লক্ষণ নেই। কালক্রমের দিক্ থেকেও দেখা যায়, এই মূর্তিগুলি উত্তরভারতের পারসীক লক্ষণযুক্ত সূর্যমূর্তির আবির্ভাবকালের পূর্বেই উৎকীর্ণ হয়েছিল। ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলে মগ বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের প্রভাবে উদীচ্যবেশধারী সূর্যমূর্তি গঠিত হ'তে আরম্ভ করে খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতক থেকে। অপর পক্ষে আমাদের আলোচিত চারটি সূর্যমূর্তির মধ্যে ভাজা, বুদ্ধগয়া এবং অনন্তগুম্ফার মূর্তিত্রয়ের কাল খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের পরে নয়। ভাজাগুহার মূর্তিটিকে সম্ভবতঃ আরও কিছু কাল পূর্বের (খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের) ব'লে অনুমান করলেও অন্যায় হয় না। সুতরাং এগুলির

মধ্যে যে গঠনপদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তা স্পষ্টতঃ মগ বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক এদেশে আনীত সূর্যমূর্তি নির্মাণের পারসীক লক্ষণযুক্ত ধারা অপেক্ষা প্রাচীনতর।

উপরের আলোচনার ফলে দেখা গেল, ভবিষ্যপুরাণে স্পষ্ট ভাষায় সূর্যমূর্তির পরিকল্পনা ও উৎপত্তি সম্পর্কে যে দাবী করা হয়েছে এবং অন্যান্য পুরাণে তার যে পরোক্ষ সমর্থন পাওয়া যায়, তা সর্বাংশে সত্য নয়। ভারতবর্ষে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের প্রভাব বিস্তারের পূর্ব হ'তেই সূর্যমূর্তি পরিকল্পিত ও গঠিত হ'তে আরম্ভ হয়েছিল। এই ধারা অবিমিশ্র ভারতীয়, কোনও প্রকার বিদেশী প্রভাব এতে লক্ষ্য করা যায় না। প্রাপ্ত নিদর্শনের ভিত্তিতে এই গঠনরীতির অস্তিত্ব সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এর অল্পকাল পরেই পারস্য থেকে মগ বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ সূর্যপূজার পারসীক ঐতিহ্য সঙ্গে ক'রে ভারতবর্ষে উপনীত হলেন এবং সূর্যপুরোহিত হিসাবে এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হলেন। উত্তরভারতীয় সূর্যোপাসনা এঁদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হ'ল এবং উত্তরভারতীয় সূমূর্তিশিল্পেও এঁরা কতকগুলি নূতন ধারা প্রবর্তন করলেন। তার ফলে পারসীক লক্ষণযুক্ত সূর্যমূর্তি উত্তরভারতে সর্বত্র সুপ্রচলিত হ'ল এবং উত্তর-ভারতের শিল্পশাস্ত্রেও সেই বৈদেশিক লক্ষণগুলি সূর্যের 'উদীচ্যবেশ'রূপে স্বীকৃতি পেল। কিন্তু সূর্যমূর্তির এই নব রূপ বহুলপ্রচলিত হওয়ার ফলে, তার প্রাচীনতর অকৃত্রিম ভারতীয় নির্মাণ-পদ্ধতির কি পরিণাম হয়েছিল? নব পদ্ধতির সঙ্গে সংঘাতের ফলে উত্তরভারতে অস্তিত্ব বজায় রাখা তার পক্ষে সম্ভবপর হ'ল না। কিন্তু দক্ষিণভারতে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ যে কারণেই হোক, যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়ে উঠতে পারেন নি। সুতরাং উত্তরভারতে পরাজয় স্বীকার করলেও সে রীতি দক্ষিণভারতে আশ্রয় পেয়েছিল। সেখান থেকে তাকে স্থানচ্যুত করা নব বৈদেশিক পদ্ধতির পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। পরবর্তী কালে তাই দক্ষিণভারতে সূর্যমূর্তির অকৃত্রিম, অবিমিশ্র ভারতীয় রূপের এমন আশ্চর্য বিকাশ ও পরিণতি সম্ভবপর হয়েছিল এবং দক্ষিণী শিল্পশাস্ত্রেও সূর্যের উদীচ্য বেশকে অস্বীকার ক'রে বিশুদ্ধ ভারতীয় রূপের বর্ণনাই স্থান পেয়েছিল। অপর পক্ষে উত্তরভারতীয় সূর্যপূজার ক্ষেত্রে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, তাঁদের প্রবর্তিত নব পদ্ধতিতে নির্মিত মূর্তিই উত্তরভারতের সর্বত্র সুপরিচিত হয়ে উঠেছিল। সুতরাং আদি সূর্যমূর্তি গঠন এবং সাম্বকর্তৃক ভারতের আদি সূর্যমন্দিরে তার প্রতিষ্ঠার কাহিনীটিও সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভাবিত ও প্রচলিত হ'ল এই উপাখ্যানের মধ্যে কিছু সত্য আছে; কেন না, শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ উত্তরভারতীয় সূর্যমূর্তিতে কিছু পারসীক লক্ষণ যুক্ত ক'রে তার রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু এ থেকে যদি আমরা সিদ্ধান্ত করি যে, তাঁরাই ভারতে সূর্যমূর্তির প্রথম প্রবর্তক, তা হ'লে ভুল হবে। প্রত্নতত্ত্বের সাক্ষ্যের সাহায্যে এ ক্ষেত্রে পৌরাণিক সাক্ষ্যকে সংশোধন ক'রে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

বৈদিক দেবতা ও অসুর

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

২। ইন্দ্র ও তৎকর্তৃক বৃত্রহনন

যে অসুরশক্তির অধীন হইয়া জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়, এই ত্রিবিধ অনাত্ম বা আসুরিক দর্শনে জীবাত্মা বাধ্য হইতেছে, তাহার নাম বৃত্র অসুর, পূর্ব্বে ইহা দেখা গিয়াছে। কিন্তু যে আত্মার নাম ইন্দ্র, তিনি জীবাত্মার ন্যায় বৃত্রাধীন হইয়া অনাত্ম-দর্শনশীল নহেন। তিনি পরম আত্মা ও বৃত্রহন্তা। তাঁহার যে ত্রিবিধ প্রকাশ, সেই প্রকাশত্রয়ের নাম তেজ, জল ও অন্ননামক ত্রিবৃৎ এবং সেই ত্রিবৃতে তিনি নিজেকে ছাড়া পর বলিয়া কিছু দর্শন করেন না। তেজ, অপ্ ও অন্ন, এই ত্রিবৃতের অর্থ কি? তেজ ও অপ্ শব্দের অর্থ পরে বলিতেছি। অন্ন শব্দের অর্থ—ভোগ্য বা ইদং আকারীয় দৃশ্য-প্রকাশ; এইটি ইন্দ্র আত্মা হইতে প্রকাশ পায়। এবং সেই দৃশ্যপ্রকাশকে তিনি 'নিজে' বলিয়া দর্শন করেন। 'ইদং' আকারীয় দৃশ্যকে 'নিজে' বলিয়া দেখেন, এই জন্য বেদ তাঁহার নাম দিয়াছেন 'ইদংদ্র' বা ইন্দ্র। এ বিষয়ে ঐতরেয় উপনিষদের উক্তি এই,—

> স এতমেব সীমানং বিদার্য্য এতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত।
> সৈষা বিদৃতির্নাম দ্বাঃ, তদেতৎ নান্দনম্।

সেই আত্মা এই সীমা (কেশবিভাগস্থানে বর্ত্তমান ব্রহ্মরন্ধ্র) বিদারিত করিয়া, এই দ্বারপথে [শরীরে] প্রবেশ করিলেন। সেই জন্য এই দ্বারের নাম বিদৃতি এবং এই বিদৃতির নাম নান্দন অর্থাৎ আনন্দ।

> স জাতো ভূতানি অভিবৈক্ষৎ, কিমিহ অন্যং বাবদিষদিতি।
> স এতমেব পুরুষং ব্রহ্ম ততমম্ অপশ্যৎ, ইদম্ অদর্শম্ ইতি।

তিনি [শরীরে] জাত অর্থাৎ প্রবেশ করিয়া ভূতসকলকে দেখিলেন। [কেন দেখিলেন ?] এখানে উহারা [আমাকে ছাড়া] অন্য কাহারও কথা বলিতেছে কি না, তাহা দেখিবার জন্য। [তাহাতে তিনি] এই পুরুষকেই (অর্থাৎ নিজেকেই) ততমম অর্থাৎ সর্ব্ব আকারে ব্যাপ্ত ব্রহ্মরূপে দেখিলেন [এবং বলিলেন] এই [আমি ইদং আকারে নিজেকে] দর্শন করিলাম।

> তস্মাৎ ইদন্দ্রো নাম, ইদন্দ্রো হ বৈ নাম, তম্ ইদন্দ্রং সন্তম্ ইন্দ্র ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ।

সেই জন্য [তাঁহার] নাম ইদন্দ্র, [ইদং আকারে নিজেকে দেখেন, এই জন্য তাঁহার] ইদন্দ্রই নাম। [দেহে] বর্ত্তমান সেই ইদন্দ্রকে [ব্রহ্মবিদ্‌গণ] পরোক্ষভাবে 'ইন্দ্র' বলেন।

দেখা গেল যে, ভৌতিক দেহে প্রবেশ করিয়া সমগ্র ভৌতিক দেহকে এবং ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারও ভূতপদবাচ্য বলিয়া, সেই সকলকে যে আত্মা 'নিজে' বলিয়া দর্শন করেন, তাঁহার

নাম ইন্দ্র। সুতরাং ইদংপদবাচ্য এই যে দেহাদি ও অহঙ্কারান্ত ভৌতিক প্রকাশ, ইহার নাম—ইন্দ্র আত্মার অন্নরূপে আত্মপ্রকাশ। এই ভাবে তিনি নিজেই নিজের ভোগ্য অন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। অধ্যাত্মের ন্যায় বিরাট্ জগতেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

অপ্ শব্দের অর্থ প্রাণ। নিজেকে নিজে হইতে বিশিষ্ট ভাবে পৃথক্ করিয়া ভোগ করিতে গেলে অর্থাৎ বহু রূপ ধারণ করিতে গেলে, যে রস ফুটিয়া ওঠে, তাহার নাম অপ্ বা প্রাণ। নিজেকে নিজে নানা আকারে ভোগ করিতেছি, আত্মার এই রূপটি বড়ই মধুময় রূপ। অধ্যাত্মে এইরূপ একটি মধুময় ভোগায়তন প্রকাশ করিয়া ইন্দ্র আত্মা যে ভোগময় হইয়া রহিয়াছেন, তাহার নাম অপ্ বা প্রাণ। দেহের আপাদমস্তকে বিস্তৃত থাকিয়া, এই প্রাণ সর্ব্ববিধ দৈহিক ও মানসিক পোষণ এবং পরিচালন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন বলিয়া আমরা জীবিত ও দর্শন-শ্রবণাদি কর্ম্মময় হইয়া রহিয়াছি। আর আমাদের যাবতীয় ভোগ প্রাণেই সম্পন্ন হইতেছে। এইরূপে বিরাট্ জগতেও ইন্দ্র অপ্ বা প্রাণময় হইয়া রহিয়াছেন।

সৃষ্টির অগ্রে আত্মা সংস্বরূপ ছিলেন। সংস্বরূপ অর্থে তিনি ছিলেন মাত্র; কিন্তু নিজেতে কোনপ্রকার বৈশিষ্ট্য দর্শন করিতেছিলেন না। দর্শনশাস্ত্র আত্মার এই স্বরূপকে অনির্ব্বচনীয় নামেও অভিহিত করিয়াছেন। পরে বৈশিষ্ট্য দর্শনে ইচ্ছুক হইয়া প্রথমে তিনি তেজোময় হইলেন বা তেজ সৃষ্টি করিলেন। সুতরাং এই তেজের অর্থ হইল—আত্মার প্রথম বৈশিষ্ট্য প্রকাশ এবং এই বৈশিষ্ট্যের অন্য নাম 'নিজেকে নিজে জানা' আকারীয় মহিমাপ্রকাশ। সংস্বরূপ আত্মার যে 'নিজেকে নিজে বিশিষ্ট ভাবে জানা,' ইহার নাম আদি তেজ এবং এই তেজই জ্ঞ বা জ্ঞাতা আত্মা নামে পরিচিত। এই তেজ বিগলিত হইয়া অপ্ এবং অপ্ ঘনীভূত হইয়া অন্ন বা দৃশ্যে পরিণত হইয়াছে।

সুতরাং ব্যষ্টি দেহে বা সমষ্টি জগতে যিনি ইন্দ্র আত্মা, তিনি নিজেই জ্ঞাতা, নিজেই জ্ঞান এবং নিজেই জ্ঞেয় হইয়া বিরাজমান রহিয়াছেন। নিজেই সব; অগ্নি বায়ু, চন্দ্র সূর্য্য, বরুণ যম ইত্যাদি নানা মূর্ত্তিতে নিজে নিজেকে বহু করিয়া দেখিতেছি; নিজে ছাড়া অন্য কেহ নাই, অন্য কিছু নাই; যাহা কামনা করিতেছি, তদাকারে নিজেকে ছাড়া অন্য কিছু বা অন্য কাহাকেও পাইতেছি না, এইরূপ যে বোধভূমি, ইহার নাম স্বর্গলোক এবং ঐ ভূমি বা লোকে যে আত্মা ঐ ভাবে বিচরণ করেন, তাঁহার নাম স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র।

কাজেই প্রতি দেহে দুই আত্মা বিরাজমান; এক আত্মা স্বর্গাধিপতি দেবরাজ ইন্দ্র, অন্য আত্মা বৃত্রপরাভূত, স্বর্গচ্যুত, সুতরাং ইন্দ্রলিঙ্গধারী বা ইন্দ্রিয়ময় হইয়া মরলোকে ভ্রমণশীল। ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্র আত্মার লিঙ্গস্বরূপ, তাই উহাদের নাম ইন্দ্রিয়। ঋগ্‌বেদের অপর এক স্থলে এই উভয় আত্মাকে সুপর্ণরূপে বর্ণনা করিয়া বলা হইয়াছে।—

> দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
> সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
> তয়োরেকঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি
> অনশ্নন্ অন্যঃ অভিচাকশীতি ॥

দুইটি সুপর্ণ; তাহারা উভয়ে সখ্যভাবাপন্ন[১] এবং পরস্পর সংযুক্ত হইয়া একই [শরীররূপ] বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। তন্মধ্যে এক পক্ষী শরীরবৃক্ষের [সুখ-দুঃখ] স্বাদযুক্ত ফলসকল ভোগ করে, অন্য পক্ষী ভোগ না করিয়া [নিজ মহিমায়] প্রকাশশীল।

ইন্দ্র আত্মা ত্রিবৃতে বা আপন মহিমায় আপনি প্রকাশশীল, আর ইন্দ্রলিঙ্গধারী বা ইন্দ্রিয়ময় জীবাত্মা বৃত্রকর্তৃক পরাভূত হইয়া স্বর্গচ্যুত ও মর জগতে ভ্রমণশীল। ইন্দ্রিয়ময় আত্মার বৃত্রপরাভূতি ঘটিল কেন? জীবাত্মার অন্য এক নাম প্রত্যগাত্মা। প্রতীপম্ অঞ্চাত—তাঁহার গতি ইন্দ্রাভিমুখী বা পরমাত্মাভিমুখী নহে, পরমাত্মাকে ছাড়িয়া, প্রতীপ—বিপরীত বা বহির্মুখে তাঁহার গতি হইয়াছে, এই জন্য তাঁহার ঐ নাম এবং তিনি যে স্বর্গচ্যুত হইয়া বৃত্রের অধীন হইয়াছেন, ঐ প্রতীপ গতিই তাহার কারণ। কেন না, অন্তরে যাহার নাম আত্মমহিমা বা দেবতা, বাহিরে তাহারই স্থূল প্রকাশের নাম অসুর। তাই প্রত্যগাত্মা বহিরিন্দ্রিয়ময় হইয়া ত্রিবৃতের বিপরীত বা স্থূল প্রকাশ বৃত্রের অধীন হইয়াছেন।

এখন তিনি স্বারাজ্য বা স্বর্গ ফিরিয়া পাইবেন কি করিয়া? বৃত্রকে সংহার করিতে না পারিলে তিনি স্বর্গে ফিরিয়া যাইতে পারিবেন না। বৃত্রকে হনন করার উপায়? বেদে ঋষিগণ তাহা বলিয়া গিয়াছেন—

…ইন্দ্রেণ যুজা তরুষেম বৃত্রম্।

অন্তরস্থ ইন্দ্র আত্মার সহিত যুক্ত হইয়া আমরা বৃত্রকে হনন করিব। ইন্দ্র আত্মা বজ্রধর; তাহার সহিত সাযুজ্য লাভ করিয়া, সেই বজ্রের প্রহারে বৃত্রবধ সম্ভবপর হইবে। এই জন্য বেদে এত ইন্দ্রস্তুতি, সোমযজ্ঞে ইন্দ্রের এত আবাহন, ইন্দ্রের এত মহিমা খ্যাপন। আমরা আজকাল বৃত্রাধিকারে অসুখী নহি; কাজেই স্বারাজ্য বা স্বর্গকে কল্পনার বস্তু আখ্যা দিয়া, ইন্দ্রকে সুদূর অতীতের গবেষণাযোগ্য দেবতারূপে স্থাপনপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত আছি।

ব্রজ ও বজ্র

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, যুগের পর যুগ, কল্পের পর কল্প ব্যাপিয়া বৃত্রের অধিকার 'ব্রজতি'—প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে; তথাপি ইহার শেষ দেখা যাইতেছে না। প্রবহমাণ শক্তি, অনবরত বহিয়া চলিয়াছে; কিন্তু তাহাকে দেখা যাইতেছে স্থির ভূমিরূপে। এই জন্য বৃত্রশক্তির নামান্তর ব্রজভূমি। অন্তরস্থ ইন্দ্র আত্মার সহিত সাযুজ্য লাভ করিলে ব্রজভূমির বিপরীত বজ্রভূমির সন্ধান মিলিবে। কেন না, ইন্দ্র আত্মা বজ্রধর; তাই তাঁহার সহিত যুক্ত হইলেই ঐ ভূমি বোধে সুপ্রকাশ হইয়া পড়ে। বজ্রভূমির কথা কঠ উপনিষদ্ এইরূপ বলিতেছেন,—

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥

১। সমান খ—একই রকম আকাশ, এই অর্থে ইন্দ্র আত্মা ও জীবাত্মা, উভয়েই সখ্যভাবাপন্ন। কেন না, স্বরূপতঃ উভয়েই চিদাকাশস্বরূপ।

ইদংপদবাচ্য যাহা কিছু জগদাকারে প্রকাশ পাইতেছে, সে সকল [ইন্দ্র আত্মা হইতে] নিঃসৃত হইয়া [তাঁহার] প্রাণই গতিশীল হইতেছে। [যাহারা ইহা জানে না], এই প্রাণ [বৃত্ররূপে] তাহাদের পক্ষে মহৎ ভয় উৎপাদন করে। আর যাহারা ইহাকে [ইন্দ্র আত্মার প্রাণশক্তি বা] উদ্যত বজ্ররূপে জানে, তাহারা অমৃতত্ব লাভ করে।

দধ্যঙ্, দধিক্রাবা, দধীচি

ইন্দ্র আত্মার যে প্রাণ জগদাকারে গতিশীল, বেদে তাঁহার নাম দধ্যঙ্, দধিক্রাবা ও দধীচি। দধি অঞ্চতি—জীবকুলকে ধারণ করিয়া লোক হইতে লোকান্তরে গমনাগমন করেন, দধ্যঞ্চ্ ও দধীচি শব্দের ইহাই অর্থ। ইনি আথর্ব্বণ অর্থাৎ অথর্ব্বার পুত্র। সর্ব্বপ্রকার 'অথ' অর্থাৎ সংশয় যাঁহার অর্ব্বাক্‌গত বা বিলুপ্ত হইয়াছে, এক কথায় যিনি পূর্ণ আত্মায় প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার নাম অথর্ব্বা। উভয়েই ঋষি বা গমনশীল। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি, চিত্ত অহঙ্কার, হৃদয় ইত্যাদি সর্ব্বস্ব লইয়া একবার মর্ত্তে ছুটিয়া আসা, আবার ঐ সর্ব্বস্ব লইয়া স্বর্গে ছুটিয়া চলিয়া যাওয়া, ইহাই দধ্যঙ্ আথর্ব্বণের স্বভাব। ঐ যে একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হইল, ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য—আথর্ব্বণ দধ্যঙ্ সর্ব্বস্ব লইয়া মর্ত্তে ছুটিয়া আসিলেন। আবার ঐ যে একজন মনুষ্য মরিয়া গেল, উহার প্রকৃত অর্থ হইল—আথর্ব্বণ দধ্যঙ্ সর্ব্বস্ব লইয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু যিনি জিষ্ণু বা জয়শীল আত্মাকে লাভ করিয়াছেন, ইনি তাঁহার ইচ্ছানুসারে গমনাগমন করেন; তখন দধ্যঙ্ আথর্ব্বণের নাম হয়—দধিক্রাবা অশ্ব; কেন না, বাজ বা অন্নসম্পন্ন দধিক্রাবা অশ্বে আরোহণ করিয়া জিষ্ণু আত্মা বিহার করেন। 'দধিক্রাব্ণোরকারিষং জিষ্ণোঃ অশ্বস্য বাজিনঃ' মন্ত্রাংশে ইহা পরিব্যক্ত হইয়াছে এবং 'বাজে বাজে বত বাজিনো নঃ' ইত্যাদি আরও বহু মন্ত্রে এই কথা অবগত হওয়া যায়।

ইন্দ্রো দধীচো অস্থভিঃ বৃত্রাণ্যপ্রতিষ্কুতঃ। জঘান নবতীর্নব।

এবম্ভূত দধীচির অস্থিসমূহ দ্বারা ইন্দ্র বৃত্রগণকে ৯৯ বার অর্থাৎ বহু বার বধ করিয়াছিলেন। দধ্যঙ্, দধিক্রাবা, দধীচি, ইহার অর্থ দেখা গিয়াছে—ইন্দ্র আত্মার জগৎরূপ গতিশীল প্রাণ। 'গতিশীল প্রাণের অস্থি' এবং তাহার দ্বারা বৃত্রের হনন, এখন এই কথার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করিতেছি। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—

তেজঃ অশিতং ত্রেধা বিধীয়তে, তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুঃ
তদস্থি ভবতি, যো মধ্যমঃ স মজ্জা, যঃ অণিষ্ঠঃ সা বাক্।

তেজ অশিত বা ভুক্ত হইয়া ত্রিধা বিভক্ত হয়। তাহার যে স্থূল ধাতু, সে অস্থি হয়, মধ্যম ধাতু মজ্জা হয়, আর সূক্ষ্ম ধাতু বাকে পরিণত হইয়া থাকে।

যাহা ধারণ করে, তাহাকে ধাতু বলা হয়। অস্থি ও মজ্জা স্থূল শরীরকে ধারণ করে; এই জন্য উহার নাম শারীর ধাতু। সেইরূপ প্রাণেরও ধাতু বা অস্থি আছে। ইন্দ্র আত্মার 'নিজেকে নিজে জানা আকারীয়' যে জ্ঞানময় তেজ, তাহার অশন, ভোগ বা অনুভব দ্বারা

গতিশীল প্রাণ বা দধীচির অস্থি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ক্ষেপণার্থক অস্ ধাতুর পরে কৃথিন্ প্রত্যয় যুক্ত হইয়া 'অস্থি' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; উহার অর্থ ক্ষেপণসামর্থ্য বা অনীপ্সিত বস্তুকে দূরে নিক্ষেপ করার ক্ষমতা। দধীচি তখন তেজোময় জ্ঞানরূপ অস্থি প্রাপ্ত হইয়া বীর্য্যবান্, বজ্রময় ও ক্ষেপণক্ষমতা বা বৃত্রহননযোগ্যতা লাভ করেন। এই জন্য বলা হইয়াছে যে, দধীচির অস্থিসমূহ দ্বারা ইন্দ্র বৃত্রগণকে বধ করিয়াছিলেন। আর যে প্রাণ ইন্দ্র আত্মার তেজ অনুভব করিতে পারে না, ঐ তেজের স্থূল ধাতু হইতে তাহার জ্ঞানময় অস্থিও নির্ম্মিত হয় না। সুতরাং অস্থির অভাবে সে প্রাণ বজ্রময় হয় না এবং বৃত্রকেও হনন করিতে পারে না। বৃত্রাধিকারে থাকিয়াই সে গতাগতিময় হইতে থাকে। এই জন্য ঋষি বলিয়াছেন—'ইন্দ্র আত্মার সাযুজ্য লাভ করিয়া আমরা বৃত্রকে হনন করিব।'

বিষয়টি দুরূহ। তাই আরও একটু সুগম করার চেষ্টা করিতেছি। 'অহং ব্রহ্মাস্মি, সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম'—এই দুইটি বেদের মহাবাক্য। বেদবাক্য আপ্তবাক্য, কখনই মিথ্যা হইবার নহে। তাহাই যদি হয়, তবে আমরা নিজেকে ও জগৎকে ব্রহ্মরূপে অনুভব করিতে পারি না কেন? না পারার প্রধান কারণ বৃত্র। তাহাকে বিনাশ করিতে পারিলে আমাদের ব্রহ্মানুভূতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। ব্রহ্মানুভূতি কিরূপ? চিন্ময় আত্মা ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। তিনিই যথার্থ দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্যরূপে প্রকাশ পাইয়া বহু হইয়াছেন এবং বহু হইয়াও একই রহিয়াছেন। প্রতি জীবাত্মা এই ব্রহ্মানুভূতির অধিকারী। কিন্তু বর্তমানে আমাদের অনুভূতি কি? দৃশ্য হইল জড় পদার্থ ও পর, দর্শন একপ্রকার জড়শক্তি, আর চিন্ময় ভূমা আত্মার পরিবর্তে দ্রষ্টা হইলাম জীব 'আমি'। বৃত্রবধের উপায় কি? বৃত্রহন্তা ইন্দ্র বা পরমাত্মা সকলের হৃদয়ে আছেন। তাঁর এই থাকাটিতে যিনি দৃঢ় বিশ্বাসী, তাঁহার হৃদয়ে অথর্ব্বা অর্থাৎ সংশয়বিহীন আত্মবোধ উদিত হইয়া থাকে। তাহার ফলে হয় কি? যে প্রাণকে আগে সাধক মরণে মরণে হারাইতেন ও জন্মে জন্মে পাইতেন, অথর্ব্বার উদয়ে সে প্রাণ তখন অথর্ব্বার সন্ততি দধীচিরূপে আবির্ভূত হয়েন। অথর্ব্বা ও দধীচি, উভয়েই জ্ঞান ও প্রাণময় আত্মবোধ, তাই ঋষিপদবাচ্য। এবং তাঁহাদের উদয়ে সাধকও তখন ঋষিপদবাচ্য। প্রাণ দধীচি, আত্মা অথর্ব্বা, এইরূপ বোধোদয়ের ফলে বৃত্রজ্ঞান বা অনাত্মজ্ঞান বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং সাধক তখন ত্রিবৃদ্‌জ্ঞান বা ব্রহ্মানুভূতি লাভ করেন। ইহারই নাম—ইন্দ্রের সাযুজ্য লাভ করিয়া বৃত্রহনন।

বাংলা ভাষায় বিদ্যাসুন্দর কাব্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অধ্যাপক শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

৬। বিদ্যাসুন্দরের কেলি-কৌতুক

ক। গান্ধর্ব বিবাহ

বিচার প্রসঙ্গ সমাপ্ত হইলে তাহার পর নায়ক-নায়িকার মিলন ও কেলি-কৌতুক সকল কাব্যেরই আলোচ্য বিষয়। সকল কবিই প্রথমে গান্ধর্ব বিবাহের অবতারণা করিয়া, তাহার পর বিহারাদি কেলি-কৌতুক বর্ণনা করিয়াছেন। সংস্কৃত 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে গান্ধর্ব বিবাহের বর্ণনা নাই। যে কয়টি শ্লোক পাওয়া যায়, তাহা হইতে অনুমান করা যায় যে, বিদ্যা ও সুন্দরের মধ্যে দূর হইতে কিম্বা কোন নির্জন স্থানে আলাপ হইতেছিল। সুন্দর প্রেম নিবেদন করিলে বিদ্যা তাঁহাকে সখীর সহিত ছদ্মবেশে গোপন পথে তাঁহার গৃহে আসিতে উপদেশ দেন। বিদ্যার গৃহে সুন্দর উপস্থিত হইলে, বিদ্যা তাঁহাকে আপন শয্যায় বসাইয়া অগুরু, চন্দন, কুসুম, কর্পূর, পুগ ইত্যাদি অর্ঘ্য দিয়া সখীগণ সহ হাস্যালাপে কান্তকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। তাহার পর সুন্দরকে কামাতুর দেখিয়া সখীগণ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

'বিহ্লন কাব্যে' অবশ্য গান্ধর্ব বিবাহের উল্লেখ আছে।* প্রাচীনতম বাঙ্গালী কবি গোবিন্দদাসের কাব্যে এই বিবাহ প্রসঙ্গ অপেক্ষাকৃত বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

"যতেক সখীগণ হইল আনন্দিত মন।
দাঁড়াইয়া সুন্দররূপ করে নিরীক্ষণ॥
ধন্য যে পূজিল বিদ্যা হর পার্ব্বতী।
তার ফলে পাইল সুন্দর হেন পতি॥
করিল বরণসজ্জা স্বস্তিক কজ্জল।
শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গাদি বাদ্য সকল॥
মালিয়ানী দিয়াছে পুষ্প পারিজাত।
কতেক বন্ধান পুষ্প সুন্দরের সাত॥
চৌদিকে মঙ্গল গীতি গায় সখীগণ।
পুলকেতে আনন্দিত হইলা সর্ব্বজন॥
মধুর স্বর ছোট শুনি বা না শুনি।
নহে বা ব্রহ্মাণ্ড ভেদ সেই মঙ্গলধ্বনি॥
বিধি নিয়োজিত বেলা হইল শুভক্ষণ।
বিদ্যারে পরাইল রত্ন আভরণ॥
কুবেরের রম্ভা যেন দেবতা নন্দিনী।
সখিগণ আনি কৈল বরণের সাজনী॥
সখিগণ মেলিয়া ধরিল অন্তঃপট।
চিত্ররেখা অরুন্ধতীর ছিল নিকট॥
অন্তঃপট আচ্ছাদিয়া সপ্ত পাক ফিরি।
পতি প্রণতি তবে করিল সুন্দরী॥
হরষিত হইয়া কৌতুক নৃপবালা।
বিজয় মাহেন্দ্র ক্ষণে বরণ কৈল মালা॥
সখিগণ মেলিয়া করিল জয়ধ্বনি।
বিদ্যাসুন্দর হইল পুষ্পের ছায়নি॥

---

* "ইত্যুক্ত এব বিজনে স বিচার্য সর্বং। গান্ধর্বরাজবিধিনা জগৃহেঽথ পাণিম্।"—(বিহ্লনকাব্যম্। ২১)

শঙ্খ ঘণ্টা জয়ধ্বনি শাস্ত্রের বিধানে। হইল গন্ধর্ব-বিভা শাস্ত্র প্রমাণে॥"*

কৃষ্ণরাম বিদ্যাসুন্দরের বিচার ও বিবাহ একই প্রসঙ্গের অন্তর্গত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণরামও গোবিন্দদাসের ন্যায় সবিস্তারে বিবাহ বর্ণনা করিয়াছেন—

"হৃদয় কৌতুক বড় জানি শুভক্ষণ। হেরিয়া হরিল আঁখি বদন কমল।
গন্ধর্ব্ব বিবাহ কৈল রাজার নন্দন॥ মনে মনে বলে মোর জনম সফল॥
বরিষে কুসুম ফুল যত সখি মেলি। সুবর্ণ সহস্র কোটি কিছু নয় বটে।
বাজে শঙ্খ ঘণ্টা আর জয় হুলাহুলি॥ সাধার আদর দূর ইহার নিকটে॥
পূজিয়া পাবক আগে যুবক যুবতী। দুহে দুহা দরশনে তনু কম্পমান।
জোড় হাত প্রণিপাত করেন ভকতি॥ হইল অবশ লাগি মদনের বাণ॥
বদল করিল মালা দুহে দুহার গলে। অগ্নি প্রদক্ষিণ করি হইলা হরষিত।
দুহাকার মনে যেন স্বর্গ করতলে॥ করিলা ভোজন তবে যেমন উচিত॥
পতি প্রদক্ষিণ সতী কৈল সাত বার। সহচরী দিল করি শয়নের স্থান।
লাজ হেতু লঘুগতি নন্দিনী রাজার॥ সোণার সাপুড়া পূরি সিসা করা পান॥
ধরিয়া প্রিয়ার মুখ সুলোচনা সখি। সুবেশা হইয়া বিদ্যা সঙ্গে সখীগণ।
সুন্দরেরে দেখাইল পরম কৌতুকি॥ ভেটিতে চলিল কান্ত রূপ উপায়ন॥

রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দরের বিবাহ প্রসঙ্গের সহিত প্রচ্ছন্নবিহার বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। রামপ্রসাদের বিবাহ-প্রসঙ্গ কৃষ্ণরামেরই কতকটা অনুকরণ—

"পরাভব মানি সুখি বীরসিংহবালা। সুন্দরীরে সমর্পিলা সুন্দরের হাতে।
স্বয়ংবরা কান্তকণ্ঠে আরোপিল মালা॥ সুন্দর সিন্দুর দিলা সুন্দরীর মাথে॥
শুভক্ষণে অন্যান্য দর্শন কুতূহলি। এই তব দাসী গুণরাশি মিথ্যা নহে।
সহচরীগণ রঙ্গে দেয় হুলাহুলি॥ আড়ালে আসিয়া আলি আড়ি পাতি রহে॥
পতি প্রদক্ষিণ সতী করে সপ্ত বার। নানা উপহার করি করিয়া ভোজন।
সুধার সাগরে ভাসে তনু দোঁহাকার কর্পূর তাম্বূলে করে মুখের শোধন॥"

রামপ্রসাদ নূতনত্ব দেখাইতে গিয়া সুন্দরকে দিয়া বিদ্যাকে সিন্দূর দান করাইয়াছেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখেন নাই যে, অনূঢ়া রাজকন্যার সীমন্তে সিন্দূরচিহ্ন দেখিলে রাজবাড়ীতে কোন কথা গোপন রহিবে না।

ভারতচন্দ্র অতি সংক্ষেপে বিবাহব্যাপার সারিয়াছেন—

"শুভক্ষণে নিজ হার খুলি নৃপবালা।
হরগৌরী সাক্ষী করি দিলা বরমালা॥"

* গোবিন্দদাসের মুদ্রিত কাব্যটিতে অনেক দুর্বোধ্য অংশ আছে। সম্ভবতঃ পুঁথিটি ভ্রমপূর্ণ।

বলরাম বিদ্যাসুন্দরের বিবাহ ব্যাপারে সখীদিগের সাহায্য লইতে পারেন নাই; নায়ক নায়িকাকেই নিজেদের তাহা করিতে হইয়াছে।

"দুহার বদন দেখি দুই জন
মজিল মদন দলে।
হরিষে কুমারী লাজ পরিহরি
মাল্য দিল তার গলে॥
হরিষে কুমার নিজ কণ্ঠহার
বদল করিল রঙ্গে।
কুঙ্কুম চন্দন করিল লেপন
বিদ্যা সুন্দরের অঙ্গে॥
হেমঘট পাতি বিদ্যা রূপবতী
পূজা কৈল দিবাকর।
বলে বিদ্যা সতী শুন দিনপতি
সুন্দর আমার বর॥
দুহেঁ বলে বাণী শুন দিনমণি
আমার গন্ধর্ব্ব বেহা।
ধর্ম্মাধর্ম্ম যত তোমা অনুগত
দোষ গুণ প্রেমলেহা॥"

বলরাম অগ্নি সাক্ষী না করিয়া সূর্যপূজা করিয়া বিবাহ সারিয়াছেন। বিবাহ কোন কালে হিন্দুমতে দিবাভাগে হয় না। সুতরাং কি ভাবিয়া বলরাম সূর্যপূজার প্রস্তাবনা করিলেন বুঝিলাম না। কবি সম্ভবতঃ ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু করেন নাই, কিম্বা হয় ত অগ্নি সংগ্রহ করা সম্ভব নহে ভাবিয়া, রাত্রিতেই দিবাকরকে স্মরণ করিয়া বিবাহের সাক্ষী করিয়াছেন। তবে ঐ ভাবে অগ্নিকেও আবাহন ও স্মরণ করিয়া ঐ কার্য করিলেও ত পারিতেন।

মধুসূদন লিখিয়াছেন, বিচারে হারিয়া বিদ্যা সখীগণকে সুন্দরের অগোচরে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বিচারে তো তিনি হারিয়াছেন; এখন পিতার পণ রক্ষার জন্য ইহাকেই বিবাহ করা উচিত। কিন্তু এরূপ ভাবে বিবাহে পিতা মত না দিতে পারেন। সুতরাং কি করা কর্তব্য। সখীগণ একবাক্যে সকলেই বিবাহের পরামর্শই দিল। তখন বিদ্যা গিয়া সুন্দরকে প্রণাম করিলেন। নায়ক নায়িকা বিবাহের দিন বিচার করিয়া সেই দিনই শুভক্ষণ আছে বলিয়া জানিতে পারিলেন। সখীগণ বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিল।

"বৈদিক মানস আজি করিল সুন্দর।
গুপ্তরূপে বাদ্য বাজে অতি মনোহর॥
যত সখীগণ মেলি করএ ব্যজন।
পুরুষবিদ্বেষী বিদ্যা জানে সর্বজন॥
রবাবী রবাব ধরে পিনাকী পিনাক।
এত দিনে মানস পাইল পরিপাক॥
বীণা বেণী মধুর বাজায় কপিনাস।
সফল করএ শিশু বিদেশী প্রবাস॥
ভবানী ভাবিয়া মনে জ্বালিল আনল।
দেখিঞা কুসুমধনু নাচে মহাবল॥
মনোহর বেশ করে রমণীরমণ।
অঙ্গেতে লেপিল গন্ধ কুঙ্কুম চন্দন॥
ভাবিয়া কৌতুকমনে শঙ্করী শঙ্কর।
মিলন করএ দুহে নাগরী নাগর॥
কুমারেরে প্রদক্ষিণ করে সাত বার।
অনল প্রণাম করি করে নমস্কার॥
চরণে ঢালিয়া দধি বরে নৃপবালা।
শুভ ক্ষণে কুমারের গলে দিল মালা॥
তার গলে দিল সখী মাল্য নিরমল।
পুনরপি দুই জনে করিল বদল॥
অনল প্রণাম করি রমণীরমণে।
আজি হৈতে পতি পত্নী ভাব দুই জনে॥
ধন্য ধন্য করে তবে যত সখীগণ।
সমানে সমানে বিধি করিল মিলন॥

শুভ ক্ষণে দেখি দোঁহে দোঁহার বদন। কামেরে করিয়া স্তুতি রাজার নন্দন॥
বামদেব্য গান করে অতি কুতূহলে। ভোজন করিল সুখে সুবর্ণের থালে॥
সুবাসিত জলেতে করিল আচমন। কৌতুকে বসিয়া করে তাম্বুল ভক্ষণ॥"

দ্বিজ রাধাকান্ত বিদ্যাসুন্দরের বিচার প্রসঙ্গের পর কয়েকটী নূতন প্রসঙ্গ অবতারণা করিয়াছেন। এ বিষয়ে ভারতচন্দ্রের "সুন্দরের সন্ন্যাসী বেশে রাজদর্শন" প্রসঙ্গটী তাঁহার আদর্শ হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিদ্যাকে বিচারে হারাইয়া, সুন্দর বিদ্যাকে কি কর্তব্য জিজ্ঞাসা করিলে বিদ্যা বলিলেন, "আমি আর কি বলিব। তোমার যাহা ইচ্ছা কর, এখন তো বিবাহ করা উচিত এবং পিতাই কন্যাদান করেন।" সুন্দর তখন বলিলেন, "বেশ, তাহাই হইবে। আমি তোমাকে প্রকারে রাজার নিকট লইয়া যাইব।" তাহার পর কজ্জল সাহায্যে বিদ্যাসুন্দর অদৃশ্য হইয়া মালিনীর গৃহে গিয়া বেশ পরিবর্তন করিয়া সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর বেশে রাজসভায় গেলেন, মিথ্যা পরিচয় দিয়া সুন্দর রাজাকে দিয়া ছদ্মবেশিনী বিদ্যাকে 'কন্যা' সম্বোধন করাইয়া বাগ্‌দত্তা করাইয়া লইলেন এবং রাজাকে বলিলেন, "তোমার কন্যাকে আন, তাহার সহিত বিচার করিব"। রাজা প্রমাদ গণিলেন এবং বলিলেন, কন্যা সমস্ত মাস শিবের পূজা করে, একদিন মাত্র অবসর পায়। সন্ন্যাসী 'সেই দিন আসিয়া বিচার করিব' বলিয়া সন্ন্যাসিনী সহ বিদায় লইলেন। তাহার পর উভয়ে নিজ নিজ বেশে বিদ্যার ভবনে উপস্থিত হইলেন। ইহার পর বিবাহের আয়োজন হইল। বিবাহের বর্ণনা রাধাকান্ত বর্ণনা করেন নাই বলিলেই হয়। প্রথমে মদন ও বসন্তাদি ষড়্ ঋতুর অবির্ভাবের কথা বলিয়া বলিতেছেন—

"আগে আগে পাহাড় (?) চলিলা ঋতুরাজ।
স্বয়ম্বরা হয় সাক্ষি সভার সমাজ॥
পতি পত্নী ভাবে মাল্য করিয়া বদল।
দুহে দুহা পানে চাহি অতি কৌতুহল॥
প্রদক্ষিণ প্রণাম করিয়া যুববরে।
রসবতী পতি সহ প্রবেশে বাসরে॥"

এই বিবাহের প্রসঙ্গে গোবিন্দদাস, কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ সাত পাকের উপর ও মাল্য বদলের উপরই জোর দিয়াছেন, কৃষ্ণরাম কেবল অগ্নি প্রদক্ষিণ করার কথা ও মধুসূদন অগ্নিকে প্রণাম করার কথা লিখিয়াছেন। গান্ধর্ব বিবাহ প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিল, সুতরাং মধ্যযুগের কবিগণের সে সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না। বাৎস্যায়ন লিখিয়াছেন—

"প্রতিপন্নামভিপ্রেতাবকাশবর্তিনীং নায়কঃ শ্রোত্রিয়াগারাদগ্নিমানায্য কুশানাস্তীর্য যথাস্মৃতি হুত্বা চ ত্রিঃ পরিক্রমেৎ। ততো মাতরি পিতরি চ প্রকাশয়েৎ অগ্নিসাক্ষিকা হি বিবাহা ন নিবর্তন্ত ইত্যাচার্যসময়ঃ॥" (৩।৫।১১-১৩)

অর্থাৎ "নায়িকার মত হইলে নায়ক কোন একটি অভিপ্রেত স্থানে তাহাকে রাখিয়া, কোন শ্রোত্রিয়ের বাটী হইতে সংস্কৃত অগ্নি আনয়নপূর্বক কুশ আস্তৃত করিয়া স্বগৃহ্যোক্ত বিধানানুসারে হোমান্তে সেই নায়িকাকে লইয়া তিন বার প্রদক্ষিণ করিবে। তাহার পর

কন্যার মাতাকে ও পিতাকে জানাইবে। অগ্নিসাক্ষিক বিবাহ আর নির্বর্তিত হয় না, ইহাই আচার্যগণের সিদ্ধান্ত।"

সুতরাং অগ্নি প্রদক্ষিণ করা গান্ধর্ব বিবাহের একটা বিশেষ অঙ্গ। রামপ্রসাদ সুন্দরকে দিয়া বিদ্যাকে সিন্দুর দান করাইয়াছেন; কিন্তু গান্ধর্ব বিবাহের আসল অঙ্গটির কথার উল্লেখ করেন নাই। সিন্দূর দান গৌণ ব্যাপার মাত্র। ভারতচন্দ্র ও রাধাকান্ত গান্ধর্ব বিবাহকে গৌণ ব্যাপার মনে করিয়াছেন। তাই কেবল মালাবদলের উপর দিয়া তাহা সারিয়াছেন।

দ্বিজ রাধাকান্ত বিচারপ্রসঙ্গ ও তাহার মধ্যে বিদ্যাসুন্দরের রাজসভায় গমনের বর্ণনা করিয়া একটা অসম্ভব ব্যাপারের অবতারণা করিয়াছেন। ইহাতে কাব্যের মূল্য অনেকাংশে ক্ষুন্ন হইয়া গিয়াছে।

খ। বিদ্যার বাসরসজ্জা ও প্রসাধন

বিবাহের পরই গোবিন্দদাস নায়ক নায়িকার বিহার বর্ণনা করিয়াছেন। বাসরসজ্জা বা বিদ্যার প্রসাধন বর্ণনা করেন নাই। কৃষ্ণরামের সুন্দর সম্ভবতঃ গান্ধর্ব বিবাহের পর সখীগণকর্তৃক বিদ্যার শয়নকক্ষে পূর্বেই নীত হইয়াছিলেন এবং বিদ্যা 'সুবেশা হইয়া' সখীগণসঙ্গে 'কান্তকে ভেটিতে' যাইতেছেন, কবি তাহার বর্ণনা করিয়াছেন—

"ষট্‌পদ পাঁতি-ভীতি-ভুরু-রাজিত নয়ন বিখঞ্জন জোর।
সুরাসুরনিকর উগারই পুনঃ পুনঃ করণগুহাবধি ওর॥
সাজল রসবতী নারী।
নারদ ভরগ আদি মুনিবর সগর সগর মনোহারী॥
যামিনীরমণদমন মুখমণ্ডল করল হিলোলে।
নাসিগ মন্দ মন্দ ঘন আসগ মুকুতা মনোহর দোলে॥
পীন পয়োধর-ভর-তনু-মন্থর শোভিত গজমুতি হারা।
কণ্ঠকম্বুবহি কনয় শম্ভুপর জনু মন্দাকিনি ধারা॥
কোকিল বিকল মৌনি তিবিপায় (?) কিয়মিয় জড়ান ভাষা।
বিমল মধুমুখ মধুকর বেড়ল সারসর (সরোরুহ ?) করি আশা॥
কিঙ্কিণী মুখর নাদ করমুঞ্জির কুঞ্জর গতি বররামা।
চমকি থমকি তনু কম্পিত মনোরথ জরজর কিয়ে সুঠামা॥
কিষণরাম ভণ অভরণ-আকর রসগুণ সায়েরি সাজে।
রমণ উদার পার করি রাখবি বিরহ পয়োনিধি মাঝে॥"

বিদ্যার 'বাসরসজ্জা' বর্ণনা করিয়া কৃষ্ণরাম সংক্ষেপে বিদ্যার অভিসার বর্ণনা করিয়াছেন—

রূপে জিনি রতি লৈয়া বিদ্যাবতী
সহচরীগণ যায়।
যথায় সুন্দর ধীর কবিবর
ভেট দিল লইয়া তায়॥

বলে সুলোচনা　　সখি বিচক্ষণা
　　শুন বিদগধমণি।
পরম রূপসী　　এই তুয়া দাসী
　　পালন করিবে জানি॥
বাহিরে আসিয়া　　নিমিখ তেজিয়া
　　গবাক্ষে দিয়া মুখ।

না কহে ভারতী　　নিশবদে অতি
　　দেখয়ে পরম সুখ॥
রতন মশাল　　জ্বলিছে উজ্বলি
　　অন্ধকার পলাইল দূর।
দুহু তনু তেজে　　মন্দির বিরাজে
　　চির অভিলাষ পুর॥

রামপ্রসাদ বা ভারতচন্দ্র এই বাসরসজ্জা ও অভিসারবর্ণনা করেন নাই। কারণ, তাঁহাদের সুন্দর বিদ্যার শয়নগৃহেই উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং সেইখানেই উভয়ের মিলন হইয়াছিল।

দ্বিজ রাধাকান্তের বিদ্যা ও সুন্দরের গান্ধর্ব বিবাহের পর প্রথম রাত্রে মিলন সংঘটিত হয় নাই। সুলোচনা সুন্দরের কজ্জল অপহরণ করিয়া "রাণী আসিতেছেন" এই মিথ্যা ভয় দেখাইলে তিনি দেবীর কৃপায় সুড়ঙ্গ সৃষ্টি করিয়া সেই পথে মালিনীর গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এদিকে সত্য সত্যই রাণী বিদ্যার গৃহে আসিয়া সন্ন্যাসী যে তাহার সহিত বিচার করিতে চাহিতেছে, তাহা জানাইলেন। বিদ্যা ও মাতাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—

"নয়ন সপনঘোরে　　শঙ্কর কহিল মোরে
　　পাবে পূর্ব্বপতি যে তোমার।
নিশ্চয় জানিহ সেই　　মম অভিলাষ সেই
　　না ভাবিহ সবধি(?) আমার॥"

পরদিন রাত্রে সুন্দর সুড়ঙ্গপথে বিদ্যার গৃহে গমন করিলেন। সেই দিন উভয়ের মিলন হইল। সুন্দর আসিয়া পুষ্পের শয্যায় কপটনিদ্রায় রহিলে সখীগণ গিয়া বিদ্যাকে লইয়া আসিল। রাধাকান্তের বিদ্যার প্রসাধন ও অভিসার বর্ণনা নিতান্ত কবিত্বশূন্য ও গ্রাম্যতাদোষ-যুক্ত। তথাপি কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"এথা বিদ্যা বসিয়া বিরলে সখী সনে।
ভুবনমোহন রূপ সাজে আভরণে॥
সুলোচনা সহচরী কহিছে সভারে।
যে যে গুণ বিধি সখী দিয়াছেন যারে॥
সুধামুখী সাজায়া সার্থক কর সব।
কমলা কহেন কেন কহ অসম্ভব॥
কি কাজ ভূষণে যেবা সহজে মোহিনী
এ রূপ দেখিয়া কেবা ধরয়ে পরাণী॥
আর এক কথা মোর শুন সুলোচনা।
নয়নে কজ্জল দিতে আমি করি মানা॥
যদি প্রাণ তেজে শুধু বাণেতে কেবল।
নিরর্থক তাকে কেন মাখিবে গরল॥"

"কি করে সরমে মরমে মজিঞা।
চল কামিনি ততকাল(?) করিঞা
এমতি রূপসী সরসে হাসিয়া।
গতি মন্থর মত্ত গজ জিনিয়া॥
যম সমান দেখিল নব কুমারে।
ধরি কপাটখানি রহে দুয়ারে॥
ধরে সখীরা যদি দিল ধরিঞা।
ভয় সরমে গেল প্রাণ উড়িঞা॥
ভাবয়ে কি জানি করে কি বলে।
আমি কেমনে কিবা কব ইহারে॥
বরং মরণ কবুল করিল।
তবু বিছানাপর পদ না দিল॥
সখীরা কহিছে সহিতে না পারি।
উঠ না বিছানাপর নৃত্যকারী॥

*　　*　　*

ভুরু ভঙ্গিমা করি কোপে কামিনী।
পদ অঙ্গুলি সদা ঘষে অবনী॥
ভাবে এ কথা প্রাণনাথ শুনিলে।
তবে লাজ কিসের যাইবে ধুইলে॥
মুখ-প্রকৃতি কিবা মিছা কপটি।
নিরখে ভামিনী ঘোমটা উলটি॥
চারু নয়নে দেখি মৃদু হাসিয়া।
মুখ ঝাঁপিল বাসে জিহ্বা কাটিয়া॥
সুখ কি ধারা তাহে করব রচিঞা।
সভে জানহ মনে দেখ বুঝিয়া॥
ভাবে কিরূপে কথা কহে নাগরী।
নব নাগর বর করে চাতুরী॥
করে কমল ছিল নিল কাড়িয়া।
সভারে ভামিনী ঈষত হাসিয়া॥
যেন উনি তা মোর দেখিঞা ছিলেন।
তাহা আপন বলি কাড়িয়া নিলেন॥
পুলকে পুরি নরমণি বচনে।
সুধা সাগরে ভাসি ধরে বসনে॥"

মধুসূদন তাঁহার কাব্যে একটু নূতনত্ব করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। বিদ্যাসুন্দরের গান্ধর্ববিবাহের পর বিদ্যার বাসরসজ্জা ও মিলন বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু পরস্পর হাস্যপরিহাসেই রজনী প্রভাত হইয়া গেল বিহারাদি সেদিন কিছুই হইল না। তাহার পর সুন্দর তিনদিন বিদ্যার গৃহে আসিলেন না বিদ্যার অভিমান হইল, সুন্দর মান ভঙ্গ করিলে তাহার পর বিহারাদি ঘটিল। মধুসূদনের বাসরসজ্জা বর্ণনায় কোন বিশেষত্ব নাই। বলরাম বিদ্যাসুন্দরের গান্ধর্ববিবাহের পরই তাঁহাদের রতি বর্ণনা করিয়াছেন।

গ। বিদ্যাসুন্দরে শৃঙ্গারের উপক্রম

প্রকাশ্য বিহার বর্ণনার পূর্বে ভারতচন্দ্র ও তাঁহার অনুসরণে রামপ্রসাদ বিবাহস্থলে বিদ্যাসুন্দরের প্রচ্ছন্নবিহার বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনায় যথেষ্ট কবিত্ব আছে আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

ভারতচন্দ্র—

"বিবাহ নহিলে হয় কেমনে বিহার।
গান্ধর্ববিবাহ হৈল মনে আঁখিঠার॥
কন্যাকর্ত্তা হৈল কন্যা বরকর্ত্তা বর।
পুরোহিত ভট্টাচার্য্য হৈল পঞ্চশর॥
কন্যাযাত্র বরযাত্র ঋতু ছয় জন।
বাদ্যকরে বাদ্যকর কিঙ্কিনী কঙ্কণ॥
নৃত্য করে বেশরে নূপুরে গীতগায়।
আপনি আসিয়া রতি এয়ো হৈলা তায়॥
ধিক ধিক অধিক আছিল সখী তায়।
নিশ্বাস আতসবাজী উত্তাপে পলায়॥
নয়ন অধর কর জঘন চরণ।
ছুহার কুটুম্ব সুখে করিছে ভোজন॥
বুঝহ চতুর এই প্রচ্ছন্নবিহার।
ইতঃ পর কহি শুন প্রকাশ ইহার॥"

রামপ্রসাদ—

"মাস মধু ডাকে মধুকর বধূচয়।
কুলবধূ কামবধূ ইচ্ছা অতিশয়॥
সুশীতল সময় মলয় মন্দবহে।
স্মর সনে শরশর ভরকত সহে॥
উত্তম ঘটক সুন্দরের গাঁথা হার।
বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তা চিত্ত দোঁহাকার॥
পুরোহিত হইলেন আপনি মদন।
বিদ্যালাপ ছলে বুঝি পড়াল৷ বচন॥
উলু দিছে ঘন ঘন পিক সীমন্তিনী।
নয়নচকোরী সুখে নাচিছে নাচনী॥"

বিহার বর্ণনার প্রসঙ্গের মধ্যেই মধুসূদন চক্রবর্তী বিদ্যাসুন্দরের প্রচ্ছন্নবিহার বর্ণনা করিয়াছেন এইভাবে—

"অপরূপ কথা শুন রসিক সকল।
বিকচ কমল ভাই উপরে কমল ॥
চক্রবাক যুগলেতে যুগল কমল।
খঞ্জন যুগলে ভাই খঞ্জন যুগল ॥
তিলফুলে তিলফুল বড় অপরূপ।
এক রবি হৈল দুই বিশেষ স্বরূপ ॥
বান্ধুলীর ফুল শোভে বান্ধুলীরফুল।
সহাস দেখিএ কেন কুমুদ আকুল ॥
মেঘেতে মেঘের ঘটা অপরূপ বড়।
মদনে মাতিল বলে সভে হয়্যা দড় ॥"

ইহাতে কোন কল্পনা নাই, কবিত্ব নাই শব্দ ঝংকার নাই।

গোবিন্দদাস, কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ, মধুসূদন ও রাধাকান্ত কেহই শৃঙ্গারের পূর্বের উপযুক্ত অবস্থা ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। সকল কবিই বাসকাগারের সজ্জার বর্ণনা অল্প বিস্তর করিয়াছেন, তাহা সুন্দরের আগমন প্রতীক্ষায় বিদ্যার বাসকসজ্জা বর্ণনার অংশ হিসাবে পূর্বেই দেখাইয়াছি। গোবিন্দদাস বিদ্যার বাসকসজ্জা বর্ণনা করেন নাই কিন্তু প্রথম মিলনের পর প্রসঙ্গান্তরে বাসকগৃহের বর্ণনা করিয়াছেন—

"সুন্দর শোভিত   মন্দিরে উপনীত
    বিদ্যাবতী আছেন কৌতুকে।
দ্রব্য অভরণ   সংহতি সখিগণ
    নানারস আছে সম্মুখে ॥
ঘৃত মধু শর্করা   গঙ্গাজল মনোহরা
    কর্পূর বাসিত গুয়াপান।
দিব্য কনকঝারি   তাহে সুবাসিত বারি
    অনুক্ষণ কাম অঠান (?) ॥
দিব্য পালঙ্ক' পরি   তাহে নেউ মশারী
    দিব্য বালিশ মনোহর।
দিব্য বস্ত্র আচ্ছাদন   দিব্য শয্যা সুশোভন
    বৈসে তথা কুমার সুন্দর ॥"

ভারতচন্দ্র বিদ্যার বাসকসজ্জা বর্ণনা করেন নাই তবে প্রচ্ছন্ন বিহার বর্ণনা করার পর প্রকাশ্য বিহার বর্ণনার উপক্রমণিকায় বিদ্যার বাসকাগারে সখীগণ যে সম্ভোগের উপচারের আয়োজন করিয়াছিল তাহার বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন—

"পালঙ্কে বসিলা সুখে যুবক যুবতী।
শোভাদেখি পায় পড়ে রতি রতিপতি ॥
গোলাব আতর চুয়া কেশর কস্তূরী।
চন্দনাদি গন্ধ সখী রাখে বাটিপুরি ॥
মল্লিকা মালতী চাঁপা আদি পুষ্পমালা।
রাখে সহচরী পুরি কনকের থালা।
ক্ষীর চিনি মিছরি সন্দেশ নানা জাতি
নানা দ্রব্য রাখে নারিকেল রাজবাতি ॥
শীতল গঙ্গার জল কর্পূর বাসিত।
পাখা মৌরছল শ্বেত চামর ললিত ॥
মিঠা পান মিঠা গুয়া চুন পাথরিয়া।
রাখে ছুটা বিড়া বাঁধি খিলি সাজাইয়া ॥
রাখে লঙ্গ এলাচি জয়িত্রী জায়ফল।
উদ্দীপন আলম্বন সম্ভোগের বল ॥"

রামপ্রসাদের "বিদ্যার বাসর সজ্জা" বর্ণনার সহিত ইহার যথেষ্ট মিল আছে তবে রামপ্রসাদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন পূর্বে আর ভারতচন্দ্র করিয়াছেন পরে।

ইহার পর ভারতচন্দ্র যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে শৃঙ্গার রসের উদ্দীপনার যে অপূর্ব বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই—

'প্রথম বৈশাখ শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী।
সুগন্ধ মারুতমন্দ নিরমল শশী॥
কোকিল কোকিলা মুখে মুখ আরোপিয়া।
কুহু কুহু রব করে মদনে মাতিয়া॥
মুখে মুখে মধুকর মধুকর বধূ।
গুণগুণ গুঞ্জরে মাতিয়া পিয়া মধু॥
চন্দ্রের অমৃতপিয়া মাতিয়া চকোর।
চকোরী সহিত খেলে কামরসে ভোর॥
বিদ্যার ইঙ্গিত পেয়ে সহচরীগণ।
আরম্ভ করিল গীত যন্ত্রের বাজন॥

*   *   *

মোহিত সখীর গীতে হারাইয়া জ্ঞান।
বীণা বাজাইয়া রায় আরম্ভিলা গান॥
সুন্দরের গান শুনি সুন্দরী মোহিলা।
মিশায়ে বীণার স্বরে গাইতে লাগিলা॥
দুজনের গানেতে মোহিত দুইজন।
আলিঙ্গন প্রেমরসে মাতিল মদন॥
কাম মদে মাতাল দেখিয়া দুই জনে।
যন্ত্রতন্ত্র ফেলায়ে পলায় সখীগণে॥"

ইহাতে বুঝা যায় ভারতচন্দ্র কামশাস্ত্রের সহিত সুপরিচিত ছিলেন সেই জন্যই এইভাবে শৃঙ্গারের অবতারণা করিতে পারিয়াছিলেন।

ঘ। শৃঙ্গারোপক্রমে নায়িকার বিনয়

ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদ ও তাঁহাদের অনুকরণে মধুসূদন চক্রবর্তী ও দ্বিজ রাধাকান্ত শৃঙ্গারোপক্রমে বিদ্যার বিনয় বর্ণনা করিয়াছেন পূর্ববর্তী কবিদ্বয় গোবিন্দদাস ও কৃষ্ণরাম ইহার বিশেষ কোন বর্ণনা করেন নাই কৃষ্ণরাম বিহারান্তে বিদ্যার মুখ দিয়া যে কয়টি কথা বলাইয়াছেন তাহা বিহারারম্ভ প্রসঙ্গেই বর্ণনা করা উচিত ছিল—

"লাজ পলাইল কাজ দেখিয়া দুহার
কাতর হইয়া বালা করে পরিহার
বালিকা দেখিয়া খেম বিদগধ রায়
খিদার সময় কেবা দুই হাতে খায়॥
মালাকার যদ্যপি দরিদ্র হয় সেই।
না তুলে ফুলের কলি বিকসিত বই॥
পণ্ডিত হইয়া কর গোয়ারের কাজ।
সখি সমাজে কালি বড় পাবে (?) লাজ॥"

আমরা প্রথমে মধুসূদন ও রাধাকান্তের বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া পরে রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের বর্ণনা উদ্ধৃত করিব।

মধুসূদন লিখিতেছেন সুন্দর উদয়কালে চন্দ্রের রক্তিমাভা হইয়াছে এই মিথ্যাবাক্যে সখীগণকে তাহা দেখিবার জন্য গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলেন সখীগণ ব্যাপার বুঝিয়া অঙ্গনে উপস্থিত হইল। সেই সময়ে সুন্দর বিদ্যাকে কোলে লইলেন এবং রতি উপক্রম করিলে বিদ্যা বাধা দান করিতে লাগিলেন সুন্দর তখন বিনয় করিয়া রতি ভিক্ষা করিলেন—

"করপুটে মাগি দেহ সুধা রস দান।
করিয়া সুরতিদান রাখহ পরাণ॥
রমণে কাতর দেখি কুরঙ্গনয়নী।
চাহিয়া কবীন্দ্র বলে সকাতর বাণী॥
বিদ্যা—বলো করপুটে নাথ বলো করপুটে
যুবতীর হীনপ্রাণ তোমার নিকটে॥
ভালমন্দ জান তুমি পরমপণ্ডিত।
বুঝিয়া করহ এমন কেন বিপরীত॥

সুন্দর—শুন মোর বাণী ধনী শুন মোর বাণী
মদন মারিল বাণ দহে তনুখানি ॥
নিষ্ঠুর মদন মোরে করিল পীড়িত।
রতিরস দানে কামে কর পরাজিত ॥
বিদ্যা—কর অবধান নাথ কর অবধান।
নাটক নাটিকা কেন না লহ প্রমাণ ॥
বিকচ কমলে অলি পিএ মকরন্দ।
কলিকা দেখিয়া কেন বাড়িল আনন্দ ॥
সুন্দর—নবীন কামিনি শুন নবীন কামিনি।
ভজিবে কেমন নাম ধর কমলিনী ॥
শুনিয়া তোমার প্রিয়া বচন মাধুরী।
আমি কোন ছার মুনি আপনা পাসরি ॥
বিদ্যা—শুন প্রাণপ্রিয় নাথ শুন প্রাণপতি।
ঘন ঘন কাঁপে প্রাণ শুনিয়া ভারতী ॥
কেমনে থাকিব তুয়া রতিবন মাঝ।
হাম কমলিনী হই তুঁহি মত্ত গজ ॥
সুন্দর—শুনলো রমণিধনি শুনলো রমণি।
এই মতে নাম ধর কুঞ্জর গামিনী ॥
সহকার ফুল কেন বহে ভৃঙ্গ-ভার।
বচনে চাতুরী পিও কতকব আর ॥
বিদ্যা—বুঝি পরিণাম নাথ বুঝি পরিণাম।
সবি রসময় কালে করহ বিশ্রাম ॥
কলিকা আসিয়ারে (?) ভ্রমর নিত্য দেখে।
ভালমতে ফুটে ফুল মধু পিএ সুখে ॥
সুন্দব—না কর চাতুরী প্রিয়ে না কর চাতুরী।
করিলে পুরুষবধ হেন মনে করি ॥
এতবলি বসন ধরিল যুবরায়।
রহ রহ বলি রামা কিঞ্চিৎ পাছে যায় ॥”

ইহার পরও মধুসূদন ত্রিপদীতে কিছু বিদ্যার বিনয় বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে কিছু নতনত্ব নাই। দ্বিজ রাধাকান্তের বর্ণনা ও মধুসূদনের বর্ণনার মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে এবং উভয়ে পূর্ববর্ত্তী কবিদিগের নিকট ঋণী তাহা সহজেই বুঝা যায়।

রাধাকান্ত—

“কত মত যতন করিয়া যুবরায়।
ধরিতে বসন বালা মস্তক ফিরায় ॥
আলিঙ্গনারম্ভে শয্যা তেয়াগে কামিনী।
হাসিয়া বসিয়া করে ধরে স্তনখানি।
অধরে অধর দিতে অধিক চপল।
প্রবল পবনে যেন হেলয়ে কমল ॥
হৃদে হাত দিতে বামা করে বাহুবল।
কি করিব যুববর ভাবেন তখন (কেবল ?)
সভার সমীপে বুঝি লজ্জা বাসে মনে।
নাগর চাতুরী করি কহে সখীগণে ॥
দেখ দেখি সখীগণ হইয়া বাহির।
আচম্বিতে কেবা আসি নাশিল তিমির ॥
না পুরিল মনোরথ নব রস সুখ।
নিদারুণ দিনকর দিল বুঝি দুখ ॥
সখীরা ইঙ্গিত বুঝি চলিল হাসিয়া।
নিরখে গবাক্ষ পথে অদৃশ্য হইয়া ॥
হাসিয়া নাগর বর করে আলিঙ্গন।
নাহিক এড়ান বিদ্যা বুঝিলা তখন ॥
আধ আধ বচনে কহেন সুকুমারী।
কে ছাড়িবে নাথ (আমি) আছি ত তোমারি
ক্ষমা কর যুবতীর মিনতি রাখিয়া।
মিছা কেন কর তিতা নেবু কচালিয়া ॥
ভ্রমরের ভর বিনা নব কিশলয়
কহ দেখি কখন পঙ্কের ভর সয় ॥
তাহাতে প্রাণের নাথ তুমি গজবর।
আমি কমলিনী কি সহিব তব ভর ॥
যুববর বলে সত্য বলিলে সুন্দরী।
শশিকলা বিনা নাহি সাজয়ে শর্ব্বরী ॥

সরোজ বিহনে কি সাজয়ে সরোবর।
কিসের কমল যাহে নাহি মধুকর॥
কেমনে প্রত্যয় যাব তুমি সে নলিনী।
কি বুঝ্যা ধর্য্যাছ নাম মরালগামিনী॥
যে জনা অবলে ধরি করে শরাসন।
নিমিষে বিজয় করে এ তিন ভুবন॥
হেন মনোভবে তুমি কর পরাজয়।
বিজয় ছুন্দুভি ছুটি ধর্য্যাছ হৃদয়॥
বুঝিলাম তোমার কথা লব বহিয়া।
এতো কি ভুলায় কেহ বিদেশী দেখিয়া॥
বুঝিলাম চাতুরী ভুলিব নাহি আর।
মিথ্যা ছল ছাড়হ সময় নাহি তার॥
সাতপাঁচ ভাবি বিদ্যা বাক্য পরিহরি।
নিশ্বাস ছাড়িয়া মুখ রহে নম্র করি॥
সম্মত লক্ষণ তার পাইয়া আশয়।
প্রবেশে মদন বলে রাজার তনয়॥"

এই বর্ণনায় কিছুমাত্র কবিত্ব নাই কেবল যেন কথা সাজাইয়া যাওয়া হইয়াছে। এইবার আমরা রামপ্রসাদও ভারতচন্দ্রের লিখিত শৃঙ্গার উপক্রমে বিদ্যার বিনয় বর্ণনা করিব।

রামপ্রসাদ—

"রমণী-মণি নাগর রাজ কবি।
রতিনাথ বিনিন্দিত চারু ছবি॥
ধনি-মুখ চিবুক ধরে যতনে।
মুখ চুম্বতি সুন্দর হৃষ্টমনে॥
নাগরী রসিকা রসিকপ্রবীণা।
যুবতীসময়ে হৃদয়ে কঠিনা॥
কুচপদ্ম কলি করপদ্মে ধরে।
তনু লোমাঞ্চিত রসরঙ্গভরে॥
চমকি চমকি কহে কি করহে।
নখঘাতন যাতন খেদ কহে॥
যুবরাজ একায তোমার নহে।
নহি ধীর এবক্তু নহে পিব হে॥
দশনে জ্বলিছে সহেনা সহেনা।
পুনতো প্রাণতো রহেনা রহেনা॥
বঁধু জীবন জীবন দান কর।
গুণরাশি এ দাসীর বাক্য ধর॥
রসকাল নহে হও কাল কেন।
দেহ মর্ম্মপীড়া ছিছি কর্ম্ম হেন॥
লাজ না বাস কি হাস বুক ফাটে।
কি করে পিরিতে এ রীতি না আঁটে॥
ছাড় কান্ত নিতান্ত অশান্তপনা।
প্রাণবল্লভ দুর্ল্লভ সুল্লভনা॥
কহ যে সহজে নহ যে সে ধারা।
এই কায অকায কুকায করা॥
ধর হাত কি নাথ পুনঃ পুনঃ হে॥
হৃদয়েশ বিশেষ কথা শুন হে॥
একি সাধ কি সাধহ বাধ কহি।
ভাব যেরূপ সেরূপ কিন্তু নহি॥
প্রভু মত্তকরী আমি পঙ্কজিনী।
করি শৃঙ্গার যোগ্য বটে করিণী॥
একবার প্রকার রূপে তরিলে।
হবে না হবে না হবে না মরিলে॥
শুন আলি ত কালি কুগালি দিবে।
প্রভু চোর হবে কি তবে ছাড়িবে॥
মরিহে মরিহে ধরিহে চরণে।
রমণে এমনে জানিহে কেমনে॥
রসিক সুজন প্রভুহে চতুর।
মরি বাল জনে কেনহে নিঠুর॥
বলে মুহু মুহু মুখে উহু উহু।
যথা কোকিল কুজিত কুহু কুহু॥
নয়ন যুগলে সলিল গলিত।
কনক মুকুরে মুকুতা রচিত॥
মদন জ্বর না কর ছাটফটি।
কবিরাজ কহে কবিরাজ বটি॥

কুচমর্দ্দনালিঙ্গন চুম্বন লো।
শুন এই ত্রিদোষজ ভঞ্জন লো॥
যদি রোগ সুসম্যক সাম্য নহে।
রসনারস পানে কি রোগ রহে॥
শ্রমনীরে শরীর সমস্ত ভাসে।
করি ধীর সমীর সুধীর ভাষে॥
কবিরঞ্জন তোটক ছন্দ ভনে।
করুণাঙ্কুরু কালী সুদীনজনে॥"

ভারতচন্দ্র—

"নৃপনন্দন কামরসে রাসয়া।
পরিধান ধুতি পড়িছে খসিয়া॥
তরুণী ধরিয়া হৃদয়ে লইল।
নলিনী যেন মত্তকরী ধরিল॥
মুখ চুম্বই চাঁদ চকোর হ'য়ে।
ধনি বারই অঞ্চল ঝাঁপি লয়ে॥
কুচপদ্মকলি কবিরাজ করে।
ধরিতে তরুণী পুলকে শিহরে॥
নৃপনন্দন পিন্ধন বাস হরে।
তরুণী অমনি প্রিয় হাত ধরে॥
বিনয়ে করপদ্ম করে ধরিয়া।
কহিছে তরুণী করুণা করিয়া॥
ক্ষমহে পতিহে বঁধুহে প্রিয়হে।
নবযৌবন জোরের যোগ্য নহে॥
রতি কেমন এমন জানি কবে।
প্রভু আজি ক্ষমাকর কালি হবে॥
তুমি কামরণে রণপণ্ডিত হে।
করুণা কর না কর পীড়িত হে॥
রসলাভ হবে রহিয়া ফুটিলে।
বল কি হইবে কলিকা দলিলে॥
যদি না রহিতে তুমি পার বঁধু।
পর ফুল্লফুলে কর পান মধু॥
রস না হইবে করিলে রগড়া।
অলি নাহি করে মুকুলে ঝগড়া॥
নখ আঁচড় লাগিল দেখ কুচে।
জ্বলিছে রুধিরে দুখ নাহি ঘুচে॥
গুণসাগর নাগর আগর হে।
নট না কর না কর না কর হে॥
শুনি সুন্দর সুন্দরীরে কহিছে।
তনু মোর মনোজশরে দহিছে॥
তুহি পঙ্কজিনী মুহি ভাস্কর লো।
ভয় না কর না কর না কর লো॥
কুচশম্ভুশিরে নখচন্দ্রকলা।
বড় শোভিল ছাড়হ ঠাট ছলা॥
কুচহেমঘটে নখরক্তছটা।
বলিহারি সুরঙ্গ প্রবালঘটা॥
ভয় না টুটিবে ভয় না তুড়িলে।
রস ইক্ষু কি দেই দয়া করিলে॥
বলিয়া ছলিয়া সহলে সহলে।
রসিয়া পশিলা ভ্রমরা কমলে॥
রতিরঙ্গরণে মজিলা দুজনে।
দ্বিজ ভারত তোটক ছন্দ ভণে॥"

রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র উভয়েই তোটকে এই প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু তুলনা করিলে বুঝা যায় রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রকে অনুকরণ করিয়াছেন। রামপ্রসাদের কাব্যখানি কৃষ্ণরামের কাব্যকে বরাবর অনুসরণ করিয়া গিয়াছে যেখানে তিনি তাহা হইতে ব্যতিক্রম করিয়াছেন সেইখানেই ভারতচন্দ্রের প্রভাব সুপরিস্ফুট। এক্ষেত্রে ভারতের তোটক প্রায় নির্ভুল কিন্তু রামপ্রসাদ বহুস্থানে ছন্দ রাখিতে পারেন নাই কাব্যও কৃত্রিমতা দোষে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে তৎসত্ত্বেও পরবর্তী কবিগণের বর্ণনা এই দুই কবির বর্ণনার নিকট তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। বহু পরবর্তী কাব্যে আমরা ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ উভয়ের নিকট হইতে ঋণের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাই।

(ক্রমশঃ)

তান্ত্রিক ধর্ম্মের ইতিবৃত্ত

শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র তর্কতীর্থ

মুখবন্ধ

সনাতন হিন্দুধর্ম বেদ হইতে উদ্ভূত হইয়া নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এবং এই বৈদিক ধর্ম পৃথিবীর সমস্ত ধর্মাপেক্ষাই প্রাচীন বলিয়া অধিকাংশ প্রাচ্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্তও করিয়াছেন। কিন্তু বৈদিক ধর্ম্মের সহিত বহুলাংশে বিরোধী, অথচ শাখারূপে পরিগণিত তান্ত্রিক ধর্ম বা তান্ত্রিক সভ্যতা কবে কোথা হইতে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার এখনও সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয় নাই।

যে তান্ত্রিক সভ্যতা আর্য্য ও অনার্য্য সভ্যতার অনেকটা সমন্বয় সাধনে সমর্থা হইয়াছে, যে তান্ত্রিক উচ্চারণ ও তান্ত্রিক বর্ণমালা* বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বাঙ্গালী জাতিকে একতা-সূত্রে গ্রথিত করিয়াছে, যে তন্ত্রশাস্ত্র সমস্ত প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শাস্ত্র (বেদেও ততটুকু সম্পূর্ণতা আছে কি না সন্দেহের বিষয়), এতাদৃশ উপাদেয় তন্ত্রশাস্ত্রের মূল অনুসন্ধান করিতে আজ প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রাচীন ও নবীন মত

তান্ত্রিক উপাসকসম্প্রদায় তন্ত্রশাস্ত্র বা তন্ত্রধর্মকে অথর্ববেদমূলক বলিয়া বেদের সমান মর্য্যাদা দিয়া থাকেন। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে অনেকে, বৈদিক ধর্মবিরোধী ও আধুনিক সভ্যতাবিরোধী মদ্য মাংস মুদ্রা মৈথুনাদি পঞ্চ মকারের সাহায্যে তান্ত্রিক উপাসনাবিধি দর্শনে ইহাকে অনার্য্যাচরিত আধুনিক ধর্ম বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করেন। তাঁহারা বলেন, বেদে তন্ত্রের কোনও প্রসঙ্গ, এমন কি, নাম পর্য্যন্তও দেখা যায় না। সংহিতাদি কোন ধর্মগ্রন্থেও তন্ত্রের উল্লেখ নাই। প্রসিদ্ধ পুরাণগুলিতেও তান্ত্রিক দশ মহাবিদ্যা প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায় না। এবং পৌরাণিক যুগ পর্য্যন্তও তাহার অস্তিত্বের জলন্ত কোন প্রমাণ নাই। কাজেই বৌদ্ধযুগে সমস্ত ভারত বৌদ্ধধর্মাক্রান্ত হইয়াছে দেখিয়া, স্মৃতিশাস্ত্রের কঠোর বিধানানুসারে তাহাদিগকে হিন্দুধর্মে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব বিবেচনায় কতিপয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক অনার্য্যাচার ও আর্য্যাচারের সংমিশ্রণে ভোগোন্মুখী এই তান্ত্রিক উপাসনা প্রবর্তন দ্বারা কঠোর সন্ন্যাসপন্থী বৌদ্ধ-ধর্ম্ম হইতে লোকদিগকে আবার হিন্দুধর্মে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই জন্য স্কন্দ-পুরাণীয় সূতসংহিতার মুক্তিখণ্ডে বলিয়াছেন—

* বঙ্গীয় বর্ণমালা ও বঙ্গীয় উচ্চারণের তান্ত্রিকতা সম্বন্ধে দুইটি পৃথক্ প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য প্রস্তুত আছে।

"বেদাচারভ্রষ্টদিগের জন্য পাঞ্চরাত্র প্রভৃতির (বৈষ্ণব তন্ত্র ও শৈব তন্ত্রের) আচার কাল-বিশেষে উপকারী হইবে।"*

এবং চণ্ডীটীকায় নাগোজী ভট্ট ও সেতুবন্ধ টীকায় ভাস্কর রায় শাম্বপুরাণীয় বচন বলিয়াছেন—

"বেদাচারভ্রষ্ট, অথচ বৈদিক প্রায়শ্চিত্তাচরণে ভীত ব্যক্তিগণ ক্রমে ক্রমে বেদাচারে প্রবেশের জন্য তন্ত্রের আশ্রয় লইবে"।†

এই জন্য তন্ত্রই কেবল নিজের প্রশংসাবিস্তারে পঞ্চমুখ হইয়াছেন। বেদাদি গ্রন্থে তাহার কোন উল্লেখ নাই। অতএব এই তন্ত্রশাস্ত্র বৌদ্ধযুগে বিরচিত সন্দেহ নাই ইত্যাদি।

আমি এই প্রবন্ধে তান্ত্রিক ধর্মকে উপযুক্ত যুক্তি প্রমাণের দ্বারা বৈদিক যুগ পর্য্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রাগ্‌বৈদিক যুগে তদীয় ভিত্তি স্থাপনের চেষ্টা করিব।

তন্ত্রের স্বরূপনির্ণয়

তন্ত্রের প্রাচীনতা আলোচনা করিতে হইলে প্রথমতঃ তন্ত্র কাহাকে বলে এবং তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় কি, তাহা দেখিতে হইবে। যেহেতু, লক্ষণ ও লক্ষ্য দ্বারাই বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় হইয়া থাকে।

যদিও বেদের শাখাবিশেষ, শাস্ত্রসাধারণ, শিবোক্ত শাস্ত্র প্রভৃতি বহুবিধ অর্থেই তন্ত্র শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তথাপি বর্তমান প্রবন্ধে শুধু শিবোক্ত শাস্ত্ররূপে পরিচিত তন্ত্রকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। আগম, নিগম, পাশুপত তন্ত্র প্রভৃতি নামে এবং যামল, ডামর প্রভৃতি অবান্তর নামেও তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়া থাকে। এই শাস্ত্রগুলি স্বয়ং মহাদেবকৃত, কি ব্যক্তিবিশেষ-বিরচিত, তাহা এখানে বিচার্য্য নহে। আমরা দেখিব, ইহাদের মূল ভিত্তি কোথায় ও কোন্ কালে এবং ইহাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ই বা কি?

বারাহীতন্ত্রে আগমলক্ষণে উক্ত‡ হইয়াছে,—সৃষ্টি, প্রলয়, দেবপূজা, সাধনা, পুরশ্চরণ, ষট্‌কর্ম্ম (মারণ, উচ্চাটন, স্তম্ভন, বশীকরণ, বিদ্বেষ ও শান্তি) এবং চতুর্ব্বিধ ধ্যানযোগ (মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ ও রাজযোগ) আগমে বর্ণিত হইবে। এবং যামললক্ষণে বলিয়াছেন,—সৃষ্টি, জ্যোতিষ, আখ্যান, নিত্যকৃত্য, ক্রমসূত্র, বর্ণভেদ, জাতিভেদ ও যুগধর্ম্ম,

---

* অত্যন্তগলিতানান্ত প্রাণিনাং বেদমার্গতঃ।
পাঞ্চরাত্রাদয়ো মার্গাঃ কালেনৈবোপকারকাঃ।
—সূতসংহিতা, মুক্তিখণ্ড।

† শ্রুতিভ্রষ্টঃ শ্রুতিপ্রোক্ত-প্রায়শ্চিত্তে ভয়মাগতঃ। ক্রমেণ শ্রুতিসিদ্ধ্যর্থং মনুষ্যস্তন্ত্রমাশ্রয়েৎ।
—শাম্বপুরাণ।

‡ সৃষ্টিশ্চ প্রলয়শ্চৈব দেবতানাং যথার্চ্চনম্। সাধনঞ্চৈব সর্ব্বেষাং পুরশ্চরণমেব চ।
ষট্‌কর্ম্মসাধনঞ্চৈব ধ্যানযোগশ্চতুর্ব্বিধঃ। সপ্তভির্‌ লক্ষণৈর্যুক্তমাগমং তদ্বিদুর্বুধাঃ।

যামলে এই আট বিষয় বর্ণিত হইবে।* এবং তন্ত্রলক্ষণে বলিয়াছেন—সৃষ্টি, প্রতিসৃষ্টি, তন্ত্র-নির্ণয়, দেবতার আকৃতি, তীর্থবর্ণনা, আশ্রমধর্ম্ম, ব্রাহ্মণলক্ষণ, প্রাণিলক্ষণ, যন্ত্রনির্ণয়, দেবোৎপত্তি, কল্পবৃক্ষ, জ্যোতিষ, পুরাণাখ্যান, কোষ, ব্রতনির্ণয়, শৌচাশৌচ নির্ণয়, নরক-বর্ণনা, হরচক্র, স্ত্রীপুরুষলক্ষণ, রাজধর্ম্ম, দানধর্ম্ম, যুগধর্ম্ম, ব্যবহারবিধি ও অধ্যাত্মবর্ণনা প্রভৃতি তন্ত্রে বর্ণিত হইবে।†

অতএব যে সকল আগম-নিগম, তন্ত্রযামলাদিসংজ্ঞক শিবোক্ত শাস্ত্রে এই সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই তন্ত্রপদবাচ্য হইবে। পাঞ্চরাত্রনামক গ্রন্থগুলিও বৈষ্ণব তন্ত্র বটে।‡ এবং সাংখ্যশাস্ত্র ও যোগশাস্ত্রকেও আমি তান্ত্রিক শাস্ত্র বলিয়া পরে প্রমাণ উপস্থিত করিব। তদ্রূপ এই সকল শিবোক্ত শাস্ত্রানুসরণকারী সিদ্ধপুরুষোক্ত শাস্ত্রসমূহও উপতন্ত্ররূপে কথিত হইয়াছে।§ কাজেই উপতন্ত্র ও পঞ্চরাত্র প্রভৃতিকে তন্ত্রেরই অন্তর্ভুক্ত ধরিতে হইবে। তন্ত্র নামটিও সম্ভবতঃ পৌরাণিক যুগেই প্রদত্ত হইয়াছে। পুরাণগুলি যেমন বেদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ বলিয়া বৈদিক সম্মান লাভ করে, তন্ত্রশাস্ত্রও সেইরূপ বেদের (বিশেষ ভাবে অথর্ব্ববেদের) ব্যাখ্যানগ্রন্থ হিসাবে বৈদিক সম্মানের অধিকারী বটে। তবে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ঋষিগণের বিচারবুদ্ধি ও রুচির বৈচিত্র্য হেতু, পুরাণে অদ্বৈত-বাদের *প্রাধান্য, ত্যাগোন্মুখী উপাসনা ও পারলৌকিক সুখজনক* ধর্ম্মকর্ম্মাদির আড়ম্বর;

---

* সৃষ্টিশ্চ জ্যোতিষাখ্যানং নিত্যকৃত্যপ্রদীপনম্।
ক্রমসূত্রং বর্ণভেদো জাতিভেদস্তথৈব চ।
যুগধর্ম্মশ্চ সংখ্যাতো যামলস্যাষ্টলক্ষণম্।

† সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ তন্ত্রনির্ণয় এব চ। দেবতানাঞ্চ সংস্থানং তীর্থানাঞ্চৈব বর্ণনম্।
তথৈবাশ্রমধর্ম্মশ্চ বিপ্রসংস্থানমেব চ। সংস্থানঞ্চৈব ভূতানাং যন্ত্রাণাঞ্চৈব নির্ণয়ঃ।
উৎপত্তির্বিবুধানাঞ্চ তরূণাং কল্পসংজ্ঞিতম্। সংস্থানং জ্যোতিষাঞ্চৈব পুরাণাখ্যানমেব চ।
কোষস্য কথনঞ্চৈব ব্রতানাং পরিভাষণম্। শৌচাশৌচস্য চাখ্যানং নরকাণাঞ্চ বর্ণনম্।
হরচক্রস্য চাখ্যানং স্ত্রীপুংসোশ্চৈব লক্ষণম্। রাজধর্ম্মো দানধর্ম্মো যুগধর্ম্মস্তথৈব চ।
ব্যবহারঃ কথ্যতে চ তথা চাধ্যাত্মবর্ণনম্। ইত্যাদিলক্ষণৈর্যুক্তং তন্ত্রমিত্যভিধীয়তে।

‡ বিষ্ণ্বাদীনাং প্রতিষ্ঠাদি বক্ষ্যে ব্রহ্মণ্ শৃণুষ্ব মে। প্রোক্তানি পঞ্চরাত্রাণি সপ্তরাত্রাণি বৈ ময়া।
হয়শীর্ষং তন্ত্রমাদ্যং তন্ত্রং ত্রৈলোক্যমোহনম্।—অগ্নিপুরাণ, ৩৯ অঃ।

সূতসংহিতার মুক্তিখণ্ডে—

পাঞ্চরাত্রাদিতন্ত্রাণাং বেদমূলত্বমাস্তিকে। নহি স্বতন্ত্রাস্তে তেন ভ্রান্তিমূলা নিরূপণে।

ইত্যাদি স্থলে পঞ্চরাত্রকে পরিষ্কার তন্ত্রসংজ্ঞা দিয়াছেন।

§ সিদ্ধোক্তান্যুপতন্ত্রাণি কাপিলোক্তানি যানি চ।
... ...
এভিঃ প্রণীতান্যন্যানি উপতন্ত্রাণি যানি চ।
ন সংখ্যাতানি তান্যত্র ধর্ম্মবিদ্ভির্মহাত্মভিঃ।—বারাহীতন্ত্র।

আর তন্ত্রে দ্বৈতবাদের জয়ধ্বনি, ভোগোন্মুখী উপাসনা ও লৌকিক প্রতিপত্তিজনক ষট্‌-কর্মাদির বাহুল্যই এই দুইটি শাস্ত্রের পার্থক্য সম্পাদন করিয়াছে।

আমি এখন ক্রমশঃ প্রতিপক্ষ মত নিরস্ত করিয়া স্বমত স্থাপনে যত্নবান্ হইতেছি।

বৌদ্ধযুগে তন্ত্রের উৎপত্তিমত খণ্ডন

প্রথমতঃ বৌদ্ধযুগে তন্ত্রের উৎপত্তি সম্ভব কি না, আলোচনা করা যাউক। যদি বৌদ্ধধর্মকে নিরস্ত করার উদ্দেশ্যেই এই তন্ত্রশাস্ত্র রচিত হইত, তবে তন্ত্র ও বৌদ্ধ-শাস্ত্রে পরস্পর কঠোর নিন্দাবাদ ও উভয় ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে সংগ্রামাদির পরিচয় পাওয়া যাইত। যেমন বৈদিকদিগের সহিত বৌদ্ধগণের ভীষণ যুদ্ধের সংবাদ জানা যায়।* কিন্তু কোনও গ্রন্থে বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকদিগের পরস্পর বিরোধের কোন বিবরণ অবগত হওয়া যায় না। বরং মহাযানপন্থী বৌদ্ধগণ তন্ত্রের অনুকরণে বহু বৌদ্ধতন্ত্র রচনা করিয়া তন্ত্রের প্রসারেই সাহায্য করিয়াছিলেন। নূতন কোন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিতে হইলেই পুরাতন ধর্ম্মাবলম্বিগণের সহিত কঠোর সংগ্রামের সম্মুখীন হইতে হয়। বৈদিক যুগ হইতেই দেখা যায়, বৈদিক আর্য্যগণের পণি প্রভৃতি জাতীয় অনার্য্য-গণের সহিত সংগ্রাম হইয়াছিল। এবং খৃষ্ট-ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক যীশু ও ইসলাম-ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হজরত মহম্মদ, উভয়কেই তাৎকালিক বহু-ঈশ্বরবাদী পৌত্তলিকধর্ম্মাবলম্বিগণের সহিত ভীষণ সংগ্রামে সমগ্র জীবন অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত যীশুখৃষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তন্ত্রের বেলায় সেইরূপ সংগ্রাম দূরের কথা; ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ ও ইতিহাস প্রভৃতিতে অধিকাংশ স্থলে তাহার প্রশংসাবাদই শ্রুত হইয়া থাকে। যথাস্থানে তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

যদি বলেন—কুমারিল ভট্ট তন্ত্রবার্ত্তিকে তন্ত্রশাস্ত্রকে বেদবাহ্য প্রতিপাদন করায় এবং বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভারতে বেদ-বিরোধী কোনও ধর্ম্ম শ্রুতিগোচর না হওয়ায় বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের পরেই তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার মারণ উচ্চাটনাদি শক্তিদর্শনে দুর্ব্বলচিত্ত ভীত মানবগণ বিনা বিপ্লবেই ইহাকে গ্রহণ করায় কোন বিরোধের সংবাদ পাওয়া যায় না।

তাহা হইলে বলিতে হইবে, সমস্ত ধর্ম্মই তৎকালে তন্ত্রের কুক্ষিগত হইয়াছিল। বিরোধী যে-কোন ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকিলে নূতন মত তাড়াতাড়ি মাথা তুলিতে পারিত না। কিন্তু ইতিহাসে সেইরূপ ধর্ম্মবিলুপ্তির প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আর তান্ত্রিক ধর্ম্মের দ্বারা হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে বলিলে, ইহার দ্বারা বৈদিক ধর্ম্মেরই সংস্কার সাধিত হইয়াছে বুঝা যাইবে। তাহাতে

* তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথের গ্রন্থে দেখা যায়, বিষ্ণু রাজার সময়ে হালি রাজ্যের অন্তর্গত বালনগরে বেদ ও বৈদিক ধর্ম্ম উচ্ছেদ মানসে বৌদ্ধগণ এককালে ৫০০ ঋষিবংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন।

তান্ত্রিক ও বৈদিক, উভয় ধর্ম্মই অভিন্ন হইয়া যায়। বর্ত্তমানে যেরূপ বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবতার বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা পূজাদিকেই আমরা বৈদিক ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া থাকি। কিন্তু ইহাও বৈদিক ধর্ম্মের প্রাচীন রূপ নহে। বহু সংস্কারের পর এই আকার ধারণ করিয়াছে। কাজেই সংস্কার করা হইলে তান্ত্রিক ধর্ম্মকেও বৈদিক ধর্ম্মই বলিতে হয়। কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে তান্ত্রিক ধর্ম্ম একটি পৃথক্ সত্তা লইয়াই অবস্থান করিতেছে।

এত ক্ষণ পর্য্যন্ত যুক্তিবলেই বৌদ্ধযুগে তন্ত্রের উৎপত্তি মত খণ্ডন করা হইয়াছে; এখন গ্রন্থাদির সাহায্যেও তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

বৌদ্ধ-পূর্ব্ব তন্ত্র

বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে মুদ্রিত 'যশস্তিলকচম্পূ' নামক কাব্যের পঞ্চম আশ্বাসে উক্ত হইয়াছে,—"এই বামাচারকে লক্ষ্য করিয়াই মহাকবি ভাস বলিয়াছেন—সুরা পান করিবে, প্রিয়তমার মুখ দর্শন করিবে ও জনগণের চিত্তাকর্ষক বিকৃত বেশ ধারণ করিবে। যে মহাদেব এইরূপ (সুন্দর) মুক্তিমার্গ প্রদর্শন করিয়াছেন, তিনি দীর্ঘায়ু হউন।"* অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ই ভাস কবিকে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতাব্দীর লোক বলিয়া থাকেন। ভাস কবির নাটকসমূহের সম্পাদক পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় ভাসকে চাণক্যেরও পূর্ব্ববর্ত্তী প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ভাসের একটি শ্লোক† চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে (১০।৩) পাওয়া যাইতেছে এবং তাহা যে অন্যের, ইহাও তাহাতে লেখা আছে। তাহা স্বীকার করিলে ভাস কবি বুদ্ধের প্রায় সমসাময়িক হইয়া পড়েন। এবং তাঁহার সময়েই বামাচার বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত থাকায় তন্ত্রকে আরও অন্যূন দুই শতাব্দী পূর্ব্ববর্ত্তী অবশ্যই বলিতে হইবে। কোনও মত সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে ২।৩ শতাব্দী অবশ্যই প্রয়োজন হয়।

ললিতবিস্তর গ্রন্থে দেখা যায়—বুদ্ধদেব বিশ্বামিত্রের নিকট যে ৪৬টি অক্ষর শিক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে স্বরবর্ণের মধ্যে "অং" "অঃ" ও ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে "ক্ষ" এই তিনটি বর্ণও আছে। এই তিনটি বর্ণ তন্ত্রেই শুধু পৃথক্‌রূপে পরিগণিত হয়। এবং ন্যাসাদি তান্ত্রিক কার্য্যে তাহার ব্যবহারও হইয়া থাকে। "ক্ষকারঃ কণ্ঠঘাতজঃ" বলিয়া সংযুক্ত বর্ণাপেক্ষা ক্ষকারের উচ্চারণপার্থক্যও প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু পাণিনি প্রভৃতি বৈদিক শাস্ত্রকারগণ, ক্ষকারকে সংযুক্ত বর্ণের মধ্যে এবং অং অঃ, এই দুইটিকে যথাক্রমে অনুস্বার বিসর্গের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পৃথক্‌ভাবে তাহাদের বর্ণত্ব স্বীকার করেন নাই। কাজেই বুদ্ধের সময়ে প্রচলিত এই তিনটি তান্ত্রিক বর্ণ দ্বারাই তন্ত্রশাস্ত্রের বৌদ্ধপূর্ব্ববর্ত্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে। এবং উক্ত ললিত-

---

* ইমমেব চ মার্গং আশ্রিত্যাভাষি ভাসেন মহাকবিনা—

পেয়া সুরা প্রিয়তমামুখমীক্ষণীয়ং গ্রাহ্যঃ স্বভাবললিতো বিকৃতশ্চ বেশঃ।
যেনেদমীদৃশমদৃশ্যত মোক্ষমার্গং দীর্ঘায়ুরস্তু ভগবান্ স পিনাকপাণিঃ।

† নবং শরাবং সলিলৈঃ সুপূর্ণমিত্যাদি প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ ৪।২

বিস্তরে অক্ষরার্থে মাতৃকা শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে। অক্ষরার্থবাচী মাতৃকা শব্দও কেবল তন্ত্রেই ব্যবহৃত হয়।*

বিশেষতঃ উক্ত ললিতবিস্তর গ্রন্থে দ্বাদশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন—এইরূপ লঙ্ঘন বিষয়ে··· নির্ঘণ্টে (যাস্কপ্রণীত বৈদিক অভিধান), নিগমে (তন্ত্রে), পুরাণে, ইতিহাসে, বেদে, ব্যাকরণে, নিরুক্তে (যাস্কপ্রণীত বেদাঙ্গবিশেষ), শিক্ষাশাস্ত্রে, ছন্দঃশাস্ত্রে, যজ্ঞকাণ্ডে, জ্যোতিষে, সাংখ্যে, যোগশাস্ত্রে, ক্রিয়াকাণ্ডে,···ইত্যাদি সর্ব্বকর্ম্মকথাশাস্ত্রে এবং লৌকিক ও অলৌকিক সর্ব্ব বিষয়ে বোধিসত্ত্ব বিশিষ্টতা লাভ করিলেন।†

দেখুন, এখানে তন্ত্রার্থে নিগম শব্দের সুস্পষ্ট উল্লেখও আছে। যদিও নিগম শব্দ বেদার্থেও প্রযুক্ত হয়, তথাপি পরে বেদ ও বেদাঙ্গের পৃথক্ উল্লেখ থাকায় এখানে তন্ত্রার্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে সন্দেহ নাই। তন্ত্রার্থে নিগম শব্দের ভূরি প্রয়োগ তন্ত্রশাস্ত্রে পাওয়া যায়।

এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে, বুদ্ধের সময়ে তন্ত্রশাস্ত্র বেশ পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল, নতুবা তিনি ইহা শিক্ষার জন্য যত্নবান্ হইতেন না।

ললিতবিস্তর গ্রন্থখানা বুদ্ধনির্ব্বাণের কিছুদিন পরেই খৃঃ-পূর্ব্ব ৩য় অথবা ২য় শতাব্দীতে বৌদ্ধসংঘ কর্ত্তৃক রচিত হয়। এবং ৬৯ খৃষ্টাব্দে চু ফ লন্ কর্ত্তৃক চীনা ভাষায় তাহা অনূদিত হইয়াছে।‡ কাজেই এই গ্রন্থের প্রামাণ্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এখন দেখিব, ইহার পূর্ব্বে তন্ত্রের কোন সন্ধান পাই কি না।

ক্রমশঃ

---

* ললিতবিস্তরের দশম অধ্যায়ে যথা—ইতি হি ভিক্ষবো দশদারকসহস্রাণি বোধিসত্ত্বেন সার্দ্ধং লিপিং শিক্ষন্তে স্ম। তত্র বোধিসত্ত্বাধিষ্ঠানেন তেষাং দারকাণাং মাতৃকাং বাচয়তাং যদা অকারং পরিকীর্ত্তয়ন্তি স্ম তদা অনিত্যঃ সর্ব্বসংস্কারশব্দঃ নিশ্চরতি স্ম। আকারে পরিকীর্ত্ত্যমানে আত্মপরহিতশব্দো নিশ্চরতি স্ম।······অংকারে অমোঘোৎপত্তিশব্দঃ। অঃকারে অস্তগমনশব্দঃ নিশ্চরতি স্ম। ক্ষকারে পরিকীর্ত্ত্যমানে ক্ষণপর্য্যন্তাভিলাপ্য সর্ব্ব-ধর্ম্মশব্দো নিশ্চরতি স্ম।

বলা বাহুল্য, এখানে "অ"এ অজগর আসছে তেড়ে। আমটি আমি খাব পেড়ে। ইত্যাদি আধুনিক অক্ষর-পরিচয়ের পদ্ধতিই অবলম্বিত হইয়াছে।

† এবং লজ্বিতে······নির্ঘণ্টে নিগমে পুরাণে ইতিহাসে বেদে ব্যাকরণে নিরুক্তে শিক্ষায়াং ছন্দস্বিন্যাং যজ্ঞকল্পে জ্যোতিষে সাংখ্যে যোগে ক্রিয়াকল্পে······ইত্যেবমাদ্যাসুসর্ব্ব কর্ম্মকলাসু লৌকিকাদিষু দিব্যমানুষ্যকাতিক্রান্তাসু সর্ব্বত্র বোধিসত্ত্ব এব বিশিষ্যতে স্ম।

‡ বিশ্বকোষ, বর্ণলিপি শব্দ দ্রষ্টব্য।

মেহেন্-জো-দড়োর সীলমোহর (মুদ্রা)

শ্রীমাহেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ সাংখ্যার্ণব

প্রাগৈতিহাসিক 'মেহেন্-জো-দড়ো' নামে একখানা বাঙ্গলা গ্রন্থ ১৯৩৬ ইংরেজী সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ গ্রন্থের পরিশিষ্টে (৮ম পৃষ্ঠায়) মেহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত মুদ্রাসমূহের পনরটি মুদ্রার ছাপ প্রকাশিত হইয়াছিল। অদ্যাপি ঐ সকল মুদ্রার পাঠোদ্ধার কেহ করিতে পারেন নাই। নানা জনে নানা কথা অনুমান করিয়াছেন মাত্র।

আমি ঐ পনরটি মুদ্রার মধ্যে দুইটি পাঠ করিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে করিতেছি। আমার ধারণা, ঐ মুদ্রাগুলি ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে পণ্যমূল্য আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহৃত নোট। যেমন আজকাল এক টাকা, দুই টাকা, দশ টাকা এবং শত টাকা মূল্যের কাগজের নোট ব্যবহৃত হইতেছে, সেইরূপ পুরাকালে মেহেন্-জো-দড়ো, হরপ্পা, মেসোপটমিয়া প্রভৃতি দেশে পাথরের, তামার বা ব্রোঞ্জের নোট ব্যবহৃত হইত। স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশের নোটে ভিন্ন ভিন্ন জন্তু বা অস্ত্রের প্রতীক অঙ্কিত হইত এবং অক্ষরে নোটের মূল্য লিখিত হইত।

মেহেন্-জো-দড়োতে যতগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, সবগুলিই তাহার নিজস্ব বলিয়া মনে হয় না। কারণ, সবগুলি মুদ্রার প্রতীক এবং অক্ষর সমান নয়। কতকগুলি বৃষভলাঞ্ছিত, কোনটি গজলাঞ্ছিত, কোনটি ছাগলাঞ্ছিত। কোন কোনটিতে এমন অদ্ভুত জন্তু অঙ্কিত আছে, যে জন্তু কেহ কখনও দেখে নাই। আমি মনে করি, ঐগুলি বিভিন্ন রাজ্যের প্রতীক। ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে ঐ সকল নোট নানা দেশ হইতে আসিয়াছিল। যেমন আজকাল দিল্লী বা কলিকাতার বাজারে বা কোষাগারে গেলে ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, বর্ম্মা প্রভৃতি নানা দেশের বিচিত্র নোট দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের নোটে অশোকস্তম্ভ এবং হিন্দী লিপি এবং পাকিস্তানের নোটে চন্দ্র-তারা ও আরবীয় লিপি দেখিতে পাওয়া যায়।

বৃষভলাঞ্ছিত নোটগুলি মেহেন্-জো-দড়োর নিজস্ব বলিয়া আমার মনে হয়। কারণ, ঐ নগরের অধিবাসীরা প্রধানতঃ শৈব ছিলেন (ইহাতে মতভেদ নাই)। বহু শিবলিঙ্গ এবং পশুপতি শিবের মূর্ত্তি ঐ স্থানে পাওয়া গিয়াছে। উপাস্য দেবতা শিবের বাহন বৃষকে রাজ্যের প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল, এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

গোস্বামি-লিখিত গ্রন্থে যে পনরটি মুদ্রার ছাপ আছে, তাহাদের দ্বিতীয় এবং সপ্তমটি আমি পাঠ করিয়াছি। দ্বিতীয়টি ককুদ্মান্ বৃষভলাঞ্ছিত এবং সপ্তমটি ককুদ্‌বিহীন বৃষভলাঞ্ছিত। দ্বিতীয়টিতে বৃষভের উপরিভাগে লিখিত আছে—

প্রথমে তিনটি রেখা (।।।), পরে তিনটি অক্ষর (ধ র ণ)।

সপ্তমটিতে বৃষভের উপরিভাগে লিখিত আছে—

প্রথমে দুইটি রেখা (।।), পরে পাঁচটি অক্ষর (ন ব ধ র ণ)।

মুদ্রায় উৎকীর্ণ রেখাগুলিকে আমি সংখ্যাবাচক মনে করি। সুতরাং দ্বিতীয় মুদ্রাটির মূল্য তিন ধরণ এবং সপ্তম মুদ্রাটির মূল্য দ্বিনব ধরণ (১৮ ধরণ)।

এখন 'ধরণ' শব্দের অর্থ স্থির করিতে পারিলেই একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ে স্বর্ণমুদ্রার মান লিখিত আছে—

"পঞ্চ কৃষ্ণলকো মাষস্তে সুবর্ণস্তু ষোড়শ।
পলং সুবর্ণাশ্চত্বারঃ পলানি ধরণং দশ।"

এই হিসাবে দেখা যায়—দশ পল বা চল্লিশ সুবর্ণে এক 'ধরণ' হয়। অতএব দ্বিতীয় মুদ্রার মূল্য তিন ধরণ ১২০ সুবর্ণমুদ্রার সমান। আর উপরিলিখিত সপ্তম মুদ্রার মূল্য ১৮ ধরণ ৭২০ সুবর্ণমুদ্রার সমান।

পূর্ব্বকালে স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে লইয়া দেশ-বিদেশে চলা দুষ্কর এবং বিপজ্জনক ছিল। কাজেই ব্যবসায়ীরা পাথরের বা তামার অথবা ব্রোঞ্জের লিপি (নোট) দ্বারা পণ্যমূল্যের আদান-প্রদান চালাইতেন। আমার এই সিদ্ধান্ত যদি বিদ্বন্মণ্ডলী মানিয়া লইতে সম্মত হন, তবে অন্যান্য মুদ্রাগুলিও পাঠ করিবার চেষ্টা করিতে পারি।

• দ্রষ্টব্য—৭২ পৃষ্ঠায় ৬নং পাদটীকার শেষে pp. 1—3. এই অংশের পূর্ব্বে 'No 30, 1927' কথা বসিবে।

গোবিন্দদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী

শ্রীঅজয়কুমার চক্রবর্ত্তী

গোবিন্দদাস বৈষ্ণব কবিদের মুকুটমণি। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পরেই গোবিন্দদাসের নামোল্লেখ করা হয়। অপিচ কোন কোন ক্ষেত্রে ইঁহার শ্রেষ্ঠত্বও স্বীকার্য্য।

প্রাচীন পুথি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে গোবিন্দদাসের কতিপয় (৫১টি) পদ প্রাপ্ত হই। তন্মধ্যে মৎপ্রাপ্ত কয়েকটি পদ কোন মুদ্রিত পুস্তকে দেখিতে না পাইয়া অপ্রকাশিত পদ মনে করিয়াই, বিচারের জন্য বিশেষজ্ঞদের সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া হইল। পুথিখানি আসাম গৌরীপুরাধিপতি রাজা ৺প্রভাতচন্দ্রের রাজদরবারের পুথিশালায় রহিয়াছে।

(১)

পৃয় সখি গমন করল প্রতি বনে বন
প্রবেসল কুণ্ডক তির।
সুসিতল বারি কুঞ্জ য়তী সোভন
মলয় পবন বহু থির॥
সুবল সখা করি কোর।
সহচরি পথ হেরি অন্তর গরচর
নয়নক লোর॥ ধ্রু॥
সচকিত নয়ন নিহারই সহচরি
আকুল শ্যামরু চন্দ।
রঙ্গ পটাম্বরে মুখ রুচি মোছই
বসন ঢুলায়ত মন্দ॥
কপুর তাম্বুল বদনহি পুরল
সচেতন ভেল পিতবাস।
সুন্দরি গমন করল অব নিকট
কহতি গোবিন্দদাস॥ (২৪সংখ্যক পদ)

(২)

কাহ্নুক চিত থির করি সুন্দরি
কুঞ্জ সো গমন কয়েল।
বসনহি ঝাপি বারি মণি মঞ্জির
নিজ মন্দিরে চলি গেল॥

রতন সেজপরে বৈঠল রষবতি
ফুকারএ সখিগণ জাই।
রজনি পোহায়ল গুরুজন জাগল
গোবিন্দদাস বলি জাই ॥ (১ সংখ্যক পদ)

(৩)

সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে জদুনন্দন ভোজন করতহি তাই।
রোহনি দেবি করত পরিবেসন রসবতি দেহত বাড়াই ॥
কনক থারি ভরি পুর।
বিবিধ মিঠাই খির দধি সাকর অম্ল´বেঞ্জন অতি সুমধুর ॥
ভোজন কেলি কহই না।হ হোঅত আনন্দ কো ঝীওর।
ভোজন সারি সয়ন করু পল এক সুখময় নন্দকিসোর ॥
জো কিছু সেস রহল থালিপর ভোজন করলহি গোরি।
গোবিন্দ দাষ ঝারি লই খাড়ই পবন ঢুলায়ত থোরি ॥ (পদসংখ্যা ১৮)

'চণ্ডীদাস সমস্যা' প্রবন্ধ সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর

১৩৬০ বঙ্গাব্দের পরিষৎ-পত্রিকার ২য় সংখ্যায় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-লিখিত 'চণ্ডীদাস সমস্যা' নামে একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। ঐ প্রবন্ধে 'বীরভূমের এক গৃহস্থের গোয়ালঘর হইতে' কৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথি পাওয়া যায় বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। এ বিষয়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিষ্ণুপুর শাখার সদস্য শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রকৃত তথ্য জানিতে চাহিয়াছেন। সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সম্পাদকীয় ভূমিকায় ৺বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল,—

"একরা'শ পুথির সঙ্গে 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' বন-বিষ্ণুপুরের সন্নিকট কাঁকিল্যানিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অধিকারে ছিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরা আপনাদিগকে প্রভুপাদ শ্রীনিবাস আচার্য্যের দৌহিত্র-বংশ বলিয়া পরিচয় দেন। পুথির সহিত প্রাপ্ত একখণ্ড কাগজের লেখা দেখিয়া অনুমান হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণলীলাত্মক কীর্ত্তনের এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ ২৫০ বর্ষ পূর্ব্বে বিষ্ণুপুররাজের পুথিশালায় সযত্নে রক্ষিত হইত।"

সুতরাং এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ সম্ভবতঃ 'বাঁকুড়া' লিখিতে ভ্রমক্রমে 'বীরভূম' লিখিয়া থাকিবেন।

পত্রিকাধ্যক্ষ।

অসমাপিকা ক্রিয়াপদ, না অব্যয়

শ্রীননীগোপাল দাশশর্ম্মা

পুরাতন বাঙ্গালা ব্যাকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক ব্যাকরণে পর্য্যন্ত দেখা যায়, ক্রিয়াপদ দুই প্রকার—সমাপিকা ও অসমাপিকা। ধাতুর উত্তর ধাতূত্তরবিহিত-বিভক্তি যুক্ত করিয়া ক্রিয়াপদ রচিত হয়, এবং ইহা দ্বারা বাক্য সম্পূর্ণতা লাভ করে। "ব্যাকরণের পুরুষ" নামক প্রবন্ধে এই বিভক্তির স্বরূপ, সংজ্ঞা ও কাল প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন বিভক্তি নাই, যাহা দ্বারা ক্রিয়াপদ রচিত হইতে পারে। অপর একদল বিভক্তি আছে, তাহা বিশেষ্য, বিশেষণ ও সর্ব্বনামের উত্তর যুক্ত হয়। ইহাদের নাম প্রাতিপদিকোত্তরবিহিত বিভক্তি। অব্যয় নামে যে পদ বাক্যে ব্যবহৃত হয়, তাহার উত্তর কোন বিভক্তি কোন অবস্থাতেই বর্তমান থাকে না। সংস্কৃত ব্যাকরণে ইহার উত্তর প্রাতিপদিকোত্তরবিহিত-বিভক্তি বিধান করিয়া, লোপ করা হয়, এবং ইহা দ্বারা অব্যয়ের পদত্ব স্বীকৃত হয়। পদ ব্যতীত কোন ধ্বনিই বাক্যে ব্যবহৃত হইতে পারে না, এই হেতু বলা হইয়াছে—"নাপদং শাস্ত্রে প্রযুঞ্জীত"।

আরব্য, পারস্য ও উর্দ্দু ভাষার ব্যাকরণে দেখা যায়, পদ তিন ভাগে বিভক্ত। এক ভাগের নাম ফেল অর্থাৎ ক্রিয়াপদ। ইহাতে ধাতুর উত্তর অন্যান্য ভাষার ন্যায় এক-জাতীয় বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। আর একটির নাম হরফ্ অর্থাৎ অব্যয়। ইহাদের উত্তর কোন বিভক্তি থাকে না। এই দুই প্রকার পদ ভিন্ন যাবতীয় বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম, ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য ও ক্রিয়াবাচক বিশেষণ একটি মাত্র পদের অন্তর্গত, তাহার নাম ইস্‌ম্। ইহাদের উত্তর একজাতীয় বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য বৈদেশিক বিভক্তিপ্রধান (Synthetic) ভাষাতেও এই রীতি অবলম্বিত হইয়া থাকে। অব্যয়ের উত্তর কোন ভাষাতেই বিভক্তি বর্ত্তমান থাকে না, অথচ তাহারা বাক্যে অর্থবোধের সাহায্যই করিয়া থাকে। অতএব এই সিদ্ধান্তে আসা যাইতে পারে, যে সকল পদে কোন অবস্থাতেই বিভক্তির অস্তিত্ব নাই, তাহারা অব্যয়ের অন্তর্গত।

অসমাপিকা ক্রিয়াপদের উদাহরণ—পড়িতে পড়িতে, খাইতে, দেখিয়া, আসিলে ইত্যাদি। এই ইতে, ইয়া, ইলে প্রভৃতি প্রত্যয়যুক্ত প্রাতিপদিক কোনও কালের নির্দ্দেশক নয়, উদ্দেশ্যপদভেদে ইহাদের কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। ইহাদের উত্তর ঐ কৃৎপ্রত্যয়গুলি ছাড়া কোন বিভক্তি বসে না।

সংস্কৃত ব্যাকরণে ইতে প্রত্যয়ের অর্থে চতুম্ প্রত্যয় ও ইয়া প্রত্যয়ের অর্থে ক্তাচ্ ও ল্যপ্ প্রত্যয় প্রয়োগ করিয়া অব্যয়ের অন্তর্গত করা হইয়াছে। দ্বিত্ব ইতে অর্থাৎ পড়িতে পড়িতে, এই প্রকার অর্থে শতৃ ও শানচ্ প্রত্যয়ের প্রয়োগ দ্বারা নিষ্পন্ন পদ বিশেষণ বলিয়া স্বীকৃত হয় এবং তাহাদের উত্তর 'প্রাতিপদিকোত্তরবিহিত-বিভক্তি'র প্রত্যেকটি অন্যান্য

বিশেষণের মত ব্যবহৃত হয় এবং স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয়ও যুক্ত হয়। ইলে প্রত্যয়ের অর্থে উদ্দেশ্যপদে সপ্তমীর ব্যবহার হয়, ক্রিয়াবাচক বিশেষণেও তদনুসারে সপ্তমীর প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহাই "ভাবে সপ্তমী" নামে প্রচলিত। ইংরাজীতে এই অর্থে Absolute nominativeএর ব্যবহার হয়। বাঙ্গালায় ইলে প্রত্যয়ান্ত অব্যয়ের দ্বারা যে বাক্যাংশ গঠিত হয়, তাহার উদ্দেশ্যপদ বা উক্ত পদে প্রথমা বিভক্তির প্রয়োগ হয়। কেহ কেহ সংস্কৃতের অনুকরণে সপ্তমীর প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু সে প্রয়োগে প্রকৃত অর্থ প্রকাশ পায় না।

এই ইতে, ইয়া ও ইলে বাঙ্গালার কৃৎপ্রত্যয়। ধাতু কৃৎপ্রত্যয়ান্ত হইয়া প্রাতিপদিকের অন্তর্গত হয়। ইহা ধাতূত্তরবিহিত-বিভক্তির বিষয় হইতে পারে না, প্রাতিপদিকোত্তর-বিহিত-বিভক্তিও ইহাদের উত্তর অবস্থান করে না। সুতরাং ইহাদিগকে অব্যয় স্বীকার করিতে হয়। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য ও ক্রিয়াবাচক বিশেষণের ন্যায় ইহাদিগকে ক্রিয়াবাচক অব্যয় বলাই সঙ্গত। ক্রিয়াপদ এবং ক্রিয়াবাচক অব্যয় এক পর্য্যায়ের অন্তর্গত নয়। পূর্ব্বোক্ত অসঙ্গত সংজ্ঞার ফলে পাঁচ প্রকার পদের (বিশেষ্য, সর্ব্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া, অব্যয়) সুনির্দ্দিষ্ট বিভাজক লক্ষণের অনুভূত ব্যাহত হয়। অতএব ক্রিয়াপদের সমাপিকা ও অসমাপিকা সংজ্ঞানির্দ্দেশ ব্যাকরণবিগর্হিত।

৪১৭। উদ্ধবসংবাদ।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-১৪, সম্পূর্ণ। তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩৷৷০ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৩৬ সাল। পূর্ব্ববর্ত্তী ৪০৮ সংখ্যক পুথির বিবরণ দ্রষ্টব্য।

আরম্ভ—

৺৭শ্রীশ্রীরাম ৷৷

বৃন্দাবন পাসরিতে নারেন মাধবে।
বনাল্যা নবীন কুঞ্জ বৃন্দাবন ভাবে ৷৷
তাহাতে বসিলা কৃষ্ণ উদ্ধব সহিত।
চিন্তিতে লাগিলা কৃষ্ণ গোপীসভার হিত ৷৷
নন্দ যশোদার প্রেম পাসরিতে নারে।
দিবানিশি পড়ে মনে ঝুরএ অন্তরে ৷৷
গোকুলে গোপিনী সঙ্গে জত কৈলা লীলা।
সে সব স্মঙরি কৃষ্ণ অবশ হইলা ৷৷

ভনিতা—

উদ্ধবের বোলে রাণী প্রবোধ না মানে।
গোবিন্দমঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্রে ভনে ৷৷

শেষ—

ব্রজবাসী আছে জত গোপ গোপীজন।
পশু পক্ষী আদি সব করএ রোদন ৷৷
যমুনাতে পড়ে আসি সেই সব জল।
তাহাতে যমুনা বড় হইয়াছে প্রবল ৷৷
এতেক বচন যদি উদ্ধব কহিলা।
শুনিয়া গোবিন্দ মোহমোহিত হইলা ৷৷

... ...

ব্যাসের ভাষিত কথা কবিচন্দ্রে ভনে।
যশ কীর্ত্তি অন্তে মুক্তি জেবা জন শুনে ৷৷

... ...

এত দূরে উপাখ্যান হইল সংপূর্ণ।
কৃষ্ণকথা শুনিলে সফল হয় কর্ণ ৷৷

ইতি উদ্ধবসংবাদ সমাপ্ত ৷৷ জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]। ইতি পটীতং শ্রীসলাগিরাম মাএ [মিত্র]। সাং রামচন্দ্রপুর ইতি সন ১২৩৬ সাল তা° ১৬ ভাদ্র বেলা আন্দাজী ১৪ চোর্দ্দ দণ্ড হইতে রোজ সমবার তিথি তৃতিয়া স্বক্লপক্ষে সংপূর্ণ ৷৷

৪১৮। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-১০, সম্পূর্ণ। পাতলা, ছিন্ন, জীর্ণ ও গলিত তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি লেখা। শেষ পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। প্রতি পত্রের নিম্নাংশ গলিয়া গিয়াছে। পরিমাণ ১৩৷০ × ৪৷০ ইঞ্চি। শেষ পৃষ্ঠার অক্ষর অস্পষ্ট হওয়ায় পাঠ উদ্ধার করা গেল না। লিপিকাল ১২৫২ সাল।

আরম্ভ—

শ্রীশ্রীহরি ৷৷

অথ দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ লিখ্যতে।
বৈশম্পায়ন মুনি সভাপর্ব্বে কয়।
শ্রীমহাভারথ কথা শুন জন্মেজয় ৷৷

রাজসূয় যজ্ঞ রাজা করিলেন সায়।
মহারাজা যুধিষ্ঠির বসিল সভায়॥

... ...

ময় দানব নামে পুরী করিল নির্ম্মাণ।
শক্র······তার হয় জলজ্ঞান॥
সভামধ্যে আইল তবে রাজা দুর্য্যোধন।
জলবুদ্ধে জ্ঞান করি তুলিল··· ॥
সভামধ্যে দুর্য্যোধন বড় লজ্জা পায়।
পথ ছাড়ি মহারাজা অন্য পথে যায়॥

... ...

ধৃতরাষ্ট্র শকুনিরে বলেন বচন।
হেন যুক্তি কর জাথে জিনে দুর্য্যোধন॥
শকুনি বলেন আমি জেই যুক্তি বলি।
পণ করি যুধিষ্ঠির সঙ্গে পাশা খেলি॥

... ...

পাশা হাতে দুর্য্যোধন খেলিবারে জায়।
যথা রাজা যুধিষ্ঠির বসিয়া সভায়॥
দুর্য্যোধন বলে মনে বড় আছে আশা।
তোমার সহিত আজি খেলিবারে পাশা॥
ভনিতা—
যুধিষ্ঠির দুই চক্ষু করে ছল ছল।
দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় গো[বিন্দমঙ্গল]॥
শেষ—
দ্রৌপদী বলেন প্রভু বলিএ তোমারে।
একদিন গিয়াছিলাম স্নান করিবারে॥
গঙ্গাজলে স্নান করেন এক [উ]দাসীন।
জলের হিল্লো[লে] গেছে তাহার কৌপীন
উলঙ্গ হইয়া লাজে উঠিতে না পারে।
আপনার আচল চিরিয়া দিল তারে॥
সন্তুষ্ট হইয়া বর দিল তপোধন।
সহস্র সহস্র গুণে পাইবে বসন॥
গোবিন্দ বলেন চিন্তা না করিহ তুমি।
তোমার লাগিয়া বস্ত্ররূপ হৈল আমি॥
আজ্ঞা পাঞা বস্ত্র জত টানে দুঃশাসন।
রাশি রাশি বস্ত্র অঙ্গে হইল তখন॥
কৃষ্ণচন্দ্র দ্রৌপদীর আছিলা নিকটে।
জত টানে তত বাড়ে বস্ত্র নাহি টুটে॥

... ...

ইতি বস্ত্রহরণ সমাপ্ত॥ লিখিতং শ্রীহারাধন দে সা······সন ১২৫২ সাল তা° ২২ জষ্টি॥

৪১৯। উদ্ধবসংবাদ।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৪, অসম্পূর্ণ। তুলোট কাগজ। প্রাত পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৪।০ × ৪।০ ইঞ্চি। শেষ খণ্ডিত; সুতরাং লিপিকাল নাই।

আরম্ভ—
শ্রীউদ্ধবসম্বাদ লিখ্যতে॥
শ্রীবৃন্দাবন পাসরিতে নারেন মাধবে।
বোনাইল নবীন কুঞ্জ···ভাবে॥
তাহাতে বসিলা কৃষ্ণ উদ্ধব সহিত।
ভাবিতে লাগিলা কিছু গোপিকার হিত॥
গোকুলে গোপীর সঙ্গে যত কৈলাম লীলা।
সে সব স্মঙরি কৃষ্ণ আবেশ হইলা॥
সজল নয়ান দুটি বৃন্দাবন ভাবে।
নিজ কথা কৃষ্ণ তবে কহেন উদ্ধবে॥
ভনিতা—
পথশ্রমে উদ্ধব করিলা শয়নে।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্রে ভনে॥
৪র্থ পত্রের শেষ—
কত অনুমান করে গোপীগণ চিত্তে।
হেন কালে উদ্ধব হইলা উপনীতে॥
উদ্ধব দেখিয়া গোপী সম্ভ্রম আপার।
তুহু কথা নিজ বাস কি নাম তোমার॥

আমা সভা প্রাণ কৃষ্ণ নন্দের নন্দন।
সেই ঠাম দেখি তোমার তেমতি বরণ॥
তে কারণে তোমারে করিলাম নিবেদন।
অবশ্য জানিবে কোথা নন্দের নন্দন॥
উদ্ধ কহেন গোপি নিবেদন করি।

৪২০। দাতা কর্ণের পালা।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৯, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩×৪ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪৩ সাল।

আরম্ভ—

…দাতা কর্ণের পালা লিখ্যতে॥
বৈশম্পায়ন মুনি আদি সর্ব্বে কয়।
অমৃত ভার…রাজা শুন মহাশয়॥
এক দিন বাসুদেব ভাবিয়া অন্তরে।
কর্ণ কেমন দাতা বটে বুঝিব তাহারে॥
জে জাহা মাগএ কর্ণ তাহা দেই দান।
সভে বলে দাতা নাই কর্ণের সমান॥
একবার জাব আমি কর্ণের নিকটে।
বুঝিব সে কর্ণ বীর কেমন দাতা বটে॥

ভনিতা—

দ্বিজ কবিচন্দ্রে কয় বিলম্ব উচিত নয়
দ্বিজরূপে বসি নারায়ণ॥

শেষ—

পরিধান পীতবাস বনমালা গলে।
অরুণকিরণ কিবা দেখি পদতলে॥
মকর কুণ্ডল কর্ণে দেখিতে সুন্দর।
অপরূপ কিবা দেখি শ্যাম কলেবর॥
কৃষ্ণের মধুর মূর্ত্তি দেখি তিন জনে।
প্রেমে গদগদ হয়া পড়িলা চরণে॥
কর্ণের ভক্তিতে তুষ্ট হইলা ভগবান্।
বৈকুণ্ঠনিবাসী হরি হইলা অন্তর্ধান॥

কর্ণ দাতার পালা হইল সমাপ্ত॥ জথা দিষ্টং [ইত্যাদি] লিখিতং শ্রীকা…ক সরকার সাং মালিবেড়া পাটক শ্রীবোষ্টমচরণ তাতি সাং মালিবেড়া সন ১২৪৩ সাল তারিখ ৯ আশ্বিন …দুই পহর বার সম বার ত্রিতি স্বকুপক্ষান্ত—

৪২১। উদ্ধবসংবাদ।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-১২, সম্পূর্ণ। দোভাঁজ-করা বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩×৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২৪ সাল।

আরম্ভ—

৭ শ্রীশ্রীহরি।

ভাগবতামৃত উদ্ধবসংবাদ লিখ্যতে।
বৃন্দাবন পাসরিতে নারেন মাধবে।
বসিয়া বনাল্য কুঞ্জ বৃন্দাবন ভাবে॥
তাহাতে বসিলা কৃষ্ণ উদ্ধব সহিতে।
ভাবিতে লাগিলা কৃষ্ণ গোপী সভার হিতে

ভনিতা—

ব্যাসের ভাষিত দ্বিজ কবিচন্দ্রে ভনে।
উথলিল শোকনদী নহে নিবারণে॥

শেষ—

উদ্ধব কহেন প্রভু করি নিবেদন।
যমুনা প্রবল কথা করহ শ্রবণ॥
ব্রজপুরে আছে জত গোপ গোপীগণ।
পশু পক্ষী আদি জত করয়ে রোদন॥
যমুনাতে পড়ে আসি সেই অশ্রুজল।
তাহাতে যমুনা নদী হইয়াছে প্রবল॥

এতেক বচন যদি উদ্ধব কহিল।
শুনিঞা সভার প্রেম বাড়িতে লাগিল॥
... ...
ব্যাসের আদেশ দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায়।
হরি২ বল সবে পালা হইল সায়॥

এই অবধি এই পুস্তক সমাপ্ত হইল।... শ্রীসেবকরাম কোঙর লিখিলেন সাং হুদিপুর পরগনে লনহি চাকলে বর্দ্ধমান সন ১২২৪ সাল ইতি তারিখ ৭ অগ্রহায়ন রোজ শুক্রবার মোকাম হাটগাছায় লিখিলাম শ্রীশ্রীহরি।

৪২২। অক্রুরাগমন।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৭, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। শেষ পত্রের বাম দিকের কতক অংশ নাই। পরিমাণ ১৩৷৷০ × ৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২৪ সাল।

আরম্ভ—

৺৭শ্রীশ্রীনারায়ণ শাধ॥
তবে রাজা অক্রুরে আনিল ডাক দিআ।
রাম কৃষ্ণ দুটী ভাএ ঝাট আন গিআ॥
নন্দ আদি গোপগণে দিবে নিমন্ত্রণে।
ধমুর্ম্ময় যজ্ঞে সভে করহ গমনে॥
করিব ধমুর যজ্ঞ করহ গমনে।
রাম কৃষ্ণ দুটি ভাই আনিহ যতনে॥
শুনিআ কংসের আজ্ঞা হইলা উল্লাস।
হাথ বাড়াইয়া জেন পাইল আকাশ॥

ভনিতা—

১। এত বলি রাধা তবে হারল চেতন।
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে ব্যাসের বচন॥
২। না বল্য এমন বাক্য শুন বাছাধন।
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে ব্যাসের বচন॥

শেষ—

চিত্রের পুথলি গোপী রহে দাণ্ডাইয়া।
হা কৃষ্ণ বলিয়া গোপী পড়ে মূর্চ্ছা হইয়া॥
...গৃহস্থ জেন ছাড়ে পুর দেশ।
দেহ ছাড়ি গেল জেন এ প্রাণ পুরুষ॥
পথের পথিক দেখি জিজ্ঞাসয়ে তায়।
রথে চড়ি রাম কৃষ্ণ কত দূর জায়॥
এত বলি গোপীগণ করুণা করেন।
হেথা রাম কৃষ্ণ দুহেঁ মথুরা গেলেন॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে পুরাণের সার।
একচিত্তে শুনে পুন জন্ম নাই তার॥
ভাগবতামৃত দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায়।
এত দূরে অক্রুর আগমন হইল সায়॥

ইতি অক্রুর আগমন শমাপ্ত॥ সন ১২২৪ সাল তারিখ ১৪ অগ্রাহায়ন রোজ সক্রু বার লিখিতং শ্রীরাইচরণ নিওগী এ পুস্তক শ্রীগোপাল গোরাঞী শর্ব্বশাং বেল্যাতোড় শমাপ্ত হইল চারি দণ্ড বেলার য়োক্তে এ পুস্তক জে চুরি করিবেক শে আপনার ঘরের মেয়া শর্প্পর্কে জত থাকীবেক শে বেটা গোপাল গোরাঞীকে দিবেক ইতি।

৪২৩। দাতা কর্ণের পালা।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-১৩, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। শেষ পত্রের অর্দ্ধাংশ নাই। পরিমাণ ৯ × ৪ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

পুথিতে ৭টি ভনিতা আছে। তন্মধ্যে ৬টি কবিচন্দ্রের, ১টি দ্বিজ পঞ্চাননের। ইহা ছাড়া পুথির সর্ব্বত্র ড অক্ষর প্রাচীন আকৃতির জএর ন্যায় লিখিত হইয়াছে।

আরম্ভ—

৺৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ জয়তি ॥

হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো [ইত্যাদি শ্লোক]।

অথো কর্ণের পালা আরম্ভঃ।

এক দিন কৃষ্ণচন্দ্র ভাবিলা অন্তরে।
কর্ণ কেমন দাতা বটে বুঝিব তাহারে ॥
জে জাহা মাগয়ে কর্ণ তাহা দেই দান।
ত্রিভুবনে দাতা নাহি কর্ণের সমান ॥
একবার জাব আমি কর্ণের নিকটে।
বুঝিব সে কর্ণ বীর কেমন দাতা বটে ॥
এই কথা মনে ভাবি দেব নারায়ণ।
মায়া করি হৈল্যা এক বৃদ্ধ জে ব্রাহ্মণ ॥

ভনিতা—

১। কবিচন্দ্রে বলে কর্ণ হয় সাবধান।
দাতা বুঝিবারে আইল্যা প্রভু ভগবান্ ॥
২। অনুমতি পায়্যা কর্ণ হাসে খলখল।
দ্বিজ পঞ্চাননে গায় গোবিন্দমঙ্গল ॥

শেষ—

কর্ণের বহুত স্তুতি শুনিয়া শ্রীহরি।
নিজ মুখে কর্ণের প্রশংসা বহু করি ॥
ধন্য২ কর্ণ তুমি কহেন শ্রীহরি।
ত্রিভুবনে দাতা নাহি বলেন বনমালী ॥
কর্ণের স্তবেতে তুষ্ট হৈল্যা ভগবান্।
নিজ স্থানে গেলা হরি হঞা অন্তর্ধান ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় গোবিন্দমঙ্গল।
এত দূরে কর্ণের পালা সমাপ্ত হইল ॥

ইতি কর্ণের পালা সমাপ্ত হইল। সাক্ষরং শ্রীরামধন দাস কর্ম্মকারের ॥ মোঃ বিষ্টুপুর কৃষ্ণগঞ্জ।

৪২৪। প্রহ্লাদচরিত্র।

রচয়িতা—দ্বিজ শঙ্কর চক্রবর্ত্তী কবিচন্দ্র। পত্র ৩-২৩, অসম্পূর্ণ। দুভাঁজ-করা বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ৮ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ৮৸০ × ৩ ইঞ্চি। আদি ও অন্ত খণ্ডিত। লিপিকাল নাই।

পুঁথির প্রথমে একটি 'বন্দনা' আছে। ৩য় পত্রের ২য় পৃষ্ঠার ১ম পঙ্‌ক্তিতে তাহা শেষ হইয়াছে। উক্ত অংশে নিতাই চৈতন্য, অযোধ্যায় রাম সীতা, খানাকুল কৃষ্ণনগরে অভিরাম গোস্বামী, বাগনপাড়ায় রমাঞী ঠাকুর ও ত্রৈলোক্যতারিণী মাতা তুলসীর বন্দনা দৃষ্ট হয়। তাহার পরে—

প্রসাদচরিত্র মন দিয়া শুন সর্ব্বে।
ব্রহ্মার বরে দেবতা গন্ধর্ব্ব জিনি পূর্ব্বে ॥
স্মরিয়া হাসেন বীর মহারাজা কোপে।
ত্রাসে চমৎকার দেব তিন লোকে কাঁপে ॥
ভয়ে কাঁপে উপদ্রব জত দেবগণ।
ক্ষীরোদে কৃষ্ণের পায় লইল শরণ ॥
হইল আকাশবাণী না ভাবিহ ক্লেশ।
যজ্ঞ দান দ্বিজে জবে করিবে উদ্দিশ ॥
জবে দুখ দিব মোর ভক্ত প্রসাদেরে।
তবে গিয়া তারে আমি বধিব সত্বরে ॥

ভনিতা—

১। শ্রীকবি শঙ্কর কন ব্যাসের আদেশে।
স্বপ্নে কৃপা কৈলা জারে ব্রাহ্মণের বেশে ॥
২। পরাভব পায়্যা গেল ভূপতির পাশে।
কবিচন্দ্র চক্রবর্ত্তী একপদী ভাষে ॥

২৩ পত্রের শেষ—

প্রসাদ কহেন তুমি দেব পরাৎপর।
পিতা প্রতি দয়া প্রভু কর গদাধর ॥
জার কুলে সাধু তুমি বৈষ্ণব জন্মিলে।
তিন শত একুশ পুরুষ উদ্ধারিলে ॥
পুনরপি প্রসাদ কহেন ধীরে ধীরে।
অভয় চরণ দেহ জনকের শিরে ॥

প্রসাদের উপরোধ এড়াতে নারিল।
অভয় চরণখানি তার শিরে দিল॥

ইতি পুস্তক সমাপ্ত॥ শ্রীগোপাল দত্ত সাং রায়বাগ্নী মোজে সন ১২৬৭ সাল তা ২৮ জেষ্টী বার মঙ্গল বার বেলা

৪২৫। কাপাসের পালা।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-২, সম্পূর্ণ। দোভাঁজ-করা শাদা তুলোট কাগজ। ১ম পৃষ্ঠায় ৯, ২য় পৃষ্ঠায় ৭ এবং শেষ পৃষ্ঠায় ৫ পঙ্‌ক্তি লেখা। ১ম পত্রের ১ম পৃষ্ঠায় 'কাপাসের পালা' লিখিত আছে। পরিমাণ ৮৷৷০×৩ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৬৭ সাল।

আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরামঃ॥

বৎসরের মধ্যে ভাই কাপাস ফসল।
ইহাতে পরম সুখী সংসার সকল॥
লোকের কারণে ছিষ্টি করিল ঈশ্বর।
সভার বাসনা বড় পরিতে কাপড়॥
চাসির বাসনা মনে রাজসাধ সুধিব।
ইহাতে পরম সুখে নির্ব্বাহ করিব॥
দুখী সুখী কাঙ্গালিনী সভাই মনে করে।
কোন মতে পাব মোরা গৃহস্থের ঘরে॥
মোদক ছুতার তারা লয়্যা জায় দোকান।
লভ্য করি লয়া জায় দ্বিগুণ প্রমাণ॥
গৃহস্থের মেয়ে ছেলে জা পায় তা নেই।
দোকানি পসারি তারা গুড় নাড়ু দেই॥
ধুচি কাচা সের দুই সের নাই চাই।
অর্দ্ধ সের পুয়া পাইলে তুষ্ট হয়্যা জাই॥
—ইত্যাদি।

শেষ—

দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় করিয়া ভাবনা।
সর্ব্বেশ্বর সভাকার পুরাহ বাসনা॥
… … …

৪২৬। রাধিকামঙ্গল—কলঙ্কভঞ্জন।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৯, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পত্র খানিকটা করিয়া কাটা; তাহাতে ১ পঙ্‌ক্তি লেখা নষ্ট হইয়াছে। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩×৪ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৩৬ সাল।

পূর্ব্বে 'রাধিকামঙ্গল' (৪০৩ সং) ও 'কলঙ্কভঞ্জন' (৪০৯-১০সং) নামে পৃথক্ পৃথক্ পুথির পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। আলোচ্য পুথিতে তাহা একখানি পুথির আকারে লিখিত হইয়াছে।

আরম্ভ—

৭ শ্রীশ্রীহরি

রাজা বলে কহ২ অপূর্ব্ব কথন।
কহ কৃষ্ণকথা শুনি জুড়াক শ্রবণ॥
শুকদেব বচনে রাজা পরিক্ষিত বলে।
কি কর্ম্ম করি…কৃষ্ণ যশোদার কোলে॥
এক দিন নন্দরাণী গোবিন্দ পাইয়া।
লক্ষ২ চুম্ব খান কোলেতে বসায়া॥
… … …
এথা সব জত গোপী একত্র হইয়া।
করেন পরম যুক্তি বিরলে বসিয়া॥
রাধা বলে ললিতা গো শুন মন দিয়া।
শ্রীনন্দের নন্দন কৃষ্ণ চল দেখি গিয়া॥
বিন্দা দেবী বলে কেন জাবে তার ঘরে।
বড়ই অবোধ ছেলে নানা মায়া করে॥

কোন রঙ্গ করে সেহ নিশ্চয় না জানি।
সভাকার বস্ত্র ধরি করে টানাটানি ॥
রাধা বলে এই আমি করিলাম আগুসার।
বস্ত্র ধরিবেক এত করে অহঙ্কার ॥
যদি সে ঢামালি করে আস্যা মোর স্থানে।
দবন করিব তার মাতা বিদ্যমানে॥ ইত্যাদি।

ভনিতা—

শুন রে ভকত ভাই হএ একমন।
শ্রীভাগবতামৃত দ্বিজ কবিচন্দ্র কন ॥

শেষ—

আমি বৈদ্য হইলাম তুমি নারিলে চিনিতে।
সহস্রধার কুম্ভ করিলাম কলঙ্ক ঘুচাইতে ॥
এক্ষণ নিশ্চিন্দ হয়্যা থাক গিয়া ঘরে।
আনন্দে জাইব আমি তোমার মন্দিরে ॥
এত বলি জান কৃষ্ণ হাসিয়া ২।
যশোদার কোলে কৃষ্ণ চাপিলেন জায়া ॥
রাধিকার মঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়।
এত দূরে রাধিকার মঙ্গল হইল সায় ॥

ইতি রাধিকামঙ্গল সমাপ্ত॥ জথা দিষ্টং [ইত্যাদি] ইতি সন ১২৩৬ তারিখ ২২ শ্রাবন··· ষ্টি ত্রিথি বুধবার লিখিত° শ্রীহরিনারায়ন·বিশ্বাষ সাকীম লালবাজার পরগনে বিষ্ণুপুর ওগয়রহ ॥

৪২৭। শিবরামের যুদ্ধ।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ৩-৭, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্ক্তি, শেষ পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৩×৪৷৷০ ইঞ্চি। পত্র কীটদষ্ট। লিপিকাল ১২৩৯ সাল। পূর্ব্বের ৪০৬ সংখ্যক পুথির বিবরণ দ্রষ্টব্য।

৩য় পত্রের আরম্ভ—

লক্ষ্মণের তরে রাম হইল ভাবিত।
লক্ষ্মণ ২ বলিয়া চলিলা তুরিত ॥
জেই পথে গিয়াছেন লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধর।
সেই পথে চলিলেন রাম গদাধর ॥
ধীরে ২ চলেন রাম চক্ষে পড়ে পানি।
কোনখানে আছ হে লক্ষ্মণ গুণমণি ॥
... ...
এত বলি রামচন্দ্র কান্দিতে ২।
উপনীত হইল গিয়া শিবের বাগানেতে ॥

শেষ—

পার্ব্বতী বলেন দেব আদে[শ] হয়্যাছে কিবা।
মস্তক পর্য্যন্ত বিক্রয় হয় তোমার পায়।
আজ্ঞা কর কোন কর্ম্ম ভাব মহাশয় ॥
শ্রীরাম বলেন দেব বলি বিদ্যমানে।
দানে দেহ আমায় ··· বীর হনুমানে ॥
হনুমানের প্রতি শিব বলেন তখনে।
আজি হইতে সেবা কর শ্রীরামচরণে ॥
আমার সেবা করিলে জেমন প্রাণপনে।
তার ছয় গুন সেবা করিবে শ্রীরামে ॥
... ...
হনুমান্ বলে শুন দয়ার নিধি রাম।
আমি অন্যাসন দিব শুন ভগবান ॥
আমি থাকিতে কিছু আর না করিহ চিন্তা।
প্রাণপনে এনে দিব সীতা দেবীর বার্ত্তা ॥
শিব রামের যুদ্ধের কথা জেই জন শুনে।
শমনভয় এড়াইয়া জায় স্বর্গস্থানে ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর বীর হনুমান।
সেবিয়া বাল্মিক দ্বিজ কবিচন্দ্রে গান ॥

ইতি সন ১২৩৯ সাল তারিখ ৫ ফাগুন এক [ই] পুস্তক শ্রীপ্রসাদ গরাইয়ের কাহার দাওা নাই দাওা করেন সে নাম—

৪২৮। নরমেধ যজ্ঞ।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৬, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩৷৷০ × ৪৷৷০ ইঞ্চি। শেষ অংশ অসম্পূর্ণ। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। পুথির তিন স্থলে কবিচন্দ্রের এবং এক স্থলে কৃত্তিবাসের ভণিতা আছে।

৺৭শ্রীশ্রীসীতারামজি॥ নরমেধ যজ্ঞ লিখ্যতে
এক দিন মহারাজা হরষিত মনে।
বার দিয়া বসিল রাজা রত্নসিংহাসনে॥
সেবার সেবক জত ধরিল জোগান।
দালান উপরে রাজা করিলা দেওান॥
পাত্র মিত্র বসিল রাজার সন্নিধান।
হেন কালে আইলেন বসিষ্ঠ তপোধন॥
মুনি প্রণমিয়া রাজা পড়িলা ধরণী।
বেদহস্তে আশিষ করিলা মহামুনি॥
…　　…　　…
মুনিকে নিবেদন করেন নৃপবর।
রাজত্ব করিলাম দশ হাজার বৎসর॥
…　　…　　…
জগত উপরে আমি যযাতি নৃপতি।
আমি পুত্র থাকিতে পিতা জাব অধোগতি॥
দান ধর্ম্ম করি কিম্বা করি কোন যজ্ঞ।
কিসে পিতা মুক্ত হব কহ মুনি বিজ্ঞ॥
এত বলি নৃপতি কান্দে উচ্চস্বরে।
রাজাকে বসিষ্ঠ মুনি পরিবোধ করে॥
অন্য দান ব্রত রাজা করিয়ে নিষেধ।
আমার বচনে রাজা কর নরমেধ॥
ভনিতা—
১। কিত্তিবাস পণ্ডিতের সুরেস বচন।
আদিকাণ্ড রামায়ণ করিলা রচন॥
২। হেথায় সুমন্ত তবে গেলা পূর্ব্বদিগে।
দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় কৃষ্ণপদযুগে॥

৬ষ্ঠ পত্রের শেষ—
সারথি বলিল গোসাঞি করি নিবেদন।
সব ধন লঞা গোসাঞি করহ গমন॥
পুত্র দিব বলি মুনি কৈল অঙ্গীকার।
রথ লঞা সারথি হইল আগুসার॥
সিদ্ধান্ত তোলিল নঞা রথের উপর।
সব ধন লঞা মুনি গেল নিজ ঘর॥
আসিয়া দাণ্ডাইল মুনি আপনার দ্বারে।
স্বামী দেখি দ্বিজপত্নী আইল বাহিরে॥

৪২৯। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ।

রচয়িতা দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-১০, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩৷৷০ × ৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২২ সাল। পূর্ব্বে ৪১১ ও ৪১৮ সংখ্যক পুথির বিবরণ দ্রষ্টব্য।

শেষ—
ভীষ্ম আদি কর্ণ আর জত জন ছিল।
রাশ ২ বস্ত্র দেখি চমৎকার হইল॥
এমন সময়ে শুন দৈবের ঘটন।
দুর্য্যোধনগৃহে অগ্নি লাগিল তখন॥
গান্ধারী আছিল দুর্য্যোধনের জননী।
পরিত্রাহি করি ঘরে লাগিল আগুনি॥
কি হল্য ২ বল্যা কান্দে রাণীগণ।
উলঙ্গ হইয়া সভে পেলিল বসন॥
দুর্য্যোধন আদি করি জত নারী ছিল।
উলঙ্গ হইয়া সভে সভাকে আইল॥
সভাতে বসিয়া ছিল রাজা দুর্য্যোধন।
হইল বড়ই লজ্জা ভাবে মনে মন॥
দেখ ২ মহারাজা ভীমসেন বলে।
এমন আশ্চর্য্য নাই দেখি কোন কালে॥
…　　…　　…
বৈশম্পায়ন বলে শুন হে জন্মেজয়।
পরের করিলে মন্দ আপনার হয়॥
পরখ্যাতি পরনিন্দা করে জেই জন।
মরিলে না মুক্তি পায় নরকে গমন॥
এত শুনি জন্মেজয় কান্দিয়া বিকল।
দ্বিজ কবিচন্দ্রে গান গোবিন্দমঙ্গল॥
ইতি বস্ত্রহরণ সমাপ্ত। সন ১২২২ সাল তারিক ১৯ আসার এক প্রহর বেলার মর্দ্ধে সমাপ্ত॥ সনি বার॥ পাটক শ্রীগোপাল গোরাঞী সাঃ বেলাতোর॥

মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত বা বাশুলীমঙ্গল

(পূর্বানুবৃত্তি)

॥ মঙ্গল ॥

পাটসাড়ি রঙ্গশঙ্খ রসাল গোটিকা।
কনকের লতিকা কনক কঙ্কতিকা॥
কনক কুণ্ডল টাড় অঙ্গুরি পাশুলি।
রতন মঞ্জির হার কনক বউলি॥
ঘটক চলিল বুঝে বরের ইঙ্গিত।
অধিবাসসজ্জ লৈয়া চলে পুরোহিত॥
গোরোচনা হলদি কুসুম ফুলমালা।
তৈল সিন্দুর গুয়া পান খই কলা॥
কঙ্কণ কিঙ্কিণী পাটথোপ বিদমালি।
নানা রত্ন ঝলমল করয়ে কাঁচলি॥
জয়ভেরি বাজে শঙ্খ ফুকরে কাহাল।
দণ্ডি মোহরি বাজে কাঁসর বিশাল॥
ঝলমল কুণ্ডল পরিয়া পাটসাড়ি।
বাহু নাড়া দিয়া আগে চলে পানি চেড়ী
বিবাহ করিব সাধু সাধুর নন্দিনী।
গুণবতী পতি গতি সুমুখী রুক্মিণী॥
বান্ধিল মঙ্গলসূত্র তার বাম ভুজে।
কবিচন্দ্র কহে দেবীর [৫৮] চরণপঙ্কজে।•॥

ঘণ্টা বাজে শঙ্খ ভেরি হরষিত হইল পুরি
সত্যবতী দেই জয় জয়।
সুখাসনে চাপে সাধু মনে জপে বৃষকেতু
দ্বিজগণে মঙ্গল গায়॥
চলে সাধু ধূস দত্ত
বিভা করি মনেতে আনন্দ।
পটহ তেঘাই দড় ঝনঝান কাঁসর
যোড়া সানি বাজে মৃদঙ্গ॥ ধ্রু॥

সাজিল যত করী তথি পর আমারি
মাহুত চাপিল তার কান্ধে॥
ইষ্টকুটুম্ব যত সাজিলেক কার্ত্তিক
যার যেবা সাজে পরিবন্ধে॥
কাড়া বাজে তাধিক মনেতে পাইয়া সুখ
রড়ারড়ি আগু করি ধায়।
ঘাঘর কটির মাঝে চরণে নূপুর সাজে
টেঁণ্টা না টাটুনি মাথায়॥
গুড় গুড় ধাঁ ধাঁ ধাঁ ঘন বাজে দামা
নাগরা বাজে দিমি দিমি।
বিভারম্ভে হরষিত নাচয়ে নর্ত্তকী যত
তোলপাড় করয়ে মেদিনী॥
পুগ নাগদল সন্দেস মছয়
যাহাতে ভেটিব সভাজন।
চিপট মুড়কি দধি সর্জ্জ লৈয়া নানাবিধি
ভারী চলে পঞ্চাশ জন॥
গণ্ড ফিরিয়া বুলে পত্তিক রঙ্গনি খেলে
ঘন ঘন হানে ধূলাবাণ।
হায় হাক ছুছন্দরি হরষিত মারামারি
সিনি ছোড়ে বজ্র সমান॥
উপনীত নিকেতনে যতেক কুটুম্বগণে
মধ্যেতে করিয়া ধূসদত্ত।
দেখি দ্বিজ গুরুজন তেজিলেক সিংহাসন
উঠিয়া করিল দণ্ডবত॥
আনি দিল আসন বসিতে কুটুম্বগণ
কর্পূর তাম্বূল খায় সুখে।
আসি দত্ত নারায়ণ দেখিয়া হরষিত মন
বরমাল্য দিলেক কৌতুকে॥

বিচারিয়া শুভক্ষণ অধিবাস আরম্ভণ
বেদধ্বনি করে দ্বিজবরে।
ত্রিপুরাচরণ আশে কবিচন্দ্র মধু ভাষে
পূজিলেক হরের কুমারে ॥০॥

॥ মঙ্গলরাগ ॥

জল সহিতে চলিল রামাগণ
কক্ষে লইয়া হেমবারি।
দ্বারে আলিপনা দেইত অঙ্গনা
ঘরে ঘরে লয় বারি ॥
পুগ নাগদলে সিন্দুর কজ্জলে
সেই প্রমদার হাথে।
দ্বিজ আদি নারী ভ্রময়ে ঘরাঘরি
হংসগামিনী পদে পদে ॥
[৫৯ক] যত রামা মেলি দেই হুলাহুলি
মঙ্গলে অবলার রোল।
বপু উল্লসিত বাজে নানা বাদ্য
তা তা দিমি দিমি বোল ॥
পট্টহ দগড় তেঘাই কাঁসর
মৃদঙ্গ দগুি মোহরি।
সানাঞি সঙ্গীত গায় অবিরত
সারেঙ্গ বাজে শঙ্খ ভেরি ॥
গৃহে উপনীতা যতেক বনিতা
থুইল নিঞা হেমবারি।
ডাকিয়া নাপিত আনিল ত্বরিত
কামায় রুক্মিণী সুন্দরী ॥
কাটিয়া পুখরি রোপিয়া রম্ভা চারি
মধ্যেতে থুইল দুসদি।
দিয়া জয়ধ্বনি আনিঞা রুক্মিণী
গোরি মাথায়ে যুবতী ॥
পূর্ণিতা গর্গরি আনিঞা ভরি ভরি
স্নান করাইল তারে।
হুলাহুলি দিয়া সূত্র বেঢ়িয়া
সুবেশ করে লৈয়া ঘরে ॥

হাঁগুি মঙ্গলিতে বসিলা চারি ভিতে
বস্ত্র আচ্ছাদন শিরে।
ঢালিল তণ্ডুল ভরি সাত বার
রুক্মিণী ডাকে ধীরে ধীরে ॥
বরিতে জামাতা চলিল কনকা
ঔষধ দিয়া নানারূপ।
চণ্ডীপদ আশে কবিচন্দ্র ভাষে
জ্বলিল ঘৃত প্রদীপ ॥০॥

॥ মঙ্গল রাগ ॥

স্বস্তিবাক্য দ্বিজবর যত মেলি।
নাগরী সুন্দরীমুখে জয় হুলাহুলি ॥
জামাতা বরিল দিয়া বসন যুগল।
গন্ধমাল্য কনকের অঙ্গুরি কুণ্ডল ॥
হরিষে সাধুর ঘরে যত বরনারী।
কেহ গীত গায় বাজে দোসরি মোহরি ॥
বরিল কনকাবতী দধি ঢালি পায়।
মালতী ফুলের মালা গড়াগড়ি যায় ॥
পাটসূতা দিয়া যুখিল মুখ হাথ।
গলায় মনোর দিয়া ফিরে বার সাত ॥
ঈষত প্রকাশে সাধু নয়নকমল।
প্রভাত সময় যেন ফুটে শতদল ॥
ছামনি করি সাধু চাপে গজরাজে।
কবিচন্দ্র কহে দেবীর চরণপঙ্কজে ॥০॥

॥ মল্লার ॥

ভবানী শিবানী নারায়ণী অমলা।
মোহিনী রোহিণী সীতা সন্তোষী কমলা ॥
মাধবী বল্লবী দুর্গা বসন্তমল্লিকা।
সুধামুখী যশোদা শচী চম্পিকা রাধিকা ॥
[৫৯] দেখিয়া সাধুর রূপ যতেক অবলা।
আঁখি আঁখি ঠারাঠারি হৃদয় চঞ্চলা ॥
যেন হাণ্ডি তেন সরা বিধির ঘটন।
হেম মরকত যেন অভেদ মিলন।
হরগৌরী আরাধন কৈল ভাগ্যবতী।
তে কারণে বিধি হেদে দিলেক সুপতি ॥

পূরব জনমে মোরা কত কৈল পাপ।
পাপের ফলেতে মোরা পাইল পতিতাপ ॥
আমার পতির কথা শুন হেদে সই।
তুমি সে দুঃখের দুঃখী তেঞি তোরে কই ॥
উঠিয়া না দেই পাশ বড় গতকণ্ডুকা।
কোণের ভিতর থাকে যেন ভেকাচকা ॥
আর রামা হাস্যা বলে তুমি তবু ভাল।
ছয় বুড়ির তৈল আনি এক গোদে গেল ॥
আর রামা বলে দিদি শুন গো বল্লভা।
জীয়ন্ত ভাতারে আমি হইলাঙ বিধবা ॥
চারি পণ পোস্ত খায় গায়ে নাহি বল।
যুগল করের খাড়ু বেচিল সকল ॥
বসন্তী বলেন সই মোর কথা শুন।
আমার ভাতারের আছে ত্রিকূট লক্ষণ ॥
নাসা অগ্র নাহি তার দশনবর্জ্জিত।
সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টিত দাদু দেখিতে কুৎসিত ॥
নিজ পতিনিন্দা করে যত দুষ্ট জন।
সুমতি রহিয়া তবে বলিল বচন ॥
শুন গো দুর্ম্মতি রামা ছাড় দুরাচার।
পতির নিন্দন নহে স্বধর্ম্ম বিচার ॥
পতিব্রতাধর্ম্ম কহি শুন লো দুর্ম্মতি।
একভাবে শুন হেদে পুরাণ ভারতী ॥
যুবতীর দেবতা পতি শুন সীমন্তিনী।
পতির সেবায় তুষ্ট হরত্রিনয়নী ॥
পতির চরণামৃত ভক্ষে যেই নারী।
অচিরাতে স্বর্গ লভে দুই লোকে তরি ॥
অন্ধ কুষ্ঠ পতি হেলা করে যেই জন।
সহস্রাব্দ [৬০ ক] হয় তার নরকে গমন ॥
এ বোল শুনিঞা যত দুর্ম্মতি অবলা।
মুখে না নিঃসরে বাণী টুটে ইন্দ্রকলা ॥
সুমতি কুমতি কথা শুনে সর্ব্বজন।
বিরচিল কবিচন্দ্র ত্রিপুরা স্মরণ ॥০॥

॥ মঙ্গল ॥

মঙ্গল উচ্চারে বাজে মধুর মাদল।
সাধুর মন্দিরে জয় জয় কোলাহল ॥
মধুরিম কাঁসর বাজয়ে জয়শঙ্খ।
পুষ্পরথে কন্যা সাধু গজনিরাতঙ্ক ॥
অনেক দুন্দুভি বাদ্য বাজে দিমি দিমি।
ধনি ধনি বর কন্যা করয়ে ছামনি ॥
সগুড় চাউলি পেলে ছামনির শেষে।
কন্যা দান করে সাধু মনের হরিষে ॥
ব্রাহ্মণ সকলে দিল বুঝিয়া দক্ষিণা।
গায়ন গণক ভাটে যে কৈল যাচনা ॥
ভোজন করিয়া সুখে বঞ্চিলেক রাতি।
প্রভাতে চলিল সাধু লইয়া যুবতী ॥
সাধুরে মন্দিরে বড় বাড়িল কৌতুক।
নাথর দ্বীপের লোক দিলেক যৌতুক ॥
বিবাহ করিয়া সাধু গেল নিজ স্থানে।
বিপরীত দেখে রাজা রজনী স্বপনে ॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥০॥

॥ অষ্টম পালা গীত সমাপ্ত ॥

॥ ধানশী রাগ ॥

বর্দ্ধমানে নিবসে সুরথ নৃপমণি।
প্রতিদিন মহারাজা পূজে শূলপাণি ॥
মহামায়া না পূজে সুরথ মহারাজা।
সিংহবাহিনী তার বুকে অষ্টভুজা ॥
পূজিলে না মোরে তোর হব সর্ব্বনাশ।
স্বপন কহিয়া দেবী চলিল কৈলাস ॥
নয়নে ছাড়িল নিন্দ একেলা নিশীথে।
অনভীষ্ট দেখিয়া বসিয়া ভাবে চিত্তে ॥
বিচক্ষণে নিবেদিত হউক প্রভাত।
না জানি কি শুভাশুভ কোন পরমাদ ॥
আনাইয়া পণ্ডিত জনে হয় দণ্ডপাত।
রজনীর কথা কহে বসুমতীনাথ ॥
সিংহপৃষ্ঠে নৃমুণ্ডমালিনী অষ্ট হাথ।
আমার হৃদয়ে কহে শুভাশুভ বাত ॥

বিবাহ করিয়া সাধু গেল নিজ স্থানে।
স্বপনের কথা রাজা কহে সভাজনে॥
গুবাক সন্দেশ দিয়া নিবেদে সুরথে।
বিবাহ করিল আমি তোমার প্রসাদে॥
স্বপনের কথা শুনি ডর লাগে বুকে।
প্রতিমা আনিঞা তুমি পূজ সেইরূপে॥
আপুনি বাঁচিবে যদি রাখিবে জগত।
ধুসদত্তে পান দেহ শুন হে সুরথ॥
প্রবোধার বচনে নৃপতি মনে গুণে।
ধুসদত্তে পান দেই প্রতিমা কারণে॥
চল সাধু আন গিয়া কবিচন্দ্র ভনে।
কারিকর আছে ভাল মানিকা পাটনে॥০॥

॥ ছন্দ ॥

সাধুর নন্দন সাধু নামে ধুসদত্ত।
করিল গৌরব তারে নৃপতি সুরথ॥
বিদায় করিয়া নৃপচরণকমলে।
যাত্রা করিবারে গেল আপন মন্দিরে॥
শুভক্ষণ গণে সাধু আনাইয়া গণক।
ঘটে চূতডাল দিয়া পূজে বিনায়ক॥
নিবসে পীযূষনিধি লগ্ন মকরে।
কর্কটে গুরু শুক্র সপ্তমে ঘরে॥
বাম স্বর পায় সাধু শশী বার দিনে।
সকল মঙ্গল বেদ পড়ে দ্বিজগণে॥
সাধুর নন্দন যাত্রা করে হেন কালে।
দুই দিকে জয় জয় শঙ্খ ফুকরে।
দক্ষিণে ব্রাহ্মণ বন্দে বামে পূর্ণঘট।
বিমল ধবল ধান্য দেখে শুভ্র পট॥
দধি নিবে গোয়ালিনী ডাকে ঘনে ঘন।
আনিল ধবল পুষ্প মালীর নন্দন॥
পল্লবিত তরুবর দেখিল সমুখে।
অনুকূল পবন কোকিলী বামে ডাকে॥
সাধুরে প্রণাম করে যুগল যুবতী।
হাসি হাসি বলে সাধু হইয় পুত্রবতী॥
সাধুর নন্দিনী দুই কনকপুত্তলি।
বিদায় করিল দুহেঁ দিয়া আতাঞ্চলি॥
[৬১ক] নয়নের জল খসে মনে ভাবে দুঃখ
নিকটে রহিল রামা করি অধোমুখ॥
প্রভু পরদেশ যায় আমি অভাগিনী।
একেলা বঞ্চিব সখি কেমতে রজনী॥
হিতাহিত বুঝি বলে সাধুর নন্দন।
শুন শুন প্রিয়ে চল আপন সদন॥
বিষাদ না কর প্রিয়ে হাম পরাধীন।
রজনী এড়িয়া চাঁদ রহে কতদিন॥
ধীরে ধীরে যায় সাধু প্রবোধিয়া নারী।
ডাহিনে থাকিয়া বামে চলিল শৃগালী॥
আগে দ্বিজ ইষ্ট মিত্র কুটুম পশ্চাত।
কারে কোল দেই সাধু কারে প্রণিপাত॥
চল নিজ ঘরে মোরে করিয়া কল্যাণ।
বিদায় করিয়া চলে সাধব প্রধান॥
ছোট বড় শত জন করিল মঙ্গল।
জল নাহি খসে আঁখি করে ছল ছল॥
গাঁট্যার গাবর জয় জয় কোলাহলে।
নৌকায় চাপি যান সাধু অজয়ের জলে॥
দোহট্ট উপর বান্ধে ধবল চামর।
বাহ বাহ বলি ডাকে ছাড়ে ঘোরতর॥
দিমিকি দিমিকি বাদ্য বাদে সারি গায়।
বাজল কিঙ্কিণী হাথে ঘন দাণ্ড বায়॥
দুই দিগে বাহ বাহ পড়িল বিদণ্ডা।
চলিল পবনগতি নূতন তরঙ্গা॥
তবকী তবক ছোড়ে বাজে সিন্ধুযান।
কেহ গীত গায় কেহ হানে ধুলাবাণ॥
জয় জয় করে কেহ পুরে সিংহনাদ।
সিনিদার পেলে সিনি যেন বজ্রাঘাত॥
ঈষত পবনে ঢেউ তাল পরমাণ।
দেখিয়া কল্লোল সাধু কাতর পরাণ॥
সাবধানে দৃঢ় মুষ্টি করে কেরোয়াল।
ভয় না করিহ মনে বলে কর্ণধার॥

বিলম্ব না করে সাধু বাহে উজবনি।
স্নান করিয়া কূলে পূজে শূলপাণি॥
সাধুর তনয় সাধু অনস্থ চরিত্র।
পূজিল দেবতা পঞ্চ কুবেরের মিত্র॥
ভারত পুরাণ শুনে সাধুর বালক।
দুগ্ধে মিলাইয়া চিনি খায় চিপিটক॥
দেবদ্বিজগুরুভক্ত গুণের নিদান।
কর্পূর দিয়া সাধু খায় গুয়া পান॥
[৬১] ভোজন করিয়া সাধু বঞ্চিলেক রাতি
প্রভাতে চলিল বাহ বাহ শুদ্ধমতি॥
শাঁখারি মোহান বাহে সাধুর নন্দন।
এক ভাটি গেল যথা মালিকা পাটন॥
মালিকা পাটনে ইন্দ্র নরপতি বৈসে।
কবিচন্দ্র কহে চণ্ডীর পদতামরসে॥০॥

তবকী তবক ছোড়ে সিনিদার সিনি।
মালিকা পাটনে লোকে কর্ণে লাগে তালি॥
মেঘ নাহি দেখি পুনঃ পুন গরজন।
কথিল পণ্ডিতে নৃপ বল কি কারণ॥
শুনহ নৃপতি মনে না ভাব বিস্ময়।
পাটনে আইল বুঝি সাধুর তনয়॥
মন্ত্রী মেলিয়া পাঁচে সুচরিত ভাট।
ঝাঁট জান গিয়া সাধু কিবা পরঠাট॥
রড় দিয়া বলে ভাট দাণ্ডাইয়া কূলে।
পরাপর কহ যদি থাকিবে কুশলে॥
ভাটের বচনে বলে নায়ের নফর।
সুরথ নৃপতি যার বর্দ্ধমানে ঘর॥
ত্রিনয়নী ত্রিপুরা কনক অষ্টভুজা।
গড়াইয়া তোমার দেশে পূজিব সে রাজা॥
শুন রে সাধুর সুত কাহ তোরে মর্ম্ম।
ইন্দ্র নরপতি বৈসে সাক্ষাতে যে ধর্ম্ম॥
তাঁর সম্ভাষণে পরিতোষ পাবে মনে।
মিলিব প্রতিমা দ্বিজ কবিচন্দ্র ভনে॥০॥

॥ পয়ার ॥

ভাগীরথী পুলিনে পূজিয়া চন্দ্রচূড়।
নৃপ সম্ভাষণে সাধু হৈল দোলারূঢ়॥
সুবর্ণ পঞ্জরে শুক গজ বেন খাণ্ডা।
অমূল্য রতন লয় ময়মত্তা গণ্ডা॥
যুগল যুগল শশ গৌল কুরঙ্গ।
ব্যাঘ্র ভলুক বনছাগল তুরঙ্গ॥
চক্র চকোর ঘুঘু পিকুমিল রঙ্ক।
শুগু সারিক নয় ধুকড়িয়া কঙ্ক।
সাধুর হৃদয় বড় বাড়িল প্রমোদ।
ডাহুক গণ্ডুক নয় ঘুরণ কপোত॥
কলসে পুরিয়া ঘৃত তৈল লবণ।
মধু মিষ্ট নারিকেল সুরঙ্গ বাগুন॥
পাট ভোট নেত নয় ময়মল্ল গণ্ডা।
ক্ষীরের সন্দেশ পুলি মধু কাকরণ্ডা॥
তেলঙ্গা ছাগল খাসি যুঝার গারড়।
পঞ্চ রতন লয় [৬২ক] ধবল চামর॥
নানা সজ্জ লয় সাধুসুত নিরাতঙ্ক।
কনকরচিত গজদন্তের পালঙ্ক॥
বাঙ্গালি খেলায় পত্তি করে কোলাহল।
দাণ্ডা মোহরি শঙ্খ ফুকরে কাহাল॥
গুড় গুড় দগড় বাজে মধুর কাঁসর।
আগে পাছে ধায় যত পাইক সকল॥
এক বাঁক দুই বাঁক তিন বাঁক যায়।
কোথা ফুলহাট পড়ে গন্ধ বিকায়॥
বিবাদে গারড় কেহ কুক্কুট যুঝায়।
সুখীর নন্দন কোথা পায়রা উড়ায়॥
দোলারূঢ় কেহ গজ তুরগর তায়।
নানা বাদ্য বাজে কোথা বরকন্যা যায়॥
কেহ গীত শুনে কেহ কোথা দেখে নাট
দেখিয়া উত্তম জনে স্তুতি করে ভাট॥
ডাকাচুরি নাহি কোটোয়াল দুরাচার।
প্রজার পালন দেখি উচিত বিচার॥

কপালে চন্দন কার গলে রত্নমাল।
ইতিকে চাপিয়া বুলে নগর্য্যা ছাওয়াল॥
কেহ বেচে কেহ কিনে নাহি অবসাদ।
ছাওয়ালে ছাওয়ালে খেলে পাতিয়া বিবাদ॥
কেহ ধিক নহে কেহ নহে হানবল।
মারামারি করে কেহ পাতিয়া কন্দল॥
কেহ সাতা চারি খেলে কেহ বুদ্ধিবল।
কেহ পাশা খেলে কেহ খেলে ত চৌবল॥
কেহ গেণ্ডু খেলে কেহ কড়ি ভাঁটা টিক।
তরুণ আবাল বৃদ্ধ সকল রসিক॥
চিনিতে না পারে সাধু সুখী দুঃখী জন।
একরূপ দেখে সব মালিকা পাটন॥
ইন্দ্র নৃপতি বৈসে যেন বৃত্রজিত।
সুরুগুরু সমান পণ্ডিত পুরোহিত॥
সাধুর নন্দন সাধু বুঝে হিতাহিত।
রাজার সভায় গিয়া হৈল উপনীত॥
নানা সর্জ্জ দিয়া সাধু রাজার চরণে।
প্রণাম করিয়া বন্দে দ্বিজ পাত্রগণে॥
আপন আসনে বৈসে নৃপনিদেশনে।
চারিদিগে চায় সাধু প্রফুল্ল বদনে॥
কোন জাতি উতপতি কিবা তব নাম।
কাহার নন্দন তুমি ঘর কোন গ্রাম॥
[৬২] কাহার সভায় থাক আইলে কি কারণে।
অমৃত সিঞ্চিল যেন নৃপতিবচনে॥
গন্ধবণিক জাতি ধুসদত্ত নাম।
উৎসাকর দত্ত পিতা ঘর বর্দ্ধমান॥
দেশের ঈশ্বর মোর নৃপতি সুরথ।
তাঁহার সভায় সর্ব্বকাল নিরাপদ॥
কনকপ্রতিমা সিংহপৃষ্ঠে অষ্টভূজা।
গড়াইয়া তোমার দেশে করিব সে পূজা॥
তথির কারণে আমি আইলাঙ পাটন।
তোমার আদেশে দিব যত লাগে ধন॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী॥০॥

॥ সিন্ধুড়া রাগ ॥

দেখিয়া ভেটের সর্জ্জ পরিতোষ মনে।
পান ফুল দিল রাজা পরদেশী জনে॥
দুগ্ধের লড্ডুক পুলি চিনির সন্দেশ।
রান্ধিয়া ভুঞ্জিতে তারে করিল আদেশ॥
চল সাধু কর বাসা আমার নিলয়।
আনিঞা প্রতিমা কালি দিয়াব তোমায়॥
সকুল চিথল মৎস্য সঙ্কুক বই।
রুহিত পাঠীন মিল ত্রিকণ্ঠ ফলই॥
তৈল লবণ খাসি ঘৃত দুগ্ধ দধি।
রন্ধন ভোজন সর্জ্জ দিল নরপতি॥
রাজার চরণে সাধু করিয়া প্রণতি।
রান্ধিয়া ভুঞ্জিয়া দিনে সুখে গেল রাতি॥
পুন দরশন দুহেঁ বসিল সভায়।
রাজা সাধু বড় প্রীতি বাড়িল কথায়॥
কনকপ্রতিমা সিংহপৃষ্ঠে অষ্টভুজা।
আনাইয়া সাধুর তরে দিল ইন্দ্র রাজা॥
নৃপতি সাধব পাশা খেলে রাত্রি দিনে।
বার মাস গেল দ্বিজ কবিচন্দ্র ভনে॥০॥

॥ ছন্দ ॥

সাধুর ঘরের কথা শুন হেন কালে।
যুবতী যুগল দিন গোঙায় কন্দলে।
কেহ বশ নহে প্রভু নাহিক নিকটে।
নিরবধি গালাগালি ভাত নাহি পেটে॥
কন্দলের তরে এক জন নাহি টুটে।
ছোট বড় যত মন্দ বলে হাটে বাটে॥
দেখিয়া রুক্মিণী রূপ বিপক্ষ উলটে।
[৬৩ক] গলিতযৌবনী সত্যবতীর বুক ফাটে॥
ঘোষাল ব্রাহ্মণীর রণ্ডা করাইল ভেদ।
দেখ রুক্মিণীর আমি করি রূপোৎছেদ॥
রবি মুনি চন্দ্র মুনি আদেশ উড়নি।
নিশাভাগ রাত্রে আন সপ্ত ঘড়া পানি॥
তাড়িপত্রের মূল আন গোরোক চাউলি।
তিন কুড়ি আন তুমি কঙ্কটের খুলি॥

শ্মশানের ভস্ম আন কবরমৃত্তিকা।
কন্দলের বেলা ধর যুগল শালিকা॥
পূর্ণ হাট বেসাইয়া যুগল প্রহরে।
আলগছে খই কড়ি স্বামী সঙ্গে মরে॥
ত্রিপথের ধূলি আঁইযহাটার আঁখ্যানি।
লাজায় শিকড় আন আর সূর্য্যমণি॥
কাক চিল মাংস আর আর চিল কুটা।
নিশাকালে উঠিতে ধরিবে চামচটা॥
ধীবর পসারে আন হাইহামলাই।
কুইলা গরুর গাঁজা বড় পুণ্য পাই॥
বানর নাভির মলা আর তিন পল।
নিশাভাগে তালতরু ত্রিদশ সফল॥
একবর্ণ গাভীর দুগ্ধ আন সপ্ত ঘড়া।
চণ্ডাল রন্ধনে অন্ন আন নয় ঝোড়া॥
দেবীর মহোৎসব দিনে শ্মশানে বসিয়া।
মনুষ্যের মুণ্ডের খুলি কজ্জল পাড়িয়া॥
যাহারে নয়ানে দিব শান কুজ বারে।
কটাক্ষে ভুবন তিন মোহিবারে পারে॥
ঔষধ বাটিয়া যার ছিটা দিব গায়।
ব্রহ্মা আদি হরি হর পশ্চাতে গো তায়॥
বানরের মলাতে বানর করে বেশ।
পেচকের নয়ানে উপাড়ি যায় কেশ॥
বাঘজিব খাওয়াইলে বিৎসেদ করায়।
যুবক পুরুষ কমলিনী নাহি ভায়॥
সত্যবতী বলে তবে করপুট করি।
আমার শকতি এত আহরিতে নারি॥
আর কোন উপদেশ বল ঠাকুরাণী।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ রচিত শুদ্ধবাণী ॥০॥

॥ পয়ার ॥

শুন সত্যবতা সই এই উপদেশ।
ঔষধ কুড়াইয়া আন [৬৩] জানিয়া বিশেষ
অনুমৃতার যদি আন শূন্যে করি ভর।
কোউলা বাছুর নাভি হরিণের হড়॥
ব্যাঘ্রের দাড়ির লোম আনিহ যতনে।
শ্মশানের মাটি আন কামিক্ষা বদনে॥
মার্জ্জারের নখ আন নক্রের দশন।
মহিষীগোময় আন করিয়া যতন॥
ত্রেমাত্রা পথের খোলা যুগ্ম আতহাণ্ডি।
যতনে আনিবে দেখ্যা দাগ সাড়া সাড়ি॥
জিয়ঙ্কের চুল আন মাজুরের কাটি।
শূকরের দগ্ধ পূরিয়া লোহার বাটী॥
অসিত বিছাতি আন্যা জ্বালহ প্রদীপ।
কেকলাশ ধরিয়া আন পাইয়া বৃক্ষনীপ॥
বানরের নখ আন বায়সের ঠোঁট।
কোঁচবকের হাড় আন জোড়া পানের ঠোঁট॥
নিমের তরুতে থাকে পেচকের বাসা।
আনিতে তাহার মাংস করিবে ভরসা॥
শৃগালরসনা আন গিধিনীর নাদি।
মশার নকুড় আন আর আকবাদি॥
ভাওবার কুটা আন দশনে ধরিয়া।
ভেকের রুধির আন পরাণ রাখিয়া॥
শুশুকের তেল আন মরালের ডিম।
কুকুরের লোম আন সলিলের বিম॥
শিঙ্গিমৎসের পোটা আন ভেদকের আঁশি।
শ্মশানভাগের বালি নিশিভাগে বসি॥
অযুগ্ম পথের ধূলি হাইহামলাই।
মনুষ্যের মুণ্ড আন আর বিড়াল ছাঁগ্রি॥
এতেক কহিল সই ঔষধের গোড়া।
আন্যা দেই কন্যা দিব যেন ধূল মোড়া॥
আর পালট আছে সই বল্যা দিব তোরে।
এতগুলি দ্রব্য যদি পার আনিবারে॥
শুনি সত্যবতী বলে সইয়ের সমুখে।
এমন ঔষধ সই হয় বড় দুঃখে॥
সাধুর রমণী হইয়া ঔষধ উদ্দেশে।
কেমনে ভ্রমিব আমি প্রভু পরদেশে॥
এসব ঔষধ কৈলে জানিব [৬৪ক] রুক্মিণী।
সাধু আইলে বল্যা দিতে পারে চেটি পানি ॥

ও কথা করহ দূর পড়ি গেল মনে।
নিজো টন করি দেহ দুঃখের রক্ষণে ॥
মিথ্যা করি পত্র লিখ প্রভুর আদেশে।
বিরচিল কবিচন্দ্র ত্রিপুরার দাসে ॥০॥

॥ বারাড়ি ॥

লিখিল কপট পত্র দিয়া পতি নাম।
রুক্মিণী তোমার দাসী আমার পরাণ ॥
আপনার মাংসে মৃগ জগতের বৈরি।
প্রথম যৌবন শিশু তরঙ্গসুন্দরী ॥
যার প্রভু ঘরে নাঞি প্রথম যৌবনে।
তাহার উচিত দুঃখ ভুঞ্জে দিনে দিনে ॥
শুন ল রুক্মিণী তুমি প্রাণের বহিনী।
প্রভুপত্র শুনি মুখে না নিঃসরে বাণী ॥
বুলিতে না দিবে কোন প্রতিবাসী ঘরে
পরিতে না দিবে তারে বসন ধবলে ॥
হিতাহত কহি প্রিয়ে শুন সত্যবতী।
রুক্মিণীর রূপে যেন জাতি হয় স্থিতি ॥
উদর পুরিয়া অন্ন না দিবে তাহারে।
যাবদ না যাই আমি আপন মন্দিরে ॥
আসিয়া প্রভুর পত্র পড়হ আপনি।
কেমতে তোমারে দুঃখ দিব গ বহিনী ॥
লংঘিতে প্রভুর বাক্য হয় অপরাধ।
বাহিনীকে দুঃখ দিব উভয় প্রমাদ ॥
কান্দে সত্যবতী মুখে করিয়া বেদনা।
হৃদয় আনন্দ আঁখি খসে জলকণা ॥
না জানি রজনী দিন করে গালাগালি।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া বাশুলী ॥০॥

[৬৪] ॥ সুই রাগ ॥ একাবলী ॥

দুঃখ দিতে মোরে কার বাপে পারি।
কুশলে থাকুক জীবনাধিকারী ॥
গৌরবে থাক ল না ঘাঁটা মোরে।
কোন লাজে সহি প্রভুর ডরে ॥
আমি শেষ পত্নী জ্যেষ্ঠ বহিনী।
তাই সুখী কত বলে কুবাণী ॥
আসুক সাধু তুমি তার মোক্ষা।
ঘরে ঘরে বুল নাহি অপেক্ষা ॥
আন পানি শুনওঁ মোর সাক্ষী।
কেনি গালি দেই গতকশুকী ॥
নাহি করি চুরি না করি দার।
ঘরে ঘরে বুলি দোষ আমার ॥
ডর লাগে তোর দেখিয়া গলা।
ঘরে থাকি শিখহ তাই নকলা ॥
আপনা না চিন কি বলি তোরে।
আন বিরালি আছ কত দূরে ॥
দুহেঁ স্বতন্তর প্রভু নাহি ঘরে।
দেখিব কে নাচে কার দ্বারে ॥
আঁখি খায়্যা মার মাঝ্যায় মাছ।
মর পড়ুক তোর মুণ্ডেতে বাজ ॥
কবিচন্দ্র বলে বাঢ়িল কালি।
কাপড় বান্ধিল দুহেঁ কাঁকালি ॥০॥

॥ মল্লার ॥

ঝুটাঝুটি করি ছিণ্ডিল কাঁঠা।
কেহ নিজি নহে দুজনে চাঁটা ॥
পাড়া পাড়া বুল দ্বারীর পারা।
প্রথম যৌবনে কত চেগরা ॥
থাক লো নাখাকী তুরত সতী।
ঝুটি ধরি পাছে মারেঁায়ে লাথি ॥
হাণ্ডি পর খাকী না কর ডর।
মোরে অশাঞ্জসি আপনি চোর ॥
চুপ দিয়া থাক আ ল রাক্ষসী।
ভাল মন্দ জানে পাটপড়শী ॥
চর্চ্চা যেবা আমার নাঞে।
আগুন জালিয়া দেউ তার মুঞে ॥
ভাল মন্দ করি চাহি কি তোরে।
রাখিতে কাটিতে প্রভু সে পারে ॥

[৬৫ক] আপনার পায় তোরে দিয়া বলি।
আলতা পরিব রূপে আগলি ॥
আ লো ধুড়ামুড়ি পাড়াকন্দলী।
লাজ নাঞি ছি ছি খাঁখার ডালি ॥
দুই গালে মারি দুই মুঠকি।
কারে গালি দেই আই ভাইখাকী ॥
গালে হাত দিয়া রহিল পানি।
বলে মর তোরা দুই সতিনী ॥
সাধুর ঘরে মারামারি শুনি।
রড়ে আইল যত প্রতিবাসিনী ॥
আলুয়া খাইয়া গায়ে বাড়্যাছে বল।
রাত্রি দিনে কত কর কন্দল ॥
জাতি মজায়িনী বান্যার ঝি।
শুনিলে মাহুষে বলিব কি ॥
কবিচন্দ্র বলে মধুর বাণী।
ঘুচিল কন্দল দুই সতিনী ॥০॥

॥ একাবলী ছন্দ ॥

পাঁচ ছয় রণ্ড মেলি।
রুক্মিণীরে দেই গালি ॥
ছি ছি লাজ নাহি মুখে।
মন্দ বল সতিনীকে ॥
তোমারে কে বলে সতী।
প্রভুর লংঘ ভারতী ॥
এই বোল শুনিঞা কানে।
রুক্মিণী হৃদয়ে গুণে ॥
তেজিল বসন ভাল।
আর যত অলঙ্কার ॥
চরণে পড়হু দিদি।
অপরাধ ক্ষেমহ সতী ॥
তুণ্ডে দিয়া মোরে ভাত।
পুষিলে বৎসর সাত ॥
না ঘুচি দৈবের বাণী।
বহিনী দুই সতিনী ॥
দু বহিনে এক প্রাণ।
কুদিনে করিল আন ॥
বৈরী করিমু করি সোস।
দাসীরে না দিহ দোষ ॥
মধুর গদ্গত বাণী।
রুক্মিণীর মুখে শুনি ॥
মনে দুঃখ প্রায় বাসি।
সত্যবতী বলে হাসি ॥
বহিনী শুন লো সুকেশী।
যদি হইলে মোর দাসী ॥
দুঃখ ভুঞ্জ দিনে দিনে।
কথিয় প্রভুর চরণে ॥
আতুয়াসে দিয়া ছড়া ঝাটি।
মার্জ্জে গাড়ু ঘটী বাটী ॥
প্রত্যহ প্রভাত কালে।
ভোজন পাত্র পাখালে ॥
ভাত খাব যত জনে।
দিনে তার ধান ভানে ॥
আচরিতে যত জল।
রুক্মিণী বহে সকল ॥
প্রতিদিন পায় দুঃখ।
রহিত সকল সুখ ॥
প্রভাতে সাধুর নারী।
হৃদয় ভাবিল গৌরী ॥
তুমি ত্রৈ[৬৫]লোক্যের মাতা।
লিখিলে এমন ব্যথা ॥
পূর্ব্বে কৈল কত পাপ।
সভায় বেচিল বাপ ॥
উত্তম যুবতী কাছে।
নাহি যাই আমি লাজে ॥
নিবেদিয়ে তব পায়।
প্রাণী কেন নাহি যায় ॥
দুঃখিনী রুক্মিণী নারী।
কৈলাসে জাগিল গৌরী ॥

বাশুলী যোগিনীরূপে।
নামিল পাথর দ্বীপে॥
সাধুর দুয়ারে ডাকে।
অতিস গোরক্ষ জাগে॥
কে আছে সাধুর ঘরে।
ভিক্ষা আনি দেই মোরে॥
রুক্মি কলস কক্ষা।
আনিল মানিক ভিক্ষা।
দেখিয়া যোগিনী মুখ।
বিসরিল সব দুঃখ॥
আনন্দে পূরিত দেহ।
দুঃখিনীর ভিক্ষা লহ॥
শুনিয়া রুক্মিণীবাণী।
হাসিয়া বলে যোগিনী॥
কাহার নন্দিনী তুমি।
সাধুর মন্দিরে কেনি॥
না দেখি আপতি চেটী।
কেনি ঘটাস্কৃত কটি॥
সত্য বল মোরে বাণী
কোন দোষে পর কানি॥
কহি কর অবধান।
তব পদে পরণাম॥
জন্মিঞা পাপিনী ঝিয়ে।
সোসে পানি নাহি পিয়ে॥
ভোখে নাহি খাই ভাত।
দত্ত নারায়ণ তাত॥
স্বামী আছে পরদেশে।
কান পরি কর্ম্মদোষে॥
দুঃখ নহে মোর কথ্য।
সকলি তোমারে বেদ্য॥
দারুণ সতিনী ঘরে।
প্রাণ কাঁপে তার ডরে॥
এ বোল শুনিঞা অম্বা।
হৃদয় জন্মিল দয়া॥

আইস আইস বলোঁ ঝিয়ে।
আর দুঃখ নাহি তোয়ে॥
পূজিহ আমার পদ।
যদি হবে নিরাপদ॥
তুমি তো রে নাহি জান।
বাশুলী আমার নাম॥
পরিচয় দিল তোরে।
আমি থাকি সুরপুরে॥
প্রভু তোর পরবাসী।
কালি ছিল উপবাসী॥
নিকটে আসিব দেশে।
বসিব তোমার পাশে॥
বর দিয়া মাহেশ্বরী।
চলিল কৈলাস গিরি॥
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে।
চণ্ডিকার দোষ সহে॥০॥

॥ বারমাসী ॥

নব জলধর উইয়ে ঘন গরজন।
[৬৬ক] সঘন দাদুরিধ্বনি স্থির নহে মন॥
বিজুরি তিমির হয় ঘন খসে জল।
একেলা পাইয়া বল করে পঞ্চশর॥
সই ল শ্রাবণ মাসে মাসে।
প্রথম বরষা ঋতু প্রভু নাহি পাশে॥ ধ্রু॥
আইল ভাদ্র মাস বরষা অবশেষ।
মুসরি সয়া কেহ করে নানা বেশ॥
প্রভু কোলে করি কেহ সুখে বঞ্চে রাতি।
আমাধিক নাহি কেহ অভাগী যুবতী॥
সই গো কি কহিব কথা কথা।
না মিলে তাম্বুল তৈল সিন্দুর সিথা॥
প্রথম শরৎ ঋতু আশ্বিন মাসে।
মেঘে অল্প জল হয় প্রসন্ন আকাশে॥
তৃষায় চাতক পক্ষ ডাকে পিউ পিউ।
প্রভুকোলে না দেখি চমকি উঠে জিউ॥

শুন প্রাণের বহিনী বহিনী।
শয়নমন্দিরে আমি বঞ্চি একাকিনী ॥
দেখিয়া সিন্দুররেখ যুবতীসিথায়।
কার্ত্তিক মাসেতে ইন্দ্রধনুক লুকায়।
কর্দ্দম শুখায় আমি যাব কোন দেশ।
প্রভুগুণ স্মঙরি পাঁজর হইল শেষ ॥
সই গো দেখিয়া যে লাভ লাভ।
দারুণ সভায় বিভা দিলেক মা বাপ ॥
হিম পরবশে নবশস্ত প্রতি ঘরে।
কেহ খাটে শোয়ে কেহ পালঙ্ক উপরে ॥
তুলির শয়ন কারো কেহ উড়ে পাড়ি।
মাইসর সাসেতে কেহ উভয়ে পাছুড়ি ॥
সই গো কি বলিব তোরে তোরে।
প্রভুগুণ স্মঙরি হৃদয় বিদরে ॥
শাক সূপ ঘণ্ট ঝোল এ বাসী ব্যঞ্জন।
কৌতুকে করয়ে কেহ নবান্ন ভোজন ॥
ভোজনের শেষে কেহ খায় দুগ্ধ দধি।
প্রভুকোলে শীত ঘুচে সুখে যায় রাতি ॥
সই গো এলা পৌষ মাসে মাসে।
আশ্বাস করিয়া প্রভু গেল পরবাসে ॥.
বিকশিত কমল ভ্রমর নাহি বনে।
কত দিন রহে মধু তাহার কারণে ॥
প্রভু নাহি নিকটে চিন্তিব কত মনে।
যৌবন পানির ফোটা যায় দিনে দিনে ॥
সই গো মাঘ মাসের দুঃখ নাহি টুটে।
না জানি কি বিধি দুঃখ লেখিল ললাটে ॥
[৬৬] শুনিল কামের দূত আইলা বসন্ত।
হরষিত হইল অলি পিয়ে মকরন্দ ॥·
ফুটিল মাধবী লতা ফাল্গুন মাসে।
পুণ্যবতী যুবতী সে পতি যার পাশে ॥
সই গমন নহে স্থির।
দোয়ালা পবন বহে বিষম শিশির ॥
নানা ফুল ফুটে বৃক্ষ সকল মঞ্জরে।
মলয় পবন বহে শ্রমজল হরে ॥
কোকিল পঞ্চম গায় কামসহচর।
মধুকরী সঙ্গে কেলি করে মধুকর ॥
সই গো শুনল কামিনী কামিনী।
মধুমাসে উইয়ে শশী দুঃসহ যামিনী ॥
উড়ে বৈসে মধু পিয়ে বিকসিত মালি।
পরাগ ধূসর মধুকর মধুকরী ॥
সিন্দুর কাজর পরে সুগন্ধি চন্দন।
যুবতীর কোলে যুবা জুড়ায় মদন ॥
সই গো বৈশাখ মাসে মাসে।
প্রথম সুন্দরী রামা প্রভু পরবাসে ॥
ভাতে নাহি পেট ভরে কি কাজ জীবনে।
কত আমি একেলা খাটিব রাত্রি দিনে ॥
একা বাসে বঞ্চিবারে করিব যাচনা।
প্রভু ঘরে নাহি মোর কে জানে বেদনা ॥
সই গো জ্যৈষ্ঠের নিদাঘে নিদাঘে।
সুগন্ধি চন্দনগন্ধ কেহ লেপে দেহে ॥
প্রভাতে উইল রবি প্রচণ্ড কিরণ।
এত দুঃখ পাই তবু না যায় জীবন ॥
পুরুবজনমে আমি কত কৈল পাপ।
তখির কারণে ভুঞ্জি দারুণ সন্তাপ ॥
সই গো আষাঢ় মাসে মাসে।
যুবতী না ছাড়ে পতি বঞ্চে এক বাসে ॥
অকারণে কর সতী সতিনীকে ভয়।
ত্রিপুরা সন্তোষ তোরে জানিল নিশ্চয় ॥
সুবেশ হইয়া সুখে নিবস মন্দিরে।
আপনি মিলিব অলি কমলিনীকোলে ॥
সই গো না ভাব বিষাদ বিষাদ।
কহে কবিচন্দ্র কালি পাবে প্রাণনাথ ॥০॥

॥ ছন্দ ॥

হেন কালে সত্যবতী রজনীর শেষে।
দেখিল স্বপনে এক বধূ বুকে বৈসে ॥
বিকট দশন কাতি কর্পর[৬৭ক]ধারিণী।
প্রেতাসনে ভগবতী নৃমুণ্ডমালিনী ॥

যদি না ঘুচাহ তুঞি রুক্মিণীর দুঃখ।
করিব রুধির পান বিদারিয়া বুক॥
নয়নে ছাড়িল নিন্দ নাহি দেখে কারে।
এ বোল শুনিঞা থরথর কাঁপে ডরে॥
পোহাইল রজনী কোকিল ডাকে ডালে।
আসিয়া মেলিল পানি চেটী হেন কালে॥
সত্যবতী বলে পানি চল রড় দিয়া।
ঝাট আন গিয়া রুক্মিণীরে ডাক দিয়া॥
রাত্রি দিবা নিরবধি মনে মনে গুণি।
বড় দুঃখ পায় মোর অনুজ্ঞা বহিনী॥
প্রভুর বচনে তাঁরে নাহি করি দয়া।
যত লোক মোরে মন্দ বলে না জানিঞা॥
এ বোলে চলিল পাতি রুক্মিণীর ঠাঞি।
বড় মা তোমারে ডাকে শুন গো সতাই॥
তোমারে সন্তোষ বিধি হৈল সুদিবস।
সর্ব্ব দুঃখ ঘুচে বুঝি প্রসন্ন মানস॥
চলিল রুক্মিণী ধীরে ধীরে হংসগতি।
উপনীত হইল যথা আছে সত্যবতী॥
দাণ্ডাইল সত্যবতী দেখিয়া রুক্মিণী।
কোলে করি চুমা দেই বলে প্রিয়বাণী॥
অষ্ট অলঙ্কার পর যথা যেই সাজে।
তোমার দুঃখে মুণ্ড নাহি তুলি লাজে॥
প্রাণের বহিনী মোর বৈস সন্নিধানে।
যত কিছু পাইলে দুঃখ না ভাবিহ মনে॥
যতেক বিবিধ লোক ত্রিভুবনে বৈসে।
একে একে সভে দুঃখ পায় গ্রহদোষে॥
এ বোল শুনিঞা বলে সুমুখী রুক্মিণী।
প্রধান সতিনী মোর তুমি ঠাকুরাণী॥
যথা যেই সাজিল পরিল অলঙ্কার।
দু বাহনে সুখ ভুঞ্জে দ্বন্দ নাহি আর॥
সুদিনে রুক্মিণী পুষ্পবতী শুভক্ষণে।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাচরণে॥০॥

॥ মল্লার ॥

সত্যবতীর বোলে পানি জানাঞিল পাড়া।
রুক্মিণীর আনন্দে করিতে পানি কম্পড়া॥
পেলিয়া কাঁখের কুম্ভ কেহ যায় রড়ে।
কাপড় সম্বরে নাহি কোথা উঠে পড়ে॥
আর শুন্যাছ আগো সই সাধুর ঘরের ডাক।
[৬৭] যাইবারে সভাকারে বাজে জয়ঢাক॥
কেহ পানি বহে কেহ কর্দ্দম খেলায়।
কেহ গীত গায় কেহ মৃদঙ্গ বাজায়॥
রড় দিয়া বুলে কেহ করে জলকেলি।
বসন পেলিয়া কেহ করে কোলাকুলি॥
গালাগালি মারামারি ঘন মুখে হাস।
আকুল চিকুর কার বুকে নাহি বাস॥
সধবা বিধবা নাচে হরষিত মতি।
বিবসন হইয়া নাচে সাধুর যুবতী॥
করতালি দেই সত্যবতী হাসে ঘন।
ধরি যত যুবতীরে করে বিবসন॥
পুরুষ দেখিয়া বলে না পালাসি ভাড়্যা।
গোময় গিলায় কারে চিত কর‍্যা পাড়্যা॥
করিল কৌতুক যত কেহ নহে রঙ্ক।
তৈল হরিদ্রা মাথে পাখালিয়া শঙ্ক॥
সিন্দুর কজ্জল গুয়া পান খই কলা।
সভে ঘরে লৈয়া গেল সন্তোষ মঙ্গলা॥
সুদিনে রুক্মিণী রামা শুভক্ষণ পাইয়া।
অর্ঘ্য দিল দিবাকরে ব্রাহ্মণ আনাইয়া॥
মঙ্গল করিল দ্বিজ নাঞি প্রতিবন্ধ।
ত্রিপুরাচরণে কহে আচার্য্য মুকুন্দ॥০॥

॥ নবম পালা সমাপ্ত ॥

॥ সিন্ধুড়া ॥

পাঠিল নৃপতি মোরে   মাণিকা পাটনেরে
আইলাঙ প্রতিমার তরে।
বৎসর হইল শেষ   নাহি গেলাঙ নিজ দেশ
না জানি কি কিবা হইল ঘরে॥
কাননে বৈসে বুঝে   ভ্রমর নাই তেজে
সুস্বাদ কমলিনী মধু।
পাশায় দিয়া মন   বাঞ্চল কত দিন
রাহল যুবতীর ঋতু॥

রূপসী এক বধূ স্বপনে দেখে সাধু
বসন্তরজনীর শেষে।
যুবতী পড়ে মনে জাগিয়া বসি গুণে
নৃপতি কিবা করে বসে ॥
নৃপতি ইন্দ্রপদ কমলে সুপ্রভাত
সময়ে সাধু পরকাশে।
হৃদয়ে পুট হাথ করিয়া বলে নাথ
বিদায় দেহ যাব দেশে ॥
সাধুর মধুবাণী শুনিঞা নৃপতিমণি
নয়নে উদগরে জল।
বিধাতা নিরপেক্ষ বাড়ায় মোর দুঃখ
জীবনে আর কোন ফল ॥
নৃপতি করে কোলে সাধু পড়ে ভোলে
নয়নে জলকণা খসে।
প্রতিমা অষ্টভুজা সিংহের পৃষ্ঠে পূজা
করিব নরপতি দেশে ॥
[৬৮ক] পাশাতে দিয়া মন বঞ্চিল কত দিন
বিলম্ব আর নাহি সহে।
ত্রিপুরাপদস্থল কমল মধুকর
মুকুন্দ কবিচন্দ্র কহে ॥০॥

॥ পয়ার ॥

পঞ্চরত্ন পান ফুল প্রসাদ বসন।
পাইয়া পরিতোষ হইল সাধুর নন্দন ॥
বলে যদি থাকে পুণ্য বুঝিব আমার।
তব পদকমল দেখিব আর বার ॥
কনক প্রতিমা সিংহপৃষ্ঠে অষ্টভুজা।
আনিঞা সাধুর তরে দিল ইন্দ্র রাজা ॥
বসুমতীপতিপুত্র চরণকমলে।
বিদায় করিয়া সাধু চলিল দেশেরে ॥
প্রতিমা লইয়া সাধু করিল গমন।
নৃপ বিনে পশ্চাতে গোড়ায় সর্ব্বজন ॥
হেম প্রতিমার পাছে চাপিল ডিঙ্গায়।
মানিকা পাটনে সাধু করিল বিদায় ॥
পাটনের লোক রহে সুরনদীকূলে।
বাহ বাহ বলে সাধু ডিঙ্গার উপরে ॥
ডিঙ্গায় আজাড় বান্ধে সাধুর প্রধান।
এক রোজে গেল যথা শাঁখারী সহান ॥
ভোজন করিয়া সাধু সুখে গেল রাতি।
বর্দ্ধমানে আসি সাধু হইল উপনীতি ॥
রাজসম্ভাষণে সাধু করিল গমন।
রাজার সভায় গিয়া দিল দরশন ॥
রাজারে প্রণাম করি দাণ্ডায় দক্ষিণে।
দ্বিজ পাত্র প্রণমিঞা বৈসে নিজাসনে ॥
প্রতিমার কথা শুনি হৃষ্ট নরপতি।
শুনিঞা দেবীর কথা উল্লসিত মতি ॥
প্রতিমা আনিতে চলে অজয়ের কূলে।
স্ত্রী পুরুষে ধাওয়াধাই সকল নগরে ॥
প্রতিমা লইয়া রাজা আইল মন্দিরে।
নানা বাদ্য [৬৮] বাজে শঙ্খ কাহাল ফুকরে
ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুব্ধ মতি।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥ ০ ॥

॥ সারেঙ্গ ॥

সফল জীবন মোর সফল জনম।
হস্তী ঘোড়া সফল সফল মোর ধন ॥
সফল রাজত্ব মোর ধন্য বর্দ্ধমান।
কেশরীবাহিনী দেবী হইলা অধিষ্ঠান ॥
ত্রিপুরা পূজয়ে রাজা নানা বাদ্য বাজে।
যুবতী সহিত রাজা নাচে উর্দ্ধভুজে ॥
গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য কলা।
আতপ তণ্ডুল মধু ঘৃত শর্করা ॥
মৃগমদ কুঙ্কুম সুরঙ্গ সিন্দূর।
অশেষ বিশেষ সজ্জ আনিল প্রচুর ॥
বিধিমত পূজিয়া ছাগল দিল বলি।
তেজিয়া কৈলাসগিরি উরিলা বাশুলী ॥
দশ বিশ মহিষ আনিঞা দিল বলি।
নানা বাদ্য বাজে পুনঃ পুন হুলাহুলি ॥

ব্রাহ্মণ সকল বেদ পড়ে একমনে।
যুবতী সহিত রাজা ত্রিপুরাচরণে॥
ঘন উঠে ঘন পড়ে করি পুটহাত।
সাক্ষাত ঈশ্বরী বর মাগে ক্ষিতিনাথ॥
ত্রিপুরাচরণে রাজা বলে সবিনয়।
কমলা জঠরে মোর হইব তনয়॥
কেশরীবাহিনী দেবী কথিল ঈশ্বরী।
তোর পুত্র হব রাজা বিক্রমকেশরী॥
বর দিয়া ভগবতী চলিল কৈলাস।
ঘরে গেল ধুসদত্ত মহেশের দাস॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী॥০॥

[৬৯ক] ॥ শ্রীরাগ ॥

যত দুঃখ দিল তোরে শুন ল বহিনী।
প্রভুর চরণে কিছু না বলিহ তুমি॥
চরণে পড়হুঁ দিদি এমু আছে রোষ।
কথিলে কি হব আর নিজ কর্ম্মদোষ॥
ঘরেতে আইল সাধু আনন্দিত হইয়া।
জলঝারি হাথে পানি যায় রড় দিয়া॥
দেখিল নয়নে সাধু প্রিয় সত্যবতী।
তার পাছে রূপসী রুক্মিণী রসবতী॥
সুখাসনে সাধু পদ পাখালিল পানি।
সাধুরে প্রণাম করে যুগল রমণী॥
জিজ্ঞাসে সাধব প্রিয়ে কহ সত্যবতী।
তোমার সংহতি আর কাহার যুবতী॥
কহে সত্যবতী শুন প্রভু ভোলানাথ।
না চিন আপন নারী বড় পরমাদ॥
চিনিতে না পার তুমি বাড়্যাছে পালনে।
কি বলিব প্রভু বেত্থ তোমার চরণে॥
ইক্ষু শসা কলা আম্র নারিকেল দিয়া।
শেষ ভাগ খাই আমি গোসাঞি স্মরিয়া॥
শুন সত্যবতী প্রিয়ে আন চেটী পানি।
ভুঞ্জিব মুকুন্দ কহে রান্ধিব রুক্মিণী॥০॥

॥ বারাড়ি ॥

হাটে গিয়া আন সজ্জ কোড়ি লৈয়া চল গজ
কামিনী সুন্দরী কলাবতী।
না কর আপন ভিন্ন ভারি লহ দুই তিন
তোমার সংহতি শীঘ্রগতি।
পানি জিজ্ঞাসিয়া চল ভাল মনে।
দত্ত নারায়ণে ঝি চাঁদমুখী বলে কি
রান্ধিতে বা জানে বা না জানে॥
শুনিতে গো ছোট মা রান্ধিতে পারিবে বা
পার নার বল ঝাট করিয়া।
তোমার রন্ধনে তাত কভু নাহি খায় ভাত
সাধব রহিয়াছে প্রাণ ধর্য্যা॥
বিরচিল কবিচন্দ্রে প্রভু বোলে কেবা রান্ধে
ধাতায় সৃজিলে রূপগুণে।
আছিল যতেক পাপ সভার বেচিল্ল বাপ
পাঁজর বিন্ধিল মোর ঘুণে॥০॥

॥ ছন্দ ॥

আনন্দে বিহ্বল পানি ভাবে মনে মনে।
ভোজন করিব সাধু [৬৯] রুক্মিণী রন্ধনে॥
নয়নে কজ্জল দিয়া মুখে মাখে তেল।
ফুটিল কমল যেন খঞ্জনের মেল॥
কেশ বেশ করিয়া মালতী মালা বেঢ়ে।
ভুজগ নায়ক চরে কনক ভুধরে॥
চন্দন তিলক দিল ললাটের মাঝে।
সাজিল গগনে যেন পূর্ণ দ্বিজরাজে॥
পরিল পাটের সাড়ি নাহি করে লাজ।
সিন্দুরে ভূষিল যেন মত্ত গজরাজ॥
কনক কুণ্ডল কানে নাহি ছাড়ে সঙ্গ।
কর্পূর তাম্বুলরসে অধর সুরঙ্গ॥
বেড় দিয়া বান্ধে পানি আপন কাঁকালি।
ভারি সব মেলি কড়ি বান্ধিল শাঁখালি॥
সুন্দরী নিতম্ববতী সহজে চঞ্চলা।
চিন্তিল সাধব যাত্রা শুভক্ষণ বেলা॥

আচ্ছাদন দিল আধ মস্তক ঢাকিয়া।
আগে আগে যায় পানি বাহু নাড়া দিয়া॥
নয়ান ফিরায় দেখে দু দিগে আওয়ারী।
জিজ্ঞাসে হাটের কথা করিয়া চাতুরী॥
ধীরে ধীরে যায় রামা কথ করে ত্বরা।
চরণযুগলে বাজে নূপুর সুন্দরা॥
পরিপাটী বুঝে চেটী বিন্ধে নাফ্রি টুটে।
কবিচন্দ্র কহে পানি প্রবেশিল হাটে॥০॥

॥ শ্রীরাগ ॥

কি দিয়া রান্ধিব কি হাটে কিনে তৈল ঘি
আম্র কাঁঠাল নানা ভাঁতি।
মান মূলা আলু কচু সভাকার কিনে কিছু
কাঁচকলা কিনে কান্দি কান্দি॥
কি কিনিব মনে গুণে কৌড়ি লইয়া ভারি সনে
পানি চেটী বিষম চতুরা।
ভাল মন্দ দুই বুঝে সকল হাটের মাঝে
দেখি বুলে পসরা পসরা॥
ভাল কিনে শ্বেত শাক বাছিয়া পলতা আগ
নালিতা কলম্বী পনা কড়া।
হেলঞ্চা শুশুনি দুই বার মাসে যাহা পাই
কিনে বাথুয়া পালঙ্গ চুচুড়া॥
সকুল বোদালি রুই চিথল কাতলা কই
গাগর ভেটকী বালি কড়া।
বামি কিনে বামি রুষ যা দেখিলে পরিতোষ
স্বর্ণ ঘাট ভাগর চিচিঙ্গা॥
নাঠা বাটা চেঙ্গ ভোলা কালুবাস সর হলা
ফলই কুলিশ টেঙ্গরা।
ইলিশ তপস্যা বাটা মাগুর পাথরচটা
নানা মাছ কিনিল চুচুড়া॥
তেতলী হরিদ্রা সিম কলামূল কিনে নিম
ভাল কিনে পালঙ্গ চুচুড়া।
[১০ক]পাকা কলা বার্ত্তাকু বাছিয়া কিনিল লাউ
সারি কচু করেল কুমুড়া॥
বাটুনা মুসরি মাঁস কাঁড়া যার দুই পাশ
মুগের বিউলি কিনে ভাল।
পাতিলেবু জলপাই চিনি কিনে বিসা দুই
ক্ষীরের সন্দেশ পণ বার॥
কিনে ঝুনা নারিকেল বাছিয়া সুপক্ক বেল
ক্ষীর কিনে বিসা দুই তিন।
বণিক সজ্জ কিনে ঝাল আদা শসা ফুটি তাল
পানিফল কেসরি প্রবীণ॥
চিপট মুড়কি কিনে সাটি গা গুয়া পানে
পূর্ণিত চূণের কিনে হাণ্ডি।
ধূপ সিন্দূর গন্ধ পরিমলে নহে মন্দ
যাহাতে সন্তোষ হব চণ্ডী॥
বেসাতি করিল যত আছিল যে অভিমত
ভারিয়ে তুলিল ভার কান্ধে।
কর্পূর তাম্বূল খায় সুখে পানি ঘর যায়
বিরচিল আচার্য্য মুকুন্দে॥০॥

[ক্রমশঃ]

১৩৬১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ—আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

শ্রীকরুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়—ছায়া, শ্রীসত্যেশ ভট্টাচার্য্য—পঞ্চমী, শ্রীযোগেশ বিশ্বাস—বই সব—রহস্যসব্য পত্ররইচঅয়, শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত—দীনেশ গুপ্তের শেষ পত্র, শ্রীবসন্তকুমার গুপ্ত—বেদান্ত রহস্য, শ্রীবিজয় মণ্ডল—বিদায় গোধূলি, শ্রীকনকেন্দ্র দত্ত—রঙ্গমতী, সেবানন্দ—বাঙালীর গান, জয়েণ্ট ডেভলপমেণ্ট কমিশনার—সাওতাল জাতির ইতিবৃত্ত, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—সাধক কবি রামপ্রসাদ, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়—শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, শ্রীশিবানন্দ কাহালী—জড়বাদ বনাম মানবজগৎ, শ্রীশীতাংশু মৈত্র—তিন পুরুষ ১ম+২য়, মাদাম বোভারি ১ম+২য়, মোহনলাল, ইউনাইটেড ষ্টেটস ইন্‌ফরমেশন সার্ভিস—Classless capitalism, I led there lives, Thomas Jefferson, টমাস জেফারসন, মেরীম্যাকলাউথ বেথুন, বগীগাড়ীর ডাক্তারবাবু, সন্ত্রাসের শাসনে, য়্যানিম্যাল ফার্ম, মস্কোর চিঠি, রাশিয়ার শোধন ও স্বীকারোক্তি, পুনর্জন্ম, ত্রিধারা, মধ্যাহ্নে আঁধার, শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ—শ্রীশ্রীগৌরকরুণার বৈশিষ্ট্য, শ্রীশ্রীগৌরতত্ত্ব, Information officer U.S. A.—The aims of Education, The red pony, The pastures of Heaven, Life on the Mississippi, Yankee Storekeeper, New world writing, On understanding Science, Walden, A world apart, The Track of the Cat, Ballet, Fire, Look to the Mountain, Emerson, Arts & the man, Director of Library Services—World Neighbors, শ্রীপ্রভাতকুমার বসু—My life story of 55 years, রামানুজ-চরিত, Srimadvagabad Gita vol. III, অর্চ্চনা ও প্রার্থনা, ভক্তিযোগ, Swami Vivekananda, শ্রীরাধাচরণ রায়—গীতার সারাংশ, শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ—Memorandum submited to the States reorganisation committee 1954, শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ—ব্রহ্ম ও আত্মাশক্তি—২য় ভাগ, শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ—শ্রীচৈতন্যদেব, রেজিষ্ট্রার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—Calender of the Calcutta University 1952, শ্রীরামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের স্বপ্ন-সাধনা, শ্রীনির্মলকুমার বসু—Mussalmani Bengali—English Dictionary, মধুমিলন পত্রিকা ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড ১৩৫৮, ঐ—২য় বর্ষ, সমকালীন চৈত্র ১৩৬০, সব্যসাচী ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড ১৩৫৯, শিক্ষা ১২শ বর্ষ ১ম—৬ষ্ঠ সংখ্যা, ক্রান্তি ৩য় বর্ষ—২।৩ সংখ্যা ১৩৬০, কর্ম্মসচিব বিশ্বভারতী—স্বরবিতান ৩৫।৩৬শ খণ্ড, প্রবন্ধ সংগ্রহ—২য় খণ্ড, সাহিত্য, শ্রীবিধানচন্দ্র রায়—অঘোরপ্রকাশ, শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক—কাব্যকাকলি, মন্মথনাথ মল্লিকের স্মৃতিকথা, যদুলাল মল্লিকের জীবনকথা, শ্রীঅতুলানন্দ রায়—সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ, সম্পাদক শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—শরণাগতি, নবদ্বীপভাবতরঙ্গ, Shrichaitanya Maha-prabhu, শ্রীচৈতন্য পঞ্জিকা, প্রেমপ্রদীপ,

ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী—১ম খণ্ড, দামোদরাষ্টকম্, জৈবধর্ম—১ম+২য় খণ্ড, গৌড়ীয় পত্রিকা ১ম—৫ম বর্ষ।

১৩৬১ বঙ্গাব্দে (বৈশাখ—আশ্বিন) নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি ক্রয় করা হইয়াছে

বাঁকা স্রোত—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, বিবাহিতা স্ত্রী—শ্রীপ্রতিভা বসু, পঞ্চ পর্ব্ব—বনফুল, চিড়িয়াখানা—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ভোল্‌গা থেকে গঙ্গা—রাহুল সাংকৃত্যায়ণ, মনভ্রমরা, কিংবদন্তীর দেশে—শ্রীসুবোধ ঘোষ, পান্থপাদপ—শ্রীপ্রভাবতী দেবী, জোটের মহল—শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ, লৌহকপাট—জরাসন্ধ, কাঠগোলাপ, শ্রেষ্ঠগল্প—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র, মৃত্যুহীন প্রাণ—শ্রীবিমল মিত্র, দুই রাত্রি—শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী, গৌরীগ্রাম—শ্রীরমেশচন্দ্র সেন, ঝড়ের সঙ্কেত—শ্রীপ্রবোধ সান্যাল, রহস্যের মায়াপুরী—শ্রীরাধারমণ দাস, খেলার রাজা ক্রিকেট—শ্রীবিনয় মুখোপাধ্যায়, হারানো অতীত—শ্রীসরলা সরকার, রবীন্দ্রনাথ—শ্রীদেবজ্যোতি বর্মন, রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ ১ম+২য়—শ্রীপ্রমথ বিশী, রবীন্দ্র নাট্যপরিক্রমা—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবনপ্রশ্ন—শ্রীশৈলেশ বিশী, পাগ্‌লা গারদের কবিতা—শ্রীঅজিত বসু, আধুনিক বাংলা কবিতা—শ্রীবুদ্ধদেব বসু, সাবিত্রী—শ্রীঅরবিন্দ, শ্রেষ্ঠ গল্প—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পদাবলী পরিচয়—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, তটিনীর বিচার—শ্রীশচীন সেনগুপ্ত, ত্রয়ী—শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ কবিতা—শ্রীজীবনানন্দ দাস, শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ-গল্প—শ্রীপরিমল গোস্বামী, বিপ্লবী বাংলা—শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী।

অশ্বান

বুদ্ধি ও বিত্ত পরম সম্পদ।
কিন্তু বলবীর্যহীন অসুস্থের
পক্ষে বুদ্ধি ও বিত্ত নিষ্ফল
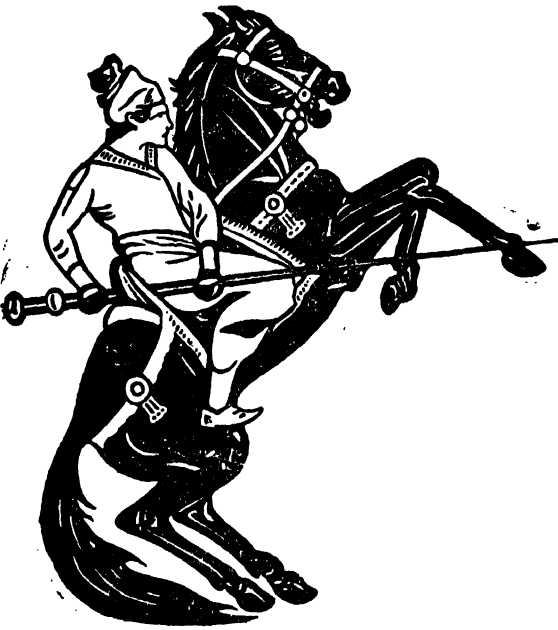
নিয়ত মানসিক পরিশ্রমে
শরীর সুস্থ সবল রাখা শক্ত।

* *
•

অশ্বানের নিয়মিত
সেবনে দৈনন্দিন
ক্ষয় পূর্ণ হইয়া দেহ
মন তেজোদৃপ্ত হয়।

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ
কলিকাতা :: বোম্বাই :: কানপুর

৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা
শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

৬১ ভাগ, তৃতীয় সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ-মন্দির

হইতে শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৬১ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

শ্রীসজনীকান্ত দাস

সহকারী সভাপতি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীযদুনাথ সরকার
রাজা শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীসুশীলকুমার দে

সম্পাদক

শ্রীনির্মলকুমার বসু

সহকারী সম্পাদক

শ্রীকুমারেশ ঘোষ
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
শ্রীজগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীমনোমোহন বসু

পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীত্রিদিবনাথ রায়
কোষাধ্যক্ষ : শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ
পুথিশালাধ্যক্ষ : শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
গ্রন্থাধ্যক্ষ : শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য
চিত্রশালাধ্যক্ষ : শ্রীশুভেন্দু সিংহ রায়

কার্য্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১। শ্রীঅতুল সেন, ২। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, ৩। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, ৪। শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, ৫। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, ৬। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৭। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, ৯। শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১০। শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু, ১১। শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ১২। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ১৩। শ্রীপ্রবোধকুমার ঘোষ, ১৪। শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর, ১৫। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৬। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, ১৭। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, ১৮। শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯। শ্রীসুশীল রায়, ২০। শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

শাখা-পরিষৎ-সভ্যগণ

২১। শ্রীঅতুল্যচরণ দে (নৈহাটী), ২২। শ্রীচিত্তরঞ্জন রায় (মেদিনীপুর), ২৩। শ্রীমাণিক-লাল সিংহ (বিষ্ণুপুর), ২৪। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া)।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৬১ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা

সূচী

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৬১ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
১৩৬১

বালুরঘাটের পুরাকীর্ত্তির পরিচয়

শ্রীকমলেন্দু চক্রবর্ত্তী

গঙ্গারামপুর থানা: বাণগড়: নবগঠিত পশ্চিম-দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ-ঘাটির অদূরে পুনর্ভবা নদীর পূর্ব্বতীরে একটি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়। প্রায় তিন মাইলব্যাপী এই ধ্বংসস্তূপ বাণগড় নামে বিখ্যাত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে এখানে কিছুটা খননকার্য্য হইয়াছে; কিন্তু অর্থাভাবে বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই।

প্রাচীন অভিধানকারগণ 'বাণপুর,' 'শোণিতপুর,' 'উমাবন' প্রভৃতি নামে যে একটি প্রাচীন নগরীর উল্লেখ করিয়াছেন, বর্ত্তমানের 'বাণগড়' তাহারই ধ্বংসাবশেষ। এই স্থান খননের ফলে মৃত্তিকাগর্ভে বাড়ীঘরের চারিটি স্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে। একটি পুরাতন নগরী ধ্বংস হইলে তাহার বুকে আবার নূতন নগরী নির্ম্মিত হইয়াছে। এইরূপ চারি বার হইয়াছে বোঝা যাইতেছে।

প্রাসাদ, মন্দির, প্রাচীর, ইঁদারা, নালা, জলনিকাশী গর্ত্ত, আর্দ্রতাভেদ্য শস্যাগার (ড্যাম্পপ্রুফ গোলাবাড়ী) প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সবগুলিই ইষ্টকনির্ম্মিত। আর পাওয়া গিয়াছে—পোড়ামাটির নরনারীমূর্ত্তি, জীবজন্তুর মূর্ত্তি, পাখী-কাটা মাটির কলস, পদ্ম ও শঙ্খ আঁকা টিক্‌লি, মালা, লোহার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। সর্ব্বাপেক্ষা চমকপ্রদ আবিষ্কার—মাটির মোহরে ব্রাহ্মী অক্ষরলিপি! ইহা খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভসময়ের লিপি বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এই লিপির পাঠোদ্ধার হইলে বাংলার ইতিহাসে নূতন আলোকপাত হইবে আশা করা যায়। বাণগড় বর্ত্তমানে রাজীবপুর মৌজার অন্তর্গত। রাজীবপুর হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর ভাস্কর্য্যের নিদর্শন একটি সদাশিবমূর্ত্তি কলিকাতা মিউজিয়মে (যাদুঘরে) নীত হইয়াছে। দশ হাত, (দৃশ্যতঃ) চার মুখ, পদ্মাসীন, অপরূপ ধ্যানী মূর্ত্তি—কালো পাথরে নির্ম্মিত ও প্রায় সাড়ে চার ফুট উঁচু। আসনের নীচে একটি লিপি আছে। বালুরঘাট হাই স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্বর্গীয় নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় ঐ লিপির এইরূপ পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন:—

"পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীগোপালদেবের রাজত্বের চতুর্দ্দশ বর্ষে তাঁহার মন্ত্রী শ্রীপুরুষোত্তম কর্ত্তৃক এই পবিত্র সদাশিবমূর্ত্তি স্থাপিত।" ভট্টশালী মহাশয়ের মতে ইনি পাল-নরপাল তৃতীয় গোপালদেব।

কলিকাতার যাদুঘরে একাদশ শতাব্দীর ভাস্কর্য্য-নিদর্শন একটি নটরাজ গণেশমূর্ত্তিও বাণগড় হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। বহুকাল পূর্ব্বে দিনাজপুরাধিপতি রাজা রামনাথ (মৃত্যু ১৭৬০ খ্রীঃ) বাণগড় হইতে অন্যান্য কারুকার্য্যময় প্রস্তরাদি সহ অতীত শিল্পনৈপুণ্যের

অপূর্ব্ব নিদর্শন সুবৃহৎ কালো পাথরের সুমসৃণ সালঙ্কার 'নাগ'-দ্বার ও লিপিসম্বলিত একটি বিচিত্র শৈলস্তম্ভ লইয়া যান। দ্বারতোরণটি বর্ত্তমানে রাজপ্রাসাদে দরজারূপে ব্যবহৃত হইতেছে; দরজার দুই পাশে দুটি নাগের লম্বিত দেহ, নানারূপ সুন্দর নক্সা ও মূর্ত্তি অঙ্কিত। এইরূপ বৃহৎ বিচিত্র দ্বারতোরণ সম্পূর্ণ অভগ্ন অবস্থায় বিশেষ দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই প্রাচীন কীর্ত্তির এই মূল্যবান্ অভিজ্ঞান সমধিক মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। যে স্তম্ভটির কথা বলিয়াছি, তাহার নিম্নভাগ চতুষ্কোণ, মধ্যভাগ দ্বাদশকোণবিশিষ্ট; ইহা একটি সুউচ্চ শৈব মন্দিরে সংলগ্ন ছিল। তলদেশে চিত্রিত পাত্র হইতে পত্রগুচ্ছ, লতা-পুষ্প ঊর্দ্ধমুখে উঠিয়াছে; আরও নানা কারুকার্য্য ও গণমূর্ত্তি দ্বারা স্তম্ভটি শোভিত। লিপিপাঠে জানা যায়, কাম্বোজবংশজ জনৈক গৌড়পতি ৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে 'বাণনগরে' পৃথিবীর ভূষণস্বরূপ এই শিবমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। স্তম্ভটি এখনও রাজবাটীর সম্মুখে বাগানে রক্ষিত আছে। এই লিপি-কথিত 'গৌড়পতি' কে? পাল-নরপাল রাজ্যপাল কাম্বোজ-কুল-তিলক বলিয়া তাম্রশাসনে পরিচিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ রাজ্যপালের মাতৃকুল কাম্বোজবংশীয় ছিলেন। রাজ্যপালতনয় দ্বিতীয় গোপাল ও তৎপুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপাল অঙ্গে রাজত্ব করিতেন এবং রাজ্যপালের অপর তনয় দ্বিতীয় নারায়ণপাল ও তৎভ্রাতা নয়পাল উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে রাজত্ব করিতেন। এইরূপে দ্বিধাবিভক্ত পালরাজ্য প্রথম মহীপালদেবের সময় পুনরায় একশাসনভুক্ত হয়। নারায়ণপাল ও নয়পালও কাম্বোজকুলজ বলিয়া পরিচিত হন। ইঁহাদের সকলেরই রাজত্বকাল খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে। সুতরাং অনুমান হয়, পালবংশের দ্বিধাবিভক্ত রাজ্যের বঙ্গীয় শাখার কোনও নরপতি উল্লিখিত শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা।

দ্বিতীয় বিগ্রহপালদেবের রাজত্বকালে অশান্তি ও আশ্রয়হীনতার ইঙ্গিত প্রথম মহীপালদেবের বাণগড়ে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে পাওয়া যায়; আরও জানা যায়, প্রথম মহীপালদেব 'অনধিকৃত বিলুপ্ত পিতৃরাজ্যে'র উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন।

প্রথম মহীপালদেবের এই তাম্রশাসনে পালনরপতিগণের নাম ও কীর্ত্তিকথার পরিচয় আছে।

'পুণ্ড্রবর্দ্ধন' ভুক্তির ('ভুক্তি' এ-কালের বিভাগ) অন্তর্গত 'কোটিবর্ষ' বিষয়ের ('বিষয়' এ-কালের জেলা) অধীন 'গোকলিকা'মণ্ডলান্তঃপাতি ('মণ্ডল' এ-কালের মহকুমা) 'কুরটপল্লীকা' গ্রাম, গঙ্গাস্নানান্তে 'বিলাসপুর'-সমাবাসিত-জয়স্কন্ধাবার (এ-কালের ক্যাম্প) হইতে ভট্টপুত্র কৃষ্ণাদিত্য শর্ম্মাকে শ্রীমন্মহারাজ মহীপালদেব বিষ্ণুসংক্রান্তির দিনে দান করেন। ভট্ট শ্রীবামন ইহার 'দূতক' ও 'পোসলী'গ্রামাগত মহীধর শিল্পী এই তাম্রশাসন উৎকীর্ণ করেন।

পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি এক সময়ে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে সুন্দরবন পর্য্যন্ত ও ভাগীরথীতীর হইতে মেঘনার তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কালে কালে এই সীমার অবশ্য হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়াছিল। কোটিবর্ষবিষয়ের মধ্যে বালুরঘাট মহকুমার অনেকাংশ পড়িত। কোটিবর্ষবিষয়ের প্রধান নগর 'কোটিবর্ষ' বা 'দেবীকোট' বর্ত্তমান বাণগড় ও তৎসন্নিহিত 'দমদমা' গ্রামেই অবস্থিত

ছিল। গোকলিকামণ্ডলের ক্ষীণ স্মৃতি পোর্ষা থানান্তর্গত 'গোয়ালা' গ্রামটি এবং 'পোসলী' গ্রামের স্মৃতি বর্তমান পোর্ষা গ্রাম নীরবে বহন করিতেছে, এইরূপ অনুমান হয়। আজ দেবকোট নগরের অস্তিত্ব নাই, গ্রামের নামও দেবকোট নাই, প্রাচীন স্মৃতি শুধু দেবকোট পরগণার নামের সহিত জড়িত হইয়া আছে। বিলাসপুর জয়স্কন্ধাবার কোথায় ছিল, তাহার প্রমাণ বা অনুমান এ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই।

পালরাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সময় 'গঙ্গাস্নান,' 'শিবমন্দির' প্রভৃতির উল্লেখ দেখিয়া ও অন্যান্য নানা প্রমাণে ইহাই সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তৎকালে হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও ধর্ম্মের 'গঙ্গাযমুনা'-সঙ্গম হইয়াছিল। দুই ধর্ম্মের উদার সমন্বয়ে পালরাজত্ব গৌরবমণ্ডিত হইয়াছিল।

ত্রিকাণ্ডশেষ নামক সংস্কৃত কোষগ্রন্থে দেবকোটকে বাণাসুরের পুরী বলা হইয়াছে। তিব্বতী পর্য্যটক লামা তারানাথের (সম্রাট্ আকবরের সমসাময়িক) ইতিহাসে পালবংশ-তালিকায় 'বাণপাল' নামে নরপতির উল্লেখ আছে। কিন্তু আইন্-ই-আকবরীতে যে দশ জন পালরাজার নাম পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে বাণপালের উল্লেখ নাই। কোনও প্রামাণ্য বংশ-তালিকায় বা 'লেখ' বা অপরাপর গ্রন্থে বাণপালের নাম নাই। তারানাথের মতে বাণপাল পুনর্ভবাতীরে দেবকোটে রাজত্ব করিতেন। নারায়ণপুর মৌজা হইতে একটি সড়ক উত্তর দিকে কুশমণ্ডী থানা হইয়া পশ্চিমে আগ্রা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রেভিনিউ সার্ভে ম্যাপে এই সড়কটি 'বাণরাজার জাঙ্গাল' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

স্থানীয় প্রবাদ মতে বাণগড় বাণরাজার পুরী। গঙ্গারামপুরের অদূরে পূর্ব্বদিকে অবস্থিত 'কালাদীঘি' নামে বিরাট্ দীঘিটি (৪০০০×৮০০ ফুট) বাণপালের মহিষী কালারাণীর নামে প্রতিষ্ঠিত এবং পুনর্ভবা নদীর অপর তীরে উষাগড় বাণের কন্যা উষার প্রাসাদচিহ্নাবশেষ। পৌরাণিক উষাহরণ কাহিনী, উষা-অনিরুদ্ধের প্রেম ও শ্রীকৃষ্ণ-বাণাসুরের যুদ্ধ—এই বাণগড় উষাগড়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। সহস্রকর বাণরাজার নয় শত নিরানব্বইটি কর (হস্ত) যুদ্ধে কর্ত্তিত হওয়ায় যে স্থলে কর দাহ করা হয়, সেই স্থানই বর্ত্তমান করদাহ গ্রাম, এরূপ প্রবাদ।

প্রত্নানুরাগী পণ্ডিত শ্রীবিনোদবিহারী রায় এই সকল প্রবাদের উৎপত্তির ঐতিহাসিক কারণস্বরূপ একটি মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা বিবেচনার যোগ্য। তাঁহার মতে বাণপাল-দেবেরও উষা নামে কন্যা ছিল; তাঁহার সমসাময়িক শূরবংশীয় রাজা প্রদ্যুম্ন শূরের পুত্র অনিরুদ্ধ শূর উষাদেবীর সৌন্দর্য্যপ্রবাদ শ্রবণে গোপনে উষার সহিত প্রণয়-সম্বন্ধ করিয়া উষার প্রাসাদে আশ্রয় লাভ করেন। বাণপাল পশ্চাৎ ইহা অবগত হইয়া অনিরুদ্ধকে কারাবন্দী করেন। প্রদ্যুম্ন সহ বাণরাজার যুদ্ধ হয় ও বাণ পরাজিত হইয়া উষার সহিত অনিরুদ্ধের বিবাহ দেন। প্রদ্যুম্ন ইহার পর দক্ষিণ-বরেন্দ্রে রাজধানী স্থাপন করেন। প্রদ্যুম্নের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এই বিজয় উপলক্ষ্যে বরেন্দ্রশূর নাম গ্রহণ করেন। বাণপুরের অপর নাম উমাবন, পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে উষাবন উমাবনে পরিণত হইয়াছে কি না বিবেচ্য।

কোটিবর্ষ : জৈন প্রজ্ঞাপনা গ্রন্থে রাঢ়ের প্রধান নগর বলিয়া 'কোডিবরিস' বা কোটিবর্ষের উল্লেখ আছে। হয়ত প্রাক্‌-গুপ্ত সময়ে রাঢ়ের সীমা উত্তরবঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গুপ্ত ও পাল-রাজত্বকালে কোটিবর্ষ পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোটিবর্ষের আর এক নাম কোটিকপুর। পরবর্ত্তী কালে এই নগরই দেবীকোট বা দেবকোট নামে পরিচিত হয়। কোট বা গড় শব্দের অর্থ দুর্গ বা দুর্গতুল্য রাজপুরী। প্রবাদ এই, দেবহূতি নামক জনৈক রাজা এই কোট বা রাজধানী স্থাপন করেন। প্রাচীন গোকলিকামণ্ডল ও হলাবর্ত্তমণ্ডল কোটিবর্ষ-বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। জৈন কল্পসূত্রে জৈন সাধুগণের কোটিবর্ষীয়া, পুণ্ড্রবর্দ্ধনীয়া, তাম্রলিপ্তিকা প্রভৃতি শাখার উল্লেখ আছে। কোটিবর্ষনগর জৈন ধর্ম্মের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল।

কোটিকপুররাজ পদ্মরথের পুরোহিত ভদ্রবাহু মৌর্য্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের গুরু ছিলেন, এরূপ প্রবাদ আছে। ভদ্রবাহু কোটিকপুরে জন্মগ্রহণ করেন ও জৈনধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ভারতের নানা স্থানে প্রচারকার্য্য করেন। অবশেষে মহীশূরের অন্তর্গত শ্রাবণবেলগোলা গ্রামের নিজ আশ্রমে প্রিয়শিষ্য চন্দ্রগুপ্তের সহিত একত্রে জৈন প্রথামতে প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করেন। এই ভদ্রবাহুরই শিষ্য গোদাস উল্লিখিত জৈন শাখাগুলির সৃষ্টিকর্ত্তা। ইহা খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকের কথা।

জৈন মহাবীর স্বামীর শিষ্য সুধর্ম্ম স্বামী ও সুধর্ম্ম স্বামীর শিষ্য জম্বু স্বামী পৌণ্ড্র রাজ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। জম্বু স্বামী ৪৬৩ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে কোটিকপুর নগরে সমাহিত হন।

দামোদরপুর-তাম্রশাসনমতে গুপ্তযুগে কোটিবর্ষনগর ব্যবসায় বাণিজ্যের বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল। তাম্রশাসন পাঠে জানা যায়, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বিষয়পতির (ম্যাজিস্ট্রেটের) অধিকরণ (আদালত), নগরশ্রেষ্ঠী ('মহাজন'সভার সভাপতি), প্রথম স্বার্থবাহ (বণিক্‌-সম্প্রদায়ের প্রধান), প্রথম কুলিক (শিল্পব্যবসায়ীদের নায়ক) ও প্রথম কায়স্থ (প্রধান লেখক কর্ম্মচারী বা সেক্রেটারী), এই কয় জন সদস্য লইয়া গঠিত ছিল। কোটিবর্ষনগর ব্যবসায় বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল, তাই তার বিচারালয়ের সংগঠন এইরূপ ছিল। অবস্থান্তরে অধিকরণের গঠন ভিন্নরূপও দেখা যায়। সেই প্রাচীন কালেও নানাশ্রেণীর 'নিগম' বা বণিক্‌-সংঘ ছিল ও তাহার সভাপতি-নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ বর্ত্তমানের 'কর্পোরেশন' ও 'ইলেক্শন' প্রথা সে কালেও ছিল। নানারূপ সরকারী কাজে অধিকরণের সদস্যগণের বিশেষ দায়িত্ব ও ক্ষমতা ছিল। সাব রেজেষ্ট্রি অফিসের কার্য্যও তৎকালে অধিকরণের করণীয় ছিল। তাম্রশাসন আধুনিক কালের দলিলের কাজ করিত। তাম্রশাসন প্রদান করিবার পূর্ব্বে অধিকরণ জমির সম্পর্কে পুস্তপালগণের (রেকর্ড কিপার) বিস্তারিত রিপোর্ট লইতেন ও ক্রয়প্রার্থীর নিকট নানারূপ প্রশ্ন করিয়া জমি ক্রয়ের উদ্দেশ্য, জমির পরিমাণ ও রকমাদি জানিয়া লইতেন।

দেবীকোট :—প্রবাদ এই, দেবহূতি নামক জনৈক রাজা এই কোট বা রাজধানী স্থাপন করেন। পাল-রাজত্বকালে দেবীকোটে একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিহার ছিল। বাংলার প্রথম

মুস্লিম রাজধানী দেবকোট বা দেওকোটে স্থাপিত হয়। বখ্তিয়ার খিলজী (১১৯৮—১২০৫ খ্রীঃ) তিব্বত ও কামরূপ আক্রমণে বিফলমনোরথ হইয়া দেবকোট রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও ভগ্নহৃদয়ে তথায় মারা যান।

গিয়াসুদ্দীন খিলজী (১২১১-১২২৭ খ্রীঃ) দেবকোট সহর হইতে বীরভূম জেলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত সড়ক নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহা নদীর বন্যা হইতে রক্ষার জন্য বাঁধের কাজ করিত। বর্তমান দম্দমা (অর্থ : চাঁদমারির জন্য মাটির উচ্চ স্তূপ) নামক স্থানেই দেবকোট সহর অবস্থিত ছিল।

বঙ্গে মুস্লিম অধিকারের সূচনায় এতদঞ্চলে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য বহু মুস্লিম সাধু পীর আগমন করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধানতম শাহ আতাউল্লা নিকটবর্ত্তী (দমদমা হইতে এক মাইল পূর্ব্বে) ধলদীঘি নামক বিরাট্ দীঘির (৪০০০ × ১০০০ ফুট) উত্তর পাহাড়ে মসজিদে সমাহিত হন। তাঁহার সময় ১৩০০-১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ। মসজিদটি সম্ভবতঃ পীর জাফর খাঁ গাজীর নির্ম্মিত ও তাঁহার আদেশে সুলতান রুকুনুদ্দীন কাইকাউসের প্রস্তরলিপি হিঃ ৬৯৭ বা ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তথায় স্থাপিত হয়। অসম্পূর্ণ মসজিদটি সুলতান সেকেন্দর সাহ ১৩৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত করেন। ধলদীঘির বর্ত্তমান মালিক উক্ত পীর আতার ভৃত্য সৈয়দ শাহ আহম্মদের অধস্তন পুরুষ। ইঁহারা ৬০০/০ বিঘা পীরপানভোগী। বাংলা ১২৬২ সালে করমালী শাহ ফকীর দীঘির দক্ষিণ পাহাড়ে একটি মেলা বসান। এই মেলায় পঞ্চাশ হাজারের মত লোক উপস্থিত হয় ও বহু সহস্র টাকা আয় হয়। দীঘির উত্তর পাহাড়ে ভূগর্ভে চিল্লার মধ্যে সাধুগণের উপাসনার স্থান ছিল।

দেবকোট বাংলার প্রথম টাঁকশাল ; সুলতান গিয়াসুদ্দীন সর্ব্বপ্রথম এখান হইতে নিজ নামে মুদ্রা প্রচার করেন।

দম্দমায় মুস্লিম বিজয়ের পর একটি দুর্গ নির্ম্মিত হইয়া তথায় সেনানিবাস স্থাপিত হয়। সুলতান হুশেন শাহের সময় (১৪৯৭-১৫২১ খ্রীঃ) দমদমা সেনানিবাস ঘোড়াঘাট সেনানিবাস সহ একটি বড় সড়ক দ্বারা সংযোজিত হয় ও সেনানিবাস দুইটি সুসংস্কৃত করা হয়।

ওয়েষ্ট মেকট সাহেব দেবকোট হইতে নিম্নলিখিত প্রস্তরলিপি সকল সংগ্রহ করেন :—

১।	সুলতান কয়কাউসের	সময়ের	একটি	৬৯৭	হিজরী	(১২৯৭ খ্রীঃ)
২।	„ সেকেন্দর সাহের	„	„	৭৬৫	„	(১৩৬৫ খ্রীঃ)
৩।	„ মুজাফর শাহের	„	„	৮৯৬	„	(১৪৯৬ খ্রীঃ)
৪।	„ হুশেন শাহের	„	„	৯১৮	„	(১৫১৮ খ্রীঃ)

পুনর্ভবা নদীতীরে সাহ সুলতান, সাহ বোখারী ও বক্তিয়ার খিলজীর কবর আছে। বাণগড়ের ধ্বংসস্তূপমধ্যে পীর সাহ বোখারীর নির্ম্মিত একটি মসজিদ আছে। পুনর্ভবার পশ্চিম তীরে পীর সাহ বাহাউদ্দীনের দরগা ও পীর নিমাই সাহেব সমাধি আছে।

কথিত আছে, দিল্লী হইতে সম্রাট্প্রেরিত সুবাদার যখন দম্দমা অধিকার করেন, তখন বক্তিয়ার খিলজীর দক্ষিণহস্তস্বরূপ শিরাণ, খিলজীদের সহিত বালুরঘাট টাউনের তিন মাইল

দক্ষিণে অবস্থিত মহীসন্তোষে আশ্রয় লন। মহীসন্তোষের শক্তিশালী হিন্দু রাজাকে পরাজিত করিয়া খিলজীরা মহীসন্তোষ অধিকার করে। পাঠান স্থলতান বার্ব্বক সাহের (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রীঃ) অধীনস্থ প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ইকরার খাঁ মহীসন্তোষে একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। ইহা প্রাচীন আরবী অক্ষরে লিখিত দরগার প্রাচীরগাত্র হইতে প্রাপ্ত শিলালিপি পাঠে জানা গিয়াছে। সম্রাট্ ফিরোজ সাহের সময়ে (৭০৩ হিঃ = ১৩০৩ খ্রীঃ) সেকেন্দর সাহ প্রথম শ্রীহট্ট জয় করেন। আগ্রাদুগুণ ও কাশীপুর গ্রাম (ধামইরহাট থানা) লইয়া বিরাট-নগর বলিয়া একটি প্রকাণ্ড সহর ছিল, স্থানীয় হস্তলিখিত পুথিতে এইরূপ জানা গিয়াছে। এই বিরাটনগরনামক প্রাদেশিক রাজধানী হইতে স্থলতান সেকেন্দর সাহ ও তৎপুত্র গাজী শ্রীহট্টে অভিযান করেন।

কথিত আছে, সম্রাট্ ফিরোজ সাহ ১৩৫৪ খ্রীষ্টাব্দে একডালা দুর্গ অবরোধ করিলে বিদ্রোহী স্থলতান ইলিয়স সাহ একডালা হইতে পলায়ন করিয়া ফকীরের বেশে পীর বাহাউদ্দীনের সমাধিস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। গঙ্গারামপুর হইতে প্রায় চারি মাইল দূরে কুশমণ্ডী ('কুশমণ্ডিকা' শক্তিমূর্ত্তিবিশেষ) থানায় একডালা দুর্গের চিহ্ন দেখা যায়। ইহা পাণ্ডুয়া হইতে ২৫ মাইল দূরে বাণরাজার জাঙ্গালের ধারে অবস্থিত ছিল।

গঙ্গারামপুরের মধ্য দিয়া কয়েকটি বৃহৎ প্রাচীন সড়ক আছে। সড়কগুলির ধারে গঙ্গারামপুর গ্রাম হইতে চারি মাইল পর্য্যন্ত সমান্তরালে প্রহরিকক্ষসমূহ দৃষ্ট হয়।

বর্ত্তমান দিনাজপুর-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা শুকদেব (মৃত্যু ১৬৭৭ খ্রীঃ) বাণরাজার জাঙ্গালের ধারে দমদমা হইতে দুই মাইল উত্তর-পশ্চিমে শুকদেবপুর নামক স্থানে একটি রাজবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

গঙ্গারামপুর থানায় গঙ্গারামপুর হইতে ছয় মাইল দূরে নিমতৈড় মৌজায় 'বোনার ভিটা' নামে একটি প্রাচীন কীর্ত্তিবহুল স্থান দৃষ্ট হয়। এখানে কালী ও বলরামের মন্দির আছে। দিনাজপুর-মালদহ রাস্তার ধারে শূরবংশীয় রাজাদের সময় দেবস্থল বা দেওতলা গ্রাম একটি বড় নগর ছিল। দেওতলায় শাহ জালালের তাকিয়া আছে। স্থলতান বার্ব্বক সাহের সময় এখানে কৃষ্ণপ্রস্তরের একটি মসজিদ নির্ম্মিত হয়। এই মসজিদের গায়ে বাবা আদম সাহের নামাঙ্কিত ৮৬৫ হিজরী অর্থাৎ ১২৬৫ খ্রীষ্টাব্দের এক প্রস্তরলিপি আছে। এখানে একটি প্রসিদ্ধ বিষ্ণুমন্দির ও অন্যান্য মন্দির ছিল।

দিনাজপুর-মুর্শিদাবাদ রাস্তার ধারে গঙ্গারামপুর থানায় "প্রাণসাগর" নামীয় বড় দীঘিটি দিনাজপুরাধিপতি রাজা প্রাণনাথ (১৬৮৭-১৭২৭ খ্রীঃ) খনন করাইয়াছিলেন।

গঙ্গারামপুর বরেন্দ্রভূমির উত্তর সীমায়। ত্রিস্রোতার প্রধান তিনটি স্রোতোধারা আত্রেয়ী, করতোয়া ও পুনর্ভবা। ডাঃ পেনান্দিকর তাঁহার "বেঙ্গল ডেল্টা" গ্রন্থে বলিয়াছেন, সুদূর অতীত কালে উত্তুঙ্গ হিমালয় হইতে বেগে পতনশীল স্রোতস্বতীসমূহের উপলবাহী প্রবাহের ফলেই কঠিন লাল মাটির বরিন্দ্ ভূমির সৃষ্টি হইয়াছিল। বরিন্দ্ ভূমিই বরেন্দ্রভূমি। ১৭৮৭

খ্রীষ্টাব্দে তিস্তা নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া আত্রেয়ী, করতোয়া, পুনর্ভবা ও তাহাদের শাখা উপশাখাসমূহের অবনতি ঘটে।

গঙ্গারামপুর থানায় বহু প্রাচীন দীঘি, বিল ও অসংখ্য পুষ্করিণী, বহু সড়ক ও বাঁধ দেখা যায়। এক অস্তশিমুলী গ্রামেই ৩৬০টি পুষ্করিণী আছে। এই সুজলা দেশ এককালে শস্যসম্ভারে পূর্ণ ছিল। কালক্রমে নদী মরিয়া ও দীঘি আদি মজিয়া গিয়াছে। দেশও জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সাঁওতাল পরগণা হইতে সাঁওতাল বুনারা আসিয়া জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া শস্যক্ষেত্রসমূহের পুনরুদ্ধার করিয়াছে।

এই প্রবন্ধে শুধু গঙ্গারামপুর থানার মধ্যেই আলোচনা নিবদ্ধ রাখিলাম। বারান্তরে অন্যান্য স্থানের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। বাংলাদেশের বিভিন্ন ইতিহাস-গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পাঠে যে পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই একত্র গ্রথিত করিয়া উপস্থিত করিলাম।

বৈদিক অসুর ও দেবতা

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

১। অহি অসুর ও ইন্দ্র

'বহু স্যাং প্রজায়েয়'—বহু হইয়া জাত হইব, চিৎস্বরূপ অদ্বৈত আত্মার এই যে কামনা, পরিদৃশ্যমান স্থূল জগৎ ও স্থূল জীবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহা পরিপূর্ণ হইয়াছে। পূর্ণ আত্মা জগৎ ও জীবরূপে নিজেকে খণ্ড খণ্ড করিয়া, বহু বহু করিয়া, তবে তাঁহার কামনা সফল করিয়াছেন। এই সাফল্যের পথে অবতরণ করিতে গিয়া যে পর্য্যন্ত তিনি স্বীয় অনন্ত ও অদ্বৈতবোধকে অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন, সেই পর্য্যন্তের নাম দেবভূমি এবং সেই ভূমির অধিবাসী দেবগণ। কেন না, দেবগণ বহু হইলেও তাঁহারা স্ব স্ব অধিকারে আনন্ত্য ও অদ্বৈতবোধের ভোক্তা। এই জন্য: বলা হইয়া থাকে—দেবগণ অদিতির সন্তান অর্থাৎ তাঁহারা সকলেই অদিতি বা আত্মার অদ্বৈতবোধের বিস্তৃতি।

চিৎস্বরূপ আত্মা স্বীয় চিৎশক্তিকে এই পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া এবং নিজে তাহাতে অধিরূঢ় হইয়াই তৃপ্ত হন নাই। ইহার পরে তিনি যেখান হইতে অদ্বৈতবোধ পরিহার করিয়া, দ্বৈতবোধরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তাহার নাম অসুরভূমি এবং অসুরগণ সেই ভূমির অধিবাসী। এই জন্য বলা হয়—অসুর বা দৈত্যগণ দিতির সন্তান অর্থাৎ তাহারা সকলে আত্মার দ্বৈতবোধের বিস্তৃতি।

সুতরাং দেব শব্দের অর্থ—অনন্ত ও অদ্বৈতবোধসম্পন্ন উর্দ্ধলোকবাসী জীব। আর অসুর শব্দের অর্থ হইল—দ্বৈতবোধসম্পন্ন জীব। আমরা মনুষ্য; পুরাপুরি দেবতা বা পুরাপুরি অসুর নহি। কিন্তু আমাদের প্রকৃতি—দৈব ও আসুর, উভয় ভাব বা শক্তির সমন্বয়ে গঠিত। এই জন্য আমাদের মধ্যেও দেবাসুরের দ্বন্দ্ব আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং অসুর ও দেবতার পরিচয় আমাদের অপ্রয়োজনীয় নহে। বিশেষতঃ বেদের আলোচনায় ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কেন না, বেদের প্রচলিত ব্যাখ্যা ও অনুবাদ-গ্রন্থে এই বিষয়ে নানা সংশয় ও কদর্থ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ইন্দ্র ও বৃত্রের স্বরূপ এবং আমাদের মধ্যে ঐ উভয়ের বিদ্যমানতা বিষয়ে আলোচনা করা গিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে অহি ও বল অসুর এবং ইন্দ্র কর্ত্তৃক তাহাদের বিনাশ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। অহি অসুরের উল্লেখ ঋগ্‌বেদসংহিতায় এইরূপ পাওয়া যায়,—

> ইন্দ্রস্য নু বীর্য্যাণি প্র বোচং যানি চকার প্রথমানি বজ্রী।
> অহন্ অহিম্ অনু অপস্ততর্দ্দ প্র বক্ষণা অভিনৎ পর্ব্বতানাম্॥

বজ্রধর ইন্দ্র প্রথমেই পরাক্রমযুক্ত যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি। তিনি অহি অসুরকে হনন করিয়াছিলেন; তাহার পরে [পৃথিবীতে] অপ্ সকল নিপাতিত

করিয়াছিলেন। পরে পর্ব্বতসম্বন্ধীয় প্রবহণশীল নদীসকলকে [কূলদ্বয় কর্ষণদ্বারা] প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

অহন্ অহিং পর্ব্বতে শিশ্রিয়াণং ত্বষ্টাস্মৈ বজ্রং স্বর্য্যং ততক্ষ।
বাশ্রা ইব ধেনবঃ স্যন্দমানা অঞ্জঃ সমুদ্রম্ অবজগ্মুরাপঃ॥

পর্ব্বতে আশ্রয়গ্রহণকারী অহিকে ইন্দ্র হনন করিয়াছিলেন। [এবং সেই কার্য্য সাধনার্থ] ত্বষ্টা ইন্দ্রের নিমিত্ত শব্দময় বজ্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। [সেই বজ্র দ্বারা অহি নিহত হইলে] বৎসের অভিমুখে ধেনুগণ যেমন ধাবিত হয়, সেইরূপ স্যন্দমান অপ্ সকল সমুদ্রকে সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিল।

বৃষায়মাণঃ অবৃণীত সোমং ত্রিকদ্রুকেষু অপিবৎ সুতস্য।
আ সায়কং মঘবাদত্ত বজ্রম্ অহন্ এনং প্রথমজাম্ অহীনাম্॥

বৃষায়মাণ অর্থাৎ বর্ষণশীল বা দানশীল ইন্দ্র সোমকে বরণ করিয়াছিলেন; তিনি ত্রিকদ্রুক নামক যজ্ঞে অভিষুত সোম পান করিয়াছিলেন। মঘবান্ ইন্দ্র বজ্রকে সায়করূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা অহিগণের মধ্যে প্রথমজাত এই অহিকে হনন করিয়াছিলেন।

উপরে যে তিনটি মন্ত্র উদ্ধৃত হইল, তাহাতে অহি অসুর এবং ইন্দ্র কর্ত্তৃক তাহার হননের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ঋগ্‌বেদসংহিতার আরও অনেক মন্ত্রে ঐ অসুরের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাহুল্যবোধে তাহা উদ্ধৃত হইল না। এইবার আমরা ছান্দোগ্য উপনিষৎ অনুধাবন করিতেছি। উক্ত উপনিষদের প্রথম প্রপাঠক, দ্বাদশ খণ্ডে দেখা যায়—

……তে হ সমুপবিশ্য হিং চক্রুঃ॥

আচার্য্য শঙ্কর ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'তে…সমুপবিশ্য উপবিষ্টাঃ সন্তঃ হিং চক্রুঃ হিংকারং কৃতবন্তঃ।' তাহারা উপবেশনপূর্ব্বক হিং বা হিঙ্কার করিল। কিন্তু হি, হিং বা হিংকার জিনিষটি কি, তাহা তাঁহার ব্যাখ্যায় পাওয়া যায় না। যাহা হউক, ইহার পরে 'পঞ্চবিধং সাম উপাসীত'—পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করিবে, এই উপদেশ প্রসঙ্গে পঞ্চবিধ সাম কি কি, বহু বিষয় অবলম্বন করিয়া তাহা কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে দুইটি বিষয় এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।—

লোকেষু পঞ্চবিধং সাম উপাসীত। পৃথিবী হিংকারঃ,
অগ্নিঃ প্রস্তাবঃ, অন্তরীক্ষম্ উদ্‌গীথঃ, আদিত্যঃ
প্রতিহারঃ, দ্যৌঃ নিধনম্।

পৃথিবী আদি লোকসমূহে পঞ্চবিধ সামোপাসনা করিবে। পঞ্চবিধ সাম কি কি? হিংকার, প্রস্তাব, উদ্‌গীথ, প্রতিহার, নিধন। ইহাদিগকে যথাক্রমে পৃথিবী, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, আদিত্য ও দ্যুলোকে উপাসনা করিবে। ইহার পরে—

বৃষ্টৌ পঞ্চবিধং সাম উপাসীত। পুরোবাতো
হিংকারঃ, মেঘো জায়তে স প্রস্তাবঃ, বর্ষতি স
উদ্‌গীথঃ, বিদ্যোততে স্তনয়তি স প্রতিহারঃ, উদ্‌গৃহ্লাতি তৎ নিধনম্।

বৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামোপাসনা করিবে। পুরোবাত অর্থাৎ বৃষ্টির পূর্বে যে বায়ু বহে, তাহা হিংকার; আকাশ মেঘে পূর্ণ হয়, তাহা প্রস্তাব; বর্ষণ করে, তাহা উদ্গীথ; বিদ্যুৎ চমকায় ও মেঘ ডাকে, তাহা প্রতিহার; বৃষ্টি থামিয়া যায়, তাহা নিধন।

পঞ্চবিধ সামোপাসনা আমাদের আলোচ্য নহে। আমাদের আলোচ্য বিষয় হি, হিং বা হিংকারের অর্থ। কেন না, উহার অর্থ জানিতে পারিলেই 'হি'র বিপরীত 'অহি' অসুরের স্বরূপ অবধারণে আমরা সক্ষম হইব। সেই জন্য একটি সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা হিংকারাদি পাঁচটি শব্দের তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। ধরুন, আমি একটি কর্ম্মপ্রার্থী। নানা সূত্রে সংবাদ অবগত হইয়া আমার বোধ হইল যে, অমুক স্থলে চেষ্টা করিলে আমার একটি কর্ম্ম জুটিতে পারে। এই যে নিশ্চয়াত্মক ধারণা বা বোধ, ইহার নাম হি বা হিংকার; কর্ম্মপ্রাপ্তি বিষয়ে এই আমার হিংকার করা হইল। তার পর যাহাকে ধরিলে আমার উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে, তাহার নিকট যাতায়াত, অনুরোধ উপরোধ চালাইতে থাকিলাম; ইহার নাম প্রস্তাব। প্রস্তাবিত কর্ম্মে আমার যোগ্যতা বিষয়ে প্রশ্ন উঠিলে, আমি যে স্বীয় দক্ষতার পরিচয় দিলাম, তাহার নাম উদ্গীথ। কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবের নিকট সফলতা খ্যাপনপূর্ব্বক যে আনন্দ ও গৌরব প্রকাশ, তাহার নাম প্রতিহার এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে কর্ম্মে যোগদান করিয়া, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ার নাম নিধন অর্থাৎ ঐ হিঙ্কারের সমাপ্তি।

হিংকারের অর্থ পাইলাম—নিশ্চয়াত্মক এমন জ্ঞানশক্তি, যে কর্ম্মকে সিদ্ধ না করিয়া নিধন বা সমাপ্তি লাভ করে না। তাহা হইলে ইহার বিপরীত 'অহি'র অর্থ কি হইবে? অনিশ্চয়াত্মক জ্ঞানশক্তি, যাহার দ্বারা কোন কর্ম্মেই সাফল্য অর্জ্জন করা যায় না। এই উভয় জ্ঞানশক্তির পার্থক্য কি? যাহা আত্মগত বা আত্মার অধিকারভুক্ত, তাহার নাম হি বা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানশক্তি। আর যাহা আত্মার অনধিকৃত, আত্মজ্ঞানের বহির্ভূত, তাহার নাম অহি, অনিশ্চিত জ্ঞানশক্তি। কেন না, পরজ্ঞানের উপর আত্মার কোন কর্ত্তৃত্ব দেখা যায় না। পক্ষান্তরে আত্মগত শক্তিতেই আত্মার কর্ত্তৃত্ব সম্ভবপর। যেমন, ইন্দ্রিয় ও মনঃশক্তির উপর বদ্ধ আত্মারও কিছুটা কর্ত্তৃত্ব দেখা যায়। কিন্তু যে শক্তি জগদাকারে প্রকাশমান, তাহা একেবারে পর বলিয়া, তাহার উপর কোন কর্ত্তৃত্ব দেখা যায় না।

এইবার অহির কার্য্য সম্বন্ধে একটু পরিচিত হওয়া যাক। ধরুন, আমি দ্যুলোক বা অদ্বৈত জ্ঞানভূমিতে গমনাভিলাষী হইয়া পৃথিবীতে হিংকার করিলাম। কিন্তু আমি বৃত্রাদি অসুরশক্তির অধীন বলিয়া আমার সে দুর্ব্বল হিংকার পৃথিবীর অন্তরস্থ অগ্নিলোকে প্রস্তাব আকারে উপস্থিত হইতে পারিল না। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলে হয় ত উপস্থিত হইতে পারিত। কিন্তু অহি ত আমার দেহ-পর্ব্বতেরই অধিবাসী। সে আমার অভিলাষ অবগত হইয়া, একটু পরেই মনোমধ্যে অভ্যুত্থিত হইল এবং সহানুভূতির সহিত বলিতে লাগিল—'তাহা কি হয়! দ্যুলোক হইল মনুষ্যের একটা কল্পনা। কল্পনাবিলাসীরা ঐরূপ কল্পনায় সুখ পায়। সুতরাং যাহার অস্তিত্বই নাই, তাহার জন্য এত চেষ্টা কেন?' আমারও উপদেশ ভাল লাগিল। আমি স্বর্গকামনা হইতে নিবৃত্ত হইলাম। অসুরশক্তি এই প্রকারে মানুষের উর্দ্ধগতিতে বাধা জন্মাইয়া থাকে।

পুরাণে আছে—দক্ষালয়ে সতীর দেহত্যাগের পর জগদ্গুরু শিব তাঁহার মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া উন্মত্তের ন্যায় ত্রিভুবনে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। জীবরূপী শিবও তেমনি জগৎরূপ এই দক্ষালয়ে হিংকাররূপিণী তাঁহার সতীকে হারাইয়া, মাটি জল, আগুন বাতাস, আকাশরূপ তাঁহার মৃতদেহ মস্তকে স্থাপনপূর্বক ত্রিলোকে ছুটাছুটি করিতেছেন। তিনি কি আর হিঙ্কাররূপিণী তাঁহার সতীকে পাইবেন না? পাইবেন। কিন্তু সে জন্য তাঁহাকে তাঁহারই আত্মা ইন্দ্রের শরণাগত হইতে হইবে। কেন না, হিংকার ইন্দ্রেরই মহাশক্তি। সেই জন্য ইন্দ্রশক্তিকে 'মহাবজ্রে!' 'বৃত্রপ্রাণহরে!' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। ইন্দ্রের হিংকার মহাবজ্রস্বরূপ। বিদ্যুৎ প্রকাশ পাইলে অন্ধকার যেমন স্বতঃই পলায়ন করে, হিংকারের আবির্ভাবে অহি অসুর তেমনি পরাভূত হইয়া থাকে। 'ইন্দ্রেণ যুজা তরুষেম বৃত্রম্'—ইন্দ্রের সাযুজ্য লাভ করিয়া, তাঁহার হিংকারশক্তিতে শক্তিমান্ ঋষিগণ যেমন বৃত্রকে হনন করিয়াছিলেন, অহি অসুরও সেই ভাবেই নিহত হইয়া থাকে। 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপমীয়তে'—ইন্দ্র তাঁহার মায়া বা হিংকারশক্তির দ্বারা বহুরূপ ধারণ করেন। তিনি এক থাকিয়াই বহু হন। যেখানে এক থাকেন, সেইখানকার মহাশক্তির নাম হিংকার। আর যেখানে বহু রূপ ধরিয়া বহু জীবাত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হন, সেইখানকার শক্তির নাম 'অহি' অসুর। সুতরাং হিংকারের অর্থ—মুক্ত আত্মার অব্যাহত শক্তি; যাহা মনে করিব, তাহাই তৎক্ষণাৎ ঘটিতে বাধ্য, এইরূপ নির্ব্বাধ আত্মশক্তি। আর অহির অর্থ—বদ্ধ জীবাত্মার বন্ধনঘটয়িত্রী শক্তি। হিংকাররূপিণী আত্মশক্তিকে আমি জানি না। যাহা জানি, তাহা অহি বা অনিশ্চিত পরশক্তি। তাহাদের উপর আমার কোন আধিপত্য নাই। পরন্তু আমি তাহাদেরই অধীন হইয়া নিজেকে ভুলিয়া রহিয়াছি।

অসুরগণের মধ্যে অহি প্রথমজ। অবশ্য 'অহি' শব্দে অসুর মাত্রকেই বুঝাইয়া থাকে। কেন না, অসুর মাত্রেই অনিশ্চিত জ্ঞান বা পরজ্ঞান। কিন্তু তাহাদের মধ্যে আবার এক এক জনের বিশেষ বিশেষ কার্য্যকারিতা লক্ষ্য করিয়া পৃথক্ পৃথক্ নাম দেওয়া হইয়াছে। অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মা যখন নিজ আত্মত্ব বা শিবত্ব ভুলিয়া যান, সেই সমকালেই তাঁহার হিংকারশক্তিও চলিয়া যায়। অনুপ্রবেশের জন্য আত্মত্ব ও আত্মশক্তিকে আত্মা ভুলিয়াছেন, অথচ পুরাপুরি জীবত্ব লাভ করেন নাই, একটু একটু করিয়া জীবত্ব আসিতেছে, এই অবস্থায় আত্মা যে অসুরশক্তির অধীন হইয়া পড়েন, তাহার নাম অহি এবং এই অহি হইল অসুরগণের প্রথমজ।

২। বল অসুর ও ইন্দ্র

বৃত্র ও অহি অসুর সম্বন্ধে বেদব্যাখ্যাতৃগণের মধ্যে কল্পনার অন্ত নাই। কেহ অন্ধকার, কেহ মেঘ, কেহ নক্ষত্র, কেহ সামুদ্রিক সর্প ইত্যাদি নানা জনে নানারূপ কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু বেদের মধ্যেই যে ঐ অসুরদ্বয়ের স্বরূপ বর্ণিত আছে, তাহাতে কেহই দৃষ্টিপাত

করেন নাই। যাহা হউক, বৃত্র ও অহির পরে এক্ষণে বল অসুরের স্বরূপ নির্ণয়, তাহার কার্য্য ও বধোপায় আমাদের আলোচ্য বিষয়। বল অসুরের উল্লেখ ঋগ্বেদসংহিতায় এইরূপ পাওয়া যায়,—

ত্বং বলস্য গোমতঃ অপাবরদ্রিবো বিলং।
ত্বাং দেবা অবিভ্যুষঃ তুজ্যমানাস আবিষুঃ ॥

সায়ণ আচার্য্য উদ্ধৃত মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এই,—"বলনামকঃ কশ্চিদসুরো দেবসম্বন্ধিনীর্গা অপহৃত্য কস্মিংশ্চিদ্‌বিলে গোপিতবান্। তদানীমিন্দ্রস্তদ্‌বিলং স্বসৈন্যেন সমাবৃত্য তস্মাদ্‌বিলাদ্‌গা নিঃসারয়ামাস। তদিদমুপাখ্যানং ইন্দ্রো বলস্য বিলমপৌর্ণোদিত্যাদি ব্রাহ্মণেষু মন্ত্রান্তরেষু চ প্রসিদ্ধং। তদেতৎ হৃদি নিধায় অয়ং মন্ত্রঃ প্রবর্ত্ততে। হে অদ্রিবঃ বজ্রযুক্ত ইন্দ্র! ত্বং গোমতো বলস্য গোভির্যুক্তস্য বলনামকস্য অসুরস্য সম্বন্ধি বিলং অপাবঃ স্বসৈন্যমুখেন অপাবৃতবানসি। তদানীং তুজ্যমানাসঃ বলেন হিংস্যমানা দেবা অবিভ্যুষঃ ত্বদীয়-রক্ষয়া বলাৎ অভীতাঃ সন্তঃ ত্বাং আবিষুঃ প্রাপ্তবন্তঃ ॥

বল নামক কোন এক অসুর দেবগণের গোসমূহ অপহরণ করিয়া কোন এক গর্ত্তে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। তখন ইন্দ্র স্বকীয় সৈন্যদ্বারা সেই গর্ত্তকে সমাবৃত করিয়া, তথা হইতে গোসমূহকে নিঃসারিত করিয়াছিলেন। সেই এই উপাখ্যান ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য মন্ত্রসমূহে প্রসিদ্ধ আছে। এই উপাখ্যানগত জ্ঞান হৃদয়ে নিহিত করিয়া এই মন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। হে অদ্রিব অর্থাৎ বজ্রযুক্ত ইন্দ্র! তুমি গোযুক্ত বলনামক অসুরের গর্ত্ত স্বকীয় সৈন্যমুখ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়াছিলে। তখন বলকর্ত্তৃক হিংস্যমান দেবগণ তোমার রক্ষার দ্বারা বলাসুর হইতে অভীত হইয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বল অসুরের কবল হইতে ইন্দ্র দেবগণের গাভী উদ্ধার করিয়া দিয়াছিলেন, এই জন্য ঋষিগণ বহু মন্ত্রে ইন্দ্রের নিকট গাভী প্রার্থনা করিয়াছেন। 'গবাম্ অপ ব্রজং বৃধি'— আমাদের গোসকলের যে ব্রজ বা নিবাসস্থান, তাহার দ্বার খুলিয়া দাও, ইহাই ঋষিগণের প্রার্থনা। কিন্তু ব্রজের দ্বার খুলিয়া দিবার জন্য ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা কেন? এই কার্য্য ত তাঁহারা নিজেরাই করিতে পারিতেন? পারিতেন, যদি ইহা পার্থিব গাভীর ব্রজ হইত। কিন্তু ইহা পার্থিব গাভীর ব্রজ নহে; এ গাভী অন্য প্রকার। ক্রমশঃ তাহা পরিস্ফুট হইবে। আর এই ব্রজদ্বার খুলিবার চাবি মনুষ্যের নিকট নাই; ইন্দ্র আত্মা বা ঈশ্বরের নিকট ইহা থাকে। তিনি খুলিয়া না দিলে অন্য কেহ ইহা খুলিতে পারে না। সেই জন্য ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা। সুতরাং ইন্দ্র শুধু বৃষ্টি, অন্ন ও ধনদাতা নহেন, উপাসকগণকে তিনি গাভীও দান করিয়া থাকেন। বৃষ্টি, অন্ন ও ধনের তাৎপর্য্য পরে বিবৃত করার ইচ্ছা রহিল।

বলাসুর দেবগণের গাভী হরণ করিয়াছিল, ইহা সুপ্রাচীন কাহিনী। সে ঘটনা কবে ঘটিয়াছিল, কে বলিবে? কিন্তু মনুষ্যে মনুষ্যে, জীবে জীবে এই ঘটনা কি আজও সংঘটিত হইতেছে না? বৃত্র ও অহির ন্যায় বল অসুরও কি প্রতি মনুষ্যের অন্তরে বর্ত্তমান থাকিয়া তথাকার দেবগাভীহরণরূপ স্বকার্য্য সাধন করিতেছে না?

দেবগাভী কাহাকে বলে, তাহার পরিচয় সংহিতাভাগে মিলিবে না। সে জন্য উপনিষদ্‌ভাগের শরণ লইতে হইবে। সংহিতা, উপনিষদ্ ও ব্রাহ্মণের মধ্যে কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তাহা অগ্রে উল্লেখ করিতেছি। যজ্ঞে প্রয়োক্তব্য মন্ত্রসমষ্টির যে সংগ্রহ, তাহার নাম সংহিতা। যজ্ঞ ও যজনীয় দেববিষয়ক নানাবিধ জ্ঞান সেই সকল মন্ত্রমধ্যে গূঢ়ভাবে নিহিত; বাহ্য দৃষ্টিতে তাহা ধরিবার উপায় নাই। কি বেদ, কি তন্ত্র, উভয়ত্রই মন্ত্রবিন্যাসের এই হইল পদ্ধতি। কিন্তু উপনিষদে সুস্পষ্টভাবে ও ব্রাহ্মণে কিঞ্চিৎ আবরণ রাখিয়া এই সকল জ্ঞানের বিস্তার রহিয়াছে। আচার্য্য শিষ্যগণকে যে ঔপনিষদ জ্ঞান উপদেশ করিতেন, তদ্দ্বারা শিষ্যেরা আত্মা বা ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতেন। পরে যজ্ঞকালে অর্চ্চনামূলক গূঢ়ার্থ মন্ত্র প্রয়োগদ্বারা মন্ত্রাত্মক দেবগণ অর্চ্চিত হইতেন। উপনিষদ্, ব্রাহ্মণ ও সংহিতার মধ্যে এইরূপ অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। কিন্তু ইউরোপীয় বেদব্যাখ্যাতৃগণ এই সম্পর্ক উপেক্ষাপূর্ব্বক শুধু মন্ত্রাংশে দেবতা অন্বেষণ করিতে গিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছেন এবং ব্রহ্মবাদী ঋষিগণকে জড়োপাসক প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এতদ্দেশে আধুনিক শিক্ষিতগণের মধ্যে বেদালোচনা ইউরোপীয়গণের অনুসরণে আরম্ভ হয়। সুতরাং তাঁহারাও বিদেশীয় চশমা দিয়াই বেদপাঠ করেন। আসলে বেদ যে অনাদি ও অপৌরুষেয়, পূর্ব্বাচার্য্যগণের এই সিদ্ধান্ত কেহই বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই। হয় ত বর্ত্তমান প্রবন্ধের পাঠকগণও এই সিদ্ধান্তে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবেন না। সেই জন্য বেদ বিষয়ে অতি সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি।

বেদ শব্দটি বিদ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। উহার অর্থ—জ্ঞান। সুতরাং পরমাত্মার জগদ্‌বিষয়ক যে বেদন বা জ্ঞান, বেদ অর্থে মূলতঃ তাহাই বুঝাইয়া থাকে। এই জন্য বলা হইয়াছে—'তস্য বা মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতৎ'—সেই মহদ্‌ব্রহ্ম, যিনি জগৎ ও জীবরূপে ভূত বা সত্তাবান্ হইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, বেদ হইল তাঁহারই নিশ্বসিত বা জ্ঞানময় কর্ম্মপ্রকাশ। পরমাত্মার এই জ্ঞানময় কর্ম্মপ্রকাশ কি রকম, তাহা কে বলিবে? তবে এ কথা ঠিক যে, আমরা যে জ্ঞান লইয়া ঘর-সংসার করি, ঐ জ্ঞান সে রকম জ্ঞান নহে। ঐ জ্ঞান সেই রকম তেজঃসম্পন্ন, যে তেজ এই স্থূল জগদাকারে পরিণত হইয়াছে। ঐ জ্ঞানে সেই রকম প্রাণ বা মহাবিধৃতিশক্তি বর্ত্তমান, যিনি এই বিরাট্ জগৎ সুশৃঙ্খলার সহিত ধারণ করিতেছেন। ঐ জ্ঞানে সেই রকম সত্যসঙ্কল্পতা বিদ্যমান, যে সত্যসংকল্পের প্রভাবে এই অসীম জগৎ সত্য হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। পরমাত্মার এইরূপ জ্ঞানময় কর্ম্মপ্রকাশের নাম যদি হয় বেদ, তবে 'বেদ সনাতন, অনাদি ও অপৌরুষেয়,' প্রাচীন আচার্য্যগণের এই সিদ্ধান্তে কোন ভুল আছে কি? বেদ সনাতন; কেন না, যে-কোন কালে, যে-কোন দেশে, যে-কোন মনুষ্য অন্বেষণ করিবে, সে তাহার এবং জগতের উৎপত্তির মূলীভূত পরমাত্মার ঐ বেদন বা বেদকেই প্রাপ্ত হইবে। জীব ও জগৎসৃষ্টি যেমন অনাদি এবং অপৌরুষেয়, উহাদের মূলীভূত পরমাত্মার বেদন বা বেদও তেমনই অনাদি ও অপৌরুষেয়। ঋষিগণ ঐ অপৌরুষেয় মন্ত্রময় বেদ প্রত্যক্ষ করিয়া মন্ত্রদ্রষ্টা ও বেদবক্তা হইয়াছিলেন। তাই তাঁহাদের

মুখনির্গত তৎকালপ্রচলিত ভাষায় সেই সকল বেদজ্ঞান নিবদ্ধ হইলেও তাহা মূলীভূত ঐ বেদেরই প্রকাশ বলিয়া বেদগ্রন্থকেও অপৌরুষেয় গণ্য করা হয়। ধরুন, অবিদ্যা ও বিদ্যাতত্ত্বের অন্তর্গত আমাদের আলোচ্য অসুর ও দেবতা। বেদগ্রন্থে পুরুষমুখে বিবৃত হইলেও এই দুইটি জিনিষ পরমাত্মার বেদন বা বেদপ্রকাশ ছাড়া অন্য কিছু নহে। সুতরাং অনাদি ও অপৌরুষেয়। কেন না, যত কাল সৃষ্টি, ততকাল দেবতা ও অসুর আছে এবং থাকিবে। সুতরাং সৃষ্টি যেমন অনাদি ও অপৌরুষেয়, অসুর ও দেবতাও তাই। কাজেই অপৌরুষেয় তত্ত্ব ভাষানিবদ্ধ হইয়া যে গ্রন্থে বিবৃত, সেই গ্রন্থকেও তদুচিত সম্মান দেওয়া অশোভন নহে। ঐ তত্ত্ব কথঞ্চিৎ হৃদ্‌গত হইলে (বুদ্ধিগত নহে) বরং ইহা একান্ত স্বাভাবিক। বেদ পুরুষরচিত, এই বহিরংশে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিলে দেশান্তর ও কালান্তর জ্ঞান না আসিয়া পারে না এবং ঐ তিনটি জ্ঞান ফুটিয়া উঠিলে মূল বেদজ্ঞান অন্তর্হিত হইয়া যায়। হইয়াছেও তাহাই। তাহার ফলে প্রকৃত বেদবিদ্যা আজ বিলুপ্ত।

এখন আলোচ্য বিষয়ে ফিরিয়া যাইতেছি। দেবগাভী বিষয়ে বৃহদারণ্যক উপনিষদে এইরূপ উপদেশ আছে,—

বাচং ধেনুম্ উপাসীত। তস্যাঃ চত্বারঃ স্তনাঃ,
স্বাহাকারঃ বষট্‌কারঃ হন্তকারঃ স্বধাকারঃ।
তস্যাঃ দ্বৌ স্তনৌ দেবা উপজীবন্তি স্বাহাকারঞ্চ
বষট্‌কারঞ্চ, হন্তকারং মনুষ্যাঃ, স্বধাকারং
পিতরঃ। তস্যাঃ প্রাণ ঋষভঃ, মনো বৎসঃ॥

বাক্‌রূপ ধেনুকে উপাসনা করিবে। পার্থিব ধেনুর ন্যায় তাহারও চারিটি স্তনবৃন্ত আছে; তাহার নাম স্বাহাকার, বষট্‌কার, হন্তকার, স্বধাকার। স্বাহাকার ও বষট্‌কার, এই দুই স্তনদুগ্ধ দেবগণের উপজীব্য, হন্তকার মনুষ্যের, স্বধাকার পিতৃগণের ভোগ্য। সেই ধেনুর বৃষ হইল প্রাণ, বৎস মন।

বাক্যরূপ একটি গাভী; তাহার বৎস হইল মন, এবং বৃষ হইল প্রাণ। মনুষ্য, দেবতা ও পিতৃগণ, সকলেরই এই তিনটি জিনিষ অর্থাৎ বাক্যরূপ গাভী, মনরূপ বৎস ও প্রাণরূপ বৃষ আছে। তন্মধ্যে মনুষ্যেরা তাহাদের মনরূপ বৎসের সাহায্যে ঐ গাভীর যে স্তনবৃন্তটি দোহন করিয়া খায়, এবং তাহাতে ঐ গাভীর বৃষ অর্থাৎ প্রাণ যাহা বর্ষণ করে, তাহার নাম হন্ত। পিতৃগণ তাঁহাদের মনোবৎসসহায়ে যে স্তনবৃন্তটি দোহন করিয়া খান, বৃষ তাহাতে বর্ষণ করে স্বধা। আর দেবগণের বেলায় বর্ষিত হয় স্বাহা ও বষট্।

বিষয়টিকে আরও একটু পরিষ্কার করার চেষ্টা করিতেছি। সে জন্য প্রথমেই হন্ত, স্বধা, স্বাহা ও বষট্, এই চতুর্বিধ স্তন্যের পরিচয় জানা আবশ্যক। হন ধাতুসমুৎপন্ন হন্ত শব্দের অর্থ হনন ও খেদ। কাহার হনন এবং কি জন্য খেদ? মনুষ্য আমরা, দিবা রাত্রি অনাত্ম বিষয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া তাহাদের সেবা করিয়া থাকি, ইহাই আমাদের স্বভাব। তাহার ফলে হয় কি? হৃদয়স্থ সত্যস্বরূপ চিন্ময় আত্মা ঐ বিষয়জ্ঞান দ্বারা আবৃত হইয়া আমাদের

কাছে উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত, অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়েন এবং বিষয়সমূহই আমাদের অতিশয় প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। ইহার পরিণামে আত্মার অস্তিত্ব বিষয়েই আমরা সন্দিগ্ধ হইয়া পড়ি। মনুষ্যের এই অবস্থাকে বেদে বলা হইয়াছে আত্মহনন। আর বিষয়-নির্ভরতার ফলে বৈষয়িক ইষ্ট বিয়োগ, অনিষ্টপ্রাপ্তি, আশাভঙ্গ, হিংসা দ্বেষ, আধিব্যাধি ইত্যাদি এবং পরিণামে মৃত্যু, এই সব প্রাপ্ত হইয়া আমাদের খেদ উপস্থিত হয়। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ বিষয়ানুসরণের মূলে মনরূপ বৎস দ্বারা বাক্যরূপ গাভীর দোহন চলিতেছে অর্থাৎ মনোমধ্যে তজ্জাতীয় বাক্য স্ফুরিত হইতেছে এবং সেই বাক্‌শক্তিতে চালিত হইয়া আমরা বিষয়ের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছি। আর ঐ বাক্যরূপ গাভীর বৃষ বা আমাদের প্রাণ হন্তকার বর্ষণ করিতেছে অর্থাৎ প্রাণ খেদযুক্ত হওয়ায় আমরাও খেদ প্রাপ্ত হইতেছি। ইহারই নাম—মনুষ্যগণের বাক্‌রূপিণী ধেনুর হন্তকাররূপ স্তন্য খাওয়া।

আর এক শ্রেণীর মনুষ্য আছেন, যাহারা দেবতা বা ভগবানের উপাসক। কিন্তু আত্মবিষয়ক জ্ঞান উপেক্ষিত, অতএব অনুন্মেষিত থাকার জন্য তাঁহাদের উপাসনা আত্মভাবে হয় না। আমি একজন পৃথক্ ব্যক্তি, আর উপাস্য দেবতা বা ভগবান্ আমা হইতে অন্য, এইরূপ পরভাবে উপাসনা ঘটে। এই উপাসনার মূলেও দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, তাঁহাদের মনোবৎসসহায়ে বাক্যরূপ ধেনুর দোহন চলিতেছে এবং প্রাণরূপী বৃষ যাহা বর্ষণ করিতেছে, তাহার নাম স্বধা। স্বস্মিন্ ধীয়তে—বৃষের ঐ বর্ষণদ্বারা স্ব—নিজত্ব বা আত্মবোধে দেবতা বা ভগবদ্‌বিষয়ক জ্ঞান বিধৃত হয়, সঞ্চিত হয়, এই জন্য ঐ বাগ্‌দোহনোত্থ স্তন্যের নাম স্বধা। এবম্বিধ উপাসনাকে পিতৃউপাসনা বলে। কেন ? প্রথমোক্ত মনুষ্যেরা বিষয়সেবা দ্বারা যে হন্তকারের ভোক্তা হন, তাঁহাদের সেই বিষয়কর্ম্ম কর্ম্মপদবাচ্য নহে ; উহার নাম অকর্ম্ম বা বিকর্ম্ম। কিন্তু দেব ও ভগবদুপাসনার নাম কর্ম্ম। ঐ সকল কর্ম্মদ্বারা পরবর্ত্তী জন্মে উপাসকের দৈব বা ভাগবত জীবন লাভ ঘটে। পিতা যেমন জন্মের কারণ, সেইরূপ ঐ সকল কর্ম্ম পিতৃরূপী হইয়া উপাসকগণকে ঐ প্রকার জন্মগ্রহণ করায়, এই জন্য নাম পিতৃউপাসনা এবং ইহার স্তন্য ভোগের নাম স্বধা।

এই পর্য্যন্ত হইল জীবপাদের বিষয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাদিতে অনুপ্রবেশ করিয়া আত্মা যেখানে জীবপদবাচ্য, সেইখানকার বিষয়। ইহার পরে দেবলোকের বিষয়। স্বধা বা পিতৃউপাসনার পরিণতিতে উপাসক স্বীয় অন্তরে এই লোকের সন্ধান প্রাপ্ত হন। নির্ম্মল প্রীতিপ্রদ অন্তর্জ্যোতিতে এই লোক উদ্ভাসিত এবং দেবতা বলিতে কি বুঝায়, এখানে আসিয়া উপাসক তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে থাকেন। এইখানকার দেবোপাসনায় ক্রমশঃ দূরশ্রবণ, দূরদর্শন, প্রাতিভ জ্ঞান, বাক্যের সত্যতা, দিব্য গন্ধ, দিব্য স্বাদ ইত্যাদি দৈব ধর্ম্মগুলি উপাসকের অন্তরে পরিস্ফুট হইতে থাকে এবং ঐ অবস্থায় উপাসনাকালে মনোবৎসের সাহায্যে তিনি যে বাক্‌রূপিণী ধেনুকে দোহন করেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণরূপী বৃষ স্বাহা ও বষট্ বর্ষণ করে। তাই দেবগণের স্তন্য স্বাহা ও বষট্। এই স্তন্যের আস্বাদ লিখিয়া হৃদয়ঙ্গম করান যায় না ; ইহা স্বানুভববেদ্য। তবে এই মাত্র বলা যায় যে, মর্ত্ত্য জগতে

হস্ত ও স্বধারূপ স্তন্যের আস্বাদকালে যে স্ব অর্থাৎ নিজ আকারীয় বোধ প্রকাশমান থাকে, তাহা অনির্দ্দিষ্ট, দুঃখময় ও জীবভাবীয়। কিন্তু স্বাহা ও বষট্ স্তন্যের আস্বাদ লাভ করিয়া ঐ নিজজ্ঞানটি সুনির্দ্দিষ্ট, সুখময়, দৈব আকৃতিসম্পন্ন ও বাক্যে বাক্যে প্রবাহিত হইয়া ব্যাপক হইতে থাকে। মরলোকে জড়ত্বের মধ্যে যে নিজত্বকে মানুষ হারাইয়া ফেলে, দেবগণের স্বাহা ও বষট্ স্তন্য পান করিয়া এখানে মানুষ সেই নিজেকে ফিরিয়া পায়। সুতরাং বাক্যে বাক্যে প্রাণরূপী বৃষের যে স্ব, নিজ বা আত্মজ্ঞান বর্ষণ, তাহার নাম স্বাহা এবং বাক্যে বাক্যে প্রবাহিত হইয়া ঐ আত্মবোধের যে, ব্যাপক আকৃতি ধারণ, তাহার নাম বষট্। বষট্ শব্দটি বহ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

ব্রহ্মের সৃষ্টিরূপ যে শক্তিপ্রকাশ, তাহা সর্ব্বত্রই দ্বন্দ্বভাবময় অর্থাৎ বিপরীত শক্তি-প্রকাশময়। যেমন দিবা রাত্রি, আলো অন্ধকার, জন্ম মৃত্যু ইত্যাদি। অন্তরের যে গূঢ় প্রদেশে দেবলোকের অবস্থান, তাহারই অন্য আর এক দিকে আলোকের বিপরীত অন্ধকারের ন্যায় দেবলোকের বিপরীত অসুরলোক বর্ত্তমান। দেবলোকে দেবগণের ন্যায় ঐ অসুরলোক বৃত্রাদি অসুরগণের বাসস্থান। পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিসম্পন্ন, এই জন্য ঐ উভয় লোকের অধিবাসী দেব ও অসুরগণের চিরশত্রুতা, একে অন্যকে পরাভূত করার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত। বল অসুর হইল অসুরলোকস্থ অসুরগণের সমষ্টীভূত বল। সমষ্টীভূত বলকে একজন অসুর বলা হইয়াছে কেন? মরলোকে চক্ষু কর্ণ, হস্ত পদ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়শক্তিগুলির ব্যক্তিত্ব দেখা যায় না; মাত্র শক্তিরূপে উহারা প্রতিভাত হইয়া থাকে। কিন্তু দেবলোকে এই সকল শক্তি ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পৃথক্ পৃথক্ দেবতারূপে অনুভূত হন। আবার একই মুখ্য প্রাণ ঐ সকল দেবতা আকারে বহু হইয়াছেন, ব্রহ্মদৃষ্টিতে এইরূপ অনুভবও পাওয়া যায়। অসুর সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যে সকল আসুরিক ভাব বা শক্তির প্রকাশ হয়, আমরা তাহাদের ব্যক্তিত্ব দেখিতে পাই না; কিন্তু অসুরলোকে ঐ সকল শক্তির পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তিত্ব আছে। আবার মুখ্য প্রাণের ন্যায় ঋষিগণ ব্রহ্মদৃষ্টিতে ঐ সকল পৃথক্ পৃথক্ অসুরবলের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একত্বও দেখিয়াছেন। বলাসুর সেই রকম সমষ্টীভূত অসুরবল হইয়াও ঐ লোকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন অসুর। তাহার কার্য্য হইল দেবগণের গাভী হরণ করা। গাভী অপহৃত হইলে স্বাহা ও বষট্কাররূপ স্তন্যের অভাবে দেবগণ দুর্ব্বল, জ্যোতি ও শ্রীহীন হইয়া পড়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধকও দেবানুভূতি হইতে বঞ্চিত হন। দিবা ও রাত্রি, উভয়ের বিদ্যামানতা দ্বারা বহির্জ্জগতের কর্ম্মসকল যেমন সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হয়, সূক্ষ্ম জগতে সেইরূপ দিবা ও রাত্রিস্বরূপ হইল দেবলোক এবং অসুরলোক। ইহাদের সমভাবে বিদ্যমানতা না থাকিলে ঐ জগতের কার্য্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। তাই একদিকে দেবগণের শ্রীহীনতা দেখিয়া এবং অন্য দিকে সাধকগণের প্রার্থনা শুনিয়া, স্বীয় সৈন্য বা শক্তি দ্বারা অসুরগুহা বেষ্টনপূর্ব্বক ইন্দ্র ঐ দেবগাভী উদ্ধার করিয়া দেন এবং ইন্দ্রশক্তির নিকট ঐ অসুরবল বা বলাসুর পরাভূত হইলে দেবগণ ও সাধক অভয় লাভ করেন।

সুতরাং ইন্দ্রের নিকট ঋষিগণের যে গাভী প্রার্থনা, গোত্রজ উন্মুক্ত করিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা, সে গাভী হইল অন্তরস্থ ঐ দেবগাভী, যাহার স্তন্য পান করিয়া মনুষ্য অমর আত্মত্ব ও আত্মার আনন্ত্যজ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। উহা পার্থিব গাভী নহে।

বাংলা ভাষায় বিদ্যাসুন্দর কাব্য

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

অধ্যাপক শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

৬। নায়ক-নায়িকার বিহার

বিদ্যাসুন্দরের বিবাহের পরই গোবিন্দদাস বিহার বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় উদ্যোগপর্ব কিছু নাই বা ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের ন্যায় প্রচ্ছন্নবিহার বর্ণনা নাই। কৃষ্ণরামের কাব্যেই আমরা প্রথম 'বিহারারম্ভ' প্রসঙ্গের পর বিহার বর্ণনা দেখিতে পাই। আমরা প্রথমে এই দুই আদি কবির বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া, পরে পরবর্তী কবিগণ এই প্রসঙ্গ কি ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার তুলনা করিব। গোবিন্দদাস লিখিতেছেন,—

"হইল গন্ধর্ব্ব বিভা হরিষ দুই জনে।
পালঙ্কে বসিলা দোঁহে কৌতুক বিধানে॥
কর্পূরেতে পুরে মুখ অধরে চুম্বন।
বাহিরে গেলেন তবে যত সখীগণ॥
কেহ হাসে কেহ লাজে কেহ হেটমুখী।
বিদ্যাসুন্দর এখন রসেতে কৌতুকী॥
প্রথমে করিল কুমার কুচমর্দ্দন।
বদনে বদন দিয়া অধরচুম্বন॥
রতিকেলিরস বিদ্যা কিছুই না জানে।
লাজে ভয়ে চমকিত সচকিত মনে॥
মনে ভঙ্গ (?) করি তবে ঘুচাইল লাজ।
বাহু পসারিয়া তবে ধরে যুবরাজ॥
নয়ানে নয়ান দিয়া বয়ানে বয়ান।
রসসিত ভৃঙ্গ যেন করে মধুপান॥
উরুপর বন্ধন অতি খরতর।
বিদ্যাবতী চমকিত জোড় করে কর॥
রতিরঙ্গ রসকেলি আমি নাহি জানি।
রঙ্গে ক্ষমা দেহ পাছে বধহ রমণী॥
ক্ষণে হাসে সচকিত ক্ষণে ভয় লাজ।
ক্ষণে ক্ষণে সুনয়ান দোঁহে মন মাজ (?)॥
ভিজিল মদনরস রতি সমাধানে।
করে ব্যাপি (?) নরপতি বাহির পয়ানে॥"

এই বর্ণনার প্রথমাংশের সহিত সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের বর্ণনার কিছু মিল দেখা যায়। সেই খণ্ডিত কাব্যটির যে কয়টি শ্লোক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এই ভাবে রতিবর্ণনা আছে—

"ক্রীড়ার্থং মদনাতুরা প্রিয়তমা সঞ্জাত-লজ্জাদরা
কান্তং কেলিনিকেতনং নৃপসুতা নীত্বাত্ম-শয্যোপরি।
সংস্থাপ্যাগুরুচন্দনং সুকুসুমং কর্পূরপূগং পুরো
দত্ত্বা প্রীতসখীজনৈঃ প্রহসিতা কান্তেন সম্মানিতা॥
সব্রীড়াং হি বিনির্গতাং প্রিয়সখীং দৃষ্ট্বা স কামাতুর-
স্তস্যাঃ পীনঘনস্তনোরুযুগলাদাকৃষ্য চীনাংশুকম্।

কৃত্বালিঙ্গনচুম্বনং নৃপসুতাং পীত্বাধরং তাড়য়ন্
মন্দং দন্তনখক্ষতানি কুরুতে ক্ষোভঞ্চ নীব্যাস্ততঃ ॥
দৃষ্টে তজ্জঘনস্থলে স্তনযুগে লজ্জাভরব্যাকুলা
বালা সৎকবরীসুপুষ্পবিগলন্মালাহতে দীপকে।
চঞ্চদ্রত্নসুতেজসা সমভবদ্দীপোপমেন স্ফুটং
দৃষ্ট্বা কান্তগুণাধিকং স্মিতমুখী সা ত্যক্ত-লজ্জাভবৎ ॥"

অর্থাৎ "মদনাতুরা প্রিয়তমা রাজনন্দিনী বিদ্যা বিহারার্থ সলজ্জে সাদরে কান্ত সুন্দরকে কেলিনিকেতনে আনয়ন করিয়া আপন শয্যায় বসাইলেন ; অগুরু চন্দন, উত্তম পুষ্প, কর্পূরবাসিত গুপারি, প্রীত সখীগণ তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করিয়া তাঁহাকে সহাস্যে অভিনন্দন করিল ; তিনিও তাহাদিগকে সম্মানিত করিলেন। প্রিয়সখী অর্থাৎ বিদ্যাকে লজ্জায় গৃহ হইতে নির্গত হইয়া যাইতে দেখিয়া, কামাতুর সুন্দর তাহার পীনঘন স্তন ও উরুযুগল হইতে চীনাংশুক আকর্ষণ করিয়া, নৃপসুতাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া, তাহার অধর পান করিয়া ধীরে ধীরে তাড়ন ও দন্তনখক্ষতাদি করিয়া নীবিবন্ধ শিথিল করিতে লাগিলেন। তাহার জঘনস্থল ও স্তনযুগল সুন্দরের নয়নগোচর হইলে অতিশয় লজ্জায় ব্যাকুল হইয়া বালা বিদ্যা তাহার উত্তম কবরী হইতে স্খলিত শোভন কুসুমমালা লইয়া তাহার আঘাতে দীপ নির্বাপিত করিয়া দিলেন। কিন্তু উজ্জ্বল রত্নসমূহের তেজে দীপালোকেরই ন্যায় দেহ পরিস্ফুট হইল ; কান্তের গুণের অর্থাৎ সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি দেখিয়া স্মিতমুখী বিদ্যা লজ্জা ত্যাগ করিলেন।"

গোবিন্দদাস পরে প্রসঙ্গান্তরে নায়ক নায়িকার বিহারের উল্লেখ করিয়াছেন। সেখানে তিনি লিখিতেছেন—

"সুন্দর শোভিত মন্দিরে উপনীত
বিদ্যাবতী আছেন কৌতুকে।
দ্রব্য আভরণ সংহতি সখিগণ
নানা রস আছে সম্মুখে॥
ঘৃত মধু শর্করা গঙ্গাজল মনোহরা
কর্পূরবাসিত গুয়া পান।
দিব্য কনকঝারি তাহে সুবাসিত বারি
অনুক্ষণ কাম-অঠান ॥"

ইহা হইতে বুঝা যায়, গোবিন্দদাস সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের সহিত পরিচিত ছিলেন।

কৃষ্ণরামের বিহার বর্ণনায় কেবল শব্দঝংকার আছে ; বিশেষ কবিত্ব নাই—

"রমণ চঞ্চল হেরিয়া অঞ্চল
রহলি আনন ঝাঁপিয়া ॥
হরিতে কাচুলি অধিক আকুলি
উঠয়ে কামিনী কাঁপিয়া ॥
উচ্চ কুচপর কবিবর কর
জোর ঘন ঘন ঘুরায়ে।
অমিয়া সাগরে লুবুধ নাগরে
খুবধ মানস পুরায়ে ॥
নাথ কর ধরি রহল সুন্দরী
কহই রহ রহ বোল।
অলপ করি করি লাজ পরিহরি
দুঁহরি চিত্ত বিলোল ॥
সঘন চুম্বন চাঁদ যেইছন
পাইল বন্ধু চকোর।
মৌলি অম্বরি বিহল নায়রি
মুদিল লোচন জোর ॥

দশন ঘাতন　　অধিক যাতন　　রাম কহ ধনী　　রমণ কাহিনী
অধর কমল বাঁধুলি।　　লাজভয় অপছরিয়া।
শুক বিদারিত　　যুকত কামিনী　　মরম পরিহরি　　রাখল সুন্দরী
সেহি হরিদ আতুলি (?)॥　　বিরহ সাগরে তরিয়া॥"

এই পাঠ এত ভ্রমপূর্ণ যে, প্রকৃত অর্থ করা সম্ভব নহে। ইহার পর যে বর্ণনা আছে, তাহা পুনরুক্তিমাত্র এবং তাহার পাঠ এত ভ্রমাত্মক যে, অর্থবোধই হয় না। তাহার পর কৃষ্ণরাম যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বিহারারম্ভ প্রসঙ্গের অন্তর্গত হওয়া উচিত ছিল, তাহা পূর্বেই দেখাইয়াছি। সেখানে একটি পংক্তি সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর হইতে লওয়া হইয়াছে—"খিদার সময় কেবা দুই হাতে খায়।" ইহা ঠিক "বভুক্ষিতঃ কিং দ্বিকরেণ ভুঙ্‌ক্তে" এই পংক্তিটির অনুবাদ।

বলরামের বিহার বর্ণনায় যথেষ্ট কবিত্ব আছে—

"এত বলি বাণী　　রাজার নন্দিনী　　আয়ত লোচন　　ঘন বরিষণ
খাটের উপর বৈসে।　　সঘন রহিয়া দাপে॥
দুহোঁ রমণিলে　　দুহোঁ দুহাঁ গলে　　নাহি সমাধান　　করে মধুপান
বাঁধা গেল ভুজপাশে॥　　অধর অমৃত যত।
কুচবিলেপন　　সুন্দর সঘন　　কাম ভেল উন　　ছিণ্ডি গেল গুণ
বসায় জঘন মাঝে।　　নিবারণ শত শত॥
হাসিয়া ব্যাকুল　　দুহে রিত রোল (?)　　প্রথম সমর　　দুঁহ জর জর
অধোমুখী ধনী লাজে॥　　অনঙ্গ সমর রঙ্গে।
নিবিড় জঘন　　চুম্ব আলিঙ্গন　　বাজিহত রথ　　নাহি বলে পথ
মদনের বশ অতি।　　মনসিজ দিল ভঙ্গে॥
নাহি নিবারণ　　দুরন্ত মদন　　নিবড়িল কাজ　　উপজিল লাজ
জিনিলেক বিদ্যা সতী॥　　বাসে ধনী মুখ ঝাঁপে।
বদনে বদন　　জঘনে জঘন　　বলরাম ভণে　　কালীর চরণে
দুই বাহু ভেল চাপে।　　অক্ষর রহিল দাপে॥"

বলরামের এই বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হইলেও কবিত্বপূর্ণ, ভাষা মার্জিত ও অলংকারযুক্ত। রাধাকান্তের কাব্যে একই প্রসঙ্গের মধ্যে 'শৃঙ্গার উপক্রম' ও 'শৃঙ্গার' বর্ণনা করা হইয়াছে। রাধাকান্ত লিখিতেছেন—

"সম্মত লক্ষণ তার পাইয়া আশয়।　　সঘনে চপল চারু নিমিক নয়ন।
প্রবেশে মদন বলে রাজার তনয়॥　　একত্রেতে চরে যেন চারিটি খঞ্জন॥
অধরে অধর রাখি ঈষৎ হাসিঞা।　　হাসি হাসি মুখশশী কেবল উজ্জ্বল।
প্রবালে প্রবাল যেন গেল মিশাইঞা॥　　প্রফুল্ল পঙ্কজ যেন বিকচ কমল॥

ক্ষণে যুববর কুচপর হাত রাখে।
তাহা দেখি স্থলোচনা হাত দেয় নাকে ॥
হেদে অদভুত শশী দেখসিয়া সখি।
কমলে গরাসে চক্রবাক চক্রবাকী ॥
রতিশ্রমে মুখে তার বিন্দু বিন্দু ঘাম।
তারায়ে বেষ্টিত যেন দেখি সুধাধাম ॥
সঘনে নিশ্বাস দীর্ঘ অমিক(?) নয়ন।
প্রভাতের শশী যেন করিয়া বদন(?) ॥
সবে অবলা তাহে পড়িঞা বিপাকে।
সবে মাত্র স্বরের পঞ্চম বর্ণ ডাকে ॥
দয়াল রমণ জয় করিয়া মদন।
মন্দ মন্দ ঈষৎ (স্মিত ?) বদন দুই জন

দ্বিজ রাধাকান্তের বর্ণনায় কোন কবিত্ব নাই; গতানুগতিক দু'একটি উপমা দিয়া কবি নায়ক নায়িকার মিলন বর্ণনা করিয়াছেন। মধুসূদন চক্রবর্তীর বর্ণনাতেও বিশেষত্ব নাই—

"মন্দ মন্দ বহে ঘন বসন্তের বাত।
কোকিল মাতিল বনে কোকিলীর সাত।
সরসিজে মধুকর মধু বরি রৈলে (?)।
মধুপানে মাতিয়্যা গুঞ্জরে কৌতুহলে ॥
মাতিয়া করিল কোলে খঞ্জন খঞ্জনী।
এথায় মাতিল পুন রমণ রমণী।
রসিকা নাগরী ধনী রসিক নাগর।
পুনরপি অপরূপ ধরএ বাসর ॥
কর্পূরে তাম্বূলে মুখ করিয়া পূর্ণিত।
দুহার নয়ানে হৈল দুহার ইঙ্গিত ॥
সুধা দরশনে দোহে দেখে দুই মুখ।
আড়ে থাকে সখীগণ দেখএ কৌতুক ॥
রসিক নাগর নাগরী করে কোলে।
অপরূপ শৃঙ্গার করএ কৌতুহলে ॥
চুম্বন করিয়া করে মধুর ভাষণ।
বাহু পসারিয়া দোঁহে দিল আলিঙ্গন।
দেখিয়া মদনরাজ করে অতি দম্ভ।
কেশরী করেতে কি রূপিল করিকুম্ভ ॥
গণিকার বিন্দ যেন গণিক ভেদিল (?)।
হরি হরি বল ভাই মদন মাতিল ॥
রমণী কাতর হঞা নব নিতম্বিনী।
করপুটে কহে শুন শুন গুণমণি ॥
প্রাণ রাখ প্রাণ রাখ করি নিবেদন।
কুমার কহিল ছলে মধুর ভাষণ ॥
দোহে অতি রতিরসে ভুঞ্জে নানা বন্ধ ॥
শ্রীযুক্ত কবীন্দ্র বলে মদনের ভঙ্গ ॥"

রামপ্রসাদ "শৃঙ্গার উপক্রমে বিত্থার বিনয়" এই প্রসঙ্গের পর শৃঙ্গার বর্ণনা না করিয়া "শৃঙ্গারে পরস্পরের উক্তি" ও "শৃঙ্গারে সখীদিগের ব্যঙ্গোক্তি" এই দুই প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। প্রথমটি মৈথিলী বা ব্রজবুলিতে এবং দ্বিতীয়টি বাংলা পয়ারে। দ্বিতীয়টি প্রথম প্রসঙ্গটিরই অনুবৃত্তি এবং প্রথমটি আবার তাহার পূর্বপ্রসঙ্গটির পুনরাবৃত্তি মাত্র। এক ই বিষয় লইয়া রামপ্রসাদ এই তিনটি প্রসঙ্গ লিখিয়াছেন। আমরা কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

(১)

"কাতর কামিনী বদন যামিনী
নাথ মলিনহি ভেল।
মুকুত জৈসন সোহত ঐসন
সরম জল উপজেল ॥

*   *   *

কোটি পরণাম হে প্রভু গুণধাম
সুরত রস দেহ ভঙ্গ।
হাম কৃশোদরী পুরুষ কেশরী
কৈসে সম তুহ সঙ্গ ॥
কহই কবিবর কুসুম শরবর
দহনে জরজর দেহ।

রমণীমণি ধনী　　নব সরোজিনী
সবহু চাতুরী এহ ॥"

(২)

অকার হকার বর্ণে আকার সংযুক্ত।
উহু উহু মুহু মুহু কেশপাশ মুক্ত ॥
কাতরা কামিনী কান্দে কহে কণস্বরে।
দিয়া পীড়া ক্রীড়া ব্রীড়া না বাণ অন্তরে ॥
চিরদিনে অনশনে ক্ষুধা বিপর্য্যয়।
আধার সহিত সুধাপান ভাল নয় ॥
যে পর্য্যন্ত কাননে কুসুম থাকে কলি।
তদবধি তাহে মধু নাহি পিয়ে অলি ॥

*　　*　　*

হত্যা হই হউক মেনে হাস যুবরাজ।
ক্ষীণা আমি ক্ষমা কর ক্ষেপা পারা কাজ ॥
ভার্য্যা সঙ্গে চর্য্যা ইহা শুনি নাই কভু।
আজি ঘর কালিকে পান্দাড় ভাব প্রভু ॥
আড়ে আলি হেস্যে পড়ে এ উহার গায়।
মলি লো গোল্লায় গেলি লাজ খেলি হায় ॥
ঘুম গেল ধুম বড় ঘর মেনে ছাড়ি।
বিয়া-রাত্রে বেহায়া বড় না বাড়াবাড়ি ॥
মিথ্যা কন্যা অবলা অবলা বোল ছাড়।
নাম মাত্র বালা দেখি ইচ্ছা বড় গাঢ়।
মুখে মুখে ফাসফুস এ কি প্রেম ঈষ।
আমরাই হইলাম দুচক্ষের বিষ ॥
কেহ বলে তুমি মেয়ে হানফেন্যা বড়।
ঘাগী বটে কত ঠাটে কথা দড় দড় ॥
কেহ বলে থেকে থেকে পড়ে কেন চীল।
শুন নাই আচট ভূমের ভাঙ্গে খীল ॥
মর্দ্দ বড় শক্ত সই কেহ কেহ বলে।
অনুমানি বুঝি ক্ষেত্রে সদ্য ফল ফলে ॥
সহ নহে ক্রোধে কহে আলো আলি শোন।
হানিয়া খাঁড়ার চোট ঘস্যা দিস লোন ॥
শিথিল অনঙ্গ রস অঙ্গভঙ্গ দিয়া।
হস্তপদ পাখালিল বাহিরেতে গিয়া ॥

এই বর্ণনার প্রথম অংশে কবি অনুপ্রাসের অট্টহাস করিয়াছেন, অলংকারের ভারে ভাষা ও ভাব পঙ্গু হইয়া গিয়াছে, শেসাংশে সখীদের আলাপ নর্মভাষণ হইলেও গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা এইবার ভারতচন্দ্রের বিহার বর্ণনাটি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

"খেলে রে সুন্দর সুন্দরী রঙ্গে।
বিষম কুসুমশর　　খর শর জর জর
তর তর থর থর অঙ্গে ॥
রতি মদ পাগর　　নাগরী নাগর
নিরাখ নিরখি দুই ঠাটে।
রাখিতে নিজধর　　রতি রতি নায়ক
কুলুপিল কুলুপ কপাটে ॥
ঝম্পই সঘন　　নিতম্ব ধরাধর
অধর ধরাধরি দন্তে।
জঘন জঘন পর　　হৃদয় হৃদয় মিলি
মাতিল সমর দুরন্তে ॥
ঝন ঝন কঙ্কন　　রণ রণ নূপুর
ঘুনু ঘুনু ঘুঙ্গুর বোলে।
লটপট কুন্তল　　কুণ্ডল ঝলমল
পুলকিত ললিত কপোলে ॥
শ্বাসপবন ঘন　　ঘন ঘন খেলই
হেলই সঘন নিতম্বে।
দংশই দশন　　দশন মধুরাধর
দুহ তনু দুহু অবলম্বে ॥
দুহ ভুজপাশহি　　দুহ জন বন্ধন
সম রস অবশ দু অঙ্গে।
দুহ তনু ঝম্পন　　কম্পন ঘন ঘন
উথলিল মদন তরঙ্গে ॥
নববয় নাগর　　নাগরী নববয়
চির দিন ভূক পিয়াসা।

সমর কড়াকড় অঝড় ঝড়াঝড়
তাবত যাবত আশা ॥
পূরণ আহুতি অনল নিভায়ল
রতিপতি হোম নিবাড়ে।
বরষিল মেঘ ধরণী ভেল শীতল
ঝড় দল বাদল ছাড়ে ॥
চুম্বন চুচুকৃতি শীৎকৃতি শিহরণ
কোকিল কুহরে গলায়ে।
সম অবলম্বন বালিশ আলশ
মুদ্রিত নয়ন ছলায়ে ॥"

ভারতচন্দ্রের এই বর্ণনার জন্য অনেক রুচিবাগীশ ভারতচন্দ্রকে তীব্র কটুবাক্য বলিয়াছেন। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসপ্রমুখ বৈষ্ণব-কবিগণ রাধাকৃষ্ণের সম্ভোগ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার যতই আধ্যাত্মিক ব্যাখা করা যাউক না কেন, মূলতঃ সুরতবর্ণনা ছাড়া তাহা আর কিছুই নহে। কিন্তু সে সম্বন্ধে এই রুচিবাগীশগণের কিছু বলিবার সাহস হয় নাই। প্রাচীন সংস্কৃতকবিগণ অপূর্ব কাব্যে সুরত বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে কেহ কখন নাসিকা কুঞ্চিত করেন নাই। যে কার্য জীবজন্মের শ্রেষ্ঠ আনন্দ ও শ্রেষ্ঠ কর্তব্য, তাহার কবিত্বময় বর্ণনাকে অশ্লীল বলিয়া বিদ্রূপ করিলে বলিতে ইচ্ছা হয়—"কবিতারসমাধুর্যং কবির্বেত্তি ন চাকবিঃ। ভবানীভ্রুকুটিভঙ্গীং ভবো বেত্তি ন ভূধরঃ ॥"

সকল কবিই অল্পবিস্তর রতাবসানিক বর্ণনা করিয়াছেন। গোবিন্দদাস বিশেষ কিছুই বলেন নাই ; কেবল লিখিয়াছেন—

"যার যেই স্থানেতে আইলা সখীগণ।
খট্টার উপর শয়ন কৈলা দুই জন ॥
রতি অবসাদে দোঁহে কিছুই না জানি।
প্রভাতে উঠিয়া দেখে পোহাল রজনী ॥"

কৃষ্ণরাম লিখিতেছেন—

পুরিল মনের আশ ক্ষেমা দিল রসে।
বসন পরিলা দুহে পরশ হরিষে ॥
রমণী রসিকা কবি বিদগধ রায়।
দুহু সমীরণ করে দুহাকার গায় ॥
দুহার গলার মালা শোভে নানা ফুল।
জোগায় রূপসী সখী সহিতে তাম্বূল ॥
পতিরে চন্দন দিল রমণীরতন।
মৃগমদ কুমকুম সৌরভে হরে মন ॥
লীলায় অপাঙ্গ দৃষ্টি নৃপতির সুতা।
মন্দ মন্দ সুন্দর অমিয়া হাসযুতা ॥
কাকালি অবধিমাত্র অধদেশে বাস।
নাভি আদি শির তার সকলি উদাস ॥
শ্রমঘাম মন্দ মন্দ মিলায় পবনে।
জায়ারে তুষিল ধীর সুগন্ধি চন্দনে ॥
অধিক করিয়া দিল উচ দুটি কুচে।
নখাঘাত জালা যত সেই ক্ষণে ঘুচে ॥"

রামপ্রসাদ সংক্ষেপে লিখিয়াছেন—

"শিথিল অনঙ্গরস অঙ্গভঙ্গ দিয়া।
হস্তপদ পাখালিল বাহিরেতে গিয়া ॥
পুনরপি শয্যায় বিহরে দোঁহে রঙ্গে।
দোঁহে সমীরণ করে দোঁহাকার অঙ্গে ॥
পরস্পর অঙ্গে রঙ্গে লেপয়ে চন্দন।
হেসে হেসে উভয়ত বদন চুম্বন ॥"

বলরাম বলিতেছেন—

"হরিষে করিল দোঁহে চুম্ব আলিঙ্গন।
কর্পূর তাম্বূল দুঁহে করিল ভক্ষণ ॥
সঙ্গে কর‍্যা রাখ্যাছিল দিব্য নারিকেল।
ক্ষীরখণ্ড খাইয়া খাইল তার জল ॥"

দ্বিজ রাধাকান্ত অপেক্ষাকৃত বিশদভাবে এই রতাবসানিক বর্ণনা করিয়াছেন—

"দয়াল রমণজয় করিয়া মদন।
মন্দ মন্দ হসিত বদন দুইজন॥
আসিয়া সখীরা সব মিলিলা তথায়।
কুমকুম কস্তুরী কেহ লেপে সর্ব্বগায়॥
কর্পূর তাম্বুল জোগাইছে কোন জন।
কমলা বাতাস করে বিনোদ ব্যজন॥"

মধুসূদন চক্রবর্তী রতাবসানিক বর্ণনা করেন নাই বটে, কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের অবসাদ লইয়া একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। আমরা পরে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

ভারতচন্দ্রও অতিসংক্ষেপে রতাবসানিক বর্ণনা করিয়াছেন—

"রসিক রসিকা সুখে যুবকযুবতী।
বসিলা পালঙ্কে জিনি রতি রতিপতি॥
সুগন্ধে লেপিত অঙ্গ সুগন্ধমালায়।
মিষ্ট জলপান করি জলপান খায়॥
সহচরী চামর ব্যজন করে অঙ্গে।
রজনী হইল সাঙ্গ অনঙ্গপ্রসঙ্গে॥"

ইহার পর সুন্দরের বিদায়। গোবিন্দদাস বিদ্যার নিদ্রিত অবস্থাতেই সুন্দরের প্রস্থান বর্ণনা করিয়াছেন—

"সুন্দর উঠিয়া দেখে বিদ্যা অচেতন।
না হইল কথাবার্তা করিল গমন॥"

কৃষ্ণরাম প্রথম বিহারের পর রতাবসানিকের সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত বিহার বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার পর রসালস ও সুন্দরের বিদায় বর্ণনা করিয়াছেন। বিদায়কালে বিদ্যাসুন্দরের কোন আলাপের বর্ণনা তিনি করেন নাই। নিদ্রাভঙ্গের পরই সুন্দর সরিয়া পড়িলেন, ইহাতে রসভঙ্গ হইয়াছে।

"পুরিল মনের আশ সুস্থির অনঙ্গ।
শয়ন করিল দুহে জুড়ি জুড়ি অঙ্গ॥
হাস পরিহাস রসে জাগিয়া যামিনী।
বঞ্চিল পরম সুখ লইয়া কামিনী॥
পোহাইল বিভাবরী তপনের শোভা।
কমলে কমলকুল অলি করে শোভা।
শয়ন তেজিয়া উঠে রাজার কুমার।
সুড়ঙ্গে প্রবেশি গেল বিমলার ঘর॥"

রামপ্রসাদ অতি সংক্ষেপে কৃষ্ণরামের অনুসরণে লিখিতেছেন—

"রূপস রূপসী নিশি শেষে নিদ্রা যায়।
প্রভাকর প্রকাশিত রজনী পোহায়॥
সুকবি সুন্দর গেলা মালিনীর বাসে।
কহিলা সকল কথা বসি তার পাশে॥"

দ্বিজ রাধাকান্ত অন্ততঃ একটু বিদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন—

"এইরূপে সুখনিশি করিয়া বিহার।
প্রভাতে মালিনীগৃহে চলিল কুমার॥
যাইবার কালে বিদ্যা কহেন তাহাকে।
আপনা বলিয়া মোরে দয়া যেন থাকে॥
তুষিয়া সুন্দর তারে করি আলিঙ্গন।
রাধাকান্ত ভণে গেল মালিনীভবন॥"

পূর্বেই বলিয়াছি যে, মধুসূদন বিদ্যাসুন্দরের অবসাদ নামে একটি প্রসঙ্গ অবতারণা করিয়াছেন। তাহার পর "বিদ্যাকর্তৃক সুন্দরের ছল নিদ্রাভঙ্গ" নামে আর একটি প্রসঙ্গে সুন্দরের বিদায় বর্ণনা করিয়াছেন। সুন্দর রতিশ্রমে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিদ্যা তাঁহাকে এই বলিয়া জাগাইতেছেন—

"শুন প্রাণপ্রিয় নাথ অভাগিনী কথা।
যাইতে বলিতে বড় মনে লাগে ব্যথা॥
রহিলে কি জানি পাছে হয় জানাজানি।
কি যুক্তি করিব প্রভু আমি অভাগিনী॥
কি জানি প্রভাতে আজি আসিবেন মাতা।
দেখিলে প্রমাদ বড় এইমন কথা॥
জনক দুর্জ্জন মোর দুর্জ্জন কোটাল।
কি জানি কি আছে মোর অভাগ্য কপাল॥
উপায় অনুচিত নিদ্রা তেজ কৌতূহলে।
গা তোল গা তোল নাথ অভাগিনী বলে॥
যুবতীর কোলে থাকি শুনে যুবরাজ।
ছলেতে বাড়ায় নিদ্রা তবে রসরাজ॥
জাগাতে তাহারে তবে জাগান না যায়।
মানিল দুর্ব্বার ভয় রমণী তাহায়॥*
রমণী কাতর দেখি দয়াল রমণ।
ছল নিদ্রা তেজিয়া করিল জাগরণ॥
তবে ধনী কহে ধরি কুমারের গলে।
অভাগীরে বিস্মৃত না হয়ো কোন কালে॥
কহি আশ্বাসিত কথা কুমার সুন্দর।
সুড়ঙ্গের পথে পুন চলিল সত্বর॥

এইখানে মধুসূদন বিদায়-প্রসঙ্গটি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ভারতচন্দ্রের বর্ণনা তাঁহাকে এ বিষয়ে কিছু সাহায্য করিয়াছে। ভারতচন্দ্র লিখিতেছেন—

"আসি বলি বাসায় বিদায় হৈলা রায়।
কুমুদ মুদিল আঁখি চন্দ্র অস্ত যায়॥
বিদ্যা বলে কেমনে বলিব যাহ প্রাণ।
পলকে পলকে মোর প্রলয় সমান॥
এ নয়ন চকোর ও মুখ সুধাকর।
না দেখে কেমনে রবে এ চারি প্রহর॥
বিরহ দহন দাহে যদি থাকে প্রাণ।
রজনীতে করিব ও মুখসুধাপান॥
রায় বলে আমি দেহ তুমি সে জীবন।
বিচ্ছেদ তখন হবে যখন মরণ॥
যে কথা কহিলে তুমি ও কথা আমার।
তোমার কি আমার কি ভাব আরবার॥
এত বলি বিদায় হইলা পুথি ধরি।
মালিনীরে না কহিও কহিলা সুন্দরী॥"

এইখানে একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। ভারতচন্দ্র ও বলরাম ব্যতীত সকল কবিই মালিনীর জ্ঞাতসারে বিদ্যাসুন্দরের এই গোপন মিলন হইতেছে বলিয়া লিখিয়াছেন। এমন কি, সুন্দর স্বয়ং মালিনীর নিকট রাত্রির বিবরণ বর্ণনা করিতেছেন ও মালিনী তাহা লইয়া বিদ্যাকে রহস্য করিতেছে। ভারতচন্দ্র সুন্দর কর্তৃক মালিনীকে প্রতারণা করাইয়া কাব্যের রস আরও ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বলরাম তো সখীগণকে পর্যন্ত কিছু জানিতে দেন নাই, তাঁহার মালিনী তো কিছুই জানিত না।

(ক্রমশঃ)

---

* এই চারি পংক্তি মুদ্রিত পুস্তকে ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে হওয়ায় একটু পরিবর্ত্তন করিয়া সাজাইয়া দেওয়া হইল।

৪৩০। কুম্ভকর্ণের রায়বার।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৪, সম্পূর্ণ। দোভাঁজ-করা বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩৷৵০ × ৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২১ সাল। পুথির বিষয়—নিদ্রাভঙ্গের পর কুম্ভকর্ণ ও রাবণের কথোপকথন।

আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরামঃ সহায়।
কুম্ভকর্ণের লিখ্যতে ॥

নিদ্রা হইতে উঠিয়া বসিল কুম্ভকর্ণ।
সুবাসিত জল কেহ জোগাইছে পূর্ণ ॥
কুম২ কস্তুরি কেহ লেপে সর্ব্বগায়।
কত শত সেনাপতি চামর ঢুলায় ॥
কুম্ভকর্ণ জাগিল শুনিল লঙ্কেশ্বর।
সাক্ষাত করিতে রাজা চলিল সত্বর ॥
কুম্ভকর্ণ প্রণমিল রাবণের পায়।
বাহু পসারিয়া রাজা কোল দিল তায়।

শেষ—

দৈবি ধরিলে লোক বুদ্ধি হয় হত।
তোর কামেতে মজিল লঙ্কা বুঝাইব কত ॥
এমন দুরন্ত কর্ম্ম কে সহিতে পারে।
আমার বসত হইল যমের অধিকারে ॥
বিভীষণ জে পথে গেছে আমার সেই পথ।
থাক ভাই রাজ্য লয়্যা আমার দণ্ডবত ॥
রসিক জনার মুখে শুনিতে আনন্দ।
কুম্ভকর্ণের রায়বার রচিল কবিচন্দ ॥
ইতি সন ১২২১ সাল তাং ২৩ আশ্বিন।

৪৩১। চিত্রকেতুর উপাখ্যান।

(ভাগবতামৃত)

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ২-৮, অসম্পূর্ণ। দুভাঁজ-করা বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। পরিমাণ ১৩৷৷০ × ৪৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই। পুথিতে চকারের আকৃতি প্রাচীন ধরণের।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধে চতুর্দ্দশ হইতে সপ্তদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত রাজা চিত্রকেতুর উপাখ্যান বর্ণিত আছে। আলোচ্য পুথি তাহার অনুবাদ।

দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ—

মন করিলে প্রভু কি করিতে নার।
রৌরব নরকে হইতে আমারে উদ্ধার ॥
করুণাসায়র তোমার হইল কৃপাদৃষ্টি।
নারদ অঙ্গিরা বলে কর পুত্র ইষ্টি ॥
রাজা বলে মহাশয় জে আজ্ঞা দোহার।
প্রস্তুত সকল দ্রব্য আছয়ে আমার ॥
শুভ জানি সেই দিনে যজ্ঞ আরম্ভিল।
যজ্ঞ করি যজ্ঞচরু ভূপতিরে দিল ॥

ভনিতা—

এত বলি দুই জন করিল প্রস্থান।
ষষ্টম স্কন্ধের কথা কবিচন্দ্র গান ॥

শেষ—

শিব বলে পূর্ণ হব মনের বাসনা।
জন্মে ২ হরিনাম করিবে সাধনা ॥
এত বলি মহাদেব গেলা নিজ স্থান।
চিত্রকেতুর যশ দেববৃন্দে গান ॥
শুক কহে শূরসেনে ছিলা চিত্রকেতু।
দেবীর শাপে বৃত্রাসুর হইলা এই হেতু ॥
জাতিস্মর অসুর অতএব কৃষ্ণভক্তি।
ইন্দ্রেতে নিধন পাইয়া পুন পাইল মুক্তি ॥
একচিত্তে শুনে জে বা এই উপাখ্যান।
অধিক পরম সুখ অন্তে মুক্তি পান ॥
চিত্রকেতু উপাখ্যান এত দূরে সায়।
শ্লোকার্থ সঙ্গীতরস কবিচন্দ্র গায় ॥

পালা সমাপ্ত ॥ লিখিত° শ্রীগকুলচন্দ পঠনার্থ শ্রীধরনি দাস ॥

৪৩২। দাতা কর্ণের পালা।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৫, সম্পূর্ণ। দুভাঁজ-করা বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পংক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পত্র ছিন্ন, তজ্জন্য অনেক লেখা নষ্ট হইয়াছে। পরিমাণ ১৪॥০×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪০ সাল। পূর্ব্বে ৪০৪, ৪২০, ৪২৩ সংখ্যক পুথির বিবরণ দ্রষ্টব্য।

ভনিতা—

চক্রবর্ত্তী মণিরাম অশেষ গুণের ধাম
তস্য সুত কবিচন্দ্রে গায় ॥

শেষ—

ব্রহ্মা আদি দেব জারে না পায় ধেয়ানে।
হেন কৃষ্ণচন্দ্র দেখি আপন ভবনে ॥
কর্ণকে করিআ কোলে দেবকীনন্দন।
বৈকুণ্ঠনিবাসী হরি হৈলা অন্তর্ধান ॥
দাতা কর্ণ গীত পালা জে করে শ্রবণ।
রোগ শোক দূরে জায় পাপ বিমোচন ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ব্যাসের কৃপায়।
হরি হরি বল সভে পালা হৈল সায় ॥

ইতি দাতা কর্ণের পালা সমাপ্ত হইল॥ ইতি সন ১২৪০ সাল ৫ ভাদ্র মো° খড়দহ হইতে এই পুস্তক হইল॥ পাটক শ্রীদ্বিনবন্ধু দাষ॥ সা° পাতরসাহের জেলা বাকুরা॥ চৌকি সোনামুখ॥ লিখিত° শ্রীউমাকান্ত সরকার সা° ফকিরপুর জেলে বর্দ্ধমান চৌকি সমরসাহি ॥

৪৩৩। অক্রূরাগমন।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ২-১০, অসম্পূর্ণ। পাতলা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৩৸০×৪॥০ ইঞ্চি। আদি ও অন্ত খণ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। পূর্ব্বে ৪২২ সংখ্যক পুথির বিবরণ দ্রষ্টব্য।

ভনিতা—

পাইয়া নন্দের আজ্ঞা চলিল কোটাল।
দ্বিজ কবিচন্দ্রে কয় হৃদয়ে বাজে শাল ॥

১০ম পত্রের শেষ—

চিত্রের পুতলী গোপী রহে দাণ্ডাইয়া।
হায়২ বলে কেহ পড়ে লোটাইয়া ॥

পথের পথিক জনে জিজ্ঞাসেন তায়।
কৃষ্ণ বলরাম রথে দেখিলে তথায়॥
কহ রে পাথক ভাই কহি তব পায়।
রথে বসি মুখে হাসি জান শ্যামরায়॥
এই মত গোপী সব করুণা করিল।

৪৩৪। অক্রুরাগমন।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-১৬, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১১ পঙ্ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩॥০ × ৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

ষষ্ঠ পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় কবিচন্দ্ররচিত 'অক্রুরাগমন' শেষ হইয়াছে। তাহার পর হইতে ষোড়শ পত্র পর্য্যন্ত বিপ্র পরশুরামের ভণিতাযুক্ত 'কংসবধ' অবধি অংশ যুড়িয়া দিয়া, লিপিকর সবটাকেই 'অক্রুরাগমন' নামে পরিচিত করিয়াছেন। এই জন্য পুথিতে দ্বিজ কবিচন্দ্রের ৬টি এবং পরশুরামের ১২টি ভনিতা পাওয়া যায়। সুতরাং আলোচ্য পুথিতে কবিচন্দ্র অপেক্ষা পরশুরাম-রচিত অংশ অধিক থাকায় পুথিকে তদ্রচিত বলিয়া উল্লেখ করাই সঙ্গত। কিন্তু সেই অধিক অংশ প্রচলিত অক্রূরাগমন পুথির পরবর্ত্তী বিষয় বলিয়া তাহা করা হইল না।

ভনিতা—

১। দ্বিজ কবিচন্দ্রে গান পুরাণের সার।
কিসের অভাব কৃষ্ণ তুমি সখা জার॥
২। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ভাই শুন সর্ব্বজনা।
গান বিপ্র পরশুরাম করিয়া ভাবনা॥

১৬ পত্রের শেষ—

এইরূপে কংসবধ করি নারায়ণ।
পুষ্পবৃষ্টি করিল জতেক দেবগণ॥
কংসাসুর বধ কৈল্য প্রভু নারায়ণ।
অসুর বধ হেতু তোমার গমন॥
অনেক তপস্যা ব্রজে কৈল্য পূর্ব্বকালে।
এই হেতু আইলে তুমি নন্দের মন্দিরে॥
যশোদার জত ভাগ্য না জায় কথন।
মা বল্যা ডাকিছিলা প্রভু নারায়ণ॥
দ্বিজ পরশুরাম ইহা করিল রচন।
কংসবধ অধ্যায় হইল সমাপন॥

আমী সাধুড়া বটী॥ ইতি অক্রুর গমন সমাপন হইল পাটক শ্রীরাম সম্মা॥

৪৩৫। লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-১৩, অসম্পূর্ণ। দুভাঁজ-করা বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্ক্তি লেখা। পরিমাণ ১২॥০ × ৪॥০ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

আরম্ভ—

৭ শ্রীশ্রীরামলক্ষনং॥
অথ লক্ষন ঠাকুরের সক্তিসেল
লিক্ষতে।

মরিল রাক্ষস জত শূন্য হইল পুরী।
অবিরত মোহে কান্দে তা সভার নারী॥
দিবানিশি মন্দোদরী শুনিয়া রোদন।
কোপ করি রণমাঝে সাজে দশানন॥
হেন কালে দশাননে বলে মন্দোদরী।
আপনার দোষেতে মজিল লঙ্কাপুরী॥

কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রজিত আদি জত বীর।
জার বলে দেবাসুর কেহু নহে স্থির ॥
ঘরে বৈসে থাক নাথ আমি করি মানা।
শ্রীরাম মনিস্য নহে তাহা গাছে জানা ॥

ভনিতা—

মন্দোদরীর কথা না শুনিল রাবণ।
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে রাবণের নিকট মরণ ॥

১৩শ পত্রের শেষ—

মাথায় পর্ব্বত আছে নাঞি ভুরুভঙ্গ।
হনুরে ধরিতে জায় কুপি তালজঙ্গ ॥
ছয় জনে প্রাণে মারে নেগুরের ঘাতে।
তালজঙ্গ পিছে ছিল কামড়ায় দন্তে ॥
প্রাণ লয়্যা উভুরড়ে রাক্ষস পলায়।
শুনিয়া রাবণ রাজা করে হায় হায় ॥
ঘরপোড়া থাকিতে মোদের শত্রু নাহি মরে।
হেন বীর নাহি কেহু ঘরপোড়ায় মারে ॥

১২শ পত্রের শেষে এই কথা লিখিত আছে—

"দিননাথ সন্ধাকে দয়া কর রাম।"

৪৩৬। দাতা কর্ণ।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৯, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১২ × ৪।০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই। পুথিতে 'পঞ্চানন' নাম-সংযুক্ত একটি ভনিতা আছে; বাকী সব ভনিতা দ্বিজ কবিচন্দ্রের। পূর্ব্বে ৪২৩ সংখ্যক পুথির বিবরণ দ্রষ্টব্য।

ভনিতা—

১। পঞ্চানন বলে কর্ণ হও সাবধান।
দাতা বুঝিবারে প্রভু আইলা ভগবান্ ॥

২। দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় বিলম্ব উচিত নয়
দ্বিজরূপে বন্থে নারায়ণ ॥

শেষ—

কর্ণ পদ্মাবতী দুহে কান্দে উভরায়।
পুনঃ পুন কান্দ্যা পড়ে গোবিন্দের পায় ॥
ধন্য ২ বলে প্রভু তুমি ভাগ্যবান্।
ত্রিভুবনে দাতা নাঞি তোমার সমান ॥
কর্ণের স্তবে তুষ্ট হইল প্রভু ভগবান্।
বৈকুণ্ঠনিবাসী হরি হইল অন্তর্ধান ॥
বৈশম্পায়ন মুনি [বলে] শুন জন্মেজয়।
কর্ণের সমান দাতা কেহো নাই হয় ॥

ইতি কর্ণের পালা সমাপ্ত হইল এ পুস্তক লিখিতং [ইংরেজি অক্ষরে] মধুস্থদন ঘোষ।

৪৩৭। অক্রুর আগমন।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-১০, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ৮ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩।০ × ৪ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২০৯ সাল। প্রথম পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় 'সন ১২১১' লেখা আছে। ৭ম পত্রের ১ম পৃষ্ঠার খানিকটা নষ্ট হইয়াছে।

আরম্ভ—

শ্রীশ্রীদুর্গা ॥

অথো অক্রুর আগমন লিখ্যতে ॥
তবে রাজা আনিল অক্রূরে ডাক দিয়া।
কৃষ্ণ বলরাম তুমি ত্বরিত আন গিয়া ॥
করিব ধনুর যজ্ঞ করহ গমন।
এত শুনি অক্রূরের আনন্দিত মন ॥
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে গোবিন্দের পায়।
মনে বড় আছে সাধ দেখিব শ্যামরায় ॥

ভনিতা ও শেষ—

এই মত রাম কৃষ্ণ মথুরায় রহিল।
মথুরা নাগরীর মনে আনন্দিত হৈল॥
দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় ভাবিয়া নারায়ণ।
ধন পুত্র বাড়ে সেই শুনে জেই জন॥

ইতি অক্রুর আগমন পুস্তক সমাপ্ত পাটক শ্রীসাধুচরন পাল সাং কল্যানপুর পরগনে। খণ্ডঘোষ সন ১২০৯ সাল তারিখ ১০ অগ্রহায়ন বেলা দুই দণ্ড থাকিতে হইল ইতি।

৪৩৮। গুরুদক্ষিণা।

রচয়িতা—শঙ্কর। পত্র ১-২৫, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ৯।০ × ৪।০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৫৬ সাল।

কংসবধের পর কৃষ্ণ ও বলরামের বিদ্যাশিক্ষার্থ অবন্তী নগরে কোনও ঋষির নিকট গমন এবং বিদ্যাশিক্ষান্তে ঋষির মৃত পুত্রকে যমালয় হইতে ফিরাইয়া আনিয়া গুরুদক্ষিণারূপে অর্পণ পুথির বর্ণনীয় বিষয়। কৃষ্ণকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য দূর দেশ গমনে পিতা মাতা অনুমতি না দেওয়ায় কৃষ্ণের মুখ দিয়া কবি এখানে হিতোপদেশাদি নানা গ্রন্থ হইতে বিদ্যাশিক্ষার অনুকূল সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করাইয়াছেন এবং 'অস্যার্থ' বলিয়া তাহার বঙ্গানুবাদ দিয়াছেন।

আরম্ভ—

৺৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ॥
অথো শ্রীগুরুদক্ষিণা আরম্ভঃ॥
নারায়ণং নমস্কৃত্য [ইত্যাদি]॥

কংস ধ্বংস করি কৃষ্ণ মথুরা নগরে।
ভক্তগণ লঞা কৃষ্ণ আনন্দে বিহরে॥
একদিন কৃষ্ণচন্দ্র ভাবিলা অন্তরে।
বিদ্যা অনুশীলন ধর্ম্ম জানাতে সংসারে॥
অবন্তী নগরে জাব পঠন কারণ।
গুরুপুত্র ছলে শঙ্খা করিব নিধন॥
বরুণে দর্শন দিব নব সংখ্যা বর।
পাপী উদ্ধারিব যমজাঁতার ভিতর॥

কৃষ্ণের শিক্ষা—

গুরুকে বন্দিয়া দোঁহে পড়েন হরিষে।
ছয় মাসের পাঠ পড়েন একুই দিবসে॥
অক্ষর পড়িয়া হরি পড়েন অভিধান।
সর্ব্বশাস্ত্র পড়ি দোহে হৈল্যা বুদ্ধিমান্॥
কথোক গ্রন্থ পড়ি হরি সকলি জানিল।
চারি বেদ পড়ি দুহাঁর জ্ঞান উপজিল॥
... ...
কাব্য অলঙ্কার পড়ে নাটক নাটিকা।
পুরাণ ভাগবত পড়ে আউটিয়া টীকা॥
নানা রসকলা হরি শিখিলা নৃত্যগীত।
বহু বিদ্যা শিখিল হরি শৃগালচরিত॥
শৃগালচরিত্র আর কাগচরিত্র পড়িল।
যজ্ঞ ভাস নাগরী বিদ্যা গাড়ড়ী শিখিল॥

ভনিতা—

কৃষ্ণের চরিত্র এই গুণের প্রকাশ।
শঙ্কর রচিল জার কুলচণ্ডায় বাস॥

শেষ—

লেখিয়া পড়িয়া যদি না দেই দক্ষিণা।
তার ফলাফল কহি শুন সর্ব্বজনা॥
জতেক শিখিল বিদ্যা বৃথা তার প্রায়।
পরিণামে সেই নর অধোগতি জায়॥
নানা দুস্থ হয় তার কষ্ট বহুতর।
এ পুঁথি দক্ষিণা দিবে যথাশক্তি জার॥
কহয়ে শঙ্কর য়েই বড়ই বিষম।

গুরুদক্ষিণা জে না দেই সে বড় অধম ॥
ইতি শ্রীশ্রীগুরুদক্ষিণা সংপূর্ণ হইল ॥ সাক্ষরং শ্রীরামধন দাস কর্ম্মকারের ॥ সাঃ বিষ্ণুপুর আইসবাজার ॥ এ পুস্তক শ্রীসিনাথ কর চৌধরি ॥ সাঃ বিষ্ণুপুর বকুলতলার বাজার ॥ ইতি সন ১২৫৬ সাল তারিখ ৪ শ্রাবণ ॥

৪৩৯। দাতা কর্ণের পালা।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৬, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পংক্তি লেখা। পরিমাণ ১৩।৷০ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২১ সাল। লিপিকরের অনবধানতায় পুথির কিছু অংশ বাদ পড়িয়াছে।

আরম্ভ—

৺৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥

বৈশম্পায়ন মুনি উদ্‌যোগ পর্ব্বে কয়।
মহাভারতের কথা শুনে জন্মেজয় ॥
শ্রদ্ধা করি মহাভারত রাখে জেই জন।
তার গৃহ নাহি ছাড়ে লক্ষ্মী নারায়ণ ॥
এক দিন গদাধর ভাবিয়া অন্তরে।
কর্ণ কেমন দাতা বটে বুঝিব তাহারে ॥
জে জা মাগে তারে কর্ণ তাহা দেয় দান।
সভে বলে দাতা নাঞি কর্ন্নের সমান ॥
একবার জাব আমি কর্ন্নের নিকটে।
বুঝিব সে কর্ণ বীর কেমন দাতা বটে ॥

শেষ—

কর্ণের ভক্তিতে তুষ্ট লইলা ভগবান্।
বৈকুণ্ঠনিবাসী হরি হইলা অন্তর্ধান ॥
বৈশম্পায়ন কহে শুনে জন্মেজয়।
কর্ণের সমান দাতা আর কেহ নয় ॥
সূর্য্যবংশে হরিশ্চন্দ্র যেমন দাতা ছিল।
ততোধিক দাতা কর্ণ তোমারে কহিল ॥
ভারত আখ্যান কথা শুনিতে সুন্দর।
বিস্তার করিয়া দেখি কহ মুনিবর ॥
ব্যাসের আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্র কয়।
এত দূরে দাতা কর্ণের পালা হইল সায় ॥
ইতি দাতা কর্ণের পালা সমাপ্ত ॥ সন ১২২১ সাল তারিখ ১৫ ভাদ্রে মঙ্গল বার ॥

৪৪০। কণ্ব মুনির পারণ।

রচয়িতা—দ্বিজ শঙ্কর কবিচন্দ্র। পত্র ১-৬, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩।৷০ × ৪।৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৩০ সাল। পূর্ব্বে ৪০৭ সংখ্যক পুথির বিবরণ দ্রষ্টব্য।

আরম্ভ—

৺৭শ্রীশ্রীহরিঃ ॥

অথ কণ্ব মুনির পারন আরম্ভ ॥
শুক কহে সনকাদি নিবেদি সভারে।
বেহার করেন কৃষ্ণ নন্দের মন্দিরে ॥
নন্দ যশোদার ভাগ্য কি বলিতে পারি।
পুত্রভাবে সেবা করে দেব চক্রধারি ॥
কৃষ্ণনিলা দেখি দুহাঁর পরম আনন্দ।
ধেয়ানে না পায় জার পদদ্বন্দ্ব ॥

ভনিতা—

আসিষ করিয়া দ্বিজবর গেলা স্নানে।
ভবিষ্য পুরাণ দ্বিজ কবিচন্দ্রে ভনে ॥

শেষ—

নন্দরাণী বলে পুন করহ রন্ধন।
ব্রাহ্মণ বলেন আমি করিলাঙ ভোজন॥
যশোদা বলেন কার বোলে অন্ন খাইলে।
গোকুল মজিল প্রায় সর্ব্বনাশ কৈলে॥
দ্বিজ বলে আগো রাণি চিনিতে না পার।
গোলোকের নাথ কৃষ্ণ এই পুত্র তোর॥
... ...
বাল্যনিলা বিরচন ভবিষ্যের কথামত।
শ্লোকার্থ সংক্ষেপে গীত বন্দিলাম কত॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় পারণ হইল সায়।
বৈকুণ্ঠবেহারি কৃষ্ণ হবে বরদায়॥

ইতি কর্ণমুনির একাদসীর পারণ সমাপ্ত হইল॥ সন ১২৩০ বার সর্ত্ত তিরিস সাল॥ তারিখ ২৯ আসাড়॥ ভিমাস্মাপী রনে ভঙ্গ [ইত্যাদি]॥ লিখিত' প' বিষ্ণুপুর তরফ সাহার জোড়া মতাবকে চৌকী সিতিল্যা সাকিম শ্রীগঙ্গা-নারায়ণ সরকার সাং মুক্তাতোড়ি॥

৪৪১। হরিশ্চন্দ্রের পালা।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। পত্র ১-১০, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি লেখা। ৫ম হইতে ৮ম পত্রের দক্ষিণাংশের কতকটা কাটা। পরিমাণ ১৩×৪।০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৫৮ সাল।

আরম্ভ—

৭ শ্রীশ্রীহরিচরণ শরণ
অথো হরিশ্চন্দ্রের পালা লিখ্যতে॥
অতঃপর শুন হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান।
কেবা দাতা আছে হরিশ্চন্দ্রের সমান॥
কৌশিক নামেতে মুনি কৈল পুষ্পোদ্যান।
ফল ফুলে পুষ্পবন নন্দন কানন॥
সেই বনে এক দিন আসি বিদ্যাধরী।
নাচে গায় কুতূহলে নানা খেলা করি॥
পুষ্প তুলি গর্ব্ব করি ভাঙ্গে তার ডাল।
পাপেতে মজিল চিত্ত পূর্ণ হইল কাল॥

মধ্য—

গঙ্গার কুলেতে ছানা সাধে রাজকর।
মহারাজা হরিশ্চন্দ্র ডোমের চাকর॥
এইরূপে দিবানিশি রহে নৃপবর।
রাজরাণী কথা বলি শুন অতঃপর।
সেই সদাগর করে শিবের সেবনা।
রাজরাণী করে তার স্থানের মার্জ্জনা॥
রোহিত জোগায় পুষ্প বরিখা সময়।
যোড়শ উপচারে পূজা কৈলা মৃত্যুঞ্জয়॥

ভনিতা—

মৃগয়ায় রাজা জায় করুণা শুনিতে পায়
কবিচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গায়॥

শেষ—

কৌশিক কান্দিয়া ভূপে করিলেন কোলে।
তোমার সমান দাতা নাহি ভূমণ্ডলে॥
তুমি ধন্য পুত্র ধন্য ধন্য তব দারা।
হেন দাতা কোন যুগে দেখি নাহি পারা॥
রাজা কহে মহাশয় তব কথা ব্রহ্ম।
তুমি স্বর্গ তুমি মোক্ষ তুমি ধর্ম্ম কর্ম্ম॥
বর দিয়া জত কথা কহিলা তাহারে।
রোহিতেরে পাটে রাজা অভিষেক করে॥
... ...
একচিত্তে শুনে জেবা এই উপাখ্যান।
অন্তে মুক্ত হয় তার বৈকুণ্ঠে গমন॥
এত দূরে হরিশ্চন্দ্র হইল সমাধান।
অতঃপর হরি২ বল সর্ব্বজন॥

ইতি হরিশ্চন্দ্র পালা সমাপ্ত॥ জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]॥ লিখিতং শ্রীপ্রেমচাঁদ তাশ্য পাটক শ্রীকালাচাঁদ তাশ্য শা° বুঃ দীঘী পরগনে খণ্ডঘোষ সন ১২৫৮ সাল তারিখ ২৭ আসাড়॥

৪৪২। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-১০, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ৯ পঙ্ক্তি লেখা। পরিমাণ ১২॥০ × ৪ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

আরম্ভ—

৺৭ শ্রীশ্রীরামচন্দ্র প্রতুলকর্ত্তা॥
দ্রোপদির বস্ত্রহরন পুস্তক নিক্ষর্তে॥
রাজা বলে কহ কহ ব্যাসের নন্দন।
কহ গোসাঞি দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ॥
যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন নকুল সহদেব।
একে একে কহ কথা জতেক পাণ্ডব॥
প্রতিজ্ঞা করিলেন তিহোঁ দুর্য্যোধন সনে।
পাশা খেলে পণ করি রাজা ততক্ষণে॥
জে জন হারিব তার বস্ত্র কেড়্যা লব।
জথোচিত মনরম্য আবস্থা করিব॥
এই পণ করি পাশা খেলে দুই জন।
সত্য সত্য ব্রহ্ম সত্য বলে সর্ব্বজন॥
তবেত বারঞ্চ পেলি যুধিষ্ঠির বলে।
এইবার জিনিব ভাই মহাকুতূহলে॥
পেলিলেন দুয়া চারি রাজা দুর্য্যোধন।
হারিলেন যুধিষ্ঠির দৈবের ঘটন॥
কোথা গেলে ভ্রাতৃবর্গ শুন মন দিয়া।
যুধিষ্ঠির বস্ত্র সভে লহ ত কাড়িয়া॥
এই ক্ষণে যুধিষ্ঠিরের বস্ত্র কেড়্যা লে।
ত্বরাপরে দ্রোপদীরে ডাক্যা আন্যা দে॥
রাজার আদেশে দৈত্য অবিলম্বে চলে।
উপনীত হৈল গিয়া দ্রোপদী মহলে॥

ভনিতা—

অশ্রুধারা বহে ঘন ধীরে ধীরে জায়।
ভাগবতামৃত দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়॥

১০ম পত্রের শেষ—

ভীম বলে জত আছ শুন সভাজনে।
এই কুরু দুষ্ট কর্ম্ম দেখিলে নয়ানে॥
জেই উরু দেখাইলি সভার ভিতর।
ভারতকুলের পশু নির্লজ্জ পামর॥
বজ্রসম প্রহার মারিয়া গদা বাড়ি।
রণ মাঝে উহার ভাঙ্গিব উরু পাড়ি॥

... ...

ভীমের প্রতিজ্ঞা দেখি কাপে বীরগণ।
সভামধ্যে বিদুর বলএ ততক্ষণ॥
আরে কুরুগণ দেখ রক্ষা নাহি আর।
ভীম ক্রোধ সিন্ধু হলে না দেখি উদ্ধার॥

মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত বা বাশুলীমঙ্গল

(পূর্বানুবৃত্তি)

॥ পয়ার ॥

রান্ধিব রুক্মিণী ভাত খাব প্রাণনাথ।
হলদি সরিষা দিয়া বাট নিমপাত॥
সাধুর রমণী সত্যবতী চিন্তাকুল।
হাকুচ মিশাইয়া বাটে সুগন্ধি তণ্ডুল॥
প্রভুর ঠাঞি গুণ আজি করিব প্রকাশ।
সোমরাজবীজ দিয়া বাটে রসবাস॥
বরিষা সময় বৃষ্টি ঘন ডাকে ভেক।
সুকুতার পত্র মিশাইল কালমেঘ॥
মাখিয়া গোময় রস কুটিল আনাজ।
জীবননাথের ঠাঞি পায় যেন লাজ॥
যদি নাহি থাকে গুণ কি করিব রূপ।
যবক্ষারে রান্ধিতে দিল কলাইর সুপ॥
রন্ধনের সজ্জ যত করিল আপনি।
স্নান করি আইস ঝাট প্রাণের বহিনী॥
সুমুখী রুক্মিণী স্নান কৈল পুণ্যজলে।
আগে পাছে সখী আইল আপন মন্দিরে॥
আঁচড়িয়া বান্ধে খোঁপা চাঁপা দিয়া তথি।
বিকচ কমলে যেন খঞ্জনের গতি॥
ধৌত বস্ত্র পরে রামা পরম সন্তোষে।
পাখালিয়া চরণ প্রবেশে মহালসে॥
ত্রিপুরা পূজার সজ্জ আনিল নিকটে।
সিন্দুর চন্দন পঙ্ক পরি[৭০]ল ললাটে॥
সহজে যুবতী জন অপুণ্যজ ক্ষেত্রে।
তিনবার স্মরিল পুণ্ডরীক নেত্রে॥
দূর্ব্বাহস্ত যুবতী আসনে বৈসে সুখে।
শ্বেতধান্য ঘটবারি আরোপি সমুখে॥
অখণ্ডিত চূতডাল হেম ঘটে দিয়া।
যথাবিধি ধূপ দীপ নৈবেদ্য রচিয়া॥
সুগন্ধি কুসুম ঝারা বান্ধিল উপরি।
আবাহন করি পূজে ত্রিপুরাসুন্দরী॥
ত্রিপুরা পূজিয়া দুই হাথ দিয়া বুকে।
আমার রন্ধনে প্রভু ভুঞ্জিব কৌতুকে॥
তুয়া পদে বর মাগোঁ করি পুটহাথ।
রান্ধিলে অমৃত হব ব্যঞ্জন ভাত॥
রুক্মিণীর পূজায় সন্তোষ নারায়ণী।
শূন্য অন্তরীক্ষ হইল আচম্বিত বাণী॥
শুন ঝিয়ে রান্ধ গিয়া না ভাবিহ আন।
তোমার রন্ধন হব অমৃত সমান॥
পুনঃ পুনঃ উঠে পড়ে করিয়া প্রণতি।
মোরে কৃপা কর মাতা দেবী হৈমবতী॥
বিনয় করিয়া বলে ত্রিপুরার ঠাঞি।
ক্ষেম অপরাধ মাতা রন্ধনের যাই॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী॥০॥

॥ গৌরী রাগ ॥

অনুমান বড়ি খোড় বার্ত্তাকু ছোট বড়
আনাজ লাউ কুমুড়া।
কলা কলাস্মূল করেলা তেতুল
মানকচু পলা কড়া॥
শাক নানাবিত খাসির পেশিত
ঘৃত দুই পরকার।
মরিচের ঝাল নানা পরকার
কুচি কুচি বালুকার॥

দিদি বান্যার ঝি কি দিয়া রান্ধিব কি
কহিবে হইয়া সুখী।
আমি নাহি জানি কহিবে আপুনি
শুন গো পঙ্কজমুখী ॥
হরিদ্রা লবণ বেসারি সঘন
দিয়া সুকুতার পাত।
মুহরি জিরক আনিল সকল
আর যত বস্তুজাত ॥
কলাই বিউলি সুগন্ধ পিঠালি
কাঁঠালবিচির রোক।
রান্ধিবার কাজ আছুক আনাজ
দেখিলে সন্তোষ লোক ॥
বেতাগ নালিতা আতুর পলতা
আর জলপাই টাবা।
[৭১ক] দুগ্ধ চিনি জল পেথ মন্দ ভাল
তুয়া পদে করি সেবা ॥
ভুঁজিব সাধব কেমতে রান্ধিব
ধরিতে না জানি হাণ্ডি।
তুমি কর কৃপা হাথে ধরি শিখা
যাহাতে সন্তোষ চণ্ডী ॥
চিত্তে করি বিষ মুখে সুধা ভাষ
আজি দুহেঁ বুদ্ধি বাঁটি।
কেনি বিড়ম্বসি আ লো মুখশশী
কে তোরে না জানে ধাঁটী ॥
ত্রিপুরাচরণে কবিচন্দ্র ভনে
তোমাকে শিখাব কে।
আপনি রূপসী সকলি জানসি
যে দিয়া রান্ধিব যে ॥০॥

॥ পয়ার ॥

নিষ্ঠুর বচন শুনি সতিনীর তুণ্ডে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে রুক্মিণীর মুণ্ডে ॥
মনে বড় দুঃখ পায় রুক্মিণী যুবতী।
আপন ইৎসিত নহে যেই করে বিধি ॥
আনল জালিয়া রামা হয় দণ্ডপাত।
কভু নাহি রান্ধি আমি ব্যঞ্জন ভাত ॥
আমার রন্ধনে তুমি হবে সাবধান।
আপুনি জলিবে তুমি নহিবে নির্ব্বাণ ॥
সাধুর যুবতী সতী সমরিয়া চণ্ডী।
উনানের উপরে বসাইল দুই হাণ্ডি ॥
ত্রিপুরার অনুভবে বুঝে তুকতাক।
নারিকেল দিয়া রামা রান্ধে দুই শাক ॥
সেতুশাক রান্ধে রামা করেলা চিঙ্গড়ি।
গুটি গুটি তথি মাসকলাইর বড়ি ॥
রান্ধিল মদগুর মৎস্য কাঁচকলা দিয়া।
নালিতার শাক রান্ধে ঘৃতে সন্তলিয়া ॥
কটু তৈলে রান্ধে রামা শাক লতাপাতা।
বেতাস তলিল কথ আওর পলতা।
ঘৃত দিয়া রান্ধিলেক শুসনির পাতা।
হরিত মৎস্যেতে হেলঞ্চ সুকুতা ॥
কলসি রান্ধিল রামা করি সড়সড়ি।
তার শেষে ভাজিলেক কথ ফুলবড়ি ॥
[৭১] পুটিমাছ দিয়া রান্ধে শর্ষা পাতড়ি।
খোসলার ঘণ্টি তাথ তুলিয়া চিঙ্গড়ি ॥
বাগদাচিঙ্গড়ি কথ করে খড়খড়ি।
ঘন বেঝোয়ার দিয়া রান্ধিল চুচড়ি ॥
ভুঞ্জিবেন প্রাণনাথ মনে বড় রঙ্গ।
রান্ধিয়া তুলায় রাখুয়া চুচড়া পালঙ্গ ॥
মুগবড়ি তলিল পৃথক পলা কড়া।
মহিষের ঘৃত দিয়া তলিল চিঙ্গড়া ॥
বরিছার থোড় রামা ঘৃত দিয়া তলে।
রান্ধে পোতা ধান গোটা কাসন্দির জলে ॥
তলিয়া মুগের বড়ি চিনিজলে পেলে।
চিঙ্গড়ার বড়া তলিলেক কটু তৈলে ॥
নিরামিষ্য ঘৃতে রামা তলিল বার্ত্তাকু।
দুগ্ধে মিশাইয়া রান্ধিলেক লাউ ॥
আনাজ গলিল মৎস্য রহে খণ্ড খণ্ড।
সুকুতা মিশাইয়া রান্ধে বোদালির ঘণ্ট ॥

গাগর ভেকটী নাঠা ফলই কুড়িসা।
ক্রমে দিয়া বড়ি থোড় শাক লাউ শসা॥
মুহরি জিরক দিয়া ব্যঞ্জন সম্ভালে।
যথা যথা সম্ভবে পিঠানি দিয়া তুলে॥
আলু দিয়া বালিকড়া কচু দিয়া ভোলা।
কাঁঠালের বীজ দিয়া রান্ধে সৌল হুলা॥
সকুল বোদানি রুই কাতলা চিঙ্গড়া।
সারি কচু মান মূলা আনাজ কুমুড়া॥
সম্বারিয়া তুলে পঞ্চ মৎস্যের ঝোল।
মহিষের ঘৃত তলে চিথলের কোল॥
কথ চঙ্গি দেই কথ মরিচের গুড়া।
চতুর্জ্জাতে রান্ধে রুই কাতলার মুড়া॥
বুঝিয়া ব্যঞ্জনে নোন দেই অনুরূপ।
রান্ধে মাস বাটুলা মসরি মুগ সুপ॥
ঘৃতে সান্তালিয়া তাহা তুলে ঠাঞি ঠাঞি।
রান্ধিল রুক্মিণী রামা মনে সুখ পাই॥
[৭২ক] পৃথক পৃথক মৎস্য তথি বার্ত্তাকু সিম।
একেত্র করিয়া রান্ধে কলামূল নিম॥
রান্ধিল পলকা ঝোল দিয়া ধানপুলি।
বোদানির বীজ তলে মিশাইয়া পিটালি॥
ত্রিপুরার বরে সতী মনে বিকলুষ।
কুমুড়ার বড়ি দিয়া রান্ধে রামা রুষ॥
পাথরচটার ঝোল রান্ধিল বনিতা।
আনাজ কেবল তথি কোমল পলতা॥
বার্ত্তাকু আনাজ দেই হরিদ্রা বেসার।
সোমরাজ দিয়া রামা রান্ধে বালুকার॥
খাসির পেসিত রান্ধে ছোলা মিশাইয়া।
ঘৃত দিয়া কথ মাংস তুলায় তলিয়া॥
চণ্ডিকার চেটী ভাল বুঝে পরিপাটী।
রান্ধিয়া বায্যের ঝোল তলে স্বর্ণপুঠি॥
ইলিসা তপস্যা বাটা চেঙ্গজলে কই।
আম্র রান্ধিল কথ দিয়া জলপাই॥
দোরগু তেঁতুলি মৎস্য বার্ত্তাকু মিশাইয়া।
পোতা ধান রান্ধিল টাবার জল দিয়া॥

রান্ধিতে রান্ধিতে রামা ঘামে তোলবোল।
গুড় দিয়া রান্ধে পাকা চালিতার ঝোল॥
চিনি দিয়া পাকা আম্র রান্ধিলেক দুগ্ধ।
কহিতে না জানি স্বাদ কত অদভুত॥
দুগ্ধ চিনি পেলায় চিতউ করে মিঠা।
চন্দ্র কাতি সাজিল ক্ষীরের পাঁচ পিঠা॥
কলাবড়া সাচাইল মধুরস পুলি।
অমৃত চিতাউ সাজে মুগের সাঙলি॥
ক্ষীরের মৃণাল সাজে নারিকেল পুলি।
কলা চিনি ক্ষীরে রামা সাজিল কাঁঠালি॥
সাজিল খখড়ি নাড়ু কি কহিব কথা।
নামে দোষে নাহি জানি খাইলে ঘুচে ব্যথা॥
ক্ষীরের গেণ্ডুয়া সাজে ক্ষীরের পানিফল।
ক্ষীরের নারিকেল গুয়া অমৃতমণ্ডল॥
ক্ষীরের গুয়া পান সাজে ক্ষীরের নানা মাছ।
তলিয়া তুলায় তাহা এতে কাছে কাছ॥
রান্ধিল তণ্ডুল যত জন খায় ভাত।
ভোজনে বসিল সাধু রুক্মিণীর নাথ॥
[৭২] রন্ধনের গুণ কি কহিব এক মুখে।
মনে পরিতোষ সাধু ভুঞ্জিব কৌতুকে॥
নৃমণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী॥০॥

॥ একাবলী ॥

রণরঙ্গিণী। জয়শঙ্খিনী॥ ধ্রু॥
আত্রক লবণ ঘৃত। কাসন্দিতে সাধুপুত॥
কাটিয়া নেম্বুর ফল। তথিতে প্রচুর জল॥
তল্যাতি উপর থুইয়া। আগে দিল দাসী লইয়া॥
রুক্মিণী চকোর আঁখি। পরিবেশে বিধুমুখী॥
শালি অন্ন হৈম থালে। দিলেন প্রভুর কোলে॥
একত্র বার্ত্তাকু সিম। কলামূল দিল নিম॥
সঙরিয়া জগদীশ। সাধু করিল গণ্ডুষ॥
পিযূষ সদৃশ রাগ। তবে দিল সেতুশাক
দুই শাক দিল বধূ। ভোজন করয়ে সাধু॥

বনশাক লতাপাতা। খাইল সাধু ললিতা॥
পলতা সুসনি পাতা। বেতাগ কলমি বাথা॥
ভোজনে সাধু নিশঙ্ক। চুঁচড়া খায়ে পালঙ্গ॥
শাক বার করে খড়ি। খাইল সর্ষা পাতাড়ি॥
রুক্মিণীর দেখে রূপ। ভক্ষিলেক চারি সুপ॥
সাধু যুত মধু কণ্ট। হেলঞ্চা সুকুতা ঘণ্ট॥
সর্ষার ঘণ্ট চুচড়ি। চিঙ্গড়ির খড়খড়ি॥
গোটা কসন্দির জলে। পোতা ধান ভাল মিলে॥
খাইয়া মনে সুখ পায়। অমৃত সিঞ্চিত গায়॥
মাংসের বড়ি বার্ত্তাকু। ভক্ষিলেক দুগ্ধলাউ॥
মুগ বড়ি পলা কড়া। ডাগর তলা চিঙ্গড়া॥
বামি রুষ বামি ঝোলে। মুণ্ড সাধু নাহি তোলে॥
ইলিসা তপস্যা চেঙ্গ। খাইয়া বাড়িল রঙ্গ॥
গাগর ভেকটী নাঠা। ফলই কুড়িয়া বাটা॥
সকুন বোদা দানি রুহি। চিথল কাতল কই॥
কনি কড়া আর ভোলা। মহাশঙ্খ সল হুলা॥
নানারূপ মৎস ঝোল। তলিত চিথল কোল॥
বড় মৎস্যের[৭৩ক]মুণ্ড ভাল। চঙ্গি মরিচের ঝাল॥
সাধুর সন্তোষ মন। ভক্ষিল অমৃত যেন॥
রোহিত পাঠিল বীজ। তলিল তথি মরিচ॥
সাধু বুঝে পরিপাটী। খায় তলা স্বর্ণপুটি॥
বালুকার খাসি ঝোল। দেখি মন উতরোল॥
তলিত মাংস রসাল। তথি মরিচের ঝাল॥
মাগিয়া অনেক বার। খাইল সাধুর কুমার॥
পলকার ঝোল বই। অম্ল দিল জলপাই॥
সুরস তেঁতুলি ঝোল। আর দিল টাবা জল॥
পাকা চালিতার ঝোল। মিশ্রিত চিনির জল॥
গুড়পাকা আম্রদুগ্ধ। স্বাদ বড় অদভুত॥
রন্ধন কি মধু সুধা। এমনি না খাই কোথা॥
রুক্মিণীরে সাধু ডাকে। পিঠা আন একে একে॥
কুঞ্জরগামিনী রামা। পরিবেশে পিবা পানা॥
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে। চণ্ডিয়ার দোষ সহে॥০॥

॥ গৌরী ॥

দুগ্ধ চিনি জলে চিড়াউ মিঠা।
চন্দ্র কাতি খায় আওর পিঠা॥
কলাবড়া মাস মধুর পুলি।
অমৃত চিতাউ মুসাউলি॥
ব্যঞ্জন ভাত খায় ফরমানি।
ঘন ঘন পিয়ে শীতল পানি॥
নারিকেল ক্ষীর রম্ভার পুলি।
সমুড়ি নাড়ু কেয়ার কাঁটালি॥
অমৃত মণ্ডল নানামো নাম।
ক্ষীরের মৎস্য ক্ষীরের গুয়া পান॥
ললাটের মাঝে সিন্দুররেখা।
চাঁদের কোলেতে রবির দেখা॥
হংসগতি পরিবেশে গোণ্ডু আরু।
ক্ষীরের পানিফল অধিক চারু॥
সাধুর নন্দিনী ভাল রুক্মিণী।
সঘন কহে সাধু ফরমানি॥
দধি দুগ্ধ খায় ভোজন শেষে।
ভুঞ্জিল সাধব মন হরিষে॥
ভোজন সাধু সমপিয়া মনে।
করিল গণ্ডূষ হাস্যবদনে॥
শুন শুন প্রিয়ে বণিকঝি।
কবিচন্দ্র কহে কি তোরে দি॥০॥

॥ পয়ার ॥

কনক ডাবর আনি দিল দাসী জনে।
আঁচমনে সাধব পবিত্র হৈল মনে॥
সরস বিরস ভাষ বুঝে কমলিকা।
আনিয়া যুগল বাস দিলেক চেটিকা॥
তাম্বূল সাঁপুড়া এতে ঢাকন ঘুচাইয়া।
সাধবের কাছে দাসী রহে দাণ্ডাইয়া॥
ত্যেজিল ভোজনবাস বসন পরিয়া।
পুন আঁচমন করে আসনে বসিয়া॥
সুবর্ণ পাদুকাপিঠে দিলেক চরণ।
মুখে পান দেই সাধু সাধুর নন্দন॥

রুক্মিণীকে দেখে সাধু ঘন উলটিয়া।
পাপিষ্ঠ সতিনী তথা চাহে আড়াকিয়া॥
মুখে কিছু নাহি বলে অন্তরে পুড়ে হিয়া।
ক্ষণে ক্ষণে বিধি নিন্দে নিশ্বাস ছাড়িয়া॥
শয়নমন্দিরে যায় ত্যেজি মহালস।
দূর দেশাগত সাধু মদনের বশ॥
ভূঞ্জিল রুক্মিণী অন্ন পরিজনে দিয়া।
আঁচমন কৈল জলে দেহ নিমজিয়া॥
চলিব প্রভুর কাছে হরষিত হইয়া।
কবিচন্দ্র কহে চণ্ডীর চরণ ভাবিয়া॥৭॥০॥

সজ্জা পাতে পানী নানারূপ জানি
বুদ্ধে অতি সচতুরা।
মনে উঠে রঙ্গ পাড়িল পালঙ্গ
নেহালি পাড়ে চৌতরা॥
তথির উপর বিচিত্র অম্বর
শিয়রে বালিস রাখে।
দুই দিগে জাদ কাঞ্চনে রচিত
চাঁদয়া খাটায় সুখে॥
চাঁদয়ার চিত দেবতা নির্ম্মিত
তাহে মুকুতার ঝারা।
রক্ত গৌর শ্বেত পুষ্প নানাজাত
সারি সারি বান্ধে মালা॥
সজ্জার উপর তুরঙ্গ কেশর
আমোদিত যার গন্ধে।
হেমপাত্র পুরি চন্দন কৌস্তরী
রাখে নানা পরিবন্ধে॥
সৌরভে আমোদ ধায় ষটপদ
ফুকরে গভীর নাদ।
বিরহিণী মন করে উচাটন
কেবল কামের ফাঁদ॥
সাঁপুড়া ভিতর কর্পূর তাম্বুল
ব্যজন থুইল পাছে।
মনের কৌতুক জ্বালিল চেরাগ
ডাবর রাখিল কাছে॥

সজ্জা পাতে পানী মনে মনে গুণি
শয়নে বাড়িল আশ।
সগত গাড় দিয়া নিবারিল হিয়া
কুমতি করিল নাশ॥
[৭৪ক] শুন সদাগর চল বাসঘর
নিবেদিল পানী চেটী।
শ্রীযুত মুকুন্দ রচিল প্রবন্ধ
রুক্মিণী করে পরিপাটী॥০॥

॥ কামোদ ॥

সখীর সংহতি বসিল যুবতী
হাথে করি কঙ্কতিকা।
কুটিল কেশপাশ বিচারি করে নাশ
সুছাঁদে বান্ধে কবরিকা॥
দর্পণে দেখে মুখ চন্দন দিই রেখ
ললাটে দ্বিতীয়ার শশী॥
অরুণ উজ্জ্বল সিন্দূর কজ্জল
চন্দনে কুচযুগ ভূষি॥
শয়নমন্দিরে চলিল গুণবতী
প্রভুমুখ দরশনে।
জলদ সুন্দর বসনে কলেবর
ঢাকিয়া হাস্যবদনে॥
অঞ্জন সঘন রঞ্জিত লোচন
খঞ্জন তুসল চরে।
কনক কুণ্ডল শ্রবণে উজ্জ্বল
পত্রাবলী গণ্ডস্থলে॥
ঝল্লিকা পরে গলে হার পয়োধরে
বউলি শোভে শ্রুতিদেশে।
লেপিল কলেবর কৌস্তরি চন্দন
সুগন্ধি সৌরভ রসে॥
ভুজের উপরে রজত তাড় পরে
অঙ্গুরি বাম করশাখে॥
পিঠে থোপ লোলে চরণে মঞ্জির
পাশুলি পদযুগ আগে॥

পরিল নিতম্বিনী কনক কিঙ্কিণী
মধুর ধ্বনি কটিদেশে।
কর্পূর তাম্বূল চন্দন গন্ধফুল
লইল পতি পরিতোষে॥
খদির রসে রঙ্গ অধর সুরঙ্গ
ঈষত পুন পুন হাসি।
জলদ মুক্তা গ্রন্থ প্রকাশে অবিরত
চন্দ্রিমা পূর্ণিমার শশী॥
আগে পাছে সখী চলে শশিমুখী
সবারি ঝারি করি হাথে।
মুকুন্দ কবিচন্দ্র রচিল প্রবন্ধ
ত্রিপুরা হরবধূপদে॥০॥

কোথাকারে যাহ ল রুক্মিণী।
অপরূপ কি আশু সাজনি॥
যাবে কিবা প্রভুদরশনে।
এই কথা লয় মোর মনে॥
আমারে কহিতে তোর ডর।
আমি সে তোমার এত পর॥
রতি আশে যাবে পতি পাশে।
পরাণ হারাও তুমি পাছে॥
কত দুঃখ পাবেন বহিনী।
আপনা হৈতে সভে জানি॥
[৭৪]সুনামে সাকো নাহি রঙ্গ।
যেন রূপ করিয়ে মাতঙ্গ॥
মৃগ যেন রূপ হরিণী।
মণ্ডুক মণ্ডুকী ধরে ফণি॥
মার্জ্জারে মূষিক যেন ধরে।
ময়ূরে ভুজঙ্গ যেন গিলে॥
যেরূপ কপোত চলয় চানে।
নাহি রঙ্গভঙ্গ দরশনে॥
কেমন সাহসে যাবে একা।
রতি কারে বলে নাহি দেখা॥
এ বোল শুনিঞা রামা হাসে।
স্মিত বিকসিত কিছু ভাষে॥
এতেক প্রমাদ ছিল যদি।
কেমনে পরাণ পাইলে দিদি॥
নিবেদন তোমার চরণে।
মোর কথা শুন সাবধানে॥
কৃষ্ণকথা শুন উপদেশ।
ব্রজাঙ্গনা ভজনবিশেষ॥
অম্বিকাচরণে দিয়া মতি।
কবিচন্দ্র রচে সুভারতী॥০॥

॥ কৌ রাগ॥

শুন দিদি তোরে বলি ঘুচাহ মনের কালি
কৃষ্ণকথা শুন গো শ্রবণে।
প্রভুর মহিমা যত কে জানে তাহার তত্ত্ব
ব্রহ্মা আদি না পায় ধেয়ানে॥
বধিতে দেবের ঐরি অবনীতে উরে হরি
দৈবকীজঠরে নারায়ণে।
জন্মি কংস কারাগারে গেলা নন্দঘোষ ঘরে
পূতনা বধিল স্তনপানে॥
ঈষত লীলায় ঠেলে চরণকমল হেলে
সকট ভাঙ্গিল শ্রোণিবাস।
শুইয়া ছিল শিশুরায় তৃণাবর্ত্তে আসি তায়
অন্তরীক্ষে তুলিল আকাশ।
করতল পাইয়া দুষ্ট হরিষে লইয়া হৃষ্ট
মরিয়া পড়িল মহীতলে।
পুন শিশুরূপে বসি যেন চর্ম্মঘাতে অসি
খেলে প্রভু তার বক্ষস্থলে॥
শিশু ক্রীড়া করি রঙ্গে যমন অর্জ্জুন ভঙ্গে
বধে প্রভু বক অজগর।
মথিয়া কালীয় দর্প চরণে শরণ সর্প
গোবর্দ্ধন ধরে গদাধর॥
ভক্ত অনুগত পাইয়া ব্রজনারীগণ লইয়া
বিরহে বিরিন্দাবন মাঝে।
কমলা রমণী ধনী কমলিনী শিরোমণি
রাধা চন্দ্রাবলী তাহে সাজে॥

শিরিষ কুসুম কিবা [৭৫ক]সুকোমল তনু আভা
ভানুর দুহিতা ঠাকুরাণী।
অনন্ত মহিমা তাঁর কি বলিতে পারি আর
ব্রজতনু হরি চক্রপাণি ॥
দৃঢ় ভক্তি করি গোপী প্রভুর চরণ সেবি
রতিরসে কৃষ্ণ হইল বশ।
এতেক বিক্রম জনে ভয় না করিল কেনে
বল দেখি কেমন সাহস ॥
প্রেমরসে গোপীগণ বান্ধিলেক নারায়ণ
আর কোথা না গেলা বন্ধন।
যোগেন্দ্র হৃদয়াসন করি ভাবে অনুক্ষণ
বান্ধিতে নারিল ত্রিলোচন ॥
শুনি এগা সিদ্ধান্ত কথা লাজে হেট করে মাথা
সত্যবতী লাগিল তরাস।
অম্বিকাচরণ আশে মধুর সঙ্গীত ভাসে
কবিচন্দ্র ত্রিপুরার দাস ॥০॥

॥ মল্লার ॥

আইমা মা করি রামা নিকসে রসনা।
কোথা হইতে জান তুমি গোপীর মহিমা ॥
দুগ্ধগন্ধ নাহি ছাড়ে তোমার রসনে।
চুপ দিয়া থাক বেটী লোক পাছে শুনে ॥
যুবতীর কুলের আনিলি কোয়াঃকার।
নিশ্চয় জানিল পারাকারিণী ভাতার ॥
এত তত্ত্ব নাহি জানি হইল গুর্ব্বিণী।
সতীনচরণে কিছু কহে শুদ্ধবাণী ॥
গুণিলে সে গুণ বুঝি নির্গুণে কিবা জানে।
গুণের প্রমাণ দেখ ভ্রমর না শুনে ॥
বনে থাকে ভ্রমর কমল থাকে জলে।
মধু পান করে অলি বসি তার দলে ॥
পুনরপি কহি দিদি নির্গুণের কথা।
একত্র বসতি ভেক কমল থাকে যথা ॥
মহীলতা খায় সে না করে মধু পান।
বিন্দাবিন্দ হই কথা কর অবধান ॥

আমার না[৭৫]চেতে দিদি যদি ব্রীড়া করে।
শিরে ঢাকি অম্বর সম্বরি যাহ ঘরে ॥
প্রত্যুত্তর দিয়া গৃহে চলিল রুক্মিণী।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ রচিল শুদ্ধবাণী ॥০॥

॥ পয়ার ॥

নানা বেশ আভরণ যেখানে যে সাজে।
চলিল রুক্মিণী রামা দুই সখী মাঝে ॥
পদে পদে যায় রামা মরালগামিনী।
কটীদেশে রুনু রুনু মধুর কিঙ্কিণী ॥
সবারি কনক ঝারি পালঙ্ক নিকটে।
এড়িয়া বসিল বামা বুন্দে নাহি টুটে ॥
চারিদিকে চারি রত্ন প্রদীপ উজ্জলে।
দুয়ারে কপাট দিয়া বৈসে প্রভুকোলে।
প্রথম প্রহর রাত্রি নিদ্রা যায় সুখে।
সুবাসিত চন্দন প্রভুর দেই বুকে ॥
অন্তরে জাগিল সাধু আখি নাহি মেলে।
হাস্যমুখ দেখি প্রভু সতী কিছু বলে ॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥০॥

॥ বারাড়ি ॥ করুণ ॥

দেখি তুয়া মুখ দূরে গেল দুঃখ
হৃদয় জাগিল কাম।
না কর বিলম্ব দেহ আলিঙ্গন
শূন্যগৃহে গুণধাম ॥
প্রাণনাথ কপটে কত ঘুম বাসি।
তুষের দহ মলয় পবন
খর রশ্মি ভেল শশী ॥
ফুটিল কমল নিকটে ভ্রমর
বিকল মধুর লোভে।
দৈবের নির্ব্বন্ধ রাত্রি যেন চন্দ্র
ভিন্ন নাহি দুহে শোভে ॥
কনক মুকুর পেখ মুখ মোর
চাঁদ নাহি পক্ষে টুটে।

নির্দ্দয় হে ধর কেন নাহি ডর
নয়ান কমল ক্ষুটে ॥
[৭৬ক] সিন্দুর কজ্জল চন্দন বিফল
হার হইল মোরে বৈরী।
সফল কবরি ধরিতে না পারি
তব প্রেমে প্রাণ ধরি ॥
কবিচন্দ্র কয় সাধু অল্প চায়
কিছু নাহি অপরাধ।
পুষ্পধনুর্দ্ধর করে মোরে বল
রক্ষ রক্ষ প্রাণনাথ ॥০॥

॥ বসন্ত ॥

দহন নিকটে ঘৃত নিরবধি জলে।
মকরন্দ পিয়ে ভৃঙ্গ বসিয়া কমলে ॥
নাথ আওল বসন্ত বসন্ত।
না ছড়ে কামিনী কোলে তুহুঁ গুণবন্ত॥
মধুর কোকিলী ডাকে বসি তরুডালে।
মদন যুড়ায় যুবা যুবতীর কোলে ॥
যুবতী রতনঘট বচন পিযূষ।
বোল দুই চারি বর্ণ শুন সুপুরুষ ॥
উনমত্ত ফুলধনু মলয় পবনে।
মঞ্জুরিল তরু নানা ফুল ফুটে বনে॥
না মেলে নয়নযুগ উলটিয়া পাশ।
বুঝিল কপটে তোর কত ঘুম যাশ।
না জীয়ে মদন কিবা হামু অভাগিনী।
রচিল মুকুন্দ দোষ ক্ষেম ত্রিনয়না ॥০॥

॥ কেদার ॥

উঠিয়া বসিল সাধু যুবতীর পাশে।
বঙ্ক নয়ানে চাহে যুবতীর আশে ॥
চারি চক্ষু দরশনে হাসে খল খল।
রবির কিরণে যেন ফুটিল কমল ॥
সরস অঞ্জনে চক্ষু চলে ঘনে ঘন।
এক যোগে চরে যেন যুগল খঞ্জন ॥
গাএ হাথ দিয়া সাধু বসন ঘুচায়।
বলি বলি করি রামা ঝটিত পাছু যায় ॥
স্মরশর জরজর সাধুর হৃদয়।
আপনারে পাসরে বলে নারীকে বিনয়॥
প্রাণদান দেহ মোরে না করিহ রোষ।
পুরুষ বধিলে জান যেই হয় দোষ ॥
আলিঙ্গন দিয়া প্রিয়ে কর পরিতোষ।
পুড়িলে কামুক জিয়ে কুচ কাম দোষ ॥
বুঝিয়া প্রভুর মন বলে নিতম্বিনী।
তুমি গজরাজ প্রভু হামু কমলিনী ॥
অবলার সহজে কাতর বড় চিত্ত।
সুরথী পণ্ডিত নাথ বুঝ হিতাহিত ॥
ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুব্ধমতি।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধু[৭৬]র ভারতী ॥

॥ সুই রাগ ॥ রামান ॥

যুবতী দেহ মোরে দান ॥
ভেরি দৃকঞ্চল কজ্জল গরল
দরশনে দহে প্রাণ ॥
প্রভুরে দেখি হই হাস্যমুখী
হাথে কৈল গুয়া পান।
যত পাইলে দুঃখ বিসরহ সব
দুরে ত্যেজ অভিমান ॥
তুমি রূপবতী বুদ্ধে বৃহস্পতি
নির্দ্দয় মন্মথবাণ।
বধিলে পুরুষ জানসি যে দোষ
তোরে কি বুঝাব আন ॥
যত দেখ জন সভে স্বামীধীন
কোলে বৈসে পরিতোষে।
শুন লো যুবতী প্রভুর ভারতী
নাহি ঠেল অভিরোষে ॥
গালে হাথ দিয়া মুচকি হাসিয়া
বসিল প্রভুর কাছে।
শ্রীযুত মুকুন্দ রচিল প্রবন্ধ
সাধব ধরিল বাসে ॥০॥

॥ কামোদ ॥

প্রভু না ধর আঁচলে আঁচলে।
তুয়া করপরশে হৃদয় কাঁপে ডরে ॥
শুনিল শ্রবণে আমি নিরখিল দিঠে।
নন্দনবনের ফুলে মধু নাহি টুটে ॥
দরবিদলিত ফুলে মধু নহেধিক
তোরে কি বুঝাব নাথ সকল রসিক ॥
বিকচ কমল দেখি হইয়া আনন্দ।
ঘন উঠে বৈসে ভৃঙ্গ পিয়ে মকরন্দ ॥
শুন ল সুন্দরি প্রিয়ে শুন এক বাত।
ভ্রমরের ভরে নাহি ভাঙ্গে ফুলপাত ॥
মধুকর বিনে নাহি শোভে কমলিনী।
পিযূষ কিরণ বিনে না শোভে রজনী ॥
মধু পিয়ে মধুপ সময় এক চাঁদ।
বুঝিয়া সকল কথা মিথ্যা পাত ফাঁদ ॥
তুমি প্রাণেশ্বরী প্রাণ রাখ ল সুন্দরী।
না সহে মদন তোর বচন চাতুরী ॥
শুন হে জীবননাথ বুঝ ভাল মন্দ।
যথোচিত কর নাথ রচিল মুকুন্দ ॥০॥

॥ মল্লার ॥

ময়ূর মাতিল রে মেঘের গরজনে।
[৭৭ক] কোলে পতি যুবতী মাতিল নিধুবনে ॥
মাতিল গিধিনী পক্ষ মহামাংস খাইয়া।
ভ্রমরা মাতিল রে ফুলের গন্ধ পাইয়া ॥
মাতিল প্রাবৃট ভেক ঘন বরিষণে।
কোকিলী মাতিল রে চন্দনসমীরণে ॥
যাহে যাহে থাকে প্রীত নাহি ছাড়ে অংশ।
মানসে মৃণাল খাইয়া মাতে রাজহংস ॥
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরার বরে।
ডাহুকী করিয়া কোলে ডাহুক গুঞ্জরে ॥০॥

॥ গৌরী ॥

প্রাণনাথ হামু তরুণী অতি বালা।
রাখিহ আপন বশ   ভুঞ্জিহ যুবতীরস
হরিণা হরিণী যেন খেলা ॥
সৌরভে হৃষ্ট মন   মধুলোভে ঘনে ঘন
মধুকর কমলিনী কাছে।
পাইয়া প্রভুর কর   ঝাপিল দৃশাঙ্কুর
মনসিজ অন্তরে নাচে ॥
চল প্রভু পরিহরি   স্মিতমুখী সুন্দরী
চাহে বঙ্ক নয়ানের কোণে।
চাতক ডাকয়ে পিউ   শুন প্রভু রাখ জিউ
হৃদয়কমল কামবাণে ॥
কামিনী করিয়া কোলে   চুম্বন করিয়া বলে
পেখি পেখি বদনকমলে।
করে চাপি ধরে কুচ   কেশরী ঝাপিল গজ
কুম্ভ যুগলে যেন খেলে ॥
জঘনে জঘনে বশ   নির্ঘাত তনুরস
ক্ষেণে ক্ষেণে দুহুঁ মুখে হাসি।
রতিরস বড় সুখ   নিরস সুন্দরী মুখ
রাহুভুকত যেন শশী ॥
ব্যজন পবন ঘন   শীতল চন্দন
পরিতোষে সোঁচিল দুকূলে।
কবিচন্দ্র ভারতী   ত্রিপুরাচরণে মতি
জাগরণে নয়ান ঢুলে ॥০॥

॥ ইতি দশম পালা বাসর ঘর সমাপ্ত ॥

॥ করুণা ॥

কৈলাসে কুতূহলে   বসিয়া প্রভুর কোলে
ত্রিপুরা জয়সিংহ কেতু।
জানিল ভগবতী   রুক্মিণী ঋতুবতী
পাটনে হৈতে আইল সাধু ॥
শুনহ জীবনধন   রুচির ত্রিনয়ন
[৭৭] আমারে দিবেক এক দান।
নিবেদি তব পদ   কমল অবিরত
করিয়া শত প্রণাম ॥
কি বোল বল প্রিয়ে   নিভৃতে শুনিল এ
আমার তুমি প্রাণেশ্বরী।

ভকতবৎসল ভকতকলেবর
ত্রিলোকে জানে ত্রিপুরারি ॥
প্রণত যেই জন তাহারে তুমি জান
অবশ্য সাধ তার কাজ।
সেবিয়া তব পদ কমলপুরসুত
ত্রিদেব নগরের রাজ ॥
সহজে আসি রামা তোমার প্রাণ সমা
আমারে ক্ষেম অপরাধ ॥
ললাটে শশধর ভকতবৎসল
সকল চরাচরনাথ ॥
সুন্দর কলেবর কুমার শশধর
করিয়া দেহ মোরে দাস।
পূজিয়া বিধিমত ভুবনে মোর ব্রত
করয়ে যেন পরকাশ ॥
মহেশ বলে চল কুমার শশধর
জনম গিয়া তুমি ভুবি।
মুকুন্দ কবিচন্দ্র রচিল প্রবন্ধ
আনিব তোমারে দেবী ॥০॥

॥ পয়ার ॥

হস্ত পদ পাখালে অন্তরে হয় শুচি।
বিষম সুরত খেদ ম্লান মুখরুচি ॥
বসিয়া প্রভুর পাশে সুমুখী রুক্মিণী ॥
কর্পূর তাম্বূল খায় চিন্তে নারায়ণী ॥
শুভক্ষণ সুদিবস বৈশাখ মাসে।
অসিত ধবল পক্ষ প্রসন্ন আকাশে ॥
হেনকালে শশধর কুমার সুন্দর।
ক্ষিতিতলে অবতরে মহেশকিঙ্কর ॥
পূজিব ত্রিপুরা মনে আছে অভিলাষ।
আসিয়া করিল রুক্মিণীর গর্ভে বাস ॥
কোকিল সুনাদ পূরে প্রভাত যামিনী।
ফুটিল কমল সুখে উইয়ে দিনমণি ॥
সাধু করিল প্রাতঃক্রিয়া দন্তধাবন।
স্নান দান করে সাধু সাধুর নন্দন ॥
অচলনন্দিনীনাথ পূজে একমনে।
সুবেশ হইয়া গেল নৃপসম্ভাষণে ॥
লিখিতে দিবস তার গেল পঞ্চ মাস।
পাত ঝিকটি অম্লে বাঢ়ে অভিলাষ ॥
দিনে দিনে বলহীন উদর চিকণ।
কালিমা কুচের আগে ধূসর বদন ॥
ঘন ঘন রমণীর মুখে উঠে হাই।
[৭৮ক] ঢুলু ঢুলু করে আঁখিকমল সদাই ॥
রুক্মিণী দেখিয়া সাধু হরষিত চিত্তা।
ইহার উদরে পুত্র কি জানি দুহিতা ॥
যদি মোরে থাকে সত্য মহেশের দয়া।
পুত্র সুন্দর হব নহিব তনয়া ॥
চলিতে বসিতে সাধু ভাবে দিনে দিনে।
চন্দন চামর নাহি নৃপনিকেতনে ॥
পাটনেরে যদি মোরে পাচে নরপতি।
কোন উপদেশে আমি এড়াব আরতি ॥
হৃদয় ভাবিয়া সাধু গেলত দেয়ানে।
নৃপতিদেশনে বৈসে আপন আসনে ॥
আসনে বসিয়া সাধু পরিতোষ মনে।
নৃপতি সহিত কহে কথোপকথনে ॥
শুন সাধু ধূসদত্ত সদ্‌গুণ বণিক।
আমার নগরে বাণ্যা নাহি তোমাধিক ॥
তারে বলি মানুষ যে জন কার্য্যে রীত।
সভাজনে বলে ভাল নৃপতি পূজিত ॥
মুকুতা চামর শঙ্খ চন্দন বিহীন।
আমার নগরে লোক বলে প্রতিদিন ॥
এ বোল বলিয়া রাজা হাথে করে পান।
সভার ভিতর করে ধূসদত্তে মান ॥
দুর্ব্বার পাটনে তুমি করহ গমন।
আন গিয়া শঙ্খ মুক্তা চামর চন্দন ॥
এ বোল শুনিয়া সাধু বলে পুটহাথে।
মনুষ্যত্বা ধন জন তোমার প্রসাদে ॥
চলিব পাটনে আমি ইথে নাহি ব্যথা ॥
আনিব চামর শঙ্খ চন্দন মুকুতা ॥

বিদায় হইয়া সাধু গেল নিজ ঘর।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাকিঙ্কর ॥০॥

॥ করুণা ॥

রমণী দেখিয়া সাধু করে অনুতাপ।
আদেশিল গাবরে ডিঙ্গায় দিতে গাব ॥
ডিঙ্গার উপর নানা সজ্জ দিল ভরা।
গণক আনিয়া গণে শুভক্ষণ বেলা ॥
রহিব কেমতে ঘরে নাহি পুণ্যলেশ।
লংঘিলে প্রমাদ বড় রাজার আদেশ ॥
প্রভাবিকা পঞ্জিকা মুকাইয়া খড়ি গণে।
তিথি বার নক্ষত্র সর্ব্বাঙ্গ নাহি মানে ॥
প্রবেশে রাহুর দশা রিপু শনি[৭৮]শ্চর।
ভাল যাত্রা নাহি দেখি দ্বাদশ বৎসর ॥
সাধুর বচনে জ্ঞানী পুনর্ব্বার গণে।
বন্দী হবে পাটনেতে রাজসম্ভাষণে ॥
সঙ্কট জীবন শুন সাধুর প্রধান।
নিশ্চয় গণিল আমি ইথে নাহি আন ॥
রাজার আদেশে আমি চলিব পাটন।
বিলম্ব না সহে শুন গণ শুভক্ষণ ॥
ক্রোধমতি অধিপতি গণকেরে কহে।
তোমারে গণনে যাত্রা কভু সিদ্ধ নহে ॥
দ্বিতীয়া মঙ্গলবার মকর লগনে।
কালি যাত্রা ভাল দ্বিজ কবিচন্দ্র ভণে ॥০॥

॥ পয়ার ॥

প্রভু পরবাসে যাব শুনিয়া রুক্মিণী।
হৃদয় ভাবিল হিমাচলের নন্দিনী ॥
সুগন্ধি ধবল ধান্য গলে ফুলমাল।
আরোপিল হেমঘট মুখে চূতডাল ॥
নানাবিধ নৈবেদ্য রচিল প্রচুর।
কুঙ্কুম মলয়াগন্ধ সুবঙ্গ সিন্দূর ॥
রচিল ষড়ঙ্গ ধূপ রত্নদীপ জলে।
বিশাললোচনী পূজে পঞ্চ উপচারে ॥
প্রণতি করিয়া রামা বলে কাকুর্ব্বাণী।
হেনকালে সত্যবতী বলয়ে বন্ধানী ॥

বসিয়া রুক্মিণী কোন কাজ করে কোণে।
দেখ গিয়া সদাগর আপন নয়নে ॥
ভাল মন্দ বিচারে দেখি ভিন্ন প্রভা।
যত মিথ্যা বলি আমি তোমার দুর্ভগা ॥
যুবতীর বোলে সাধু গেল গর্ভাগার।
দেখিয়া রুক্মিণী রামা লাগে চমৎকার।
সাধুর হৃদয় ভাবে এই কোন হেতু।
কোন দেবতায় পূজ ক্রোধে বল সাধু ॥
প্রণতি করিয়া রামা বলে পুটহাথে।
মনুষ্যত্ব ধন জন যাহার প্রসাদে ॥
দেবাসুর নর যার না জানে মহত্ত্ব।
ঘটে আরোপিয়া পূজি বাশুলীর পদ ॥
এ বোল বলিয়া সাধু লংঘে বাম পায়।
মহা পাতকিনী পূজে মাইয়া দেবতায় ॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥০॥

[৭৯ক] ॥ করুণাশ্রী ॥

থর থর করে ঘট হইল অন্ধকার।
নয়ানে না দেখে সাধু না পায় দুয়ার।
লোটাইয়া রুক্মিণী ধরে বাশুলীর পায়।
চারিদশ লোক জিয়ে তোমার কৃপায় ॥
দাসীরে দেখিয়া চণ্ডী ক্ষম অপরাধ।
অবশ্য রাখিবে চণ্ডী আমার আইয়াত ॥
দ্রুহিণী গৃহিণী তুমি বচন দেবতা।
কমলানিলয় তুমি হরের বণিতা ॥
পর্ব্বতনন্দিনী তুমি হরসহচরী।
কি বলিতে পারি আমি তোমার কিঙ্করী।
রুক্মিণীর বোলে চণ্ডী হাসে খলখল।
মুকুলিত বৃক্ষে অবশ্য ধরে ফল ॥
নিমজ্জিল দোষ যেন শেষ শশিকলা।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সন্তোষ মঙ্গলা ॥০॥

॥ পয়ার ॥

যাত্রা করিল সাধু মঙ্গল দিবসে।
রোহিণী মকর লগ্ন কুম্ভ পরবেশে ॥

দ্বিজগণ পড়ে বেদ মঙ্গলের ধ্বনি।
আওয়াস ত্যেজিয়া সাধু দেখিল শকুনী ॥
মুক্ত চিকুরে ধায় পরি কৃষ্ণপট।
বেদীর নিকটে গিয়া দেখে শূন্য ঘট ॥
অশুভ দেখিয়া সাধু ভাবিল মানসে।
না জানি কি হয় আমি যাই পরবাসে ॥
গুরুজন দেখি সাধু করিল প্রণাম।
কারে কোল দেই কারে করয়ে কল্যাণ ॥
অজয় নদীর কুলে সাধুর প্রধান।
মধুকরে চাপে সাধু চিন্তে ভগবান ॥
তোমার সেবক আমি কিছুই না জানি।
ত্রিপুরতারণ দেব রক্ষিবে আপুনি ॥
ডিঙ্গায় ফুকরে শঙ্খ গরজে মাদল।
ধূলাবাণ হানে জয় জয় কোলাহল ॥
ঘন দণ্ড পড়ে হাথে বাজল কিঙ্কিণী।
বাহ বাহ বলে কর্ণধার চূড়ামণি ॥
বর্দ্ধমান এড়াইল বাজে রণতূর।
ঈষত লীলায় গেল বড়সৌউল ॥
রাজার প্রতাপে কেহ নাহি বলে রহ।
বিষম সঙ্কট এড়াইল জামদহ ॥
জলের কল্লোলে কানে কিছুই না শুনি।
বেউরগ্রামে গিয়া সাধু পূজে শূলপাণি ॥
ফলাহার করিলেক সাধুর নন্দন।
হিরণ্যগ্রামে [৭৯] গিয়া করে রন্ধন ভোজন।
শীতল পবন বহে কার্ত্তিক মাসে।
মউলা উত্তরে সাধু রজনী প্রবেশে ॥
প্রভাতে পূজিয়া শিব করিলেক ত্বরা।
জাড়গ্রাম দিয়া সাধু পাইল দশঘরা ॥
প্রতিদিন পূজে শিব নাহি করে হেলা।
কোথা রান্ধে ভুঞ্জে খায় খণ্ড ক্ষীর কলা ॥
দশঘরা এড়াইয়া গেল বৈদ্যপুর।
ধুসদত্ত সাধু রহে ডিঙ্গার ঠাকুর ॥
তেঘরা বাহিয়া যায় বাজে রণতূর।
ঈষৎ লীলায় সাধু গেল চণ্ডীপুর ॥
সেদিন রহিয়া করে রন্ধন ভোজন।
সানন্দে পূজিল সাধু শম্ভুর চরণ ॥
হিম পরবেশে আইল অকাল কুহিড়া।
দ্বীপদ্বারহাটা দিয়া গেল জাঙ্গিপাড়া ॥
কোথা গীত শুনে সাধু কোথা দেখে নাট।
এড়াইল টাছয়া আর ডিঙ্গালহাট ॥
সকল রসিক সাধু বুঝে হিতাহিত।
বাঘাগুায় আসি ডিঙ্গা হইল উপনীত ॥
দেউল দেখিয়া ডিঙ্গা ঠেক দিল দহে।
কবিচন্দ্র কহে চণ্ডী যার দোষ সহে ॥০॥

॥ সুই রাগ ॥

বল ভাইয়া কর্ণধার সমুখে দেউল কার
কেমত দেবতা আছে ইথি।
শুন সাধু ধুসদত্ত দেউল দিল মহারথ
বাশুলী স্থাপিল নরপতি ॥
এ বোল শুনিঞা কোপে দেবীর দেউল ভাঙ্গে
বাখাগুায় বসিয়া আপুনি।
কৈলাসে কুতূহলে বসিয়া প্রভুর কোলে
ভগবতী বিশাললোচনী ॥
অবতরে গো মা সর্ব্বমঙ্গলা
কৈলাস ত্যেজিয়া বিবাদে।
ফুল জলে কোন কাজ পাইল বিষম লাজ
দেউল ভাঙ্গিল ধুসদত্তে ॥
দ্বিতীয়ার চাঁদ শিরে কাতি কর্পর করে
ত্রিনয়নী নৃমুণ্ডমালিনী।
চাপিয়া কুলুপ বুকে চাহে দেবী চারিদিগে
অন্ধকার সকল মেদিনী ॥
ধায় নন্দী মহাকাল ক্রোধে হইয়া চৌতাল
আকুল কুন্তল নাহি বান্ধে।
নেকা চোকা ভেবা ভুলা গলার ওড়ের মালা
দাণ্ডাইল সাধু যথা রান্ধে ॥
[৮০ক]বিপরীত বহে বাত ক্ষেণে ক্ষেণে বজ্রপাত
ডিঙ্গার উপরে হনুমান।

ঘন ঘন পড়ে শিঙ্গা চাক যেন ফিরে ডিঙ্গা
কেহ ডরে ত্যেজিল পরাণ ॥
অমলা বিমলা সখী ডরে নাহি মেলে আঁখি
পুটহাথে বলে স্তুতিবাণী।
তুমি ত্রিভুবনমাতা তোমার বচন মিথ্যা
পাশরিলে রুক্মিণীর স্বামী ॥
তুমি তারে কৈলে বধ না হব তোমার ব্রত
দাসীর থাকিব দুঃখ মনে।
সাধু মায়াদহে গেলে নগর দেখাইয়া জলে
বন্দী করাইহ রাজস্থানে ॥
এই বাক্য শুন মোর সাধু যাকু দেশান্তর
নিবেদিলু তোমার চরণে।
রক্ষ দেবী ভগবতী রমানাথে নিরবধি
চন্দ্রশেখর সনাতনে ॥
কহে দ্বিজ কবিচন্দ্র ত্রিপুরা পরম মন্ত্র
যেই জন ভাবে নিরন্তর।
নৃপ দস্যু পশুগণে জলানলে রণে বনে
ত্রিভুবনে কারে নাহি ডর ॥০॥

॥ পয়ার ॥

ডিঙ্গায় চাপিয়া পুন দেই হুলাহুলি।
বাঘাণ্ডা এড়িয়া সাধু গেল নাঞ্চিকুলি ॥
নায়ের গাবর যত সাধু তার পিতা।
বাহ বাহ বলি সাধু পাইল গো চিতা ॥
বিলম্ব করিয়া তথা মহেশ পূজিয়া।
বুড়া মন্তেশ্বর দেখে কূল্যায় থাকিয়া ॥
ধীরে ধীরে বাহিয়া এড়ায় দেবনদ।
বিষম সঙ্কট দেখি বলে ধূসদত্ত ॥
আকাশে পাতালে ঢেউ নাহি দেখি তীর।
শুনিয়া জলের ডাক প্রাণ নহে স্থির ॥
কর্ণধার বলে ভাই শুন ধূসদত্ত।
ইহারে অধিক আছে জলদুর্গপথ ॥
ভয় না করিহ তুমি নায়ের ঠাকুর।
যমখানা এড়াইয়া পাইল মানকৌর ॥
কর্ণধারে দিল সাধু হেমনেতধড়ি।
স্বর্গসম দেখিল পাটন তড়বড়ি ॥
নানা সজ্জ লৈয়া হাট হয় প্রতিদিনে।
অবসাদ নাহি কার কেহ বেচে কিনে ॥
কাকড়া পেলাইয়া ডিঙ্গা ঠেক দিল দহে।
দ্রব্য বেচে কিনে যে যাহার মনে লয়ে ॥
বিষ্ণু হরিপদ কেহ পূজে একমনে।
হরির কিঙ্কর নাচে হরির কীর্ত্তনে ॥
জোয়ারে [৮০] পূর্ণিত নদজল দিল ভাঠি।
ডিঙ্গায় আজাড় বান্ধে বুন্ধে পরিপাটী ॥
সিলিদার পেলে সিলি মেঘ যেন ডাকে।
তড়বড়ি পাটনেতে চমৎকার লাগে ॥
তমলিপ্ত এড়াইল মহেশকিঙ্কর।
মগরা বাহিয়া গেল গঙ্গাসাগর ॥
সঙ্কেতমাধবপদ পূজে একমনে।
বিলম্ব করিয়া তথা বস্তুজাত কিনে ॥
জলজন্তু রহে যথা কার্ত্তিকের ঘাটে।
কৌতুকে এড়ায় বেনু নৃপতির পাটে ॥
যাহারে সন্তোষ প্রভু জয় বৃষকেতু।
কাঞ্চি বাহিয়া সাধু গেল রামসেতু ॥
শঙ্খ কাঁকড়া যোঁক কড়িয়া পাটন।
এড়াইয়া গেল সাধু সাধুর নন্দন ॥
প্রতিদিন ধূসদত্ত পূজে শূলপাণি।
সিংহল নগরে যথা নিবসে পদ্মিনী ॥
সঙ্কটে জপে সাধু শিব শিব নাম।
এড়াইয়া যায় সাধু বাবুর মোকাম ॥
জলের কল্লোল বড় খরস্রোত বহে।
জানিল ত্রিপুরা সাধু গেল মায়াদহে ॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥০॥

॥ বারাড়ি ॥

পরমান হনুমাণ সভে করি অনুমান
ভগবতী তারে দিল পান।

উরে নন্দী মহাকাল সুরগজ ক্ষেত্রপাল
মায়াদহে কৈল অধিষ্ঠান ॥
ঈষত পবন মেলে তরঙ্গে তরণী ঠেলে
ভয় নাহি বলে কর্ণধার।
ঈশানে উইল ঘন অনুকূল সমীরণ
চারি দিগে ঘোর অন্ধকার ॥
সচিন্তিত বলে সাধু নাঞি জানি কোন হেতু
কেমন দেবতা করে হট।
আচম্বিতে উইয়ে ঘন না জানি রজনী দিন
মায়াদহে জীবন সঙ্কট।
সচিন্তিত সাধুর নন্দন।
আপন করমদোষে আঘণ মাসের শেষে
মায়াদহে ঝড় বরিষণ ॥
ঘন ডাকে জলধর সুরগজ তুলে জল
কুল কুল শব্দ গগনে।
জল পড়ে ঝিমি ঝিমি ভেকের মধুর ধ্বনি
ঘন বরিষণ রাত্রি দিনে ॥
দেখ ভাই দুর্দ্দিন জীবনের কোন চিহ্ন
পড়িলাঙ যমরাজ বেড়ে।
কি বিধি লিখিল দুঃখ থর থর কাঁপে বুক
অধর যুগল কাঁপে জাড়ে ॥
বিপরীত বাত বহে ঠেকাঠেকি নায়ে নায়ে
ফিরে [৮১ক] যেন কুমারের চাক।
ধবল পাষাণ পড়ে বিপরীত জল বাড়ে
বল রে কেমনে পাব রাখ ॥
অবিরত বরিষণ হুড় হুড় গরজন
ঝনঝনা পড়ে অবিশাল।
দু কূলে দেওয়াল খসে বড় বড় গাছ ভাসে
ভাগ্যে ডিঙ্গা না যায় পাতাল ॥
কৌতুকে হনু ধায় লাফ দিয়া চাপে নায়
ঝলকে ঝলকে লয় পাণি।
আকাশে বিসম ঝড় উড়াইল ছইঘর
নিকেতনে রহিল ছিটনি ॥
নন্দী মালুয়ে চাপে মহাকাল বুলে কোপে
সাত ডিঙ্গা করে টল টল।

বলে ভাই কর্ণধার রাখিতে না পারি আর
আজি ডিঙ্গা যায় রসাতল ॥
মরি তারে নাঞি ব্যথা নাঞি গেলাঙ দেশ যথা
পুনরপি যুগল রমণী।
সুরথ পৃথিবীনাথ না দেখিল গুরুপদ
এই মনে রহিল পুড়নি ॥
আকাশে পাতালে ঢেউ চমকিয়া উঠে জিউ
ঘন ঘন বিকশে বিজুরি।
বলে সাধু ধুসদত্ত দাসে দোষ অবিরত
ক্ষেম নাথ দেব ত্রিপুরারি ॥
ঘুচিল বাদল ঝড় সাত ডিঙ্গা হইল জড়
রবির উদয় মধ্যদিনে।
রক্ষ দেবী ভগবতী রমানাথে নিরবধি
চন্দ্রশেখর সনাতনে ॥
কহে দ্বিজ কবিচন্দ্র ত্রিপুরা পরম মন্ত্র
যেই জন জপে নিরন্তর।
নৃপ দস্যু পশুগণে জলানলে রণে বনে
ত্রিভুবনে কারে নাহি ডর ॥০॥

॥ সুই রাগ ॥

কনক শ্রীফল কুচ সুবলিত দুই ভুজ
সুবর্ণ কঙ্কণ শঙ্খ আগে।
কনক কুণ্ডল দোলে শ্রবণ কপোল মূলে
মনোহর রুচি দুই ভাগে ॥
সুরঙ্গ বসন পরি হাসে গজগতি নারী
কনক কলস কক্ষতলে।
অগাধ প্রচুর জল অতিশয় নির্ম্মল
কমলিনী সুরসরোবরে ॥
কমলিনী গো মা সর্ব্বমঙ্গলা
স্বর্গ ত্যেজিয়া ত্রিনয়নী।
কৌতুকে অবতরে সাধুর নন্দন ছলে
মায়াদহে শক্তিরূপিণী ॥
জলের উপর পড়ি কেহ যায় গড়া[৮১]গড়ি
লাফ দিয়া উঠে কোন জন।

কনকরচিত পুরী প্রতি ঘরে সুন্দরী
পুরুষ না দেখি একজন ॥
কেহো মাংস কুটে বেচে শূন্য ভর করি নাচে
কেহো গজ করয়ে গরাস।
কেহো পেলে কেহো লুফে মধুকর মধু লোভে
বদনকমলে কার হাস ॥
গজ গিলে উদগরে সহজে প্রকৃতি ধরে
যুবতী যুবতী করে কোলে।
অধর পাকিম বিম্ব বদন কমলে চুম্ব
দেখি সাধু পড়ি গেল ভোলে ॥
মধুর কোকিল স্বরে গীত গায় মনোহরে
ঘাঘর নূপুর করতলে।
সুনাদ মাদল বাজে ঘরে ঘরে প্রতি নাচে
বিপরীত সকল নগরে ॥
মধুর কোকিল হাসি কুটিল কুন্তল কেশী
সিন্দূর তিলক ললাটে।
পয়োধরে উইয়ে হার কটাক্ষ মূর্চ্ছিত মার
কমলিনী নগর নিকটে ॥
দুই হাথ দিয়া কুচে বিবসন হইয়া নাচে
কজ্জল নয়নসরোজে।
দেখিয়া হৃদয় গুণে আইলাঙ কেমন ক্ষণে
হেট মাথা করে সাধু লাজে ॥
দেখ ভাইয়া কর্ণধার দেশখান কদাচার
যুবতী নগরে মাংস বেচে।
কেহ রান্ধে কেহ ভুঁজে মুকুত চিকুরে নাচে
বসন না দেই ঘটকুচে ॥
সাক্ষী সর্ব্বজন দুর্ব্বার পাটন
নরপতির চরণকমলে।
কবিচন্দ্র কহে দেবী চরণপঙ্কজ সেবি
নিবেদিব সভার ভিতরে ॥০॥

॥ পয়ার ॥

তবকী তবক ছোড়ে সিলিদার সিলি।
দুর্ব্বার পাটনে লোকে কর্ণে লাগি তালি ॥
মেঘ নাহি দেখি পুনঃ পুন গরজন।
কথিল পণ্ডিতে নৃপ বল কি কারণ ॥
শুন নৃপতি মনে না ভাব বিস্ময়।
পাটনে আইল কিবা সাধুর তনয় ॥
মন্ত্রী মেলিয়া পাঁচে সুচতুর ভাট।
ঝাট যান গিয়া সাধু কিবা পরঠাট ॥
রড় দিয়া বলে ভাট দাণ্ডাইয়া কূলে।
পরাপর কহ যদি থাকিবে কুশলে ॥
ভাটের বচনে বলে নায়ের নফর।
সুরথ নৃপতি যার বর্দ্ধমানে ঘর ॥
তাহার সাধব এই আ[৮২ক]স্যাছে পাটন।
বেচে কিনে পায় যদি শীতল বচন ॥
শুন হে বৈদেশী সাধু তোরে কহি মর্ম্ম।
দুর্ম্মুখ নৃপতি বৈসে সাক্ষতে যে ধর্ম্ম ॥
তার সম্ভাষণে পরিতোষ পাবে মনে।
সুখে বেচ কিন দ্বিজ কবিচন্দ্র ভনে ॥০॥

॥ ছন্দ ॥

পূজিয়া মহেশ মায়াদহের পুলিনে।
দোলারূঢ় হইল সাধু নৃপসম্ভাষণে ॥
সুবর্ণ পঞ্জরে শুক গজবেল খাণ্ডা।
অমূল্য রতন লয় ময়মত্ত গণ্ডা ॥
যুগল যুগল শশ গৌল কুরঙ্গ।
স্বর্ণ সারিক লয় ধুকড়িয়া কঙ্ক ॥
চক্র চকোর ঘুঘু পিক মীন রঙ্ক।
কনক চরণ পিঠে নাহি ছাড়ে সঙ্গ ॥
সাধুর হৃদয় বাড়িল বড়ই প্রমোদ।
ডাহুক গণ্ডুক লয় ঘুরল কপোত ॥
কলসে পূরিয়া ঘৃত তৈল লবণ।
মধু মিষ্ট নারিকেল সুরঙ্গ বাণ্ডন ॥
পাট ভোট নেত লয় মৃগমদ গণ্ডা।
ক্ষীরের সন্দেশ পুলি মধু কাকরণ্ডা ॥
তেলঙ্গা ছাগল খাসী মুঝার গরড়।
পঞ্চ রতন লয় ধবল চামর ॥

নানা সজ্জ লয় সাধুসুত নিরাতঙ্ক।
কনকরচিত গজদন্তের পালঙ্ক ॥
বাঙ্গালি খেলায় পত্তি করে কোলাহল।
দণ্ডি মুহরি শঙ্খ বাজে অবিরল ॥
গুড় গুড় দগড় বাজে মধুর কাঁসর।
আগে পাছে ধায় যত পাইক সকল ॥
এক বাঁক দুই বাঁক তিন বাঁক যায়।
কোথা ফুলহাট পড়ে গন্ধ বিকায় ॥
বিবাদে গারড় কেহো কুক্কুট যুঝায়।
সুখীর নন্দন কোথা পায়রা উড়ায় ॥
দোলারূঢ় কেহ গজ তুরগ রড়ায়।
নানা বাদ্য বাজে কোথা বর কন্যা যায় ॥
কোথা গীত শুনে সাধু কোথা দেখে নাট।
দেখিয়া উত্তম জনে স্তুতি করে ভাট ॥
ডাকা চুরি নাহিক কোটাল দুরাচার।
প্রজার পালন দেখি উচিত বিচার ॥
কপালে চন্দন কারো গলে রত্নমাল।
ইড়িক চাপিয়া বুলে নগর্য্যা ছাওয়াল ॥
[৮২]কেহ বেচে কেহ কিনে নাহি অবসাদ।
ছাওয়ালে ছাওয়ালে খেলে পাতিয়া বিবাদ
কেহধিক নহে কেহ নহে হীনবল।
মারামারি করে কেহ পাতিয়া কন্দল ॥
কেহ সাতাচারি খেলে কেহ বুদ্ধিবল।
কেহ পাশা খেলে কেহ খেলে চ্যুতবল ॥
কেহ গেণ্ডু খেলে কেহ কড়ি ভাঁটা টিক।
তরুণ আবালবৃদ্ধ সকল রসিক ॥
চিনিতে না পারে সাধু সুখী দুঃখী জন।
একরূপ দেখে সর্ব্ব দুর্ব্বার পাটন ॥
দুর্ম্মুখ নৃপতি বৈসে যেন বরতীত।
সুরগুরু সমান পণ্ডিত পুরোহিত ॥
সাধুর নন্দন সাধু বুঝে হিতাহিত।
রাজার সভায় গিয়া হৈল উপনীত ॥
নানা সজ্জ দিয়া সাধু রাজার চরণে।
প্রণাম করিয়া বন্দে দ্বিজ পাত্রগণে ॥

আপন আসনে বৈসে নৃপনিদেশনে।
চারি দিগে চায় সাধু প্রফুল্ল বদনে ॥
কোন জাতি উতপতি কিবা তব নাম।
কাহার নন্দন তুমি বাটী কোন গ্রাম ॥
কাহার সভায় থাক আইলে কি কারণে।
অমৃতে সেঁচিল দেহ নৃপতিবচনে ॥
গন্ধবণিক জাতি ধুসদত্ত নাম।
উৎসাকর দত্ত পিতা ঘর বর্দ্ধমান ॥
দেশের ঈশ্বর মোর নৃপতি সুরথ।
তাঁহার সভায় সর্ব্বকাল নিরাপদ ॥
ভাণ্ডারী নিবেদে নিত্য চরণে রাজার।
পরিপূর্ণ ছিল দেব রত্নের ভাণ্ডার ॥
চামর চন্দন শঙ্খ মুকুতা প্রবাল।
দিনে দিনে টুটে দ্রব্য নাহিক আপার ॥
এ বোল শুনিঞা রাজা মোরে দিল পান।
তথির কারণে মোর পাটনে পয়ান ॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥০॥

॥ যথা রাগ ॥

দেখিয়া ভেটের সজ্জ পরিতোষ মনে।
পান ফুল দিল রাজা পরদেশী জনে ॥
দুগ্ধের লড্ডুক কলা চিনির সন্দেশ।
রান্ধিয়া ভুঞ্জিতে তারে করিল আদেশ ॥
চল সাধু কর বাসা আমার নিলয়।
বেচ কিন বস্তু যে তোমার মনে লয় ॥
সকুল চিথল মহাসক্ক কবই।
রোহিত পাঠীন মীন ত্রিকণ্ট ফলই ॥
তৈল লবণ খাসি ঘৃত দুগ্ধ দধি।
রন্ধন ভোজন সজ্জ দিল নরপতি ॥
রাজার চরণে সাধু করিয়া প্রণতি।
রান্ধিয়া ভুঞ্জিল দিনে সুখে গেল রাতি ॥
পুন দরশনে দুহেঁ বসিয়া [৮৩ক] সভায়।
রাজা সাধু বড় প্রীত বাঢ়িল কথায় ॥

সুরথ পৃথিবীনাথ বর্দ্ধমানে ঘর।
দুর্ব্বার পাটনে আমি বসুমতীশ্বর॥
উভয় দেশের মধ্যে ভাল মন্দ কি।
কবিচন্দ্র কহে নৃপ বড় পুণ্যে জী॥

রায়
কি কহিব আর　　দেশ কদাচার
　　যথি তুমি অধিকারী।
গজ গিলে নারী　　বলিতে না পারি
　　কিবা রাক্ষসের পুরী॥
মোর অভিমত　　থাকি তব পদ
　　কমলে করিয়া সেবা।
শুনিল শ্রবণে　　দেখিল নয়ানে
　　যেন পুরন্দরসভা॥
মায়াদহ জলে　　কাঞ্চন নগরে
　　কহি শুন নৃপমণি।
জন্ম সীমন্তিনী　　আকৃতি পদ্মিনী
　　প্রকৃতি শক্তিরূপিণী॥
আছে নরমণি　　পূর্ব্বে নাহি জানি
　　যে কালে না ছিল জল।
দহের উপর　　পেলিলে পাথর
　　কত দিনে যায়ে তল॥
কনকের ঘর　　বিচিত্র নগর
　　তাথ কি পদ্মিনী জাতি।
সাধুর নন্দন　　তুমি অচেতন
　　স্বপন দেখিলে রাতি॥
হই প্রণিপাত　　কহি নরনাথ
　　এ বোল অসত্য নহে।
নগর পদ্মিনী　　গজ গিলে জানি
　　দেখাইব মায়াদহে॥
মাংস কুটে বেচে　　শূন্যে ভরে নাচে
　　দেখিলে লাগিব ডর।
এ বার বৎসরে　　বন্দী কারাগারে
　　যদি মিথ্যা কহুত্তর॥
সাধুর ভারতী　　শুনিঞা নৃপতি
　　সাক্ষী করে জনে জনে।
যদি সত্য হয়　　রাজ্য দিব তোয়
　　বসাইব সিংহাসনে॥
মিশ্র বিকর্ত্তন　　সন্তবকারণ
　　তুষ্ট যারে ত্রিনয়নী।
হারাবতীসুত　　মুকুন্দ অদ্ভুত
　　রচিল মঙ্গলবাণী॥০॥

॥ পঠমঞ্জরী ॥

নৃপ কোপে লাফ দিয়া উঠে　চাপিয়া হাতী পিঠে
　　সাধু সনে করিয়া বিবাদ।
খাঁটিল ধবল ছত্র　　আগে পিছে পাত্র মিত্র
　　ঘন সিঙ্গা বরঙ্গো নিনাদ॥
রাউত মাহুত পতি　　জিন করে ঘোড়া হাতী
　　পবন জিনিঞা যার গতি।
গায় দিয়া আঙ্গরেখি　　কেবল নয়ন দেখি
　　মাথার টাটুনি নানা ভাঁতি॥
বীর সাজিল রে দুর্ব্বার পাটনেশ্বর
　　মায়াদহে দেখিতে পদ্মিনী।
সাধু অসম্ভব্য [৮৩] কহে　গজ গিলে মায়াদহে
　　কনকনগরে সীমন্তিনী॥ধ্রু॥
গুড় গুড় দগড় বাজে　　পাইক সকল নাচে
　　কোন জন গোঁফে দেই তোলা।
কেহ ধরে ধনু সর　　লেঙ্গা খাণ্ডা করতল
　　কাহার গলায় রত্নমালা॥
চন্দন তিলক ভালে　　নৃপতিনন্দন চলে
　　কুমতি তাহার জ্যেষ্ঠ ভাই।
রণরঙ্গি হাথে টাঙ্গি　　শেল শক্তি শূল সাঙ্গি
　　পাইক সকলে ধাওয়াধাই॥
কেহ পেলে খাণ্ডা লোফে　মাথায় মুকুট শোভে
　　কোন জন বহেত তরোয়ারি।
হাঁণ্ডিয়া চামর ঢাল　　হাথে করি বাঙ্গাল
　　রড় দেই সমরবেহারী॥

ঘন পড়ে দাবাসিলি ঢাকিল কিরণমালি
তৃতীয় ভুবন কাঁপে ভয়।
চলিল রাজার ঠাট চল্লিশ দিনের বাট
আগে পাছে গণন না হয়॥
রত্নমন্দির নায় রাজার কামিনী যায়
সঙ্গে লৈয়া যত পুরীজন।
সধবা বিধবা নারী প্রতি নায়ে সারি সারি
আগে পাছে করিল গমন॥
দণ্ডি মুহরি বাজে শঙ্খ ফুকরি নাচে
দড়মসা বাজে ঢাক ঢোল।
মৃদঙ্গ বাজায় নটী তোলপাড় করে মাটি
রাওয়ারাই হইল গণ্ডগোল॥
কতোয়াল দুরাচার খর খাণ্ডা বহে ঢাল
লাফ দেই নৃপ সন্নিধানে।
তার ভাই মহারূঢ় ময়গল গজারূঢ়
অধিকার যার রাত্রি দিনে॥
ধাইল তাহার দল ভেরি বাজে অবিরল
কাহাল মধুর যন্ত্র বেণি।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে উপনীত মায়াদেহে
কোথা গজ নগরপদ্মিনী॥০॥

॥ কেদার ॥

গোসাঞি
তোমার পয়ান শুনি পালাইল পদ্মিনী
নগর লুকাইল মায়াদহে।
দেবতাসুরের জায়া আছিল পাতিয়া মায়া
আমার বচন মিথ্যা নহে॥
অবনীনাথ নিবেদিল তোমার চরণে।
দেখিল আপন আঁখি হয় নয় আছে সাক্ষী
নিবেদিয়া বুঝ তার স্থানে॥
তুমি রাজা পুণ্যবান ভাল মন্দ আছে জ্ঞান
পরাজয় না ভাবিহ মনে।
ঠাকুরে সেবকে বাদ অতি অনুচিত নাদ
অক্রোধ নহ কি কারণে॥

[৮৪ক]
কে তোমার আছে সাক্ষী সম্প্রতি আনহ দেখি
বলুক আমার সন্নিধানে।
যদি সে দেখিয়া থাকে অর্দ্ধরাজ্য দিব তাকে
আর বসাইব সিংহাসনে॥
শুনহ পৃথিবীপাল যশোমন্ত কর্ণধার
সাক্ষী আমার এই ভাই।
শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে চণ্ডী সুপ্রসন্ন জনে
সকল ভুবনে পরাজয়ি॥০॥

নাবিক ভাই যথোচিত বলহ সভায়।
তোমার বচন শুনি দুই জনে হারি জিনি
ছোট বড় নাহিক ইহায়॥
অনায়াসে পুণ্য পাপ অর্জ্জনে নরক লাভ
উভয় দেখিয়া সত্যবাণী।
কনকনগরে নারী মায়াদহে গিলে করি
দেখিলে কি না দেখিলে তুমি॥
মায়াদহ হেমপুরে যুবতী কুঞ্জর গিলে
সাধু বলে হইয় তুমি সাক্ষী।
গন্ধবণিক জাতি কহে শুদ্ধ ভারতী
আপন নয়ানে নাহি দেখি॥
সাক্ষীর বচন শুনি আদেশিল নৃপমণি
সাধুকে করহ নিঞা বন্দী।
কবিচন্দ্র কহে শুন ডিঙ্গ লুটে যত জন
নৃপতি চাপিয়া গেল দন্তী॥০॥

॥ ছন্দ ॥

ধর ধর বলে ঘন ঘন সিঙ্গা পড়ে।
ডিঙ্গার উপর কেহ লাফ দিয়া চড়ে॥
নায়ের গাবর যত নাহিক প্রতিভা।
ডিঙ্গা হইতে পেলে কারে দিয়া টুটি চিপা॥
আই বাপু রাওয়ারাই হইল মহাহট্ট।
নারিকেল লুটে কেহ ধোকড়ার চট্ট॥
মার মার বলে কেহ কার ধরে চুলে।
ধবল কাপড় কার লুটিল তসরে॥

কেহ চিনি লোটে কেহ তসরের সুতা।
পিপ্পলি পিত্তল কংস লুটিল মুকুতা॥
হস্তী ঘোড়া লুটে কেহ মূল্য নাহি যার।
পঞ্চরতন লুটে রত্নের ভাণ্ডার॥
ব্যাঘ্র ভল্লুক যত আছিল বানর।
নানারূপ পক্ষগণ ছাগল কুঞ্জর॥
সুঝার গাবড় খাসী তেলঙ্গা ছাগল।
আজ্ঞা দিয়া কটোয়াল লুটিল সকল॥
নায়ের গাবর যত জল জল চাহে।
জীবনে কাতর সব বাঙ্গাল পালায়ে॥
পথে লাগ পাইয়া কেহ কারে মারে কিল।
না মার চরণে পড়োঁ হও ধর্ম্মশীল॥
সানন্দা আনন্দা গৌরীবর তিন ভাই।
আর যত বাঙ্গাল রহিল ঠাই ঠাই॥
একত্র হইয়া কান্দে পাঁচ সাত জনে।
রমানাথে রক্ষ দেবী কবিচন্দ্র ভনে॥০॥

॥ করুণাশ্রী ॥

[৮৪] কাঁদে রে বাঙ্গাল ভাই বাফই বাফই।
কুখেনে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই॥
কান্দেরে বাঙ্গাল ভাই পেলাইয়া সোনা।
হেট মাথা করি রহে কাকতলি মনা॥
আর বাঙ্গাল বলে ভাই গায় নাহি বল।
আমার জীবনধন এড় রে হিন্দল॥
আর বাঙ্গাল বলে ভাই মিথ্যা কেন দ্বন্দ্ব।
পুরুষ সাতের মুঞি হারালু কামন্দ॥
আর বাঙ্গাল বলে মুঞি হইলু অনাথ।
সর্ব্ব ধন গেল মোর হুকুতার পাত॥
আর বাঙ্গাল বলে মুঞি হইলু হুতাশ।
জীবনে কাতর মুঞি ভাঙ্গিল বাওয়াস॥
আর বাঙ্গাল বলে ভাই কহিতে বড় লাজ।
হলদিগুগুলি গেল জীয়া কোন কাজ॥
হলদি হুকুতা পাতা হিন্দল হিক্কই।
মজিল সকল ধন কেমতে কুলাই॥

আর বাঙ্গাল বলে ভাই এই সে ছিল গতি
দুর্ব্বার পাটনে মৃত্যু লিখিয়াছিল বিধি॥
যুবতী যৌবনবতী ছাড়িল কি দোষে।
আর বাঙ্গাল বলে দুঃখ পাই গ্রহদোষে॥
ইষ্টকুটুম্বগণে লাগে মায়া মো।
আর বাঙ্গাল বলে না দেখি মাগু পো॥
কপর্দ্দক হেতু পরাধীন যেই জন।
আর বাঙ্গাল বলে তার বিফল জীবন॥
কেন বা আইলু মুঞি খাইয়া আপনা।
বিপাকে মজিল মোর হিঙ্গের মনা॥
অবুধ সাধব নাহি বুঝে হিতাহিত।
রাজার সভার কেনি কহে বিপরীত॥
আর বাঙ্গাল বলে যে জন নাহি বুঝে।
ক্ষিতিতলে মরণ প্রকৃতি নাহি ঘুচে॥
বাঙ্গালের বচনে সাধুর দ্রবে মন।
সজল নয়ানে বলে বিনয় বচন॥
সাত ডিঙ্গা লুটিয়া পাইল নানা ধন।
ঢাক ঢোল বরোঙ্গেতে ঘাই ঘনে ঘন॥
ময়গল শ্রুপ শ্রবণে নিশাপতি।
খগরাজ তুরগ রাহুত সেনাপতি॥
মহাহট্ট পদাতি সারথি মহারথী।
রাজার আজ্ঞায় বন্দী করিল বিরোধী॥
না মার সেবক জনে প্রহরাষ্টপতি।
শ্রীযুক্ত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী॥০॥

॥ ছন্দ ॥

সাত ডিঙ্গা লুটিয়া পাইল নানা ধন।
ঢাক ঢোল বরোঙ্গ তৈঘাই ঘনে ঘন॥
ময়গল শ্রুপ শ্রবণে নিশাপতি।
খগরাজ তুরগ রাউত সেনাপতি॥
মহাহট্ট পদাতি [৮৫ক] সারথি মহারথী।
রাজার আদেশে চলে বান্ধিতে বিরোধী॥
পরদেশী সাধুর কাঁকাল্যে দিল ডোর।
উপনীত কারাগারে বন্দী যেন চোর॥

বিবিধ বন্ধনে বান্ধে সাধুর কুমারে।
বন্দী করি কারাগারে থুইল সদাগরে ॥
সদাগর বন্দী হইয়া চিন্তিল শঙ্করে।
সেবকবৎসলা জয়া জানিল অন্তরে ॥
কৈলাস ত্যেজিয়া হইল দেবীর গমন।
কারাগারে গিয়া চণ্ডী দিল দরশন ॥
ত্রিপুরা কথিল সাধু বন্দী কি কারণে।
আমি বন্দী কৈল ইবে রাখে কোন জনে ॥
ভক্তি করি পূজ বেটা আমার চরণ।
কালি হইব তোহর বন্ধন বিমোচন ॥
ধুসদত্ত বলে মোর যদি যায় প্রাণ।
মহাদেব বিনু দেব না পূজিব আন ॥
এ বোল শুনিঞা রুষিল মহামায়।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরা সহায় ॥০॥

॥ গৌরী ॥

লোক পাতক না ভাজি হরে।
আপন করমফলে চিত্ত তহুঁ চলে
বাধক নাহি কি অরে ॥
বিষ করে পান বলদে প্রয়াণ
হাড়মালা ভস্ম দেহে।
মহেশ দিগম্বর সর্ব্বভূতেশ্বর
সে কেন চাঁদকে বহে ॥
দেব পিতামহ বাহন হংসারোহ
কর্দ্দম চড়ই নীরে।
পঙ্কজে মূলই নিরন্তর খোসই
অমৃত না খায় ঘরে ॥
কৃষ্ণের বাহন ভুজঙ্গ ভূষণ
এ সব লোকেতে গায়।
মহেশবাহন করে হলাসন
বান্ধিলে কো নাহি পায় ॥
কুঞ্জরবদন মুষিকবাহন
ত্রিলোক যাহারে বন্দে।

শ্রীযুত মুকুন্দ রচিল প্রবন্ধ
ত্রিপুরা হরবধূপদে ॥
॥ সোমবারের দিবাপালা সমাপ্ত ॥

॥ জাগরণ পালারম্ভ ॥

॥ ছন্দ ॥

সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং সর্ব্বলোকভয়াপহাং।
ব্রহ্মেন্দ্রবিষ্ণুনমিতাং প্রণমামি সদাশিবাম্ ॥১
প্রচণ্ডে পুত্রদে নিত্যং সুপ্রীতে সুরনায়িকে।
কুলদ্যোতকরে চোগ্রে জয়ং দেহি নমোঽস্তু তে ॥২
আয়ুর্দ্দেহি সদাকালী পুত্রান্ দেহি সদাশিবা।
ধনং দেহি মহামায়া নারসিংহী যশো মম ॥৩
॥ শ্রীশ্রীদুর্গাচরণ সত্য ॥

॥ ছন্দ ॥

পাটনে রহিল বন্দী ধুসদত্ত তথা।
এমন সময় শুন রুক্মিণীর কথা ॥
ছয় মাস গেল সাত মাস পরবেশে।
নানা সাধ খায় রামা দিবসে দিবসে ॥
গৌরী পূজে নানা দ্রব্যে তথি দিয়া ঘৃত।
অষ্ট মাস গেল রামা খায় পঞ্চামৃত ॥
সুখ দুঃখ যত সব কর্ম্ম অধীন।
দশ মাস গেল পূর্ণধিক দশ দিন ॥
আচম্বিতে জনমিল তার পেটে ব্যথা।
আই বাপু করি চিন্তে হিমালয়সুতা ॥
ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুব্ধ মতি।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥০॥

॥ করুণা ॥

না জিব পরাণে দিদি গলে দিব কাতি।
জঠরে বেদনা বাঢ়ে না পাই স্বস্তি ॥
আই আই কাঁকালি ভাঙ্গে চলিতে না পারি।
কি আছে কপালে দুঃখ তেঞি নাই মরি ॥

পিপাসা বাঢ়িল বড় বিরূপ রচনা।
দুয়োরে বসিল যম নিবেদিল তোমা ॥
বদনে সঘন হাই গায় নাহি বল।
উঠিয়া দাণ্ডাইতে নারি করি টলটল ॥
তুমি যে সারথি মোর শুন সত্যবতী।
মরিলে তোমার কোলে নহিব দুর্গতি ॥
দাসীর বধেতে চণ্ডী ভয় নাহি তোরে।
বর দিয়া বিসরিলে রুক্মিণী চেটীরে ॥
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুরস বাণী।
আসনে টলিল হিমাচলের নন্দিনী ॥৩॥

॥ পয়ার ॥

ধেয়ানে জানিল স্মরহরসহচরী।
প্রসব বেদনা খায় রুক্মিণী সুন্দরী ॥
যোগিনীর বেশে চণ্ডী উরিলা আপুনি।
সাধুর দুয়ারে গিয়া ডাকে উচ্চবাণী ॥
ছয় মাস ঝিয়ে নাঞি খাই অন্ন পানি।
চক্ষে নাহি দেখি উচ্চ রায় কর্ণে শুনি ॥
রুক্মিণীরে বল ঝাট আনি দেওক ভিক্ষা ॥
ধর্ম্মে মন দিয়া মোর প্রাণ করা রক্ষা ॥
উপনীত হইল পানী জলঘটকক্ষা।
ক্ষেণেক বিলম্ব কর আনি দিব ভিক্ষা ॥
এড়িয়া কক্ষের কুম্ভ রন্ধনমন্দিরে।
মনে যুক্তি করে কি কি দিব যুগিনীরে ॥
তৈল লবণ [৮৬ক] ঘৃত আতপ তণ্ডুল।
দিয়া নিবেদিল মাতা হও প্রতিকূল ॥
ভক্ষদ্রব্য পাইয়া চণ্ডী পুলকিত বপু।
জিজ্ঞাসিল মন্দিরে কে করে আই বাপু ॥
যোগিনীর বোলে পানী মনে ভাবে ব্যথা।
কেমতে জানিল যুগী বুড়ী এই কথা ॥
ডাকিনী রাক্ষসী কিবা বলে ঘরে ঘরে।
কথিলে কি না কথিলে কোন ফল ধরে ॥
রুক্মিণী সাধুর নারী গর্ভ্ভ দশ মাস।
প্রসববেদনা তার করিল প্রকাশ ॥

মন্দির ভিতর শুনি ইহা লাগি রোল।
প্রসব করাব আমি কোন ছার বোল ॥
কাল ভাণ্ড করি আন আলগছে পানি।
গুরুর প্রসাদে আমি সিদ্ধমন্ত্র জানি ॥
আমার মন্ত্রিত জল যায় যার পেটে।
তৎকাল প্রসবে পুত্র ফুল পড়ে হেটে।
এ বোল শুনিঞা হেঠ মাথা করে পানী।
রড় দিয়া কহে যথা নিবসে রুক্মিণী ॥
এক যোগী বুড়ী তোর জিজ্ঞাসিল বাত।
না জানি কি শুভাশুভ কোন পরমাদ ॥
শুনিঞা পানীর মুখে কথিল রুক্মিণী।
ঝাট আন গিয়া তুমি যুগীর নন্দিনী ॥
রুক্মিণী বেদনা খায় দেই হামাকুড়ি।
রুক্মিণী বলয়ে পানী যাহ রড়ারড়ি ॥
পুনরপি গেল যথা নিবসে যোগিনী।
যোগিনীর পদে তবে বলে চেটী পানী ॥
গড় করি চল ঝাট শুন যোগীঝি।
তোমারে দেখিলে রুক্মিণী বলে জী ॥
পানীর বচনে গেলা বিশাললোচনী।
কাকুতি করিয়া পায় ধরেত রুক্মিণী ॥
জিউ যায় প্রাণ রাখ শুন ঠাকুরাণী।
কাল ভাণ্ড আলগছে ঝাট আন পানি।
নয়গাছি দুর্ব্বা আন তুলসীর দল।
প্রসাবিবে এখন মন্ত্রিয়া দিলে জল ॥
তৎকাল আনিল সব পানী সুশিক্ষিতা।
মন্ত্রিত উদক দিল যোগীর দুহিতা ॥
শুন ঝিয়ে পিয় পানি চিন্তা নাহি মনে।
সুলক্ষণ পুত্র প্রসবিবে এইক্ষণে ॥
যোগিনী[৮৬]মন্ত্রিত জল অচেতনে পিয়ে।
ঘুচিল সকল দুঃখ বল হৈল দেহে ॥
উপজিলা ধর্ম্ম শুন দেখিয়া যোগিনী।
সুখে প্রসবিল পুত্র সুমুখী রুক্মিণী ॥
রড় দিয়া পানী গিয়া আনিলেক ধাই।
জয় দিয়া নাভিচ্ছেদ করিল তথাই ॥

কোলে পুত্র দিয়া চণ্ডী গেল স্বর্গপুরী।
আনন্দে থাকিল ঘরে রুক্মিণী সুন্দরী॥
আড়াইহানা বেলা আনে আর পাঁচ গেড়ি।
অগ্নি জালিয়া কোলে সাজিল আঁতুড়ি॥
এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় যায়।
জাগরণ করে নিশি ষষ্ঠীপূজায়॥
আসিয়া লেখিল বিধি ললাটে আপুনি।
নৃপ শাস্ত্র সানে তোর টলিব কঠিনি॥
গুরু তোরে কথিবেক অকথ্য কথন।
বহিত্র সাজিয়া যাবে দুর্ব্বার পাটন।
মায়াদহে গজ গিলে যুবতী নগরে।
দেখিয়া কথিবে গিয়া নৃপতিগোচরে॥
দক্ষিণ মশানে রাজা তোরে দিব বলি।
স্বর্গ ত্যেজিয়া তোরে রক্ষিব বাশুলী॥
নিশ্চয় লিখিল আমি ইথে নাহি আন।
দুর্ম্মুখ নৃপতি তোরে দিব কন্যাদান॥
ডালে ডাকে কোকিলী সুগন্ধি বহে বায়ু।
শতেক বৎসর বিধি লিখিলেক আয়ু॥
লিখিয়া চলিল বিধি আপনার ঠাঞি।
আটক নষ্ট ডাইয়া কৈল সাত দিন বই॥
জগতবিখ্যাত যার যেই কুলাচার।
নব দিনে করিলেক নব নত্তা তার॥
দিবস গণিতে গেল বিংশতি দিন।
ষষ্ঠী পূজিতে আইয় ডাকে সাত তিন॥
বাথর দ্বীপের লোক হইয়া হরষিত।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরার গীত॥০॥

॥ মঙ্গল রাগ ॥

ষষ্ঠী পূজিতে চলিল রুক্মিণী
আপন কোলে পুত্রখানি।
যতেক আইয় মেলি দেই হুলাহুলি
মৃদঙ্গ বাজে শঙ্খ বেণি॥
অমূল্য আৎসাদন অনেক আভরণ
রুক্মিণী মৃগ সুগামিনী।
সঘনে জয় জয় উল্লাস হৃদয়
আগে পিছে নিতম্বিনী॥
যুগল বাজে সিঙ্গা ধাইল রণচিঙ্গা
ছাওয়াল কত নাহি জানি।
তৈল সিন্দুর হরিদ্রা প্রচুর
কুঙ্কুম মলয় গন্ধখানি॥
ত্রিসর জালিখানি পাতিলি কাল জিনি
[৮৭ক] ধবল পাট ভোটবাস।
সুরঙ্গ শুয়াঠুটী পরিল তাত কাঁঠি
যাহার সেই অভিলাষ॥
ধবল কাল শত ছাগল যূথে যূথ
প্রবীণ মহিষ মেষে।
খড়্গ হাথে করি ধাইল খাণ্ডারী
নগরে যত জন বৈসে॥
কদলি কান্দি কান্দি সন্দেশ নানা ভাঁতি
দুগ্ধে মিশাইয়া চিনি।
সুগন্ধি তণ্ডুল বাওন নারিকেল
হরিষে বটনিবাসিনী॥
কলসে দ্রব্য ভরি চলিল কথো ভারী
ধাইল হাথে অপঝারি।
ব্রাহ্মণ যায় আগে ত্রিবিধি বেদ মুখে
কাঁসর বাজে শঙ্খ ভেরি॥
সুগন্ধি ফুলঝারা বিংশতি এক বারা
বটতলে হুলাহুলি॥
ষড়ঙ্গ ধূপ দীপ নৈবেদ্য নানারূপ
মোদক খই ক্ষীরপুলি॥
কর্প্পূর তাম্বূল মধুর শ্রীফল
লবঙ্গ নানা জাতি ফল।
ব্রাহ্মণ পড়ে স্তব সর্ব্বাদি পূজে দেব
পঞ্চোপচারে লম্বোদর॥
ষষ্ঠীর দুই পদ পূজিয়া বিধিমত
কল্যাণ করে দ্বিজ শেষে।
ত্রিপুরাপদস্থল কমল মধুকর
মুকুন্দ কবিচন্দ্র ভাষে॥০॥

॥ ছন্দ ॥

বিলায় সাধুর নারী সরস সিন্দুর।
পতি পত্নী যুবতী ললাটে উয়ে সুর ॥
মস্তক উপরে দেই তৈল পলা পলা ॥
গুয়া পান দেই একে একে খই কলা ॥
ক্ষীরপুলি দেই রামা করিয়া বিশেষ।
দধি মধু নারিকেল চিনির সন্দেশ ॥
ইক্ষু শসা দেই কারে পনসের ফল।
চিপট মুড়কি আর বাগুন নারিকল ॥
সজ্জ বিলাইয়া রামা উল্লসিত বুক।
বাদ্য নাটে উল্লসিত যত কৃতভুক ॥
ব্রাহ্মণে গুবাক দেই কর্পূর পান।
পরিহার মাগিলেক করিতে কল্যাণ ॥
আনন্দে যুবতীগণের গায় বাঢ়ে বল।
আপনা আপুনি পাতে হরিষ কন্দল ॥
পরিহাস করে কেহ নাহি করে হেলা।
হরিদ্রা কুঙ্কুম চুনে কেহ পাতে খেলা ॥
আতাঙ্গলি দিয়া ঢাকে বদনকমল।
গালে হাথ দিয়া কেহ হাসে খল খল ॥
মাসাস পিসাস দেখ ননদ জাগর্ত্তি।
কোন লাজে যাব ঘর কুৎসিত [৮৭] মূর্ত্তি।
মাথায় কাপড় নাহি কুচ নাহি ঢাকে।
ছি ছি বলিয়া হাসে লাজ নাহি মুখে ॥
গুড় গুড় দগড় বাজে মাদল কাঁসর।
যুবতীর আনন্দে ছাওয়াল দেই রড় ॥
সজ্জ বিলাইয়া রামা অবশেষ বেলা।
ছাওয়ালে ছাওয়ালে কাড়াকাড়ি খই কলা
বিলাইল সজ্জ যত মঙ্গল বাধাই।
বিদাই করিল সভে বটতরু ঠাই ॥
ষষ্ঠী পূজিয়া গেল যার যথা ঘর।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাকিঙ্কর ॥০॥

এক দুই তিন চারি গেল পঞ্চ মাসে।
পুরোহিত আনি নাম গুণদত্ত ভাষে ॥
পাঁচ মাস গেল ছয় মাস পরবেশে।
অন্নপ্রাশন করাইল সুদিবসে ॥
বাপের মন্দিরে শোভে সুন্দর সুবালা।
দিনে দিনে বাঢ়ে যেন শশী ষোলকলা ॥
সাত অষ্ট মাস যায় হয় অন্নরুচি।
নয় মাস পরবেশে দেই আলগছি ॥
দশ একাদশ মাস বার পরবেশে।
পূর্ণিত মাসেতে বৎসর হইল শেষে ॥
সরল খেলানি করে প্রথম বয়েসে।
গণিতে বৎসর তার পঞ্চ পরবেশে ॥
ব্রাহ্মণ আনিঞা শুভক্ষণ সুদিবসে।
কর্ণবেধ করাইল মনের হরিষে ॥
গণক আনিঞা কৈল পঢ়াবার দিন ॥
গুণবন্ত গুণদত্ত মতি যে প্রবীণ ॥
ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুব্ধ মতি।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥০॥

॥ বারাড়ি ॥

পাঠাইয়া মনুষ্য আনাইয়া নিজ ঘরে।
সমর্পিল তনয় পণ্ডিত গৌরীবরে ॥
নানা রত্ন সুগন্ধি চন্দন গন্ধ ফুল।
যুগল বসন দিল কর্পূর তাম্বূল ॥
বসিতে কহিতে যেন জানে রাজস্থানে।
নিবেদি তোমার পায় পঢ়াবে যতনে ॥
গুরুপদ পূজিয়া পূজিল গণেশ্বর।
ঈশ্বরী পূজিয়া বিদ্যারম্ভে সদাগর ॥
ককারাদি চতুস্ত্রিংশ পড়িলেক স্বর।
অকারাদি পঢ়িল বান্যা সংযোগ অক্ষর ॥
গুরুর নিকটে সাধু পায় পরিতোষ।
ব্যাকরণ পঢ়িল দিনে দিনে কাব্য কোষ
নানা শাস্ত্র পড়ে সাধু মতি যে প্রবল।
নাটক নাটিকা ছন্দ পঢ়িল পিঙ্গল ॥
সাহিত্যদর্পণ কাব্যপরকাশ ধ্বনি।
মহিমা বামন দণ্ডী পঢ়ে ফরমানি ॥

[৮৮ক] সুরত সঙ্গীত শাস্ত্র পড়িল যতনে
শুনিয়া যতেক লোক উৎসা হয় মনে ॥
বিষম পড়িয়া পদ প্রতিদিন সাধে।
কঠিনি টলিল গুরু তুলি দেহ হাথে ॥
এ বোল শুনিঞা গুরু প্রকাশিত তুণ্ড।
কি বলিস তুঞি মোরে ওরে বেটা ভণ্ড ॥
গুরুর বচনে সাধু মাথা করে হেট।
লাজে কিছু নাহি বলে ক্রোধে ফুলে পেট
রচিল মুকুন্দ গুরুর চরণ বন্দিয়া।
শুতিল মন্দিরে গিয়া কপাট চানিয়া ॥০॥

॥ করুণা ॥

শুতিয়া মন্দিরে ভাবে সাধুর কুমারে।
কেন বা বলিল গুরু জারজ আমারে ॥
জনক না দেখি আমি আপন নয়ানে।
কেনি বা জননী আছে সধবা লক্ষণে ॥
যুগল জননী সদা আমিষ্য ভোজন।
সুরঙ্গ বসন পরে তাম্বূল ভক্ষণ ॥
ললাটে সিন্দূর পরে নয়নে কজ্জল।
দুই হাথে সরল শঙ্খ নবীন উজ্জ্বল ॥
কিছু নাহি দেখি আমি বিধবা লক্ষণ।
এতেক দেখিয়া গুরু বলে কুবচন ॥
এ সব ভাবয়ে মনে সাধুর নন্দনে।
চিন্তা উপজিল ওথা রুক্মিণীর মনে ॥
প্রভাতে গিয়াছে পুত্র পড়িবার তরে।
এ দুই প্রহরে পুত্র নাহি আইল ঘরে ॥
পুত্রে চাহিবারে হৈল রামার গমন।
কবিচন্দ্র বলে দুর্গা হও সুপ্রসন্ন ॥০॥

॥ করুণা ॥

অরণ্য প্রান্তরে চাহিলু ঘরে ঘরে
আর গুরু সন্নিধানে।
পর্ব্বত নিঝোরে চাহিলু সরোবরে
না দেখি শুনি আঁখি কানে ॥
ক্ষুধাতৃষাকুল না খাও অন্ন জল
মারিল কে করিলেক দ্বন্দ্ব।
না জানি কোন পাপ কে দিল অভিশাপ
ভুবনে নাহি করি মন্দ ॥
হরি হরি হরি কান্দে রে সত্যবতী
রুক্মিণী উচ্চস্বরে ডাকে।
আরে গুণদত্ত কোথা গেলি পুত্র
সঘনে ভুজ মারে বুকে ॥ধ্রু॥
আকুল সরসিজ নয়ানে নাহি লাজ
বসন নাহি দেই কুচে।
সমুখে যারে দেখে জিজ্ঞাসা করে তাকে
ভ্রমিঞা বুলে প্রতি নাছে ॥
আসিয়া নিজ ঘর ভোজন না কর
কে গালি দিল সমাঝে।
কা সনে কৈলে কেলি কে তোরে দিল গালি
ঘর না আইস কেন লাজে ॥
আকাশে হৈল বাণী [৮৮]শুন লো সীমন্তিনি
বিষাদ না ভাবিহ মনে।
নিবসে পুত্র তোর চিন্তিত বহুতর
শয়ন সুখনিকেতনে ॥
শুনিঞা গুণবতী ধাইল গজগতি
দেখি গিয়া নিজ সুতে।
শ্রীযুত মুকুন্দ রচিল প্রবন্ধ
ত্রিপুরা হরবধূপদে ॥০॥

॥ সুই রাগ ॥

বাছা কা সনে কৈলে দ্বন্দ্ব কে তোরে বৈল মন্দ
কি কারণে রহিয়াছ শুতিয়া।
তোর বাপ হাথে হাথে সুরথ পৃথিবীনাথে
পুরীজন গেল সমর্পিয়া ॥
কহি শুন রতিপতি ভগবতীপদ গতি
আমি তোর জনমধারিণী।
নৃপপদশতদল নিবেদিয়া কর ফল
যেবা তোরে কথিল কুবাণী ॥

চল ঝাঁট নরপতি যথা।
আপনারে বল রাখে   তোমা সনে বাহু জোঁখে
কে ধরে কন্দরে দুই মাথা॥
মাতা লিখিতে টলিল খড়ি   ওঝার চরণে পড়ি
নিবেদিল তুলি দেহ হাথে।
এ বোল শুনিঞা কোপে   গুরু থর থর কাঁপে
ক্ষণেক রহিলা হেট মাথে॥
ঘরে ঘরে স্থনগরে   জিজ্ঞাস আমার বোলে
তোমার জননী পতিব্রতা।
বলে গৌরীবর শুদ্ধি   ওরে বেটা অসজ্জাতি
জানিস কে তোর জন্মদাতা॥
তুমি মাতা কহ কথা   কোথা সে আমার পিতা
উদ্দেশ করিব স্থনিশ্চয়।
যদি না কথিবে সত্য   গুণদত্ত তোর বধ্য
কথিল তোমায় সবিনয়॥
স্থরথ স্থরথ রাজা   ভাল জানে যত প্রজা
তোর বাপ দুর্ব্বার পাটনে।
তোর বাপ হয় জ্যেষ্ঠ   গৌরীবর হয় ছোট
উপহাস্য কবিচন্দ্র ভনে॥০॥

॥ শ্রী রাগ ॥

উপহাস নহে শুন জনমধারিণী।
সভায় পণ্ডিত মোরে কথিল কুবাণী॥
চলিব পাটনে আমি ইথে নাহি আন।
চরণে ধরিয়া বলি দেহ সম্বিধান॥
হৃদয় সন্তোষ নাহি কর মোরে ক্ষমা।
জনপদ ঘুচুক মোর রহুক মহিমা॥
শিশুবুদ্ধি শুন রে বালক গুণদত্ত।
না যাব পাটনে বড় জল দুর্গপথ॥
মাতা লংহিলে পরম দোষ তব বাক্য বেদ।
আমার হৃদয় জাগে না কর নিষেধ॥
বাছা বহিত্র গড়াহ আগে চলিহ পাটনে।
বিদায় করহ গিয়া নৃপতিচরণে॥
পরম সন্তোষ [৮৯ক] পাইল মায়ের বচনে।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ ত্রিপুরাপদে ভনে॥০॥

॥ পয়ার ॥

কনক চাঙ্গড়া পরিজন দিয়া কাছে।
রাত্রি দিবা ভ্রমায়ে যে নগরের মাঝে॥
যে জানে গঠিতে ডিঙ্গা ধরিয়া তাহারে।
আনিবে আমার ঠাঞি আদেশিল তোরে।
জানিল ত্রিপুরা সাধু চলিব পাটনে।
বাপের উদ্দেশে ডিঙ্গা নাহিক গঠনে॥
আনন্দিত নগরে সাধুর পুরীজন।
কে জানে গঠিতে ডিঙ্গা ডাকে ঘনে ঘন॥
বিশ্বকর্ম্মে বলে মাতা হাথে দিয়া পান।
সাত ডিঙ্গা গঠ গিয়া সঙ্গে হনুমান॥
এক চক্ষু নাহি এক চরণ ডাগর।
স্থবর্ণ চাঙ্গড়া ধরে নগর ভিতর॥
সকল বিরূপ দেখি যত জন হাসে।
উপনীত করিল সাধব যথা বৈসে॥
শরীর দুর্ব্বল বড় অন্ন নাহি পেটে।
সত্বরে চলিতে নারে কোথা পড়ে উঠে॥
আমি ডিঙ্গা গঠিব ধরিল হেম ডালি।
কবিচন্দ্র কহে গেল সাধু বরাবরি॥০॥

শুন কারিকর ভাই তুমি গুণবান।
কেমতে গঠিবে ডিঙ্গা বল সন্নিধান॥
দক্ষিণ চরণে গোদ বাম চক্ষু কাণ।
নড়ির ঠেকনি বিনে না কর পয়ান॥
অন্ন বিহনে দেহ নহে বলবান।
ধনলোভে মন মজে বুঝিল গেয়ান॥
সাধুর বচনে দুই কারিকর কোপে।
শত হাত কাষ্ঠ পেলি লাফ দিয়া লোফে॥
দেখহ সাধুর স্থত গুণ নহে বুড়া।
দুইখান করে কাষ্ঠ দিয়া পাকমোড়া॥
ষষ্ঠী দ্বিগুণ হাত মধুকর নাম।
ভূমিতে পাতিলে রেখা করিয়া সন্ধান॥
একে একে দশ দশ হাত কৈল উন।
সাত ডিঙ্গা গঠিব না হব সাত দিন॥

সমুদ্রে বিষম ঢেউ বহে দহে দহে।
গতাগতি লোক পাটনের কথা কহে ॥
ঝঞ্ঝা পবনে নাঞি ভাঙ্গি যেন রহে।
হেন ডিঙ্গা গঠিবে বিলম্ব নাহি সহে ॥
বিশ্বকর্ম্মা হনুমান সাধু বোলে বলে।
সুকাষ্ঠ আনিঞা দেহ দেবনদকূলে ॥
আমার বচন মিথ্যা নহে কোন কালে।
সাত ডিঙ্গা দেখিবে সাত দিন বই [৮৯] জলে॥
এ বোল শুনিয়া দুই জনে দিল পান।
প্রসাদ বসন দিয়া করিল সম্মান ॥
গঠিলে সকল ডিঙ্গা দিব রত্ন কড়ি।
তাড় বলয়া দিব আর নেত ধটী ॥
দিব্য বস্ত্র বিংশতি এক শত হাত।
ক্রমে দশ দশ ন্যূন পাতে কাষ্ঠ সাত ॥
উভে ষষ্ঠী গজ ক্রমে পাঁচ পাঁচ ন্যূন।
যেখানে যে লাগে ডিঙ্গা গঠে দুই জন ॥
সাত ডিঙ্গা গঠিল দুই জনে রাত্রি দিনে।
উজ্জ্বল করিল চক্ষু রজত কাঞ্চনে ॥
কারিকর স্বর্গ গেল ডিঙ্গা ভাসে জলে।
কবিচন্দ্র কহে লোক দেখে প্রাতঃকালে ॥০॥

॥ পয়ার ॥

ডিঙ্গা সজ্জ হইল সাধু লোকমুখে শুনে।
কারিকর নহে নর ভাবে মনে মনে।
আমার মায়েরে আছে ত্রিপুরার কৃপা।
হৃদয় জানিল মোর ঘুচিবেক ত্রপা ॥
একদিনে সাত ডিঙ্গা সুনীল গঠন।
পিতা পুত্রে বুঝি হব পাটনে মিলন ॥
প্রসন্ন মানস বুঝি ঘুচিল বিবাদ।
নরপতি সম্ভাষণে মিলিব প্রসাদ ॥
এতেক ভাবিয়া মনে ডাকিলেক মায়।
আসিয়া চণ্ডীর দাসী সম্মুখে দাণ্ডায় ॥
আরে পুত্র গুণদত্ত কেন ডাক মোরে।
শুন বিপরীত মাতা নিবেদি তোমারে ॥
কারিকর দুই জন অলক্ষ চরিত্র।
আসিয়া গঠিল সাত আমার বহিত্র ॥
না দেখিল বিলম্ব দিবস দুই তিন।
তুমি পুণ্যবতী চণ্ডী তোমার অধীন ॥
যত দুঃখ ছিল মোর ঘুচিল মানসে।
তথাপি পাটনে যাব বাপের উদ্দেশে ॥
ত্রিপুরার দাসী তুমি জানি বসুন্ধরা।
পাটনে চলিব আমি নায় দিয়া ভরা ॥
চল মায়ে পোয়ে দেবনদে ডিঙ্গা দেখি।
শুনিঞা পুত্রের বাক্য বলে শশিমুখী ॥
সাত ডিঙ্গা একদিনে গঠে দুইজন।
পরশি তাহার পদ করাহ মিলন ॥
মায়ের বচনে বলে সাধু সুচরিত।
না দেখিল পুন আমি ভাগ্যরহিত ॥
মায়ের চরণ বন্দে ধরি দুই হাথে।
[৯০ক]দেখিলেক সাত ডিঙ্গা গিয়া দেবনদে ॥
ডিঙ্গারে প্রণাম করে সাধুর যুবতী।
তুমি মধুকর মোর রক্ষিবে সন্ততি ॥
স্নান করিয়া দুয়ে দেবনদজলে।
মায়ে পোয়ে সন্তোষ হইল কুতূহলে ॥
ঘরে গিয়া ভুঞ্জিল সন্তোষ দুই জনে।
কর্প্পূর তাম্বূল খায় হরষিত মনে ॥
প্রভাতে চলিব সাধু নৃপ সন্নিধানে।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ ত্রিপুরাপদে ভনে ॥০॥

॥ মল্লার রাগ ॥

মায়ের চরণধূলি সাধু নিল মাথে।
বিদায় করিতে চলে নৃপতি সুরথে ॥
পদাতি প্রচুর সঙ্গে সাধু চাপে গজে।
অবিরত মধুর মুরলী কাছে বাজে ॥
ঠাঞি ঠাঞি কোলাহল ঘন সিঙ্গা পড়ে।
নানা অস্ত্র বহে পদাতিক যায় রড়ে ॥
নানা সজ্জ এড়িলেক নৃপতি নিকটে।
দণ্ডবত হইয়া সাতবার পড়ে উঠে ॥

ধুসদত্ততনয় দাণ্ডায় পুট হাথে।
আদেশিল নরনাথ জানিঞা বসিতে ॥
ঘরের কুশল কহ বণিকতনয়।
বলে সাধু তব পুণ্যে নাহি কোন ভয় ॥
সকল কুশল দেব এক নিবেদন।
নরপতি বলে কহ বণিকনন্দন ॥
নিবেদিয়ে শুন দেব তোমার চরণে।
বাপের উদ্দেশে আমি চলিব পাটনে ॥
অল্প বয়েস তুমি না যাবে পাটনে।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ ত্রিপুরাপদে ভনে ॥০॥

॥ পয়ার ॥

অনেক যতনে রাজা করিল নিষেধ।
প্রবোধ না মানে সাধু মনে বড় খেদ ॥
তোমার বচনে মোর মনে লাগে ডর।
সমর্পিয়া পুরীজন যাব দেশান্তর ॥
চলিব পাটনে রায় না কর নিরোধ।
লংঘিলে তোমার বাক্য পাছে বাঢ়ে ক্রোধ।
পরিতোষে যদি মোরে না দেহ বিদায়।
মোর বধ লাগিব তোমার দুই পায় ॥
সাধুর বচনে রাজা ভাবে মনে মনে।
যতনে রাখিলে পাছে না জিয়ে পরাণে ॥
সাবধানে পাটনেরে করিহ গমন।
[৯০] ভাল কর্ণধার লইহ জলধি দুর্গম ॥
এথাকার কোন চিন্তা না ভাবিহ মনে।
তোমার পুরীর জন রাখিব যতনে ॥
এ বোল বলিয়া রাজা দিল ফুল পান।
বিদায় মাগিয়া করে ভুমিষ্ঠ প্রণাম ॥
নৃপসম্ভাষণে সাধু পরিতোষ মনে।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ ত্রিপুরাপদে ভনে ॥০॥

॥ কামোদ ॥

সাধুর নন্দন সাধু গুণদত্ত নাম।
সুরথ নৃপতি যারে করিল সম্মান ॥
বিদায় করিয়া পুন নৃপপদতলে।
যাত্রা করিবারে গেল আপন মন্দিরে ॥
গাঁঠ্যার গাবরে সাধু ডাক দিয়া আনে।
বাপের উদ্দেশে আমি চলিব পাটনে ॥
কারে পান ফুল দিল কারে দিল বাস।
কনক কুণ্ডল কারে দিলেক আশ্বাস ॥
রজত বলয়া কারে রজতের তাড়।
হীরাধর কড়ি কারে দিল রত্নমাল ॥
শুন গো জননী আমি যদি হই দাস।
সেবকে সম্বল ধরে দিবে বারমাস ॥
আদেশিল সদাগরে নায়ের নফরে।
নানা সজ্জ ভরা দিল নায়ের উপরে ॥
শুভক্ষণ গণাইল আনাইয়া গণক।
ঘটে চুতডাল দিয়া পুজে বিনায়ক ॥
নানারূপ ধুপ দীপ নৈবেদ্য রচিয়া।
পূজিল ত্রিপুরাপদ প্রণতি করিয়া ॥
নিবসে পিযুষনিধি লগ্ন মকরে।
কর্কটের গুরু শুক্র সপ্তম ঘরে ॥
দক্ষিণ স্বর পায় সাধু শশী শুভদিনে।
সকল মঙ্গলবেদ পঠে দ্বিজগণে ॥
সাধুর তনয় যাত্রা করে হেন কালে।
দুই দিগে জয় জয় শঙ্খ ফুকরে ॥
দক্ষিণে ব্রাহ্মণ বন্দে বামে পূর্ণঘট।
বিমল ধবল ধান্য দেখে শুক্ল পট ॥
দধি নিবে গোয়ালিনী ডাকে ঘনে ঘন।
আনিল ধবল পুষ্প মালির নন্দন ॥
পল্লবিত তরুবর দেখিল সমুখে।
অনুকূল পবন কোকিলী বামে ডাকে ॥
আনন্দিত হইল যত সাধবের পুরী।
দক্ষিণে থাকিয়া বামে চলিল শৃগালী ॥
ধীরে ধীরে উপনীত দেবনদকূলে।
[৯১ক] মধুকর প্রভৃতে দেখিল ডিঙ্গা জলে
চরণে ধরিয়া বলে সাধুর প্রধান।
শুন গো সতাই মোরে করিবে কল্যাণ ॥
বাপে পোয়ে পাটনে মিলন যেন হয়।
মায়ের চরণধূলি লইল মাথায় ॥

আশীর্ব্বাদ করিল রুক্মিণী সত্যবতী।
পিতা পুত্র দরশনে বাঢ়িব পীরিতি ॥
সত্যবতী রুক্মিণী নাম্বিল জলমাঝে।
গুরুজন দেখি মুণ্ড নাহি তোলে লাজে ॥
একে একে পূজিল সুন্দর সাত না।
গুণদত্ত সাধুর তোমরা বাপ মা ॥
প্রণতি করিয়া বলে তুই হাথ বুকে।
আমার নন্দনে কভু না ছাড়িবে দুঃখে ॥
তুমি দেবরূপী ডিঙ্গা নাম মধুকর।
তোমার চরণে আমি করিল গোচর ॥
যশমন্ত নাবিকে রুক্মিণী সত্যবতী।
হাথে হাথে সমর্পিল আপন সন্ততি ॥
জলধি দুর্গম যত সংশয়ের বেলা।
অনুকূল হব তথা ভাবিহ মঙ্গলা ॥
হিতবাক্য গুণদত্ত শুনিল শ্রবণে।
বিদায় করিল তুই মায়ের চরণে ॥
আগে দ্বিজ ইষ্ট মিত্র কুটুম্ব পশ্চাত।
কারে কোল দেই সাধু কারে দণ্ডপাত ॥
চল ঘরে সভে মোরে করিয়া কল্যাণ।
বিদায় করিয়া বলে সাধুর প্রধান ॥
ছোট বড় যত জন করিল মঙ্গল।
জল নাহি খসে আঁখি করে ছলছল ॥
গাঁঠ্যার গাবরে জয় জয় কোলাহলে।
মধুকরে চাপে সাধু দেবনদজলে ॥
ধবল চামর বান্ধে দোহট্ট নিচয়।
ডিঙ্গার মেলান বাহে দিয়া জয় জয় ॥
দিমিকি দিমিকি বাদ্য বাজে সারি গায়
বাজল কিঙ্কিণী হাথে ঘন দাণ্ড বায় ॥
ত্রিপুরাচরণ চিন্তে সাধুর কুমার।
পরিণতমতি যশমন্ত কর্ণধার ॥
বর্দ্ধমান এড়াইল বাজে রণতূর।
ঈষত লীলায় গেল বড়সউল ॥
রাজার প্রতাপে কেহ নাহি বলে রহ।
বিষম সঙ্কট এড়াইল জামদহ ॥

জলের কল্লোলে কানে কিছু নাহি শুনি।
বেউড়গ্রামে গিয়া সাধু পূজে নারায়ণী ॥
ফলাহার [৯১] করিলেক সাধুর নন্দন।
হিরণ্যগ্রামে গিয়া করে রন্ধন ভোজন ॥
শীতল পবন বহে কার্ত্তিক মাসে।
মৌলায় উত্তরে ডিঙ্গা রজনী প্রবেশে ॥
পঞ্চ উপচারে সাধু পূজিল ত্রিপুরা।
জাড়গ্রাম দিয়া সাধু পাইল দশঘরা ॥
প্রতিদিন পূজে সাধু সর্ব্বমঙ্গলা।
কোথাহ রন্ধন করে কোথা চিড়া কলা ॥
দশঘরা বাহে সাধু সাধুর নন্দন।
চণ্ডীপুরে গিয়া ডিঙ্গা দিল দরশন ॥
সানন্দে পূজিল সাধু চণ্ডীর চরণ।
সেদিন রহিয়া করে রন্ধন ভোজন ॥
হিম পরবেশে আইল অকাল কুহিড়া।
দ্বীপা দ্বারহাটা দিয়া গেল জাঙ্গিপাড়া ॥
কোথা গীত শুনে সাধু কোথা দেখে নাট।
এড়াইল চাঁচুয়া আর ডিঙ্গালহাট ॥
সকল রসিক সাধু বুঝে হিতাহিত।
বাঘাণ্ডায় গিয়া সাধু হইল উপনীত ॥
জিজ্ঞাসিল নাবিকে দেউল কেন ভাঙ্গা।
রহ রহ বলি সাধু চাপাইল ডিঙ্গা ॥
বিবরণ শুনে সাধু নাবিকবদনে।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ ত্রিপুরাপদে ভনে ॥০॥

॥ গৌরী রাগ ॥

তোমার বাপের কথা অতি বিপরীত।
বাঘাণ্ডায় আসি ডিঙ্গা হইল উপনীত ॥
মহেশসেবক সাধু না পূজে ভগবতী।
বিধি বিড়ম্বিল তারে আচ্ছাদিল মতি ॥
ভাঙ্গিল দেউল সাধু দেবীকে না মানে।
জীবনে না জিয়ে কিবা বিরুদ্ধ পাটনে ॥
নাবিকবদনে শুনি বিপরীত কথা।
দুই চক্ষে খসে জল হেট করে মাথা ॥

ব্রাহ্মণ আনাইয়া পূজে বাশুলীর পদ।
ছাগ বলি দিয়া বর মাগে গুণদত্ত ॥
বাপে পোয়ে যদি মোর হয় দরশন।
সানন্দে পূজিব দুহেঁ তোমার চরণ ॥
এ বোল বলিয়া সাধু হয় দণ্ডপাত।
চণ্ডীর আদেশে পুষ্প হইল অচিরাত ॥
কল্যাণ করিল দ্বিজ দক্ষিণা পাইয়া।
অদুঃখে [৯২ক] বঞ্চিল তথা পরিবার লৈয়া॥
প্রভাতে চলিল সাধু পরিতোষ মানি।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ রচিল শুদ্ধবাণী ॥০॥

॥ পয়ার ॥

আরে হীরামণি সোনার না
রূপার বৈঠা পড়ে না রে ॥ধ্রু॥
ডিঙ্গায় চাপিয়া পুন দিল হুলাহুলি।
বাঘাণ্ডা এড়িয়া ডিঙ্গা গেল নাঞিকুলি ॥
নায়ের নফর যত সাধু তার পিতা।
বাহ বাহ বলে সাধু পাইল গো চিতা ॥
বিলম্ব করিয়া তথা মেলাই পূজিয়া।
বুড়া মন্তেশ্বর দেখে কুল্যায় থাকিয়া ॥
ধীরে ধীরে বাহিয়া এড়ায় দেবনদ।
বিষম সঙ্কট দেখি বলে গুণদত্ত ॥
আকাশে পাতালে ঢেউ নাহি দেখি তীর।
শুনিঞা জলের ডাক প্রাণ নহে স্থির ॥
কর্ণধার বলে ভাই শুন গুণদত্ত।
ইহারে অধিক আছে জলদুর্গ পথ ॥
ভয় না করিহ তুমি নায়ের ঠাকুর।
যমখানা এড়াইয়া পাইল মানকৌর ॥
কর্ণধারে দিল সাধু হেমনেত ধড়ি।
স্বর্গসম দেখিল পাটন তড়বড়ি ॥
নানা সজ্জ লইয়া হাট হয় প্রতিদিনে।
অবসাদ নাহি কার কেহ বেচে কিনে ॥
কাকড়া পেলাইয়া ডিঙ্গা ঠেক দিল দহে।
দ্রব্য বেচে কিনে যেবা যার মনে লয়ে ॥

বিষ্ণুহরিপদ সাধু পূজে একমনে।
হরির কিঙ্কর নাচে হরির কীর্ত্তনে ॥
জোয়ারে পূর্ণিত নদজল দিল ভাটি।
ডিঙ্গায় আজাত বান্ধে বুদ্ধে পরিপাটী ॥
সিলিদার পেলে সিলি মেঘ যেন ডাকে।
তড়বড়ি পাটনে লোক চমৎকার লাগে ॥
তমোলিপ্ত এড়াইল ত্রিপুরাকিঙ্কর।
মগরা বাহিয়া গেল গঙ্গাসাগর ॥
ত্রিপুরার পদ সাধু পূজে একমনে।
বিলম্ব করিয়া সাধু বস্তুজাত কিনে ॥
জলজন্তু রহে তথা কার্ত্তিকের ঘাটে।
কৌতুকে এড়ায় বেনু নৃপতির পাটে ॥
যাহারে সন্তোষ দেবী ত্রিভুবন হেতু।
[৯২] কাঞ্চি বাহিয়া সাধু গেল রামসেতু ॥
শঙ্খ কাঁকড়া জোঁক করিয়া পাটন।
এড়াইয়া গেল সাধু সাধুর নন্দন ॥
প্রতিদিন গুণদত্ত পূজে নারায়ণী।
সিংহল নগরে যথা নিবসে পদ্মিনী ॥
সঙ্কটে জপে সাধু ত্রিপুরার নাম।
এড়াইল দুস্তর বাবুর মোকাম ॥
জলের কল্লোল ঘন খর স্রোত বহে।
জানিল ত্রিপুরা সাধু গেল মায়াদহে ॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥

॥ বারাড়ি ॥

পরমাণ হনুমান দুহেঁ করি অনুমান
ভগবতী যারে দিল পান।
উরে নন্দী মহাকাল সুরগজ ক্ষেত্রপাল
মায়াদহে কৈল অধিষ্ঠান ॥
ঈষত পবন মেলে তরঙ্গে তরণী ঠেলে
ভয় নাহি বলে কর্ণধার।
ঈশানে উইল ঘন অনুকূল সমীরণ
চারিদিগে ঘোর অন্ধকার ॥

সচিন্তিত বলে সদাগরে।
কি বিধি লিখিল গতি বাম হৈল ভগবতী
ঠেকিলাঙ জলনিধিনীরে॥
নাহি জানি কোন দোষে আঘণ মাসের শেষে
কেমত দেবতা করে হট।
আচম্বিতে উইয়ে ঘন না জানি রজনী দিন
মায়াদহে জীবন সঙ্কট॥
ঘন ডাকে জলধর সুরগজ তোলে জল
কুল কুল শব্দ গগনে।
জল পড়ে ঝিমি ঝিমি ভেকের মধুর ধ্বনি
ঘন বরিষণ রাত্রি দিনে॥
দেখ ভাই দুর্দ্দিন জীবনের কোন চিহ্ন
ঠেকিলাঙ যমরাজ বেড়ে।
কি বিধি লিখিল দুঃখ থর থর কাঁপে বুক
অধরযুগল কাঁপে জাড়ে॥
ঝঞ্ঝা পবন বহে ঠেকাঠেকি নায়ে নায়ে
ফিরে যেন কুমারের চাক।
ধবল পাষাণ পড়ে বিপরীত জল বাড়ে
বল রে কেমতে পাইব রাখ॥
অবিরত ঝনঝন হুড় হুড় গরজন
ঝনঝনা পড়ে অবিশাল।
দুদিগে দেয়াল খসে বড় বড় গাছ ভাসে
পুণ্যে ডিঙ্গা না যায় পাতাল॥
কৌতুকে হনু ধায় লাফ দিয়া চাপে নায়
ঝলকে ঝলকে [৯৩ক] লয় পানি।
আকাশে বিষম ঝড় উড়াইল ছইঘর
নিকেতনে রহিল ছিটনি॥
নন্দী মালুয়ে চাপে হনুমান বুলে কোপে
সাত ডিঙ্গা করে টল টল।
বলে ভাই কর্ণধার রাখিতে নারিল আর
আজি ডিঙ্গা যায় রসাতল॥
মরি তারে নাহি ব্যথা না দেখিল জন্মদাতা
পুনরপি যুগল জননী।
সুরথ পৃথিবীনাথ না দেখিল গুরুপদ
এই মনে রহিল পুড়নি॥
আকাশে পাতালে ঢেউ দেখিয়া চমকে জিউ
ঘন ঘন বিকশে বিজুরি।
বলে সাধু গুণদত্ত দাসে দোষ অবিরত
ক্ষম দেবী হরসহচরী॥
ঘুচিল বাদল ঝড় সাত ডিঙ্গা হৈল জড়
রবির উদয় মধ্যদিনে।
রক্ষ দেবী ভগবতী রমানাথে নিরবধি
চন্দ্রশেখর সনাতনে॥
কহে দ্বিজ কবিচন্দ্র ত্রিপুরা পরম মন্ত্র
যেই জন জপে নিরন্তর।
নৃপ দস্যু পশুগণে জলানলে রণে বনে
ত্রিভুবনে কারে নাহি ডর॥০॥

[ক্রমশ]

১৩৬১ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক—চৈত্র মাস পর্য্যন্ত উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

নির্ম্মলকুমার বসু—লাইব্রেরী সংরক্ষণ, সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস আণ্টোনিনাসের আত্মচিন্তা, নূতন পত্রিকা ১ম বর্ষ, ১ম-৫ম সংখ্যা, Poetical works of Derozio, Ontology, সংগঠন—১ম-৩য় সংখ্যা, ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস—History of the U. S., যুক্ত রাষ্ট্রের সমাজ কল্যাণ, একটি কর্ম্মব্যস্ত সমাজ, বাংলা সর্টহ্যাণ্ড, রামনাথ বিশ্বাস—লোণাজল ও পলিমাটী, ব্লুব্লাড, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ—বাঙ্গলা ভাষা প্রসারের কথা, ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস—Man's Vast, আমেরিকার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, শ্রেণীহীন ধনিকতন্ত্র, আমেরিকার বর্ত্তমান পররাষ্ট্র নীতি, শৈলেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় —প্রবাসী ১৩১৮-২৫, ১৩২৬ ১ম খণ্ড, মাসিক বসুমতী—১৩৩৬-৪১, মানসী—৫ম বর্ষ-১০ম বর্ষ, ভারতবর্ষ—১ম-২য় বর্ষ, ৩য় বর্ষ ১ম খণ্ড, ৪র্থ-৬ষ্ঠ বর্ষ, ৭ম বর্ষ ১ম খণ্ড, সাহিত্য ১৩১৮-১৯, কর্ম্মসচিব বিশ্বভারতী—গীতবিতান ৩৭ ও ৩৮ খণ্ড, জাতীয় আন্দোলনে নারী, চিত্র বিচিত্র, মাসি, পোর্সিলেন, রবীন্দ্রসঙ্গীতে ত্রিবেণীসঙ্গম, পেট্রোলিয়ম, পঞ্চানন ঘোষাল—মুণ্ডহীন দেহ, গুরুপদ হালদার—বৈদ্যক পুরাবৃত্ত, মহম্মদ শহীদুল্লাহ—বিদ্যাপতিশতক, হেমচন্দ্র দত্ত—বারাণসী ও সারনাথ, সুধাকান্ত দে—জীবন দোলায়, সুনৎকুমার গুপ্ত—মধুস্মৃতি, পতিমন্দির, ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার—ঈশ কেন কঠোপনিষৎ, শিশিরকুমার আচার্য্য চৌধুরী—বাংলা বর্ষলিপি ১৩৬১, রেণুপদ মুখোপাধ্যায়—সেকালের জনাই ২য় খণ্ড, নির্ম্মলকুমার বসু—Bengali Selections 1892 (অসম্পূর্ণ), সুধাংশুকিরণ ঘোষ—কয়েদী, আলোকানন্দ মহাভারতী—ঠাকুর দয়ানন্দ ও অরুণাচল মিশন, কনসালেট জেনারল দি পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না—Chinese Literature, The White Haired Girl, Change in Li-village, সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়—জীবনবেদ, সম্পাদক বাণী পত্রিকা—শারদীয়া বাণী ১৩৬১, নলিনীকান্ত সরকার—হাসির অন্তরালে, সুশীলকুমার দত্ত—রৌদ্র জ্যোৎস্না, কানাই সামন্ত—নীরাঞ্জনা, সুধীরচন্দ্র ভাদুড়ী—কবিকঙ্কণ মুকুন্দ ও রাজা রঘুনাথ, The Cachar States Reorganisation Committee—Purbachal reconsidered, পুরীদাস মহাশয়—শ্রীশ্রীমদলঙ্কার কৌস্তভঃ, অধ্যক্ষ পাটবাড়ী—শ্রীশ্রীচরিতমাধুরী ১ম খণ্ড, সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা, যোগেশচন্দ্র মজুমদার—দাদুবাণী, ভবানী ভট্টাচার্য্য—পরিণাম, জহরলাল সাহা চৌধুরী—নবীন, সুরেন্দ্রকুমার ভৌমিক—কবিতা-কুঞ্জ ও কৃষিতত্ত্ব, সজনীকান্ত দাস—আত্মস্মৃতি ১ম।

১৩৬১ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক—চৈত্র মাস পর্যন্ত ক্রীত পুস্তকের তালিকা

হিমালয়ের হিমতীর্থে, মুক্ত পুরুষপ্রসঙ্গ—প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়, প্রতিদিন—বাণী রায়, ছুটি পাতা একটি কুড়ি—মুলুকরাজ আনন্দ, সাহেব বিবি গোলাম—বিমল মিত্র, তুঁহু মম জীবন, তুমি কোথায়, জীবনযাত্রী—ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, আত্মস্মৃতি ১ম—সজনীকান্ত দাস, সঞ্চারিণী—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শুভাশুভ—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রহর—রমাপদ চৌধুরী, ফণী মনসা, চক্রবাক—নজরুল ইসলাম, কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য ১ম, ২য়—মোহিতলাল মজুমদার, সাহিত্যচর্চ্চা—বুদ্ধদেব বসু, অমৃত কুম্ভের সন্ধানে—কালকূট, ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বাংলার লোক-সাহিত্য—আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, শঙ্খবিষ—দীপক চৌধুরী, কন্যা—অন্নদাশঙ্কর রায়, পোষ্যপুত্র—অনুরূপা দেবী, নানা নিবন্ধ—সুশীলকুমার দে, শ্যামলী—নিরুপমা দেবী, বলাকা কাব্য পরিক্রমা—ক্ষিতিমোহন সেন, বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা—গোপাল হালদার, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, দীনেন্দ্রগ্রন্থাবলী, শৈলজানন্দ-গ্রন্থাবলী, আশাপূর্ণা-গ্রন্থাবলী—বসুমতী সং, চাঁপাডাঙ্গার বৌ—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আদর্শ হিন্দু হোটেল—বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প—প্রমথ বিশী, বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ গল্প, গজেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প—মিত্র ঘোষ, ত্রিযামা—সুবোধ ঘোষ, লক্ষ্মীর আগমন, পিতামহ—বনফুল, গৌড়মল্লার, ছায়া পথিক, বিজয়লক্ষ্মী—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকলি—পরশুরাম, বিপ্লবের পদচিহ্ন—ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য—শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস—হরেন্দ্রচন্দ্র পাল, বিজ্ঞান ভারতী—দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, মহাস্থবির জাতক ৩য়—মহাস্থবির, পদসঞ্চার—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, গৃহ প্রবেশ—কানাই বসু।

৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা
শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

৬১ ভাগ, চতুর্থ সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

২৪৩।১, আপার সারকুল'র রোড, কলিকাতা-৬

বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ-মন্দির

হইতে শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৬১তম বর্ষের কর্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

শ্রীসজনীকান্ত দাস

সহকারী সভাপতি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীযদুনাথ সরকার
রাজা শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীসুশীলকুমার দে

সম্পাদক

শ্রীনির্মলকুমার বসু

সহকারী সম্পাদক

শ্রীকুমারেশ ঘোষ
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
শ্রীজগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীমনোমোহন ঘোষ

পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীত্রিদিবনাথ রায়
কোষাধ্যক্ষ : শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ
পুথিশালাধ্যক্ষ : শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
গ্রন্থাধ্যক্ষ : শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য
চিত্রশালাধ্যক্ষ : শ্রীশুভেন্দু সিংহ রায়

কার্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১। শ্রীঅতুল সেন, ২। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, ৩। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, ৪। শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, ৫। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, ৬। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৭। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, ৯। শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১০। শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু, ১১। শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ১২। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ১৩। শ্রীপ্রবোধকুমার ঘোষ, ১৪। শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর, ১৫। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৬। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, ১৭। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, ১৮। শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯। শ্রীসুশীল রায়, ২০। শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

শাখা-পরিষৎ-সভ্যগণ

২১। শ্রীঅতুল্যচরণ দে (নৈহাটী), ২২। শ্রীচিত্তরঞ্জন রায় (মেদিনীপুর), ২৩। শ্রীমাণিক-লাল সিংহ (বিষ্ণুপুর), ২৪। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া)।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৬১ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা

সূচী

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৬১ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
১৩৬১

পর্ত্তুগীজ মিশনারী ও বাংলা গদ্য

শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(ক) ভূমিকা

পর্ত্তুগীজ মিশনারী সম্প্রদায়ের সহিত বাঙ্গালীর সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের মূল্যমান নির্ণয় করিতে হইলে বাংলা দেশের রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনে এই বিদেশী ধর্ম্মপ্রচারকদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। বাহ্যতঃ পর্ত্তুগীজ রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীদের সহিত বাংলা গদ্যের উন্মেষকালের কিছু সম্পর্ক আছে বটে, কিন্তু বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনের সহিত এই পাদ্রীসম্প্রদায়েরও যে নিবিড়তর যোগাযোগ ছিল, তাহার নানা ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। অধুনা মিশনারী-বাংলা রুচিবান্ পাঠকের নিকট হাস্যকর মনে হইবে, কিন্তু ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা গদ্যের কায়াকান্তি গঠনে পর্ত্তুগীজ মিশনারীদেরও কিছু কিছু অবদান রহিয়াছে।

১৪৯৮ খ্রীঃ অব্দে ৮ই জুলাই ভাস্কো-ডা-গামা ১৬০ জন নাবিক লইয়া যখন ভারত যাত্রায় বাহির হইলেন, তখন পর্ত্তুগালের অধীশ্বর ইমানুয়েল ইহার ভাবী ফলাফল বোধ হয় অনুমান করিতেও পারেন নাই। ১৫শ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে পর্ত্তুগীজ জাতি ভারতে অবতরণ করিয়া যে পাশব প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়াছিল, তাহার রক্ত-পিচ্ছিল ইতিহাস পর্তুগীজের ভারত অভিযানের ইতিবৃত্তে এখনও মলিন হইয়া যায় নাই। ভারত ও আরব-সাগরে পর্তুগীজ বণিক্গণ অল্পাধিক দস্যুতা করিত, তাহাদের শিরা-ধমনীতে পাশব-প্রবৃত্তির উত্তপ্ত শোণিতধারা যেন সর্ব্বদা বহমান ছিল। ভাস্কো-ডা-গামার বিশ্বাসঘাতকতায় তাহার শুরু হইল এবং তাহার পর প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া ভারতের পশ্চিমে এবং বাংলার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ প্রান্তে পর্তুগীজ জলদস্যুর দল যে নির্ম্মম অত্যাচারের ধারা প্রবাহিত করিয়াছিল, সভ্যতার ইতিহাসে তাহার তুলনা বিরল। এমন কি, য়ুরোপীয় লেখক রেভাঃ অর্মে তাহার বর্ণনা দিতে গিয়া কুণ্ঠা ও জুগুপ্সা বোধ করিয়াছেন[১]। ১৫০০ খ্রীঃ অব্দে পর্তুগালের অধীশ্বর ১৩টি যুদ্ধজাহাজ, ১২০০ আরোহী ও তদনুযায়ী গোলা-বারুদ সহ ভারতে যে বাহিনী প্রেরণ করেন, তাহাদের অধিকর্ত্তাকে এই আদেশ দেন: "To destroy all infidels refusing to listen to the Christianity which the friars preached."[২]

১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভে গোলাবারুদের শ্বাসরোধকারী ধূম ও পর্তুগীজ-বিশ্বাসঘাতকতার যুগপৎ আঘাতে সাধারণ ভারতবাসী ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। পর্তুগীজ জাতি স্বর্ণের

১। J. D. Orsey—Portuguese Discoveries, p. 32.

২। Ibid. Pp. 23-24.

লোভে ভারতে আসিবার পথ খুঁজিতেছিল; এক হস্তে তরবারি, আর এক হস্তে ক্রুশ-চিহ্ন ধারণ করিয়া ন্যায়-অন্যায়-বোধহীন প্রায়-বর্ব্বর এই শ্বেতজাতি ভারতে পদার্পণ করে। ১৫৪৫ খ্রীঃ অব্দে পর্তুগীজ-ভারতের গভর্ণর আল্‌ফান্‌জো-দে-সুজা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ঐতিহাসিক ঘটনাসম্মত।[৩]

✓ সমসাময়িক বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস ঘনঘটাচ্ছন্ন। ১৫৭৬ খ্রীঃ অব্দ হইতেই বাংলা দেশ 'গৌড়বঙ্গ-উৎকল-অধিপ' মানসিংহের কর্তৃত্বাধীনে যায় এবং দীর্ঘকালব্যাপী অরাজকতার পর আকবরের শাসনে আসিয়া বাংলায় কিছু শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়া আসে। কিন্তু আকবরের শাসনাধীনে আসিবার অন্ততঃ অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে (১৫১৭ খ্রীঃ অঃ) বাংলা দেশে পর্তুগীজ বণিক্ আনাগোনা শুরু করিয়াছে।[৪] শের সাহের মৃত্যু হইতে আকবরের শাসনাধীনে আসা পর্য্যন্ত (১৫৪৫-১৫৭৬) প্রায় ৩০ বৎসরব্যাপী এই অরাজকতার মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গে পর্তুগীজ বণিক্ নানা বাণিজ্যিক সুবিধা করিয়া লইয়াছে। ১৫৯৯ খ্রীঃ অব্দে বাকলার রাজা পরমানন্দ রায় পর্তুগীজদের সহিত যে সন্ধি করেন, তাহা মূর্খতাপ্রসূত ও অপমানজনক।[৫] যাহা হউক, আকবরের কেন্দ্রীয় শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই বাংলা দেশের রাষ্ট্র ও বাণিজ্যক্ষেত্রে পর্তুগীজ বণিকের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। ১৭শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে আরাকানী মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের পরস্পর সহযোগিতার ফলে বাংলায় যে ভয়াবহ অরাজকতার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে পূর্ণচ্ছেদ পড়িল ১৬৬৮ খ্রীঃ অব্দে। এই সময় মুঘল প্রতিনিধি সায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম হইতে পর্তুগীজদিগকে সমূলে উৎখাত করেন। ইহার পরেই ১৭শ শতাব্দী হইতে পর্তুগীজ জলদস্যুগণের অসপত্ন সামুদ্রিক প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইতে আরম্ভ করে। ১৮শ শতক পর্য্যন্ত পর্তুগীজ বণিক্ ও পাদ্রীদের প্রভাব বাংলা দেশে বেশ কিছু কাল অটুট ছিল; শেষে ইহাদের রক্ত-রাঙা মশাল ও শোণিত-সিক্ত তরবারি বঙ্গোপসাগরের লবণাম্বুতলে সমাধি লাভ করিলেও পর্তুগীজ ভাষার স্বল্প ভগ্নাংশ, তাহাদের আনীত বৃক্ষলতাদি, কিছু কিছু আচার ব্যবহার এবং অগাস্তীনীয় পাদ্রীদের গদ্য-চর্চ্চা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচার-পুস্তিকা দেশের মধ্যে কিছু কাল জীবিত ছিল। অবশ্য ধর্ম্মপ্রচার-মূলক পুস্তকগুলি পর্তুগীজ পাদ্রী ও ধর্ম্মান্তরিত দেশীয় খ্রীষ্টানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেও বাংলার শব্দভাণ্ডারে কিছু কিছু পর্তুগীজ শব্দ স্থান পাইয়াছে।

চট্টগ্রাম, সপ্তগ্রাম ও হুগলীকে কেন্দ্র করিয়া পর্তুগীজ বণিকের বাণিজ্যকেন্দ্র যেমন স্ফীতি লাভ করিতে লাগিল, তেমনি সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে অতি নিষ্ঠুর-স্বভাব জলদস্যুগণের অমানুষিক অত্যাচারে বাঙ্গালীর ধনপ্রাণ বিপর্য্যস্ত হইল; কিন্তু ১৬শ শতাব্দী হইতেই পর্তুগীজ মিশনারী সম্প্রদায় বাংলার জানপদ জীবনে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করেন। পূর্ব্ব

৩। B. D. Bose.—The Rise of Christian Power in India. p, 2.

৪। J. J. A. Campos —History of Portuguese in Bengal.

৫। Jadunath Sircar—History of Bengal, Vol. II.

ও পশ্চিমবঙ্গে এখনও কিছু কিছু পর্তুগীজ গির্জ্জার চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। এক মাত্র ব্যাণ্ডেলের অগাস্তীনীয় চার্চ্চ[৬] ব্যতীত অন্যান্য পর্তুগীজ গির্জ্জা সেই যুগে ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।[৭] পর্তুগীজ-জলদস্যুভীতি ও পর্তুগীজ বণিকের বাণিজ্য ব্যাপার আজ ইতিহাসের বিবর্ণ পাতায় আশ্রয় লইয়াছে; কিন্তু এই উপাসনালয় এবং তাহার সহিত সম্পর্কিত ধর্ম্মান্তরিত রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান সম্প্রদায় নগণ্য হইলেও এখনও বাংলার পল্লী অঞ্চলে দুষ্প্রাপ্য হইয়া যায় নাই। পরবর্তী কালের প্রটেস্টাণ্ট ধর্ম্মযাজকগণ বাংলাদেশে অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা বাঙ্গালীর প্রাণের ধাতুপ্রকৃতির সহিত মিশ্রিত হইতে পারেন নাই। বরং অগাস্তীনীয় সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিবর্গ বাঙ্গালীর গ্রাম-জীবনের সহিত অধিকতর নিবিড় সম্পর্ক রক্ষা করিয়াছিলেন। শুধু কার্ভালো বা গঞ্জালেসের অমানুষিক অত্যাচারই নহে, অনেক পর্তুগীজ মিশনারী বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনের সহিত জড়িত হইয়া গিয়া তাহার সুখ-দুঃখের অংশীদার হইয়াছিলেন। Campos সাহেবের বিবরণী হইতে দেখা যাইবে যে, একদা বাংলা দেশে পর্তুগীজ ধর্ম্মযাজকগণ কি ভাবে ধর্ম্মান্তরীকরণ শুরু করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত অন্ততঃ তেরটি গির্জ্জার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

ট্যাভারনিয়র ১৬২০ খ্রীঃ অব্দে ঢাকা অঞ্চলে বিরাট্‌ অগাস্তীনীয় গির্জ্জা দেখিয়াছিলেন[৮]। ভ্রাম্যমাণ বার্ণিয়ারও ১৬৬০ খ্রীঃ অব্দে বাংলাদেশে আট নয় হাজার ধর্ম্মান্তরিত খ্রীষ্টান দেখিয়াছিলেন[৯]। পর্তুগীজ পাদ্রীগণ নিশ্চয় দেশীয় ভাষাজ্ঞানের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই বাংলা ব্যাকরণ শব্দকোষ রচনা ও বিতর্কমূলক ধর্ম্মপুস্তক প্রচারের জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। পর্তুগীজ মিশনারীদের বাংলাভাষায় রচিত ও রোমান অক্ষরে মুদ্রিত দুইখানি প্রচারপুস্তিকা (দোম আন্তোনিও-বিরচিত 'ব্রাহ্মণ রোমানক্যাথলিক সংবাদ' এবং মানো এল-দা-আস্‌সুম্পসাঁউ-বিরচিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ') এবং একখানি ব্যাকরণ অভিধান (Vocabulario em idioma e portuguez) পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার অন্ততঃ এক শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে অর্থাৎ ১৫৯৯ খ্রীঃ অব্দের দিকে দোমিনিক-দে-সুজা (Dominic de Souza) সোনারগাঁয়ের নিকট শ্রীপুরে বসিয়া বাংলা ভাষা শিখিয়া 'জেসুইট' পাদ্রীসম্প্রদায়ের প্রচারক ফ্রান্সিস্‌কো ফারনান্দেজ-প্রণীত দুইখানি প্রচারপুস্তিকা বাংলায় অনুবাদ করেন[১০]। শুধু দে-সুজা নহে, পূর্ব্ববাংলার অন্যান্য পর্তুগীজ ধর্ম্মপ্রচারকগণ যে বাংলা ভাষায় প্রচারপুস্তিকা রচনা করিতেছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বাংলা মিশনের প্রধান অধ্যক্ষ ফাদার মার্কস্‌ আন্তোনিও সাতুচ্চি

৬। ১৫৯৯ খ্রীঃ অব্দে স্থাপিত।

৭। Compos-এর History of Portuguese in Bengal গ্রন্থে পর্তুগীজ গির্জ্জার পূর্ণ বিবরণী আছে।

৮। Tavernier's Travels, Vol. I,

৯। Barnier's Travels.

১০। Bengal Past & Present (July—Dec.), 1914.

(Father marcos Antonio Satucci S. J.) ১৬৩৮ খ্রীঃ অব্দে এই সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন[১১]। ১৭২৩ খ্রীঃ অব্দে ফাদার বারবিয়ার (Father Barbier) তাঁহার Lettres Edifiantes et Curienses-এ লিখিয়াছিলেন যে, তিনি বাংলা ভাষায় একখানি ক্ষুদ্র বিতর্কমূলক প্রচারপুস্তিকা রচনা করেন[১২]। এই উল্লেখগুলির কোন বাস্তব বা চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। অতএব ১৮শ শতাব্দীর পূর্ব্বে ভাওয়ালের নাগরী গ্রাম ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে ধর্ম্মান্তরিত অগাস্তীনীয় খ্রীষ্টান সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করিয়া যে, পর্তুগীজ খ্রীষ্টানী বাংলা-সাহিত্য ও ব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল, তাহার কোন পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে। শুধু এইটুকু অবধারণীয় যে, পূর্ব্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলে খ্রীষ্টান মিশনারী সম্প্রদায় বাংলা গদ্য চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এই সময়ের দলিল-দস্তাবেজের কথা ছাড়িয়া দিলেও, বৈষ্ণব সহজিয়াদের প্রচারপুস্তিকাগুলিতে গদ্যের যে রূপান্তর ঘটিতেছিল, পর্তুগীজ পাদ্রিগণ তাহা পাঠ করিবার সুযোগ সুবিধা পান নাই; তাহার জন্য যে ধৈর্য্য ও পরমত-সহিষ্ণুতার প্রয়োজন, তাহা হইতে ইহারা বঞ্চিত ছিলেন। রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মমত ব্যাখ্যান ও প্রচারপুস্তিকা রচনার জন্য বাংলা গদ্যের সাহায্য প্রয়োজন; কারণ, যাহা মূলতঃ বিতর্কমূলক ও বুদ্ধিকেন্দ্রিক, তাহাকে গদ্যের সীমাবদ্ধ বাগ্‌ভঙ্গিমার মধ্যে ব্যক্ত করিতে হয়। তাই পর্তুগীজ মিশনারী সম্প্রদায় প্রায় নূতন করিয়া বাংলা গদ্য রচনায় প্রয়াস পাইয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহারা যদি বাংলা সাহিত্যের কিঞ্চিৎ পরিচয়ও রাখিতেন, তাহা হইলে দেখিতেন যে, তাঁহাদের আবির্ভাবের শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শুধু পয়ারের সাহায্যে কি কঠিন তত্ত্ববাদ অবলীলাক্রমে ব্যক্ত করিয়াছেন! পর্তুগীজ ধর্ম্মপ্রচারকগণের বুদ্ধির সমুৎকর্ষ ও চিত্তের সজীব কৌতূহল 'দশ অনুজ্ঞার' সীমাবন্ধনী ছাড়াইয়া উদার ধর্ম্মবোধের সার্ব্বজনীন প্রাঙ্গণতলে মিলিত হইতে পারে নাই।

সমসাময়িক কালের পর্তুগীজ গির্জ্জা ও তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট সমাজজীবনের যৎসামান্য পরিচয় পাওয়া গিয়াছে; অবশ্য অধিকাংশ স্থলেই তাহা অনুমানের উর্দ্ধে উঠিতে পারে নাই। আমাদের অনুমান, প্রত্যেক গির্জ্জার সহিত প্রচুর জমিজমা থাকিত এবং প্রায়শই গির্জ্জার অধিকর্ত্তা ভূস্বামী হইয়া বসিতেন। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদেই' তাহার ইঙ্গিত আছে। গুরু-শিষ্যের কথোপকথন—

গুরু। কোথায় যাও?
শিষ্য। বাড়ীতে যাই।
গুরু। তোমার বাড়ী কোথায়?
শিষ্য। ভাওয়াল দেশে; আমি তোমার রাইয়ত, নাগরীতে বসি[১৩]।

১১। Ibid.

১২। Dr. S. K. De.—History of Bengali Literature in the Nineteenth Century. p. 68.

১৩। শ্রীসজনীকান্ত দাস-সম্পাদিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ,' পৃ ১৮১। এ সম্বন্ধে ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন তৎসম্পাদিত 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদের' প্রস্তাবনায় (পৃ ২।/০) বলিয়াছেন, "ভাওয়ালের খ্রীষ্টান' কৃষকেরা

এই উদ্ধৃতির দ্বারা অন্ততঃ ইহা স্পষ্ট হইতেছে যে, পর্তুগীজ গির্জ্জার সহিত বিরাট্ জমিদারী থাকিত। ইহার ফলে যাজকগণের মধ্যেও কিছু কিছু বিকৃতি ঘটা সম্ভব[১৪]। ভূষণার রাজপুত্র দোম আন্তোনিওর নামেও বোধ হয় অনুরূপ কোন অভিযোগ উঠিয়াছিল[১৫]। সে যাহা হউক, ভাওয়ালের দেশীয় খ্রীষ্টানগণ যে সকলেই কৃষিজীবী ছিল, তাহা জানা যায় ভাওয়ালের প্রধান প্রচারক ফাদার আম্ব্রোসিয়োর (১৭২৬ খ্রীঃ অব্দে ভাওয়ালে প্রচারক-রূপে আবির্ভূত) বিবরণীতে[১৬]। ফাদার হস্টেনের মতে, তৎকালীন পর্তুগীজ পাদ্রীগণ দোম আন্তোনিও সম্বন্ধে নানা কটূক্তি করিয়াছিলেন[১৭]। ভারতের অন্যতম প্রাচীন গির্জ্জা ব্যাণ্ডেলের অগাস্তীনীয় কনভেণ্ট্ সম্বন্ধেও নানা জনে নানা বক্র উক্তি করিয়াছেন। ১৭১০ খ্রীঃ অব্দে আলেকজাণ্ডার হামিল্টন্ নামক এক ব্যক্তি এই গির্জ্জার নৈতিক আদর্শকে অতি কঠোর ভাষায় নিন্দা করিয়াছিলেন[১৮]। এই নৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকায় দোম আন্তেনিও দে-রোজারিও এবং মানো এল-দা-আসম্পসাঁউ বাংলা প্রচারপুস্তিকা ও ব্যাকরণ শব্দকোষ রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহাদের সাহিত্যিক স্বরূপ বিচার প্রসঙ্গে তৎকালীন সামাজিক আদর্শ ও পারিপার্শ্বিকতাও বিশেষ ভাবে বিবেচ্য।

(খ) দোম আন্তোনিও ও বাংলা গদ্য

১৮শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রচিত তিনখানি পর্ত্তুগীজ বাংলা গদ্য গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে—দোম আন্তোনিও দে রোজারিও প্রণীত (১) 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' (গ্রন্থটির পর্ত্তুগীজ নাম বাংলায় অনুবাদ করিলে দাঁড়াইবে—"জনৈক খ্রীষ্টান অথবা রোমান ক্যাথলিক ও জনৈক ব্রাহ্মণ বা হিন্দুদিগের আচার্য্যের মধ্যে শাস্ত্রসম্পর্কীয় তর্ক ও বিচার; ইহাতে বঙ্গভাষায় হিন্দুধর্ম্মের অসারতা ও আমাদের পবিত্র ক্যাথলিক ধর্ম্মের অভ্রান্ত সত্যতা প্রতিপন্ন হইয়াছে; একমাত্র এই ধর্ম্মেই মুক্তির পথ ও ভগবানের প্রকৃত বিধানের সন্ধান আছে"[১৯]) এবং মানোএল-দা-বিরচিত (২) কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ (Crepar Xastrer

---

যে দোম-আন্তোনিওর রায়ত ছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই।" তাহা সত্য হইতে পারে বটে, কিন্তু নাগরী গ্রামের প্রচুর ভূখণ্ড যে পাদ্রিদের অধিকারে ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

১৪। Father Hosten এ সম্বন্ধে কিছু সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। Bengal Past & Present (1914) দ্রষ্টব্য।

১৫। 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদের' প্রস্তাবনা (পৃ. ২৵০) দ্রষ্টব্য।

১৬। ঐ, প্রস্তাবনা, পৃ. ২৶০।

১৭। Bengal Past & Present, 1914.

১৮। Campos—*History of Portuguese in Bengal*, p. 237.

১৯। ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ, প্রস্তাবনা, পৃ ৩।৴০।

Orth Bhed[২০]) এবং (৩) বাংলা ব্যাকরণ ও বাংলা-পর্তুগীজ, পর্তুগীজ বাংলা শব্দকোষ (Vocabulario em idioma Bengalla, e Portuguez)। এই তিনখানি গ্রন্থের মধ্যে দোম আন্তোনিওর পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে পর্তুগালের এভোরা নগরীর সাধারণ গ্রন্থালয়ে; ইহা মুদ্রিত হইয়াছিল কি না বলা যায় না। দোম আন্তোনিওর পরবর্ত্তী কেন্দ্রকর্ত্তা মনোএল-দা-আস্‌সুম্পসাঁউ-এর উল্লিখিত দুইখানি পুস্তকের সহিত দোম আন্তোনিওর বিতর্কিকাখানিও মুদ্রণের নিমিত্ত পর্তুগালে প্রেরিত হয়। কিন্তু মানোএলের গ্রন্থ দুইখানি মুদ্রিত হইলেও (১৭৪৩) দোম আন্তোনিও সে সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়াই অনুমীত হয়। ফাদার হস্টেন থিব্‌সো লোপেস্ নামক এক স্পেনবাসীর নিকট সর্ব্বপ্রথম এই তিনখানি গ্রন্থের সংবাদ সংগ্রহ করেন[২১]; লোপেসের মতে দোম আন্তোনিওর এই গ্রন্থও ১৭৪৩ খ্রীঃ অব্দে লিসবনে ফ্রান্সিস্‌কো দা সিলভা মুদ্রিত করেন[২২]। অথচ ইহার মুদ্রিত সংস্করণের কোন 'কপি' কোথাও পাওয়া যায় নাই, অথবা মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া অন্য কোন প্রমাণও নাই। ১৮৫০ খ্রীঃ অব্দে কুন্হা রিভারা এভোরার সাধারণ গ্রন্থালয়ের হস্তলিখিত পুথির যে তালিকা প্রস্তুত করেন (Catalogo dos Manuscriptos da Bibliothica Publica Fvorensa), তাহাতে তিনি দোম আন্তোনিওর গ্রন্থকে হস্তলিখিত পুথির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। ফাদার আম্ব্রোসিয়া ১৭৫০ খ্রীঃ অব্দে ভাওয়ালের সন্ত নিকোলাস তলেন্তিনো মিশনের বিবরণীতে আন্তোনিওর পুথির উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু মুদ্রণের কোন ইঙ্গিত নাই[২৩]। উল্লিখিত প্রমাণপুঞ্জের দ্বারা অনুমিত হয় যে, দোম আন্তোনিওর পুথি মুদ্রণের জন্য বাংলার বাহিরে প্রেরিত হইলেও কোন কারণবশতঃ মুদ্রিত হয় নাই। মুদ্রণ বিভ্রাট, কর্ত্তৃপক্ষের নীতিপরিবর্ত্তন, আন্তোনিও সম্বন্ধে পর্তুগীজ পাদ্রীগণের বক্র কটাক্ষ—যে কোন কারণেই হোক, এই গ্রন্থের প্রতি পর্তুগালের ধর্ম্মনৈতিক কর্ত্তৃপক্ষ সুবিচার করেন নাই। মুদ্রণ বিভ্রাটও যে হইতে পারে না, তাহা নহে; কারণ, স্বয়ং মানোএলের গ্রন্থটি রচনার অন্ততঃ নয় বৎসর পরে মুদ্রিত হয়[২৪]। তিনটি গ্রন্থই পর্তুগীজ ও বাংলা দুই ভাষায় লিখিত। বাংলা অক্ষর তখনও মুদ্রণ-সৌভাগ্য লাভ করে নাই। সুতরাং ইহারা রোমান হরফে তৎকালীন উচ্চারণরীতি অনুযায়ী বাংলা অক্ষরকে সাজাইয়াছিলেন। এই জটিল ব্যাপারের জন্য মুদ্রণের বিলম্ব হইতে পারে। রোমান হরফে ভারতের প্রাদেশিক বর্ণমালাকে রূপান্তরিত করিয়া দেশীয় ভাষায় পুস্তক রচনা ও মুদ্রণের

২০। ১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দে শ্রীরামপুর হইতে এইগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিয়াছিলেন চন্দননগরের ফরাসী পাদ্রি 'জাকবছ ফ্রাঁছিস্‌কস্ মারিয়া গেরে ' (Jacobus Franciscus Meria Guerin)। তিনি ইহাকে 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ' বলিয়াছেন।

২১। Bengal Past & Present, 1914.

২২। Ibid.

২৩। ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ (পৃ ৩।৶৹)।

২৪। রচিত ১৭৩৪ খ্রীঃ অব্দে, মুদ্রিত ১৭৪৩ খ্রীঃ অব্দে।

প্রথম গৌরব ভারত-প্রবাসী পর্তুগীজদের প্রাপ্য। ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে গোয়াতে পর্তুগীজদের প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়; বলা বাহুল্য যে, য়ুরোপ হইতে আনীত রোমান অক্ষরেই এই ছাপাখানার কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। পরে প্রয়োজনমতো মারাঠি ও কোঙ্কনী ভাষায় রোমান হরফের সাহায্যে গ্রন্থাদি মুদ্রিত হইতে আরম্ভ করে গোয়া অঞ্চলে। বাংলা অক্ষর মুদ্রাযন্ত্রে স্থান পাইবার প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ১৫৭৭ খ্রীঃ অব্দে কোচিনের এক জেসুইট পাদ্রি সর্ব্বপ্রথম তামিল অক্ষর নির্ম্মাণ করেন[২৫]।

দোম আন্তোনিওর জীবনকথা যেমন বিচিত্র, তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনও তেমনই বিস্ময়কর[২৬]। তিনি বাঙ্গালী, ভূষণার রাজপুত্র, আবার 'Grande Chattequiste'—প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টশাস্ত্রবিৎ। ১৬৬৩ খ্রীঃ অব্দে আরাকানের মগ জলদস্যুগণ ভূষণার এই রাজপুত্রকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। মানোএল দা রোজারিও নামক এক পর্তুগীজ পাদ্রী অর্থের বিনিময়ে ইঁহাকে উদ্ধার করেন এবং খ্রীষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। এই সময় রাজপুত্রের বয়ঃক্রম নিতান্ত অল্প ছিল না। কারণ, তিনি প্রথমে পৈতৃক ধর্ম্ম ত্যাগে স্বীকৃত হন নাই। পরে সেণ্ট আন্তোনিওর প্রত্যাদেশে তিনি রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং দোম আন্তোনিও দা রোজারিও নামে পরিচিত হন। বাঙ্গালী হইয়াও খ্রীষ্টানধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় অধিকার ছিল এবং পূর্ব্ববঙ্গে ক্যাথলিক মত প্রচারে তাঁহার কৃতিত্ব ছিল সমধিক; তিনিই সর্ব্বপ্রথম সাধারণ্যে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম ব্যাপক ভাবে প্রচার করেন এবং তাঁহার প্রচেষ্টার ফলেই পূর্ব্ববঙ্গের ৩০-৪০ হাজার লোক এই ধর্ম্ম গ্রহণ করে। তিনি বাঙ্গালী ছিলেন বলিয়া অতি সহজে বাঙ্গালীর হৃদয় জয় করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ নামক প্রচার-পুস্তিকার জনপ্রিয়তার জন্য পরবর্ত্তী কালে ভাওয়ালের সেণ্ট নিকোলাস অব টলেণ্টিনোর সর্ব্বাধ্যক্ষ মানোএল-দা-আস্‌সুম্পসাঁউ উহার পর্তুগীজ অনুবাদ সমেত লিসবনে প্রেরণ করিয়াছিলেন—সম্ভবতঃ মুদ্রণের জন্য। দুর্ভাগ্যক্রমে ইহা মুদ্রিত হয় নাই। আমাদের অনুমান, এই পুস্তিকা ১৮শ শতকের তৃতীয় বা চতুর্থ দশকে রচিত হইয়া থাকিবে[২৭]।

এই বিতর্কমূলক পুস্তিকার ধর্ম্মতত্ত্ব ও তার্কিকতার মান উচ্চশ্রেণীর নহে; যে অঞ্চলে বসিয়া ইহা রচিত হইয়াছিল, সেই নাগরী গ্রামের সন্ত নিকোলাস তলেন্তিনো মিশনের ধর্ম্মান্তরিত খ্রীষ্টানগণ কৃষক শ্রেণীভুক্ত ছিল, এবং তাহারা পর্তুগীজ ভাষা তো দূরের কথা,

২৫। Grierson—Linguistic Survey of India, Vol IV, p 301.

২৬। ডাঃ সুশীলকুমার দে তাঁহার History of Bengali Literature in the 19th Century গ্রন্থে (পৃ. ৭৬) দোম আন্তোনিওকে 'Semi-legendary Figure' বলিয়াছেন। ফাদার আম্বে্রাসিও লিখিত বিবরণীতে রোমান ক্যাথলিকসুলভ কিছু কিছু অলৌকিকত্ব থাকিলেও দোম আন্তোনিওকে কিছুতেই 'অর্দ্ধপৌরাণিক চরিত্র' বলা যায় না। এ বিষয়ে 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদের' প্রস্তাবনার ২।৶০ পৃষ্ঠায় ডাঃ সেনের মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

২৭। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন সম্পাদিত মানোএলের ব্যাকরণের 'প্রবেশক' (পৃ. ৶০) দ্রষ্টব্য।

মাতৃভাষা বাংলাতেও লিখিতে পড়িতে জানিত কি না সন্দেহ। এই কৃষিপ্রধান হিন্দুমুসলমান জনগোষ্ঠীর মনোভাবের প্রতি চাহিয়াই তিনি এই পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন; মূল উদ্দেশ্য ছিল, তর্কে হিন্দুদিগকে হেয় প্রতিপন্ন করিয়া রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের মহিমা বৃদ্ধি করা। সেই জন্য ব্রাহ্মণ ও রোমান ক্যাথলিকের প্রশ্নোত্তর ও তর্কবিতর্কের দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের কয়েকটি আচার অনুষ্ঠানের প্রতি বক্র কটাক্ষপাত করা হইয়াছে। ধর্ম্মান্তরিত খ্রীষ্টানদের অধিকাংশই ছিল হিন্দুসম্প্রদায়ভুক্ত। উপরন্তু দেশের চতুর্দ্দিকে যে কুশাগ্রতীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্রাহ্মণগণ তৎপর হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তর্কে পরাভূত না করিতে পারিলে এই অঞ্চলে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচারের কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাই দোম আন্তোনিও ও মানোএলের প্রধান লক্ষ্য ছিলেন এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। মুসলমান সম্বন্ধে দোম আন্তোনিও ও মানোএল কিঞ্চিৎ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে পর্তুগীজ বণিক্ ও জলদস্যুর সহিত মুসলমান বণিক্‌দের রক্তাক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত, আরব সাগর ও ভারত মহাসাগরে অনুরূপ বহু ঘটনা ঘটিয়াছে। তাই নাগরী ও অন্যান্য গ্রামাঞ্চলের মিশনারীগণ মুসলমান সম্প্রদায়কে খুব সম্ভবতঃ সাধ্যমত এড়াইয়া চলিতেন। তাঁহাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য স্থল ছিল হিন্দুর সমাজ, লোকাচার ও ধর্ম্ম। কারণ, হিন্দুধর্ম্ম রাজধর্ম্ম ছিল না, ছিল বিজিতের ধর্ম্ম। অতএব তাহার বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করিতে তাঁহাদের কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ হয় নাই। এই মিশনারীগণ প্রথমে আন্তোনিওর পিতার জমিদারী মধ্যে কোষাভাঙ্গা নামক গ্রামে[২৮] নিরুপদ্রবে ধর্ম্মপ্রচার করিতেন। কিন্তু সম্ভবতঃ বিভাষী ও বিজাতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত স্থানীয় হিন্দুগণের মাঝে মাঝে সংঘর্ষ উপস্থিত হইত। যাহা হউক, এই উপদ্রবে বিব্রত হইয়া ১৬৯৫ খ্রীঃ অব্দে ফাদার লুইস দোস আঞ্জোস (Luis dos Anjas) ভাওয়াল পরগনার নাগরী গ্রাম ক্রয় করিয়া উক্ত মিশনকে এই স্থানে স্থানান্তরিত করেন[২৯]। ফাদার আম্ব্রোসিও-লিখিত বিবরণ হইতে জানা যাইতেছে যে, পূর্ব্ববঙ্গে ১৬শ—১৮শ শতাব্দীতে অগাস্তীনীয় ও জেসুইট খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচার লাভ করিলেও, তাহা কৃষকসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সুদৃঢ় অবরোধের সম্মুখে পাদ্রীদিগকে রীতিমত বিব্রত হইতে হইয়াছিল এবং তাহারই প্রতিবিধানকল্পে দোম আন্তোনিওকে ব্রাহ্মণ্য-বিদ্বেষী বিতর্কমূলক প্রচারপুস্তিকা রচনা করিতে হইয়াছিল।

আলোচ্য পুস্তিকায় ব্রাহ্মণ ও রোমান ক্যাথলিকের প্রশ্নোত্তরের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের কয়েকটা মৌলিক তত্ত্বের উপর কটাক্ষাঘাত করা হইয়াছে এবং যুক্তির সাহায্যে হিন্দুর অবতারতত্ত্ব, ব্রহ্মবাদ ও ত্রিদেবতত্ত্বকে একেবারে ধূলিসাৎ করা হইয়াছে—পরবর্ত্তী কালের শ্রীরামপুর মিশনের প্রটেস্টান্ট্ মিশনারীগণও এই একই যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন। দোম আন্তোনিও হিন্দু বংশে জন্মিয়া হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম ও আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলেন না, এবং হিন্দুর প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাসের দুর্ব্বলতা সম্বন্ধেও অবহিত ছিলেন।

২৮। কোষাভাঙ্গা গ্রাম কোথায় অবস্থিত, তাহা জানা যায় নাই। (ব্রা. রো. সং. পৃ. ২।/০)

২৯। 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ,' পৃ. ২।০।

তাই তিনি যুক্তির দ্বারা হিন্দুধর্ম্মকে পরাভূত করিয়া খ্রীষ্টানধর্ম্মের মহিমা প্রচারের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দুর পৌরাণিক মতাশ্রিত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কৌতূহলী ছিলেন, কিন্তু অবতারতত্ত্ব ও পুরাণকাহিনী ব্যাখ্যানে হাস্যকর অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন; দশাবতারের মধ্যে কৃপাচার্য্যকে গ্রহণ করিয়াছেন। রামচন্দ্র ইন্দ্রজিৎকে বধ করিয়াছিলেন, এই ভুল সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন, শঙ্খাসুর ও শঙ্খচূড়ের পার্থক্য ধরিতে পারেন নাই, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের ভক্তগণকে বর্ণনা করিতে গিয়া হাস্যকর পুরাণজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা মৌলিক আবিষ্কার বোধ হয় এই,—দক্ষযজ্ঞের পর বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে সংঘর্ষের উপক্রম হইলে, "পার্ব্বতী শিবের স্ত্রী বিবসন হইয়া দুই জনের মধ্যে দাড়াইলেন; তবে অতো কষ্টে দুই জনের মির্তু রখ্যা হইলেন।" কিছু পুরাণ, কিছু জনশ্রুতি, কিছু গ্রামীণ সংস্কারের সংমিশ্রণে দোম আন্তোনিও মাঝে মাঝে অদ্ভুত পৌরাণিক তথ্য বিবৃত করিয়াছেন।

সাধারণতঃ দোম আন্তোনিও বৈজ্ঞানিক বোধ ও যুক্তিমার্গের প্রাথমিক প্রতীতির দ্বারা চালিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। অবতারতত্ত্ব, ব্রহ্মবাদ ও ত্রিদেবতত্ত্ব সম্বন্ধেও সেই বাস্তব প্রতীতির পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য তিনি যে সম্প্রদায়ের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন, সেই রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম ও অলৌকিকত্বের উপর আদ্যন্ত প্রতিষ্ঠিত; এবং তিনি হিন্দুর ধর্ম্মচেতনার বিরুদ্ধে যে অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই লোকবুদ্ধি ও বাস্তববোধের লৌকিক যুক্তি প্রয়োগ করিলে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের মহিমাও হ্রাস পাইত। নরকরোটীর ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তাঁহার বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের পরিচয় পাওয়া যায়[৩০]। কৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণের অবতার সম্বন্ধে রোমান ক্যাথলিকের উক্তি—"যেমত আর আর অবোতার কহিয়াছ, এও সেই; কিন্তু অতি পাপী।" কৃষ্ণ শয়তানের প্রতীক, দেবকীর উদরে শিশুশরীরে ভূত প্রবেশ করিয়াছিল—সেই শয়তান বা ভূতই হইতেছেন কৃষ্ণ—রোমান ক্যাথলিক আচার্য্য পরম অবজ্ঞাভরে এই অশ্রদ্ধেয় উক্তি করিয়াছেন। কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার আক্রোশ যেন কিছু অধিক। নাগরীতে বৈষ্ণব সম্প্রদায় ছিল কি না, জানা যায় না এবং হিন্দুর মধ্যে বৈষ্ণবগণই রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন কি না, তাহাও অনুমানের বিষয়। গঙ্গাজলের পবিত্রতা সম্বন্ধে[৩১] রোমান ক্যাথলিকের উক্তি 'থেরীগাথার' পুন্নিকার উক্তির অনুরূপ। ব্রহ্ম সম্বন্ধে ব্রাহ্মণের উক্তি সরল ও পরিচ্ছন্ন, "তিনি ক্ষীরোদশায়ী ভগবান বটপত্রে ভাসিতে ভাসিতে ফিরেন; নিদ্রিত ছিলেন, নিদ্রা এ রূপে অচৈতন্য ছিলেন; আর সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা হইলো…।" এই 'ক্ষীরোদশায়ী' ব্রহ্ম যে 'বাক্‌পথাতী', তাহা দোম আন্তোনিওর ব্রাহ্মণ জানিতেন, "তাহান নিরূপণ কে পাইবেক? কার যুগ্যোতা ভজিতে? অনন্ত কুটি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ যাহার ধ্যানে না পাএ; তাহানে আমরা মরলোকে কেমতে ভজিবো?"

৩০। ব্রা. রো. ক্যা. সংবাদ, পৃ. ৮।
৩১। ঐ, পৃ. ৭৪-৭৫।

রোমান ক্যাথলিকের ধর্মবোধ নিয়মানুগ ও বৈধীভক্তিসঞ্জাত হইলেও তাহার মধ্যেও আত্মবিলুপ্তির উচ্চতর সুর আছে। "তিনি যথার্থ ধর্ম্মরাজ, এবং করুণমএ, পতিতপাবন।" রোমান ক্যাথলিক মিশনারীদের ধর্ম্মমত সাম্প্রদায়িক নীতিশাস্ত্র ও গোষ্ঠীচেতনার দ্বারা সঙ্কুচিত; দোম আন্তোনিওর চিন্তাধারা ও মতবাদ তদপেক্ষা উগ্র বা নিকৃষ্ট নহে; যুক্তির পারম্পর্য্য আধুনিক কালের ধর্ম্মৈষণার দ্বারা বিচার করিলে,শিশুসুলভ মনে হইবে। তবে তাঁহার সমস্ত প্রতিবাদের মধ্যেই যে একটা বৈজ্ঞানিক যুক্তিবোধ ও লৌকিক প্রতীতির স্বাক্ষর রহিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন এভোরার জাতীয় গ্রন্থাগার হইতে এই গ্রন্থের যেটুকু নকল করিয়া আনিয়াছেন,[৩২] তাহার মধ্যে যে জাতীয় ধর্ম্মচেতনা ও নীতিবোধের ছায়াপাত হইয়াছে, তাহা অসম্পূর্ণ হইলেও সে সম্বন্ধে একটা স্থূল ধারণা করা যায়। কিন্তু বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে ও বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ আলোচনা করিবার জন্যই উহার উপাদান অতিশয় মূল্যবান্ বিবেচিত হইবে। মূল পুঁথিটি দোম আন্তোনিও নিশ্চয় বঙ্গাক্ষরে লিখিয়াছিলেন এবং নাগরীর এক পাদ্রি "দুই কলমে আন্তোনিওর পুথি নকল করিয়াছিলেন—একদিকে বাংলা অক্ষরে, আর একদিকে পর্তুগীজ হরফে মূল অংশ হুবহু নকল করিয়া তিনি নীচে পর্তুগীজ অনুবাদ যোগ করিয়া দিয়াছিলেন"।[৩৩] কিন্তু এভোরার পুথি বোধ হয় আর একখানি নকল-করা 'কপি'। কারণ, তাহাতে বঙ্গাক্ষর নাই, বাংলা অংশও রোমান হরফে রচিত; ভাষানুবাদটুকু পর্তুগীজ ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন নাগরীর অধ্যক্ষ মানোএল-দা-আস্‌সুম্প-সাঁউ; তিনি Prologo বা প্রস্তাবনায় স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন, "সরল পাঠক, তোমাকে এই বইখানি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করি; মৎকৃত বলিয়া নহে; কারণ, বাংলা হইতে পর্তুগীজ অনুবাদটুকু মাত্র আমার।"[৩৪] এভোরার পুথিতে শুধু রোমান হরফ রহিয়াছে; তখনও লিপ্যন্তরীকরণের ধ্বনিবিজ্ঞান-সম্মত কোন রীতি স্বীকৃত হয় নাই, পর্তুগীজ পাদ্রীগণ বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার সম্বন্ধেও কতটুকু অবহিত ছিলেন, তাহাও বিবেচ্য। সুতরাং রোমান হরফের মধ্যে পড়িয়া বহু বাংলা শব্দের আশ্চর্য্য রূপান্তর হইয়াছে। দোম আন্তোনিও মাঝে মাঝে যে সংস্কৃত শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে ভয়াবহ অজ্ঞতা ধরা পড়িয়াছে। এমন কি, 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদের' সম্পাদক ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন একটি শ্লোকের প্রকৃত পাঠ উদ্ধার করিতে পারেন নাই[৩৫]। এত ত্রুটি সত্ত্বেও ১৭শ শতাব্দীর বাংলা গদ্যের নিদর্শন হিসাবে উহার ভাষাতাত্ত্বিক মূল্য

৩২। ডাঃ সেন এভোরার পুথিটীর ১-৮৩ পৃষ্ঠা ও শেষের দুই পৃষ্ঠা নকল করিয়া আনিয়াছেন। অবশিষ্ট ৩৫ পৃষ্ঠা নকল করা সম্ভব হয় নাই।

৩৩। 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ,' পৃ. ২৸০।

৩৪। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক Prologo-র বঙ্গানুবাদ হইতে উদ্ধৃত।

৩৫। সেই শ্লোকটি হইতেছে এই: "অলভ্যাং যদস্তে ফলং মর্থো ভাবে রহো তন্তা, দণ্ডে ব্রহ্মা জামএ যাতি জন দিনোপ্কো, প্রমাদো নাহমিতি বাণীশং মলান্তি মৃত্যুং।"

অসাধারণ। ইহাতে কিছু কিছু পূর্ব্ববঙ্গীয় শব্দ আছে, বাগ্‌ভঙ্গিমার মধ্যে স্থানীয় উপভাষার চিহ্ন আছে, কিন্তু মূল কাঠামো যে সাধুভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাংলা গদ্যের সাধুভাষা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতমুন্‌সীদের রচিত একটা কৃত্রিম ভাষা নহে, ইহা বহু পূর্ব্ব হইতেই জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল ; তাহার প্রধান প্রমাণ, দোম আন্তোনিওর ভাষা-রীতি। তাঁহার ভাষা মনোএল বা শ্রীরামপুরের প্রটেস্টাণ্ট মিশনারীদের গদ্য অপেক্ষা অনেক বেশী সজীব ও চলতাধর্ম্মী—বাঙ্গালীর বোধগম্য সাহিত্যিক সাধুভাষার নিকটতম আত্মীয়। উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক বলিয়া ভাষার মধ্যে মাঝে মাঝে নাটকীয় পরিস্থিতির ছায়াপাত হইয়াছে। কয়েক স্থলে রোমান ক্যাথলিকের উক্তির মধ্যে ব্যঙ্গের সুর ধ্বনিত হইয়াছে। কৃষ্ণাবতার কেন অসুর বধ করিয়াছিলেন, সেই বিষয় সমর্থন করিতে গিয়া যখন ব্রাহ্মণ বলিলেন যে, অসুরবধের জন্য কৃষ্ণাবতারের প্রয়োজন হইয়াছিল, তখন রোমান ক্যাথলিক বিদ্রূপাত্মক ভাষায় প্রশ্ন করিলেন, "কেনো? পরমেশ্বরের আগ্যাতে মরে না? এ কারোণে শরীর ধরিয়া মারিলেন?" বর্ণনামূলক পরিচ্ছন্ন ভাষা হিসাবে নিম্নোদ্ধৃত উদাহরণ প্রশংসনীয় :

বলি বরো ধর্ম্মষ্ঠ ছিলো, মহাদাতা ছিলো, যে যাহারে চাহিত, তাহারে তাহা দিতো, এ কারোণ পরমেশর ব্রামন রূপে হইয়া এক পদ দিলা প্রিথিবীতে, এক পদ পাতালে, আর পদ সর্গে, এইরূপে বলিরাজারে ছলিলেন।

প্রায় সমসাময়িক এবং কিছু পরবর্ত্তী কালের রচনা বলিয়া পরিচিত বৈষ্ণব সহজিয়াদের তত্ত্ববাদপূর্ণ উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক গুরু-শিষ্য-সংবাদ জাতীয় পুথির ভাষা ইহা অপেক্ষা সুগঠিত নহে, বরং তাহাতে বাক্যগুলি অতি সংক্ষিপ্ত, কোথাও বা প্রশ্ন ও উত্তর একাক্ষরের মতো অতি শীর্ণ; ভাষা তখনও বর্ণনামূলক প্রসারতা লাভ করিতে পারে নাই। সে দিক্ দিয়া 'ব্রাহ্মণ রোমানক্যাথলিক সংবাদে'র ভাষা প্রশংসনীয়। কিন্তু পুস্তিকাটি হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী ছিল বলিয়া নাগরী গ্রামের গির্জ্জা ও ধর্ম্মান্তরিত খ্রীষ্টান সম্প্রদায় ব্যতীত বৃহত্তর হিন্দু সমাজে একেবারেই প্রচলিত ছিল না, এবং ১৯১৪ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে বাংলা দেশের শিক্ষিত বাঙ্গালীরাও উহার নাম জানিতেন না।[৩৬] সুতরাং বাংলা গদ্যের ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের সহিত ইহার বিশেষ যোগাযোগ নাই। তবে প্রাচীন বাংলা গদ্যের নিদর্শন হিসাবে ইহার মূল্য অসাধারণ, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

ক্রমশঃ

৩৬। ১৯১৪ খ্রীঃ অব্দে Bengal Past & Present-এ ফাদার হস্টেন সর্ব্বপ্রথম ইহার উল্লেখ করেন। ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে A, C, Burnell তাঁহার A Tentative List of Books and Mss. relating to the History of the Portuguese in India নামক গ্রন্থে মানোএলের Volcabulario ও Cathecism da Doutrina Christa-তে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু শেষোক্ত গ্রন্থখানিই যে 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ,' তাহা হস্টেন সাহেবের লিখিত প্রবন্ধের পূর্ব্বে কেহই জানিত না। ১৯০৩ সালে গ্রীয়ার্সন তাঁহার Linguistic Survey of India গ্রন্থের ৫ম খণ্ডে (Part I) শুধু মানোএলের ব্যাকরণের উল্লেখ করিয়াছেন।

বাঙ্গলা ভাষায় বিদ্যাসুন্দর কাব্য

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

অধ্যাপক শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

৬। (চ) বিপরীত বিহার

বিপরীত বিহার প্রসঙ্গটির দুইটি অংশ, (১) বিপরীত বিহারারম্ভ ও (২) বিপরীত বিহার। গোবিন্দদাস এই প্রসঙ্গটির বর্ণনা করেন নাই। কৃষ্ণরাম, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ও দ্বিজ রাধাকান্ত বিপরীত রতি বর্ণনা করিয়াছেন। গোবিন্দদাসের ন্যায় বলরাম ও মধুসূদনও এই প্রসঙ্গের অবতারণা করেন নাই।

সংস্কৃত 'বিদ্যাসুন্দরম্' কাব্যের যে খণ্ডিত অংশটি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এই সম্বন্ধে তিনটি শ্লোক আছে ; তাহার প্রথমটি বিপরীত রতি বর্ণনার শেষ শ্লোক এবং অপর দুইট বিদ্যার বিপরীত রতিতে তৃপ্ত সুন্দরের উক্তি। ইহা হইতে মনে হয়, মূল কাব্যে বিশদভাবে বিপরীত রতিবর্ণনা ছিল। জানি না, শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের পুঁথিতে তাহা আছে কি না। শ্লোক তিনটি যথাস্থানে উদ্ধৃত করিব।

কৃষ্ণরাম ও তাঁহার অনুসরণে রামপ্রসাদ প্রথম দিনেই নায়ক নায়িকার বিপরীত শৃঙ্গার বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা নবোঢ়া নায়িকার পক্ষে শোভন হয় নাই। প্রথম রজনীর আলাপে নবোঢ়ার পক্ষে এরূপ প্রগল্‌ভতা রসশাস্ত্রবিরোধী।

কৃষ্ণরাম এই প্রসঙ্গ এইরূপভাবে আরম্ভ করিয়াছেন—সুন্দর যখন প্রথম বিহারের পর বিদ্যার শ্রমাপনোদন করিবার কালে তাঁহার কুচযুগলে চন্দনলেপন করিতেছিলেন, তখন—

"ধরিয়া প্রিয়ার হাত দিল নিজ শিরে।
বিনয় করিয়া কবি কহে ধীরে ধীরে॥
উচ্চকুচ ফুটিয়া চঞ্চল মন অতি।
বিপরীত রতি দেহ পরম যুবতী॥
ঈষৎ হাসিয়া রামা ফিরাইল মুখ।
বাহিরে না ছাড়ে লাজ অন্তরে কৌতুক॥
ঢাকিল বসন দিয়া পীন পয়োধর।
মাত্মানী হইয়া পুন বাড়ায় আদর॥
বলে বামা বিপরীত সে আর কেমন
বুঝি প্রাণনাথ মোরে হইলে শমন॥
প্রকার কহিয়া দিল বিদগধ রায়।
এমনি করিয়া রাখ কিনিয়া আমায়॥"

রামপ্রসাদ কৃষ্ণরামের অনুসরণ প্রায় সর্বক্ষেত্রেই করিয়াছেন, এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। প্রথম বিহারের পর রসালস বর্ণনা করিয়াই রামপ্রসাদ লিখিতেছেন—

"ক্ষণেক অন্তরে কহে কবি মহামতি।
বিপরীত রতিদান দেহ লো যুবতী॥
নেকা ঢঙ্গ হয়্যে রামা কহে সেই কি।
প্রকার শুনিয়া লাজে দাঁতে কাটে জি॥
অন্তরে আনন্দ অতি সায় দিতে নারে।
পুরুষের কাজ প্রভু রমণী কি পারে॥"

কৃষ্ণরাম ইহার পর প্রসঙ্গান্তরে বিদ্যাসুন্দরের বিপরীত বিহার লইয়া বাক্‌ছল বর্ণনা করিয়াছেন—

"বলে রামা এড় মেনে এ কি এ বালাই।　প্রায় বুঝি পতি বধে ভয় নাহি কর॥
কেমনে এমন বল লাজমাত্র নাঞি॥　সুকবি পণ্ডিত যেবা বিদগধ রায়।
রমণী এমন কাজ করে না যে কভু।　অবলা ভুলান তার কত বড় দায়॥
ছাড়হ গোঁয়ারপনা নিদারুণ প্রভু॥　ভুলিল রমণীমণি পতির আদরে।
কে তোমারে শিখাইল এমন বন্ধান।　ঈষৎ হাসিয়া বলে গদগদ স্বরে॥
আমি ত না জানি কভু ইহার সন্ধান॥　কত বা করিব নয় পুন পুন সাধ।
পতি যার বৃদ্ধ হয় সেবা ইহা পারে।　এ বড় তরাস করি পাছে মোরে বধ॥
লাজ ঘুচাইয়া কত কহিব তোমারে॥　এমনি করিবে যদি দূরকর আল।
বারবধূ লইয়া বুঝি আছিলা কোন দেশে।　আঁধারে কি করে লাজ তবে হয় ভাল॥
তে কারণে বাসনা হইল হেন রসে॥　নৃপসুত বলে যদি দীপ দূর করি।
এবা কোন কর্ম্ম কেন এতেক যতন।　তথাপি তোমার রূপে আল করে পুরী॥
প্রায় পোহাইল নিশি করহ শয়ন॥　ভাবিয়া চিন্তিয়া রামা তেজে ভয় লাজ।
কবিবর বলে যদি বাক্য নাহি ধর।　মাতিল মদন রসে বিপরীত কাজ॥"

রামপ্রসাদ এই ভাবে উভয়ের বাক্‌ছলের বর্ণনা করিয়াছেন—

"বিদগ্ধ বট হে প্রভো বিজ্ঞ নিজে হও।　লংঘনে স্বামীর বাক্য জন্মে মহাপাপ।
কেমনে এমন কথা মুখ ভরে কও॥　সুধাংশু বদনে শীঘ্র শান্ত কর তাপ॥
সাঁতারে হাঁপায়ে শেষে স্রোতে ঢাল গা।　বিদ্যা বলে পায় পড়ি সে কি এত মধু।
সেইরূপ চেষ্টা পাও মনে আছে যা॥　গণিকা ত নহি প্রভু হই কুলবধূ॥
এ কথা না ভুলি আর মরমে রহিল।　কবি কহে যে কহ সে কহ প্রাণপ্রিয়া।
এমন সময় নহে কালেতে হইল॥　রক্ষা কর বিপরীত রতিদান দিয়া॥
মিছে পরিহাস হাস কিবা প্রিয়ে ভাষ।　নহিলে হে তাহা আমি যদি মরি আজি।
ভাবে বুঝি ভর্ত্তা বধে ভয় নাহি বাস　ভ্রান্ত কান্ত শান্ত হও হইলাম রাজি॥"

দ্বিজ রাধাকান্ত একটু নূতনত্ব করিয়াছেন। বিদ্যার গর্ভপ্রকাশ হইয়া পড়ার পর কোটাল যখন চোর ধরিবার ফাঁদ পাতিতেছিল, সেই সময় একদিন সুন্দর আসিয়া বিপরীতরতি প্রার্থনা করিলেন—

"এথায় আসিয়া রায় যুবতী লইঞা।　সেরূপ প্রকার তারে কহে যুবরায়।
সে দিবস বড় রস শুন মন দিঞা॥　শুনিয়া সরোজমুখী বসনে লুকায়॥
হাসি হাসি মধুপূর্ণ অধর চুম্বিত।　বলে একবারে কি খায়াছ সব লাজ।
বলে একবার দেহ রতি বিপরীত॥　নারী কি করিতে পারে নাগরের কাজ॥
বিদ্যা বলে কি কহ কিছুই না জানি।　আই মা কি বালাই জঞ্জাল এত আছে।
সে আর কেমন নাথ, কহ দেখি শুনি　অসম সমস্যা সব শিখ কার কাছে॥

লাজেরে পড়ুক বাজ বলে যুবরাজ।
এখন যে কব লাজ এ বড় নিলাজ ॥
কত না যতনে রামা সম্মত হইঞা।
সাজিলা পুরুষ সাজ বসিলা হাসিয়া ॥
কামিনীর বসনে ভূষণে সাজে রায়।
অদ্ভুত দেখিয়া সব সখীরা পালায় ॥"

এখানে দ্বিজ রাধাকান্ত বিদ্যাকে পুরুষ ও সুন্দরকে নারী সাজাইয়া বিপরীত বিহারের কৌতুক করিয়াছেন। তিনি যে গর্ভবতী বিদ্যাকে দিয়া বিপরীত বিহার করাইয়াছেন, তাহা অনুচিত হইয়াছে। কামশাস্ত্র বা চিকিৎসাশাস্ত্র মতে গর্ভিণীর পক্ষে বিপরীত রতি একেবারেই উচিত নহে।*

ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন, প্রথম দিন মিলনের পর সুন্দর বিদ্যার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিয়া দামোদরতীরে প্রভাতক্রিয়া সমাপনান্তে স্নানপূজা সারিয়া হীরার মন্দিরে গেলেন। মালিনী ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া রাজবাড়ীতে গেলে বিদ্যা সখীগণকে ইঙ্গিতে জানাইয়া দিলেন, তাহারা যেন তাহাকে রাত্রির বৃত্তান্ত কিছু না বলে। বিদ্যা হীরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তাঁহাকে আনিবার কি উপায় করিলে ?" হীরা বলিলেন—

"তারে গিয়া কহিলাম তোমার বচনে।
সে বলে বিদেশী আমি যাইব কেমনে ॥
কোন মতে কোন পথে কেমনে আনিবে।
কে দেখিবে কে শুনিবে বিপাকে মজিবে ॥
কি জানি কি বুঝিয়াছ কি আছে কপালে।
মজাইবে মিছা কাজে পরের ছাবালে ॥
মিছা ভয় করিয়া না কহ বাপমায়।
আমি কহিবারে চাহি মানা কর তায় ॥
বুঝিয়া আপনি কর যেবা মনে ভায়।
ধর্ম্ম জানে আমি নাহি এ সব কথায় ॥"

হীরা পূর্ব্ববৎ বাজার করিয়া আনিয়া দিলে রন্ধন ভোজন করিয়া সুন্দর তাহাকে বিদ্যার গৃহে যাইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। হীরা বলিল, প্রকাশ্যে রাজা রাণীকে বলিয়া সে বিবাহ সংঘটন করিতে পারে, কিন্তু চুপে চুপে বিদ্যার আলয়ে তাহাকে লইয়া যাইতে সে অক্ষম। সুন্দর তাহাকে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়ার জন্য অনুযোগ করিয়া বলিলেন, "আমি দৈববলে ঐ কার্য্য করিব। তোমার ঘরে কুণ্ড কাটিয়াছি, কালীর সাধনা করিব, রাত্রে যেন তুমি আমার সন্ধান করিও না।" তাহার পর দ্বারে খিল দিয়া সুড়ঙ্গপথে রাত্রে বিদ্যার মন্দিরে গমন করিলেন। দ্বিতীয় রাত্রের মিলনের প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র লিখিতেছেন—

"এত বলি দুই দ্বারে খিল লাগাইয়া।
বিদ্যার মন্দিরে গেলা শুকেরে কহিয়া ॥
বুঝহ চতুর সব কি এ চতুরালি।
কুটনীরে ফাঁকি দিয়া করে নাগরালি ॥
যেমন নাগর ধূর্ত্ত তেমনি নাগরী।
সেবার কারণ মাত্র জানে সহচরী ॥
গীতবাদ্য কৌতুকে মজিয়া গেল মন।
মত্ত দেখি দুজনে পলায় সখীগণ ॥"

ইহার পর বিদ্যাসাগর-সংস্করণে ও প্রচলিত সংস্করণগুলিতে প্রসঙ্গ সমাপ্তিসূচক দুই পংক্তির পর "বিপরীত বিহারারম্ভ" নামক প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ফরাসী রাজধানী প্যারি

---

* "ন সেবতে ন প্রসূতাং ন মৃগীং ন চ গর্ভিণীম্। ন চাতিব্যায়তাং নারীং যোজয়েৎ পুরুষায়িতে।" কামসূত্রম্ ২।৮।

নগরীর জাতীয় গ্রন্থাগারে যে পুঁথিখানি রক্ষিত আছে, তাহাতে অতিরিক্ত চারিটি পংক্তি আছে। আমাদের মনে হয়, তাহা ভারতচন্দ্রের মূল পুস্তকের অন্তর্গত। পংক্তি কয়টি উদ্ধৃত করিতেছি—

"পূর্ব্বমত কামহোম করি সমাপন। বিহারে মদনরসে অধিক করিয়া।
সুরতান্তে শান্ত হইয়া বসিলা দুজন ॥ ধীরে ধীরে কহে ধীর অধীর হইয়া ॥"

এই পংক্তি চারিটি যে ভারতচন্দ্রের রচনা নহে, তাহা মনে করিবার কোন হেতু নাই। তাহার উপর কামশাস্ত্রমতে সুরতের প্রারম্ভেই বিপরীত বিহার, বিশেষতঃ নবোঢ়া নায়িকার পক্ষে একেবারেই সম্ভব নহে। পূর্বে একবার সুরত ঘটিলে তাহার পরই বিপরাত শৃঙ্গার সম্ভব। ভারতচন্দ্র কদাচ এইরূপ শাস্ত্রবিরোধী ভুল করিবেন না।

ভারতচন্দ্র সুন্দরকে দিয়া সুকৌশলে বিপরীত বিহারের প্রস্তাব করাইয়াছেন, ইহা তাঁহার মৌলিকত্ব—

"সুন্দরীর করে ধরি　　সুন্দর বিনয় করি
　　কহে শুন শুন প্রাণেশ্বরি।
আজি দিনে দুপ্রহরে　　দেখিলাম সরোবরে
　　কমলিনী বান্ধিয়াছে করী ॥
গিরি অধোমুখে কাঁদে　　এ কথা কহিতে চাঁদে
　　কুমুদিনী উঠিল আকাশে।
সে রস দেখিতে শশী　　ভূতলে পড়িল খসি
　　খঞ্জন চকোর মিলি হাসে ॥
কি দেখিনু আহা আহা　　আর কি দেখিব তাহা
　　কি জানি ঘটাবে বিধি কবে।
তুমি কন্যা এ রাজার　　তোমারি এ অধিকার
　　দেখাও যদ্যপি দেখি তবে ॥
বিদ্যা বলে মহাশয়　　এ নাকি সম্ভব হয়
　　রায় বলে দেখিনু প্রত্যক্ষ।
এ দুঃখে যদ্যপি তার　　এখনি দেখাতে পার
　　কি কর সিদ্ধান্ত পূর্ব্বপক্ষ ॥
সুন্দরী বুঝিয়া ছলে　　মুচকি হাসিয়া বলে
　　বড় অসম্ভব মহাশয়।
শিলা জলে ভাসি যায়　　বানরে সঙ্গীত গায়
　　দেখিলেও না হয় প্রত্যয় ॥
রায় বলে আমি করী　　তুমি কমলিনীশ্বরী
　　বান্ধহ মৃণাল ভুজপাশে।
আমি চাঁদ পড়ি ভূমি　　ফুল্ল কুমুদিনী তুমি
　　উঠ মোর হৃদয় আকাশে ॥
নয়ন খঞ্জন মোর　　নয়ন চকোর তোর
　　দুহে মিলি হাসিবে এখনি।
ঘামছলে কুচগিরি　　কাঁদিবেক ধীরি ধীরি
　　করি দেখ বুঝিবে তখনি ॥
শুনি মনে মনে ধনী　　বাখানে নাগরমণি
　　বিনামূলে কিনিলে আমারে।
অন্তরে না সহে ব্যাজ　　বাহিরে বাড়ায় লাজ
　　এড় মেনে হারিনু তোমারে ॥
পুরুষের ভার যাহা　　নারী না কি পারে তাহা
　　তুলিতে আপন ভার ভারি।
আজি জানিলাম দড়　　পুরুষ নির্লজ্জ বড়
　　লাজে বাধে নৈলে কৈতে পারি ॥
শিখিয়াছ যার কাছে　　তাহারি এ গুণ আছে
　　সে মেনে কেমন মেয়ে বটে।
ভাল পড়া পেয়েছিল　　ভাল পড়া পড়াইল
　　লাভে হৈতে মোরে ফের ঘটে ॥
লাজ নাহি চল চল　　কেমনে এমন বল
　　পুরুষের এত কেন ঠাট।
যার কর্ম্ম তার সাজে　　অন্য লোকে লাঠি বাজে
　　কে কোথা দেখেছে হেন নাট ॥

চেতাইলে বুঝি চেত যৌবনে অলস এত
বুড়া হৈলে না জানি কি হবে।
ক্ষমা কর ধরি পায় বিফলে রজনী যায়
নিদ্রা যাও নিদ্রা যাই তবে॥
আমারে বুঝাও ভাবে এ কর্মে কি সুখ পাবে
আমি কিছু না পাই ভাবিয়া।
হৃদয়ের রাজা হয়ে চোর হেন হেঁটে রয়ে
কিবা লাভ নিগ্রহ সহিয়া॥
করিয়া সুখের নিধি পুরুষে গড়িল বিধি
দুঃখহেতু গড়িল তরুণী।
তাহা করি বিপরীত কেন চাহ বিপরীত
এ কি বিপরীত কথা শুনি॥
রায় বলে পুন পুন সাধিলে যদি না শুন
অরণ্যে রোদনে কিবা ফল।
কথায় বুঝিনু আজ আমা হৈতে প্রিয় লাজ
লাজ লয়ে করহ কৌশল॥
দিয়াছি যে আলিঙ্গন করিয়াছি যে চুম্বন
সে সব ফিরিয়া মোরে দেহ।
কল্যাণ করুন কালী নাহি দিও গালাগালি
দেশে যাই মনে রেখ স্নেহ॥
হাসি ঢলি পড়ে ধনী কি বলিলা গুণমণি
ফিরে দিব চুম্ব আলিঙ্গন।
এ কি কথা বিপরীত দুই মতে বিপরীত
দায়ে কাটে কুমড়া যেমন॥
না দেখি না শুনি কভু যদি ইহা হবে প্রভু
না পারিব থাকিতে প্রদীপ।
ভারত দিলেন সায় যে কর্ম্ম করিবে তায়
অপ্রদীপে হইবে প্রদীপ॥"

কৃষ্ণরামই সর্বপ্রথমে, সম্ভবতঃ সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের পূর্বোদ্ধৃত শ্লোকটির ছায়া অবলম্বনে (৬।৩), বিদ্যাকর্তৃক দীপ নির্বাপিত করিবার প্রস্তাব করাইয়াছেন। রামপ্রসাদ সর্ববিষয়ে তাঁহার অনুসরণ করিলেও তাঁহার বিদ্যা অধিকতর প্রগল্ভা, সে ঐরূপ কোন প্রস্তাব করে নাই।

বিপরীত শৃঙ্গারের অনেক বর্ণনা সংস্কৃত সাহিত্যে আছে। সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর কাব্যটিতে এ সম্বন্ধে যে তিনটি শ্লোক পাওয়া যায়, তাহার প্রথমটি বিপরীত শৃঙ্গার সম্বন্ধে কবির উক্তি এবং বাকী দুইটি সুন্দরের উক্তি। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

"শৃঙ্গারমেতদ্‌বিপরীতমস্যাঃ সমাচরন্ত্যা নৃপরাজপুত্র্যাঃ।
কর্ণে শশী কুণ্ডলছদ্মরূপো গণ্ডস্থলী চুম্বতি কিং স কামী॥"

অর্থাৎ এইরূপে নৃপনন্দিনী যখন বিপরীত শৃঙ্গার করিতেছিলেন, তখন তাঁহার কর্ণস্থিত কুণ্ডলটিকে মনে হইতেছিল, যেন কামী চন্দ্র ছদ্মবেশে তাঁহার গণ্ডস্থল চুম্বন করিতেছেন।

"উত্তুঙ্গস্তনযুগ্মনির্দয়দৃঢ়াশ্লেষেণ তেঽস্য প্রিয়ে,
দন্তাঘাতনখক্ষতৈঃ সুমধুরালাপৈস্তথা চুম্বনৈঃ।
নানাবন্ধবিনোদিতাধিকরসেনৈতৎ কৃতং সার্থকং
গাত্রং মে পুরুষায়িতেন শমিতা কন্দর্পবাণব্যথা॥
যদ্বক্ত্রং মুখরঙ্ক কুণ্ডলযুগং দোলায়মানং প্রিয়ে
নিঃশব্দং বহতীহ নূপুরযুগং যদ্‌যৎ কৃতং ভাবিনি।
নিঃশব্দা কটিমেখলা ঘনরবং বিজ্ঞাপয়ন্তী স্মরং
কুর্বাণা জয়ডিণ্ডিমধ্বনিমসৌ শৃঙ্গারসম্ভাণ্ডবে॥"

অর্থাৎ "হে প্রিয়ে, আজ তোমার উত্তুঙ্গ স্তনদ্বয় নির্দয়ভাবে দৃঢ়মর্দন করিয়া, দন্তাঘাত, নখক্ষত, সুমধুর আলাপ, চুম্বনাদি ও নানাবিধ রতিবন্ধে সঞ্চারিত অত্যধিক কামরসে আমার দেহটি সার্থক হইয়াছে এবং তুমি যে পুরুষায়িত বা বিপরীত শৃঙ্গার করিয়াছ, তাহার দ্বারা আমার কন্দর্পের বাণের ব্যথা প্রশমিত হইয়াছে।

হে প্রিয়ে, তোমার যে (রতকূজিতে) মুখর বদন, তাহা এখন নিস্তব্ধ, দোলায়মান কুণ্ডলযুগল নিশ্চল, নূপুরদ্বয় নিঃশব্দ, শৃঙ্গারতাণ্ডবে তোমার যে কটিমেখলা ঘন রব করিয়া কামকে সম্বর্ধনা করিয়া জয়ডিণ্ডিমধ্বনি করিতেছিল, তাহাও এখন নিঃশব্দ হইয়া রতাবসান সূচিত করিতেছে।

বিপরীত শৃঙ্গার বর্ণনা ভারতচন্দ্র ব্যতীত আর কেহই বিশদভাবে করেন নাই। কৃষ্ণরাম অতি সংক্ষেপে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন—

"সঘনে নিতম্ব দোলে মুকুত কুন্তল।
তাহা আবরণ কৈল বদন মণ্ডল॥
সিহালায় সরোজ ঢাকিয়া হেন বাসি।
রাহু যেন গরাসিল পূর্ণিমার শশী॥
সমর বিজয় দেখি পতি দিল ভঙ্গ।
গন্ধবহা চন্দনেতে জুড়াইল অঙ্গ॥"

রামপ্রসাদও কৃষ্ণরামের ন্যায় সংক্ষেপে বিপরীত শৃঙ্গার বর্ণনা করিয়াছেন—

"লাজের দুয়ারে ধনী ভেজায় কপাট।
প্রবৃত্ত প্রকৃত কার্য্যে তবু নানা ঠাট॥
বিগলিত জঘনে সঘনে বেণী দোলে।
যেন পূর্ণশশী পূর্ণশশী করে কোলে॥
অদ্ভুত চরিত্র চিত্ত মধ্যে লাগে ধন্দ।
প্রফুল্ল কমলে মধু পিয়ে মকরন্দ॥
চকোর খঞ্জনে প্রেম আলিঙ্গন করে।
বিকচ কমলে চান্দে বারি বিন্দু ঝরে॥
মনের বাসনা পূর্ণ তূর্ণ রসে ক্ষমা।
মুখে মন্দ মন্দ হাস বাস পরে রামা॥"

দ্বিজ রাধাকান্ত কিঞ্চিৎ বিস্তারিতভাবে লিখিয়াছেন—

"লাজে পরিহরি রতি আরোহে কামিনী।
কনক শিখরে যেন খেলে কমলিনী॥
অনুমানি চাঁদ যেন আসিয়া ভূতলে।
পিয়ে মধুরস সার বসিয়া কমলে॥
রতিরস বিনা সে আকুল কেশপাশ।
রাহু যেন আসি শশী করিল গরাস॥
রহি রহি কুচযুগ দেখিছে চাহিঞা।
নাচয়ে অচল যেন অধোমুখ হৈয়া॥
রতিবল শ্রমে মুখে বহে ঘর্ম্মধারা।
সারি সারি শোভে যেন মুকুতার হারা॥"

ইহার পর দ্বিজ রাধাকান্ত লিখিতেছেন। রাণী রাত্রে স্বপ্নে ইহা দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গে প্রভাতে কন্যার ভবনে উপস্থিত হইলেন। সখী সুলোচনা বিদ্যাসুন্দরকে সাবধান করিয়া দিলেন, সুন্দর নারীবেশেই পলায়ন করিলেন। বিদ্যার অঙ্গে রতিচিহ্ন ও পরিধানে পুরুষের বসন দেখিয়া রাণী তাহাকে ভর্ৎসনা করিলেন ও সেই পুরুষের বসন লইয়া রাজাকে গিয়া দেখাইলেন।

ভারতচন্দ্রের বিপরীত বিহার বর্ণনা অপূর্ব কাব্য—

"মাতিল বিদ্যা বিপরীত রঙ্গে।
সুন্দর পড়িলা প্রেম তরঙ্গে॥
আলুথালু লাজে কবরী খসি।
জলদের আড়ে লুকায় শশী॥

লাজের মাথায় হানিয়া বাজ।
সাধয়ে রামা বিপরীত কাজ॥
ঘন অবিলম্ব নিতম্ব দোলে।
ঘুন ঘুন ঘন ঘুঙ্ঘুর বোলে॥
আবেশে ছাঁদি ধরে ভুজ যুগে।
মুখ পূরে মুখ কর্পূর পূগে॥
ঝন ঝন ঝন কঙ্কণ বাজে।
রন রন রন নূপুর গাজে॥
দংশয়ে পতির অধর দলে।
কপোত কোকিলা কুহরে গলে॥
উথলিল কামরস জলধি।
কত মত সুখ নাহি অবধি॥
ঘন ঘন ভুরু কামান টানে।
জর জর করে কটাক্ষ বাণে॥
থর থর ধনী আবেশে কাঁপে।
অধীরা হইয়া অধর চাপে॥
ঝর ঝর ঝরে অঙ্গের ঘাম।
কোথায় বসন ভূষণ দাম॥
তনু লোমাঞ্চিত শীৎকার মুখে।
কাঁপিয়া কাঁপিয়া চাপয়ে সুখে॥
অটল আছিল টলিল রসে।
অবশ হইয়া পড়ে অলসে॥
পড়িল দেখিয়া উঠে নাগর।
আহা মরি বলি চুম্বে অধর॥
অবশ দোঁহে মুখ মধু খেয়ে।
উঠিল ক্ষণেকে চেতন পেয়ে॥
জর জর দুই বীরের ঘায়।
রতি লয়ে রতিপতি পলায়॥"

এত সংযত ভাষায় কোন বাঙ্গালী কবি এই প্রসঙ্গ বর্ণনা করিতে পারেন নাই।

(ছ) বিদ্যাসুন্দরের রহস্যলীলা

গোবিন্দদাস লিখিতেছেন, প্রথম রাত্রির মিলনের পর সুন্দর মালিনীর গৃহে আসিয়া রাত্রের বসনাদি পরিত্যাগ করিয়া মালিনীকে দিলে, সে তাহা কাচিতে দিবার জন্য রজকের গৃহে গেল। রজক হাসিয়া মালিনীর সহিত রহস্য করিয়া বলিল, "তোমার গৃহে পুরুষ নাই, ইহা আমি জানি।" মালিনী ইহাতে ভীত হইয়া উঠিল, সে সভয়ে বলিল "মোর বাড়ী আসিয়াছে মোর বুহিনীতনয়।" রজক তখন তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল…"মাল্যানী তুমি যাহ বাড়ী। যে তোমার মন লয় দেহ সেই কড়ি।"

এই রজকপ্রসঙ্গ কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ চোর ধরা প্রসঙ্গে ভিন্ন ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা যথাস্থানে তাহার আলোচনা করিব। গোবিন্দদাস ইহার পর বিদ্যাসুন্দরের কেলিকৌতুকের কোন বৈচিত্র্যের বর্ণনা করেন নাই। কৃষ্ণরাম প্রথম রাত্রির মিলনের পর বিদ্যার সহিত মালিনীর রহস্যালাপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার পর বিদ্যার মানভঞ্জন প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। কৃষ্ণরাম যে মালিনী ও বিদ্যার মধ্যে রহস্যালাপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে কিছু বিশেষত্ব নাই, কিন্তু রামপ্রসাদ এ বিষয়ে কিছু বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন।

"শুনিয়া নিশির কথা মনে মনে হাস্যযুতা
হীরাবতী প্রফুল্ল অন্তরে।
নানা ফুলে নানা ভাতি যেন মুকুতার পাঁতি
হার গাঁথি লইল সত্বরে॥
গেল নৃপসুতা পাশে রামা হাসে লাজ বাসে
অধোমুখে বিধুমুখ ঢাকে।
আগুসারি যত্ন করি মালিনীর হাতে ধরি
সমাদরে বসাইল তাকে॥

হীরা বলে রও রও কেন গো উতলা হও
আজি এত কেন ঠাকুরালি।
হেদে বাছা ছাড় লাজ সারাসোরা হল্যো কাজ
দেহ পুরস্কার ঘটকালি॥
কুশল সংবাদ কহ ভাব যদি ভিন্ন নহ
তুমি বধূ বটি গো শাশুড়ী।
হবে গো ছুলাল তোর সেদিন কেমন মোর
সে ডাকিবে কোথা আইবুড়ী॥
কাছে আস্যা হাস্যা আলি শিরে তৈল দিল ঢালি
আপনি আঁচড়ে বিদ্যা কেশ।
কত ঠাট জানে হীরা পুনরপি কহে ফিরা
বুড়ী আমি বৃথা কর বেশ॥

বিদ্যা বলে নহ বুড়ী মাশাশ্ রসের গুঁড়ী
মর্ মাগী এত এসে তোরে।
ছাই কথা কি কহিস পুনঃ পুনঃ লজ্জা দিস
পায় পড়ি ক্ষেমা কর মোরে॥
যেতে হবে ঠাঁই ঠাঁই ভুলিয়াছি মনে নাই
মালিনী কৌতুকে কহে হাসি।
হইল স্নানের কাল মিছা করি গল্পগাল
সকলি শুনিব কাল আসি॥
বিদ্যা দিল চালু কড়ি কলাই কুমড়া বড়ী
হীরাবতী ঘরে যায় রঙ্গে।
কি কর শাশুড়ে বসে কহে হেসে শুন এসে
যে কথা হইল তার সঙ্গে॥

এই আলাপে অনেক গ্রাম্যতা রহিয়াছে, যাহা রাজকন্যা বা রাজপুত্রের সহিত আলাপে থাকা উচিত নহে। রামপ্রসাদ ইহার পরে কৃষ্ণরামের অনুসরণে বিদ্যার মানভঞ্জন প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। গোবিন্দদাস, কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও মধুসূদন বিদ্যাসুন্দরের মিলনাদির পর হইতে বিদ্যার মান পর্য্যন্ত আর কোন প্রসঙ্গের অবতারণা করেন নাই, রামপ্রসাদ কেবল মালিনী ও বিদ্যার রহস্যালাপ এবং মধুসূদন 'বিদ্যাসুন্দরের গোপন জীবন যাপন' প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, সুন্দর দিনে সন্ন্যাসী সাজিয়া নগরে নগরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ও রাত্রে বিদ্যার গৃহে নিশিযাপন করিতে লাগিলেন।

দ্বিজ রাধাকান্ত বিদ্যাসুন্দরের শৃঙ্গার বর্ণনার পর "বিদ্যাসুন্দরের সহিত মালিনীর আলাপ ও সুন্দরের সহ পুষ্পবনে বিহারে বিদ্যার সম্মতি" এই প্রসঙ্গ হইতে কয়েকটি প্রসঙ্গের ভিতর দিয়া বিদ্যার খণ্ডিতাবস্থা বা 'মান' ও 'মানভঙ্গ' প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। আমরা যথাকালে তাহার বিষয় আলোচনা করিব।

ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দরের "বিপরীত বিহার" প্রসঙ্গের পর "সুন্দরের সন্ন্যাসিবেশে রাজদর্শন" ও "বিদ্যার সহিত সুন্দরের রহস্য" নামক দুইটি প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার পর "দিবাবিহারের" সূত্র ধরিয়া "বিদ্যার মান" ও "মানভঙ্গের" বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের সুন্দর একাকী সন্ন্যাসিবেশে রাজসভায় দর্শন দিয়াছিলেন। রাধাকান্ত বিদ্যা ও সুন্দর উভয়কে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী সাজাইয়া রাজসভায় লইয়া গিয়াছেন অথচ রাজা নিজ কন্যাকে চিনিতে পারেন নাই, ইহা অত্যন্ত অসম্ভব ও অশোভন হইয়াছে। অনূঢ়া কন্যা কর্তৃক পিতার সহিত এরূপ ছল মোটেই শিষ্ট-রুচি-সম্মত হয় নাই।

ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন, সুন্দর নানাবিধ ছদ্মবেশে নগরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন তাহার পর তাঁহার রাজসভা দেখিবার বাসনা হইল এবং সন্ন্যাসিবেশে যাইলে আদর পাইবেন, এই মনে করিয়া সন্ন্যাসিবেশে গিয়া বিদ্যার প্রতিজ্ঞার কথা উল্লেখ করিয়া তাহার সহিত বিচার প্রার্থনা করিলেন। রাজা ফাঁফরে পড়িলেন। রাজাকে ভাবিতে দেখিয়া সুন্দর কহিলেন—

"সন্ন্যাসী কহেন কিবা ভাবহ এখন।
ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন ॥
রাজা বলে গোঁসাই বাসায় আজি চল।
করা যাবে যুক্তিমত কালি যেবা বল ॥
সভাসদে জিন আগে করিয়া বিচার।
তবে সে বিচারযোগ্য হইবা বিদ্যার ॥"

সুন্দর প্রত্যহ সভাসদ্‌গণকে বিচারে পরাস্ত করিয়া বিদ্যাকে আনিতে বলিতে লাগিলেন। এদিকে সুন্দর বিদ্যাকে আসিয়া বলিলেন যে, একজন সন্ন্যাসী তাহার সহিত বিচার করিতে আসিয়াছে, সে সমস্ত সভাসদ্‌কে বিচারে পরাস্ত করিয়াছে। এই লইয়া উভয়ের মধ্যে রহস্যালাপ হইল। মালিনী রাজবাড়ীতে সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া বিদ্যাকে আসিয়া বলিল—

"কেমন সুন্দর বর আমি দিনু আনি।
না কহিয়া বাপমায়ে হারাইলা জানি ॥
তোমা হেন রসবতী তার ভাগ্যে নাই।
কি কব তোমারে তারে না দিল গোঁসাই ॥
থাকহ সন্ন্যাসী লয়ে সন্ন্যাসিনী হয়ে।
সে যাউক সন্ন্যাসী হয়ে হাতে খোলা লয়ে ॥

বিদ্যা তাহা শুনিয়া হীরাকেই তিরস্কার করিলেন যে, "নিত্য নিত্য তাহাকে আনিয়া দিতে বলি, তুমি আনিয়া দেও না, তাহার রূপ দেখিয়া নিজে ভুলিয়াছ।" হীরা বাড়ী ফিরিয়া সুন্দরকে সন্ন্যাসীর কথা বলিল, সুন্দর বিদ্যার মত জানিতে চাহিলেন—

"হীরা বলে সে মেনে তোমারি দিকে আছে। এখনো কহিল লয়ে যেতে তার কাছে ॥"

পূর্বেই বলিয়াছি, দ্বিজ রাধাকান্ত বিদ্যাসুন্দরের বিচারের পর বিবাহের জন্য রাজার অনুমতি লইবার জন্য সুন্দর ও বিদ্যাকে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী সাজাইয়া রাজদ্বারে লইয়া গিয়াছেন ও ছলে তাঁহার সম্মতি আদায় করাইয়াছেন (৬। ক)। এই ব্যাপার লইয়া রাধাকান্ত তিনটি প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন—(১) সুন্দর ও বিদ্যার তপস্বী ও তপস্বিনীর সাজ, (২) রাজসভায় বিদ্যাসুন্দরের ছদ্মবেশে উপস্থিতি ও মিথ্যা পরিচয় দান ও (৩) বীরসিংহের নিকট হইতে সুন্দরের বিবাহের জন্য ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ ও বিদ্যার সহিত বিচার প্রার্থনা। ইহা নিতান্তই নূতনত্ব দেখাইবার জন্য ভারতচন্দ্রের উপর কারসাজির ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

বলরাম কবিশেখর বিদ্যাসুন্দরের "বিহার" প্রসঙ্গের পর "স্বপ্নচ্ছলে সখীদিগের নিকট বিদ্যার সুন্দরের সহিত মিলন বর্ণনা" করিয়াছেন; এই বর্ণনায় যথেষ্ট কবিত্ব আছে।

"সুলঙ্গের পথ বিদ্যা গুপতে রাখিল।
কপাট ঘুচায়্যা যত সখীরে ডাকিল ॥
সন্নিধানে আইল যতেক সখীগণ।
ভাঙিয়া কহেন বিদ্যা নিশির স্বপন ॥
শুনহ স্বপন সখি বৈস মোর পাশে।
স্বপন দেখিয়া বড় পাইল তরাসে ॥
এমত স্বপন নাহি দেখি কোন কালে।
না জানি বিধাতা কিবা লিখিল কপালে ॥
এক যে পুরুষবর বড়ই সুন্দর।
নাহি জানি কোন পথে আইল মোর ঘর ॥
চন্দ্রবদন তার রূপ মনোহর।
হাসি হাসি বসিয়া ধরিল মোর কর ॥
করে ধরি বসন কাড়িয়া নিল বলে।
মাণিক রচিত হার দিল মোর গলে ॥
লাজ পরিহরি তোরে কহিল স্বপন।
রতিরস মাগি মোরে দিল আলিঙ্গন ॥
নিদ্রা ভাঙ্গিল নিশি হইল প্রভাত।
নাহি জানি কোন পথে গেল প্রাণনাথ ॥"

সখীগণ স্বপনের বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিল—ইহা অত্যন্ত শুভলক্ষণ, কোন রাজপুত্র তোমার বর হইবে। ইহার পর বলরাম যে বিদ্যাসুন্দরের গোপন জীবন যাপন প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে লিখিয়াছেন যে, একদিন সুন্দর অতিরিক্ত নিদ্রিত হইয়া পড়ায় বিদ্যার গৃহে যাইতে পারেন নাই, সেই জন্য কুমারের আশায় রাত্রি জাগিয়া বিদ্যা মানিনী হইয়াছিলেন, অথচ বিদ্যার মান-ভঞ্জন প্রসঙ্গ বলরাম বর্ণনা করেন নাই।

(ক্রমশঃ)

টলেমি-বর্ণিত কিরাদিয়া (Kirradia) কোথায় ?

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত বি. এস-সি.

অধ্যাপক শ্রীহেমচন্দ্র রায়চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত বাংলার ইতিহাস, ১ম ভাগ, ৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "বঙ্গদেশের সমুদ্রতীরে ম্লেচ্ছদের বসতি ছিল, মহাভারতে তাহার বর্ণনা আছে ; ভাগবতপুরাণে (১১. ৪. ১৮) সুহ্মদের পাপিষ্ঠ জাতি বলিয়া উল্লেখ আছে—কিরাত ও হূণগণও ঐ পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে—পুণ্ড্র ও বঙ্গদেশীয়দের মধ্যে ভ্রমণান্তে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে বলিয়া বৌধায়নের ধর্মসূত্রে বিধি প্রদত্ত হইয়াছে।"[১]

ডাঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায়, ১৯৫০, পৃ. ৭৫, লিখিয়াছেন, "আর্যদের ভারত আগমনের আগে যে সব জাতি ভারতবর্ষে ছিল, তাহাদের মধ্যে তৃতীয় ছিল মোঙ্গলীয়। প্রাচীন আর্যগণ ইহাদের কিরাত বলিয়া জানিতেন। যজুর্বেদে ও অথর্ববেদে এই কিরাতদের উল্লেখ আছে। ইহারা গুহা ও পর্বতে বাস করিত। ইহারা নেপাল ও হিমালয়ের দক্ষিণে নানা অঞ্চলে অধিষ্ঠিত হয়।"[২]

প্রাচীন বিদেশী লেখকদের মধ্যেও আমরা কিরাতের উল্লেখ পাই। পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সিতে আছে "সমুদ্রতীরে ফিরিয়া (পূর্বোক্ত) ৩টি বাজার হইতে বেশী দূরে নয়—আমরা পাই ম্যাসালিয়া (Masalia), এখান হইতেই দেশে প্রবেশের পথ—ভিতরে বিস্তীর্ণ ভূভাগ। এখানে বহু পরিমাণে সূক্ষ্ম মসলিন প্রস্তুত হয়। ম্যাসালিয়া হইতে সমুদ্রযাত্রার পথ হইল পূর্বদিকে পার্শ্ববর্তী একটি সমুদ্রাংশ অতিক্রম করিয়া। দোশারিন (Dosarene), দোশারিণীয় (Dosarenic) নামক হাতীর দাঁত সেখানে পাওয়া যায়। এই দোশারিন হইতে যাত্রাপথ হইল উত্তর দিকে। বিবিধ অসভ্য জাতি অতিক্রম করিয়া—তাহাদের মধ্যে কিরাদাইও আছে (Kirrhadae)—এই অসভ্যদের নাক বোঁচা—"[৩]

পরবর্তী কালে, গ্রীক জ্যোতির্বেত্তা ও ভৌগোলিক টলেমি ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলস্থ কিরাদিয়া (Kirradia) কিরাতদের দেশ—উল্লেখ করিয়াছিলেন। পেণ্টাপোলিস (Pentapolis) বা পাঁচনগরী এই কিরাদিয়ায় একটি নগর এবং কিরাদিয়ার সর্বোত্তরস্থ অংশ হইল চতুর্গ্রাম। এবং টলেমি আরও বলেন যে, কিরাদিয়াতেই সর্বোৎকৃষ্ট তেজপত্র পাওয়া যায়। Indische Atterthumskunde, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৩৫—২৩৭তে লাসেন (Lassen) এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, চতুর্গ্রাম হইল বর্তমান

১। অধ্যাপক শ্রীহেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, History of Bengal. Vol 1. Du, p, 36

২। ডাঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, J. R. A. S. B, Vol, XVI. 1951, p 75

৩। The Commerce and the Navigation of the Erythraean Sea, J. W. Mc Crindle, 1879 Edition, pp, 144, 145

চট্টগ্রাম এবং কিরাদিয়া হইল সন্নিহিত পার্বত্য অঞ্চল। [Mc crindleএর টলেমীর প্রাচীন ভারত—অধ্যাপক সুরেন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, পৃ. ১৯২-১৯৪][৪]

চতুর্গ্রাম যখন কিরাদিয়ার সর্বোত্তরস্থ অঞ্চল, তখন তাহা চট্টগ্রাম কেমন করিয়া হইবে? চট্টগ্রামের দক্ষিণেই সমুদ্র ; মসলিন প্রদায়ী ম্যাসালিয়া (Periplus of the Erythraean Sea) ঢাকার অঞ্চল বলিয়া বোধ হইতেছে এবং গ্রীকবর্ণিত বিবরণ হইতে ইহার পূর্বাঞ্চল হইল আসাম এবং সেখানে হাতীও পাওয়া যায়। এই হাতীর দেশ ছাড়িয়া উত্তর দিকে হইল কিরাদিয়া—সেখানে নাক-বোঁচা অসভ্যদের বাস, তারা তেজপত্রের ব্যবসায় করে, এবং সদলে অধিষ্ঠিত আছে। এই ভাবে আমরা উত্তরবঙ্গে আসিয়া পড়িলাম। এখানে করতোয়া নদী প্রবাহিত এবং তেজপত্র জন্মে।

ডাঃ শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক, বৈগ্রাম লিপি[৫] ও ডাঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার কলাইকুড়ি লিপির[৬] সম্পাদনা করিয়াছিলেন। উভয় লিপিতে দত্ত ভূমি হইল হিলি ও পাঁচবিবি রেল ষ্টেশনের সন্নিহিত। এবং উভয় লিপিতেই উল্লেখ আছে যে, এই অঞ্চলের রাষ্ট্রযন্ত্রের কেন্দ্র হইল পঞ্চনগরী। মৎসম্পাদিত বেলওয়া-লিপিতে (মহীপালের) পঞ্চনগরী একটি বিষয় (District)রূপে বর্ণিত হইয়াছে।[৭] ডাঃ সরকার মন্তব্য করিয়াছেন যে, পঞ্চনগরী ও টমেলীবর্ণিত Pentapolis সম্ভবত এক।

বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির, ১৭, ২, ১৯৫১, পৃ. ১২২, ১৩৩-তে বহু তথ্য সমাবেশ করিয়া আমি দেখাইতেছি যে, বর্তমান[৮] পাঁচবিবি রেলষ্টেশন হইতে দুই মাইল উত্তরপূর্বস্থিত পাথরঘাটা নামক তুলসীগঙ্গা নদীর তীরস্থ ধ্বংসাবশেষ হইল উপরোক্ত পঞ্চনগরীর রাষ্ট্রযন্ত্রের কেন্দ্র। মুসলমান রাজত্বের আমলে মুসলমান প্রভাবে পঞ্চনগরী পাঁচবিবি হইয়াছে এবং ১৮৪০-৭৫তে যে নক্সা (Survey of India) রচিত হইয়াছিল, তাহাতে পাঁচবিবি ছাপা নাই, আছে পঞ্চবিবি (Panchabibi)। শ্রীপ্রভাস সেনের বগুড়ার ইতিহাস, পৃঃ ৭৪-৭৯ এবং বুকাননের দিনাজপুরে—পৃ. ৫৭ এবং স্বর্গত অক্ষয় মৈত্রেয় মহাশয়ের Ancient Monuments of Varendra পুস্তকের ৮, ৯ পৃষ্ঠায় পাথরঘাটার বিস্তৃত বিবরণ আছে।

কিরাদিয়ার সর্বোত্তর প্রদেশ হইল চতুর্গ্রাম। সেই স্মৃতি বহন করিয়া রহিয়াছে চৌখণ্ডী। এই চৌখণ্ডী হইল ঘোড়াঘাটের অপর নাম। সেই ঘোড়াঘাট, যাহা বঙ্গদেশে পাঠান রাজত্বকালে অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রকেন্দ্র ছিল। ঘোড়াঘাট পাঁচবিবি হইতে উত্তর-পূর্বে

৪। অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত, Mc Crindle's Aricient India as described by Ptolemy, Pp 192, 193, 194

৫। ডাঃ শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক, Ep. Ind, Vol, XXI, Pp 81-82

৬। ডাঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার Indian Historical Quarterly, March, 1943, p. 21

৭। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, The two Pala copper Plate Inscriptions of Belwa, J A S Bengal, Letters, Vol XVII, No. 2, 1951, P, 129

৮। ঐ, Pp, 122, 123

করতোয়া-তীরে অবস্থিত এবং সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ম্যাপে উহার অপর নাম চৌখণ্ডী ছাপা আছে।[১]

শেষ কথা

উপরোক্ত বিবরণ হইতে দেখা গেল যে, কিরাদিয়ার যে বর্ণনা আমরা Periplus of the Erythraean Sea ও টলেমিতে পাই, তাহা সবই পঞ্চনগরী অধ্যুষিত অঞ্চলে পাওয়া গেল। ইহার সঙ্গে যদি বিবেচনা করা যায় যে, বর্তমান বঙ্গদেশের দক্ষিণাংশ নদীর পলিদ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, তবে চতুর্গ্রাম চট্টগ্রাম এবং কিরাদিয়া তাহার সন্নিহিত অঞ্চল নয় বলিয়া বিশ্বাসের আর কোন অন্তরায় থাকিবে না। বরং ইহা নিশ্চিত বলিয়া বোধ হইবে যে, পঞ্চনগরীর (Pentapolis) স্মৃতি যেমন পাঁচবিবির সন্নিহিত পাথরঘাটা বহন করিয়া আছে, তেমনি চতুর্গ্রামের স্মৃতি রাখিয়াছে ঘোড়াঘাট।

[Mc Crindle সম্পাদিত Periplusএ প্রচুর ভুল আছে ; তাহার পরে প্রকাশিত Wilfred H. Schroff কর্তৃক অনূদিত ও বিস্তৃত টীকাটিপ্পনী যুক্ত The Periplus of the Erythraean Sea পুস্তকে যে বর্ণনা আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহা হইতে লেখকের যুক্তি কিছু শিথিল হইয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়—পত্রিকাধ্যক্ষ।

61. About the following region, the course trending toward the east, lying out at sea toward the west is the island Palaesimundu (পারসমুদ্র), called by the ancients Taprobane (তাম্রপর্ণী). The northern part is a day's journey distant, and the southern part trends gradually toward the west, and almost touches the opposite shore of Azania (Zanzibar), It produces pearls, transparent stones, muslins, and tortoise-shell.

62. About these places is the region of Masalia (মৌসল বা মসুলিপতম) stretching a great way along the coast before the inland country ; a great quantity of muslins is made there. Beyond this region, sailing toward the east and crossing the adjacent bay, there is the region of Dosarene (দশার্ণ), yielding the ivory known as Dosarenic. Beyond this, the course trending toward the north, there are many barbarous tribes, among whom are the Cirrhadae, a race of men with flattened noses, very savage ; another tribe, the Bargysi (ভর্গ) ; and the Horse-faces and the Long-faces, who are said to be cannibals.

63. After these, the course turns toward the east again, and sailing with the ocean to the right and the shore remaining beyond to the left, Ganges comes into view, and near it is the very last land toward the east, Chryse. There is a river near it called the Ganges, and it rises and falls in the same way as the Nile. On its bank is a market-town which has the same name as the river, Ganges. Through this place are brought malabathrum and Ganetic spikenard and pearls, and muslins of the finest sorts, which are called Gangetic...]

১। H. Blockman In J A S B, 1873, P. 215

গোবিন্দদাস কবিরাজের কয়েকটি অপ্রকাশিত পদ

অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার সেন

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৬১ ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যায় শ্রীঅজয়কুমার চক্রবর্তী 'গোবিন্দদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী' শীর্ষক নিবন্ধে গোবিন্দদাস কবিরাজের তিনটি পদ প্রকাশিত করিয়াছেন। উক্ত পদগুলি সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় 'একান্ন পদাবলী'র কয়েকটি পাণ্ডুলিপি আছে। 'পৃয়সখিগণন' এবং 'সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে' এই দুটি পদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯৯, ৩০১, ৩০৩, ৩০৭, ৩০৮, ৩১০ সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে আছে। এখানে সেখানে একটু পাঠভেদ আছে। সেগুলি খুবই নগণ্য। উক্ত পুথিগুলিতে এই দুটি পদের সংখ্যাও যথাক্রমে ২৪ এবং ১৮।

চক্রবর্তী মহাশয়ের উল্লিখিত পুথির ৯ সংখ্যক পদটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিতে ১ সংখ্যক নয়। কিন্তু ২৯৯, ৩০১, ৩০৩, ৩০৮, ৩১০ এবং ৩১১নং পুথিতে কিছু বৃহৎ আকারে উক্ত পদটি আছে। পদসংখ্যা ৫। এই পদটির পূর্ণ রূপ নিম্নে দেওয়া হইল।—

মণিমঞ্জির সুচরণে পরায়ল উরূপর পর (?) দেয়ল হার।
তাম্বুল সাজি বদন ভরি নিছুয়ায়ে তনু আপনার ॥
(১) বেশ বনায়ই বদন পুন হেরই পাদহিঁ পড়হিঁ বারেবার।
জর জর লোর জরকী বহে লোচনে নিজ তনু নহে আপনার ॥
বিনদিনী কোরে আগোরল কাহ্নু।
দেহ বিদায় মন্দিরে হাম জায়ব দিন করি করব পয়ান ॥
(২) কামুক চিত থীর করি সুন্দরী কুঞ্জসেঁ গমন কয়োলী।
বাসনহিঁ ঝাপি করি মণিমঞ্জির নিজ মন্দিরে চলি গেল ॥
রতিরষে উজাগর বৈঠল রসবতি ফুকরি সখিগণ চাই।
রণি। রজনি পোহায়ল গুরুজন জাগল গোবিন্দদাস বলি জাই ॥

১। এই পাঠটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯৯ সংখ্যক পুথি হইতে গৃহীত। ৩০৩ সংখ্যক পুথিতে এই পংক্তি হইতে আরম্ভ।

২। চক্রবর্তী মহাশয়ের দৃষ্ট পুথিতে পদটি এই পংক্তি হইতে আরম্ভ।

বাঙ্গলা সর্বনাম পদ

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মাইতি এম. এ.

অষ্টাধ্যায়ীর রচয়িতা পাণিনি "সর্বাদীনি সর্বনামানি" সূত্রের দ্বারা সর্বনাম শব্দের গণ নির্দেশ করিয়াছেন এবং ইহার প্রথমাংশের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার পতঞ্জলি বলিয়াছেন:—"সর্বেষাং যানি চ নামানি তানি সর্বাদীনি।" এই উভয় অংশ হইতে উক্ত গণভুক্ত পদগুলির উপযোগিতা সুস্পষ্ট নহে,. তবে আধুনিক যুগে ভাষাতত্ত্ববিদ্ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়—"পুনরুল্লেখ নিবারণ অথবা প্রত্যক্ষ করাইবার জন্য সর্ব অর্থাৎ সকল নাম অর্থাৎ বিশেষ্য বা তৎপ্রতীক পদের পরিবর্তে যে সকল পদ ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে সর্বনাম বলে," এই সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া তাহা পূরণ করিয়াছেন।

বাঙ্গলা সর্বনামের সম্যক্ আলোচনায় উক্ত অধ্যাপক মহাশয়ের সংজ্ঞা স্বীকার ছাড়া আরও একটি উক্তি সমাধানসূত্ররূপে মানিয়া লওয়া প্রয়োজন। তাঁহার "বাঙ্গলা ভাষা-তত্ত্বের ভূমিকা" গ্রন্থে (পৃঃ ১১২-১১৩) বলিয়াছেন—"আধুনিক সাধু ভাষায় দুইটি বিষয় লক্ষণীয়; ইহার ক্রিয়া, সর্বনাম প্রভৃতির রূপগুলি, মৌখিক ভাষাগুলিতে ব্যবহৃত রূপসমূহ অপেক্ষা পূর্ণতর এবং উহাদের মূলস্থানীয়; এবং সাধুভাষায় সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ একটু বেশী, প্রাদেশিক মৌখিক ভাষায় নিবদ্ধ শব্দের ব্যবহার ইহাতে কম। প্রাচীন কালে মৌখিক ভাষায় ও সাহিত্যের ভাষায় ব্যাকরণ-ঘটিত পার্থক্য তত বেশি ছিল না। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে মুখ্যতঃ পশ্চিমবঙ্গের ভাষার আধারের উপর পুরাতন বাঙ্গলার সর্বজন-গ্রাহ্য একটি সাহিত্যের ভাষা দাঁড়াইয়া যায়। এই প্রাচীন সাহিত্যের ভাষার ধারাটিকে অনেকটা অব্যাহত রাখিয়াই আধুনিক সাধুভাষার উদ্ভব হইয়াছে। প্রাচীন রূপটি বিশেষ করিয়া ক্রিয়াপদে ও সর্বনামেই বহুল পরিমাণে সাধুভাষায় অপরিবর্তিত আছে।"

বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্বেই তাঁহার "জীবন-স্মৃতি" গ্রন্থে বলিয়াছেন:—"দেখা যায় বাংলায় গ্রন্থের ভাষা ক্রমে চলিত ভাষার দিকে নামিতেছে এবং চলিত ভাষা গ্রন্থের ভাষার দিকে উঠিতেছে—এত দিন উভয়ের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল ভেদ ছিল, তাহা প্রতিদিন ঘুচিয়া আসিতেছে।" কাজেই বাঙ্গলা সাহিত্যের দ্বিবিধ ভাষা—সাধু ও চলিতকে একই ব্যাকরণের আধারে আলোচনা করিবার যে দায়িত্ব আজ পালন করিবার সময় আসিয়াছে, তাহাতে সুনীতিবাবুর উক্ত সূত্রের প্রত্যেকটি কথার গুরুত্ব উপলব্ধি আবশ্যক।

বাঙ্গলা ভাষায় যে সকল সর্বনাম সংস্কৃত হইতে হুবহু আসিয়া ব্যবহৃত হয়, সেগুলি হইতেছে—উভয় (সর্বাদি), অন্য (অন্যাদি), পর, অপর (পূর্বাদি)। তাহারা সংস্কৃত সর্বনামের পঞ্চ বিভাগের প্রথম তিনটি বিভাগ হইতেই আসে, কিন্তু বাংলায় বিশেষণ-রূপেই প্রয়োগ পায় এবং বাঙ্গলা সর্বনামরূপে প্রয়োগ করিতে গেলে ১মার ১ বচনরূপে এ-প্রত্যয়ান্ত করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। সংস্কৃত যদাদি সর্বনামগুলির এ-প্রত্যয়ান্ত

তদ্ভব রূপ—যে, সে, কে, এবং ইদমাদিগুলির অপভ্রংশ রূপ—আমি, তুমি প্রভৃতি ছাড়া বাঙ্গলার নিজস্ব সর্বনামই অধিক। কাজেই বাঙ্গলা সর্বনামের আলোচনা সংস্কৃত ব্যাকরণের বিভাগানুযায়ী করা যায় না। "সর্ব" শব্দেরই বাঙ্গলায় সর্বনাম পদরূপে ব্যবহার নাই বলিয়া ইহা আরও সত্য।

ব্যাকরণের পুরুষ কেবল সর্বনাম ও ক্রিয়ায় ধরা পড়ে, আর বাঙ্গলায় এই উভয় পদে সাধু ও চলিত, এই দ্বিবিধ ভেদ দৃষ্ট হয়। কাজেই যে সকল সর্বনামের পুরুষ অনুসারে বিভেদ ধরা যায়, সেগুলিকে (যেমন,—আমি, তুমি, সে) পুরুষবাচক সর্বনাম (Personal pronoun) বিভাগে ফেলিতে হয়। লক্ষ্য করিবার এই যে, "সে" পদটি "যে" সর্বনামের আপেক্ষিকাংশরূপে বাক্য-সংযোজকের (Relative pronoun) কাজ করে এবং বস্তু বা ব্যক্তি বা উভয়বাচক অর্থভেদে "সে" ও "তাহা" দ্বিবিধ রূপ পায়। "সে" পদ ১মার ১ বচনে ব্যক্তিবাচক হইলেও অন্য সকল কারক ও বচনরূপে (যথা :—তাহারা, তাহাকে ইত্যাদি) "তাহা" পদকে আশ্রয় করিয়া গঠিত হয়, আবার "তাহা" পদ ১মার ১ বচনে বস্তুবাচক হইলেও সমস্ত বহুবচন রূপগুলিতে "সে" পদ দ্বারাই (যথা :—সেগুলিকে, সে-গুলির ইত্যাদি) গঠিত হয়। তবে ২য়া প্রভৃতি একবচনগুলিতে উভয়বাচক অর্থে "তাহা" পদের অপভ্রংশ "তা" বা "টি, টা" প্রভৃতি নির্দেশযুক্ত "সে" পদ হইতে গঠিত রূপ (যথা :— তাকে, সেটিকে, সেটির ইত্যাদি) মিলে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, পুরুষবাচক সর্বনামের মধ্যম ও প্রথম পুরুষে সম্মানসূচক ও তুচ্ছবাচক রূপ আছে, যদিচ মধ্যমপুরুষের সম্মানসূচক "আপনি" পদটিকে আত্মবাচক বা প্রত্যাবৃত্ত সর্বনাম-(Reflexive pronoun) রূপেও ব্যবহার করা হয় এবং তখন ইহা সকল পুরুষ অর্থ সূচনা করে।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নির্দেশিত পথে আমরা বাঙ্গলা ব্যাকরণে যে পুরুষবাচক সর্বনাম বিভাগ স্বীকার করিতেছি, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াই ঘটিতেছে ; কেন না, সংস্কৃত মতে উত্তম পুরুষের অস্মদ্ ও মধ্যম পুরুষের যুষ্মদ্ শব্দ ইদমাদির এবং প্রথম পুরুষের তদ্ শব্দ যদাদির অন্তর্গত ; তবে ব্যাকরণে সে দুইটী পদের ঘনিষ্ঠ মিলনে ক্রিয়াপদ গঠিত হয় (The personal endings of verbs are identified with the corresponding Pronouns— Rask। বাঙ্গলায় "আমি"র "আম" অংশ অতীত কালের এবং "ই" অংশ বর্তমান কালের ক্রিয়া-বিভক্তি। সেই ক্রিয়া রূপের উদ্দেশ্যভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বস্তুতঃ সংস্কৃত বা ইংরাজী সর্বনামের মত বাঙ্গলা সর্বনামের লিঙ্গভেদ না থাকায় বিভক্তিযুক্ত রূপের উপর নির্ভর না করিয়া কেবল ব্যবহারের উপর ভিত্তি করিয়াই সর্বনামের এই বিভাগ করা হইয়াছে। কিন্তু শ্রদ্ধেয় সুনীতিবাবুর সূত্র দ্বারা এই একটি সর্বনাম বিভাগ মাত্র করা যায়, অবশিষ্ট বিভাগে উক্ত সূত্র প্রযোজ্য নহে। অতএব তাহাদের জন্য বর্তমান ভাষাতত্ত্বদর্শন মতে Form, Function ও Meaningএর উপর নির্ভর করিয়া পদ বিভাগ করা কর্তব্য ; কেন না, ভাষা-তত্ত্ববিৎ Otto Jesperson বলেন, in my opinion everything should be kept in

view, form, function and meaning [The Philosophy of Grammer ; page 60]। যদিও এই সিদ্ধান্ত পদবিভাগ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, তথাপি ইহা পদের অন্তর্বিভাগ সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা উচিত—এই কথা উল্লিখিত "Every thing" কথাটি হইতে ধরা যায়। অতএব বাঙ্গলা সর্বনামের অবশিষ্ট বিভাগ কিরূপ হওয়া প্রয়োজন, তাহা এই পদের বিশেষ পরীক্ষা ও উক্ত সূত্র প্রয়োগ দ্বারা করা যাইতেছে।

পুরুষবাচক সর্বনামগুলির (Personal Pronoun) রূপের বিশেষত্ব এই যে, ই-কারান্তগুলি ২য়ার একবচন হইতে শেষ পর্যন্ত শব্দের অন্তর্হিত "ই" বা ইনি ত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্তে আ-কারান্ত (হা-কারান্ত) রূপ প্রাপ্ত হয়। অন্-ভাগান্ত বিশেষ্য পদের রূপে অ-কার পরিবর্তে অনুরূপ দীর্ঘস্বর করাইবার জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণে "সর্বনামস্থান" স্বীকার করা হইয়াছে এবং ক্লীব লিঙ্গ ও অন্য দুই লিঙ্গভেদে এই সর্বনামস্থান যে দুই প্রকার, তাহা (১) "শি সর্বনাম-স্থানম্" ও (২) "সুড্ নপুংসকম্" (পাঃ, ১।১।৪১-৪২) সূত্র দুইটি দ্বারা নির্দিষ্ট। বাঙ্গলায় সর্বনামের কোন লিঙ্গ না থাকিলেও 'সর্বনামস্থান' কয়েকটি স্থান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নহে, বরং 'আপনি' পদে ১মার ১বচন বাদ দিয়া এবং 'তুমি' ও 'আমি' পদে ১মার উভয় বচন বাদ দিয়া শেষ পর্যন্ত স্বীকৃত হয়। অতএব অধ্যাপক মহাশয়ের 'পুরুষবাচক সর্বনাম' বিভাগ Form ও Function দিক্ দিয়া অবধারিত।

সংস্কৃত যদাদি বিভাগের আর একটি সর্বনাম 'কিম্' শব্দ তদ্ভব-রূপে বাঙ্গলায় স্বীকৃত হয়। শুধু প্রশ্নসূচক (Interogative) অর্থ ছাড়া ইহা নিজ বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ। প্রথমেই লক্ষণীয় যে, প্রশ্নসূচক সর্বনাম বাঙ্গলায় প্রায় একটিমাত্র বটে, কিন্তু তাহা প্রাণিবাচক উভলিঙ্গ এবং বস্তুবাচক ক্লীবলিঙ্গভেদে দুইপ্রকার রূপ পায়। "কে—কাহারা" প্রভৃতি যেমন প্রাণিবাচক উভলিঙ্গ রূপ, "কি—কি সব" প্রভৃতি বস্তুবাচক ক্লীবলিঙ্গ রূপ। শেষোক্ত এই রূপের বিশেষত্ব এই যে, সংস্কৃত সর্বনামের ক্লীবলিঙ্গগুলির মত "কি" পদ ১মা এবং ২য়ার একবচনের সাধারণ রূপ। ইহা ছাড়া "কিসে" এবং "কিসের" পদ প্রাচীন বাঙ্গলায় প্রযুক্ত "কিস" হইতে [যথা :—"বাক্‌পথাতীত ক(া)হিব কিস" (চর্যাপদ-৩০) "বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে" (প্রাচীন ছড়া) বা "কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা কিসের ক্লেশ" (দ্বিজেন্দ্রলাল)] বর্তমান বাঙ্গলায় আসিয়াছে। "কোন" এই অ-কারান্ত বিভাগকারী বিশেষণ (Distributive adjective) পদ হলন্ত হইয়া যখন 'গুলি'—এই বহুবচন বিভক্তি বা টা, টি প্রভৃতি নির্দেশক গ্রহণ করে, তখন ইহা এবং ইহার বিভক্তিযুক্ত রূপও এই প্রশ্নসূচক সর্বনাম হয়।

কিন্তু উল্লিখিত প্রশ্নসূচক উভলিঙ্গ সর্বনামের বিশেষত্ব এই যে, ২য়া ও সম্বন্ধের একবচনরূপ 'ও'প্রত্যয়ান্ত হইয়া যদি অনির্দিষ্ট সর্বনাম (Indefinite Pronoun ; যথা :—কাহাকেও, কাহারও) সৃষ্টি করে, তবে বিভক্তির অর্থ অব্যাহত রাখে। এই বিশেষত্বের অপেক্ষাও আরও অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য এই যে, উক্ত "কাহাকেও" ও "কাহারও" পদ পূর্বে কোনও বিশেষ্য বা অন্য সর্বনামের বহুবচন রূপ পাইলে এই অনির্দিষ্ট সর্বনাম অর্থও ত্যাগ করিয়া বিভাগকারী সর্বনামে

(Distributive Pronoun) পরিণত হয়। এখানেও যে Sound, Form ও Function-এর দিক্ দিয়া পদ দুইটীর বিভাগ-স্বাতন্ত্র্য দেখিতেছি, তাহা নহে। স্বীয় বৈশিষ্ট্য দ্বারা বাঙ্গলা সর্বনামের স্বতন্ত্র দুইটী বিভাগ স্বীকার করিতে বাধ্য করিতেছে।

শব্দের অর্থ ধরিয়া বিচার করা যদিও প্রাচীন ভারতের নিরুক্তশাস্ত্র এবং বর্তমান ভাষাতত্ত্ববিদ্গণের Semantics বা Sematology শাস্ত্রের আলোচ্য বস্তু, তথাপি এই বিচারকে ব্যাকরণের নিয়মভুক্ত করা বিষয়ে Grammaire historiqueএর গ্রন্থকার Nyropই পথপ্রদর্শক। সংস্কৃত ব্যাকরণে দুই এক স্থলে অর্থ অর্থাৎ Meaning স্বীকার করার চেষ্টা দেখা গেলেও মূলতঃ বিভক্তির Functionকে ধরিয়াই পদ-বিভাগ করা হইয়াছে। পাণিনি "পূর্বপরাবরদক্ষিণোত্তরাপরাবরাণি ব্যবস্থায়াং সংজ্ঞায়াম্" (১।১।১৪) ও "স্বমজ্ঞাতিধনাখ্যায়াম্" (১।১।৩৫) সূত্র দ্বারা সর্বনাম বিভাগে অর্থ বা Meaningকে লক্ষ্য রাখিয়াও বিভক্তির অধিকারসূত্রকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। যদিও আকৃতিগণ (চাদয়োঽসত্ত্বে ; পা, ১।৪।৫৭ সূত্র প্রভৃতির গণপাঠ দ্রষ্টব্য] সঙ্কেত দ্বারা অব্যয় সংজ্ঞার Form রক্ষামূলক চেষ্টাই মুখ্য, তথাপি সাঁইত্রিশের অধিক আকৃতিগণ কেবল গণ-পাঠেই দৃষ্ট হয় ; অষ্টাধ্যায়ীর মূল সূত্রে একটিও পাওয়া যায় না। সর্বনাম বা অব্যয় যে দুইটি মাত্র পদকে পৃথক্‌ভাবে ধরিবার চেষ্টা অষ্টাধ্যায়ীতে দেখা যায়, তাহা গণনির্দেশেই সীমাবদ্ধ ; 'আকৃতিগণ' উল্লেখ থাকিলেও তাহার সহিত Formএর কোন সম্পর্ক নাই।

বাংলায় Sound form ধরিয়া পদবিভাগের একটা প্রচেষ্টা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ১৩৪৩ সালের পৌষ-সংখ্যা প্রবাসীতে একটী প্রবন্ধে করিয়াছেন এবং উহাতে লিখিয়াছেন—"অকারান্ত শব্দের হসন্ত উচ্চারণ বাঙ্গলাতে সর্বত্রই হয়। শুধু দ্ব্যক্ষরবিশিষ্ট বিশেষণপদে প্রায়ই হয় না।" অনুরূপ Sound form ধরিয়া সংস্কৃত অব্যয় বা ধাতুবিভাগের উল্লেখ অষ্টাধ্যায়ীতে মিলে। "নিপাত একাজনাঙ্" (১।১।১৪) ; 'ঋহলোর্ণ্যৎ (৩।১।১২৪) ; আতশ্চোপসর্গে (৩।৩।১০৬) প্রভৃতি এ বিষয়ে প্রমাণ। কিন্তু উক্ত Sound form সংস্কৃত বা বাঙ্গলা কোনও সর্বনামেই ধরা যায় না, কাজেই আবশ্যকমত শুধু Form, Function ও Meaning ধরিয়াই বাঙ্গলা সর্বনামের অন্তর্বিভাগ প্রচেষ্টা হওয়া উচিত।

উপরের আলোচনায় আমরা দেখিতেছি যে, এক প্রশ্নসূচক সর্বনাম হইতেই Functionএর দিক্ দিয়া বিচারে আমরা অনির্দিষ্ট সর্বনাম ও বিভাগকারী সর্বনাম, এই দ্বিবিধ বিভাগ পাইতেছি। সংস্কৃত হইতে আগত "অন্য (অন্যাদিগণীয়)," পূর্বাদিগণীয়, 'অপর' ও সর্বাদিগণীয় 'এক' পদ বাঙ্গলায় বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গলার বিশেষণ বিভাগে 'অন্য ও অপর' পদ, অন্যাদি—ইতর ও পূর্বাদি—স্ব এই দুই পদের ন্যায় গুণবাচক বিশেষণ এবং 'ইতর' প্রভৃতি পদ বিশেষণের গণ্ডীতে একেবারে চলিয়া গিয়াছে। 'এক' পদ সংখ্যাবাচক বিশেষণ, তবে এই তিন পদ প্রথমার একবচনে এ-প্রত্যয়ান্ত হইলে পুনরায় সর্বনাম হইয়া উল্লিখিত অনির্দিষ্ট (Indefinite Pronoun) শ্রেণীভুক্ত হয়। প্রথমার একবচন ছাড়া অন্যান্য সমূহ বিভক্তিতে ইহারা আর এ-প্রত্যয় আবশ্যক করে না। বাঙ্গলার নিজস্ব 'কেহ,' 'কেহ কেহ' বা

"কেউ কেউ" পদগুলিও অনির্দিষ্ট সর্বনাম; 'কেহ' শব্দের একবচন রূপই আছে: দ্বিতীয়া বিভক্তি যোগে ইহা 'কাউ' রূপ এবং সম্বন্ধ বিভক্তিযোগে কারু রূপ পায় (যথা :—কাউকে, কারুর), তবে 'কাউকে' পদের অর্থ উল্লিখিত 'কাহাকেও' বটে অর্থাৎ তদ্ভব সর্বনামের রূপ যেন চলিত সর্বনামের Meaning অর্থাৎ অর্থের সহিত গাঁটছড়া করিয়াছে। কোনও পুরুষবাচক সর্বনাম 'অন্য' পদের পূর্বগ (Antecedant) হয় না; তবে বাঙ্গলায় এই একটি সর্বনামই ইংরেজী Relative Pronoun অর্থাৎ সংযোজক সর্বনামের মত পূর্বগ গ্রহণ করে।

সর্বাদিগণীয় 'উভয়' পদ এবং 'এক' সর্বনামজাত 'প্রত্যেক' ও 'অনেক' পদও বাঙ্গলায় বিশেষণ। অবস্থা অনুসারে 'অনেক' পদ সংখ্যা বা পরিমাণবাচক বিশেষণ হয়। "উভয়" পদ কেবল সংখ্যাবাচক বিশেষণ এবং 'প্রত্যেক' পদবিভাগকারী বিশেষণ। এ-প্রত্যয়ান্ত হইয়া 'উভয়ে' ও 'প্রত্যেকে' পদদ্বয় বিভাগকারী সর্বনাম হয়। কিন্তু 'অনেকে' পদসমষ্টিবাচক বিশেষ্য (Collective Noun)। এই তিন পদের এ-প্রত্যয়ান্ত রূপ ১মার একবচনেরই রূপ এবং 'অন্য' প্রভৃতি পদের ন্যায় ১মা ছাড়া অন্য বিভক্তি যোগ সময়ে এ-প্রত্যয় আবশ্যক করে না। এখানে লক্ষ্য করা দরকার যে, 'উভয়ে' ও 'প্রত্যেক' পদের একবচন রূপগুলিই আছে, কিন্তু 'অনেক' পদের 'গুলি' যোগে বহুবচন রূপ হয়। সংস্কৃতে 'অনেকে' পদের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং 'অনেক' পদের সকল বচনের রূপ হয়, তবে এই শব্দের প্রথমার বহুবচনে অনেকে না হইয়া অনেকাঃ হয়।

বাঙ্গলায় অনির্দিষ্ট সর্বনাম ও বিভাগকারী সর্বনাম বিভাগে Function ও Meaning-এর প্রভাব সুস্পষ্ট এবং বিশেষণের ভিতর দিয়া পুনরায় সর্বনামে আগমন শুধু উপরোক্ত দুই বিভাগেই দেখা যায়, কিন্তু সংস্কৃত অব্যয় পদেরও বিশেষণপদের মধ্য দিয়া সর্বনামে আগমন আমরা বাঙ্গলায় পাইতেছি। সর্বনাম 'ইদং' শব্দ বিভক্তিসংজ্ঞক তদ্ধিত প্রত্যয় পাইয়া 'ইহ' রূপে ক্রিয়াবিশেষণ বা অব্যয় (যথা :—ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ইত্যাদি) সংজ্ঞায় 'অত্র' পদের অর্থের কাজ করে, তখন ইহা বিশেষণ নয় বটে, কিন্তু 'সংসার, জগৎ, জীবন' প্রভৃতির পূর্বে বসিলে নির্দেশক বিশেষণ হয়। বাঙ্গলার 'ইহ' পদের যেমন নির্দেশক বিশেষণ (Demonstrative Adjective) প্রয়োগ পাই, আ-প্রত্যয় করিয়া অনুরূপ নির্দেশক সর্বনামরূপে ব্যবহারও হয়। অতএব 'ইহা' পদ Function, Form ও Meaning, এই ত্রিবিধ দিক্ দিয়া বাঙ্গলায় নির্দেশক সর্বনাম (Demonstrative Pronoun); অবশ্য এই শ্রেণীতে বাঙ্গলার নিজস্ব 'এ, ইনি, ও, উনি, উহা, অমুকে' প্রভৃতি বহু পদ মিলে। যদাদিগণীয়ের আদি শব্দ 'যৎ' সর্বনামের দুইপ্রকার তদ্ভব রূপের যে শব্দ যেমন প্রাণিবাচক, তেমনই 'যাহা' পদ বস্তুবাচক। কিন্তু বহুবচনরূপে ইহা 'কি' প্রশ্নসূচক সর্বনাম বা 'সে' পুরুষবাচক সর্বনামটির ন্যায় পরস্পর পরিবর্তন পায়। বাঙ্গলায় 'সে' ও 'তাহা' এই দুই (প্রথম) পুরুষবাচক সর্বনামকে আপেক্ষিকরূপে লইয়া 'যে' বা 'যাহা' পদ ত্রিবিধ খণ্ডবাক্য (Clause) যুক্ত জটিল বাক্য (Complex sentence) গঠন করে। 'যে' পদের কারক রূপের সহিত 'সে' পদের অনুরূপ কারকরূপ দ্বারা খণ্ডবাক্য যোজিত থাকিলে অর্থাৎ খণ্ডবাক্যের

অবচ্ছেদাংশ স্বরূপসম্বন্ধরূপা হইলে উক্ত 'যে' যুক্ত খণ্ডবাক্য বিশেষ্যপদী (Noun clause) হয়। কারকরূপের বিভিন্নতা ঘটিলে তাহা বিশেষ্যপদী খণ্ডবাক্য না হইয়া বিশেষণপদী খণ্ডবাক্য হইয়া দাঁড়ায়। কারক ও বচনরূপের সমতা বা বৈষম্যফলে যেমন উক্ত দুই প্রকারের খণ্ডবাক্যভেদ হয়, তেমনই উক্ত দুইরূপ ভিন্ন প্রত্যয়ান্ত উক্ত সর্বনামদ্বয় (যথা :—যেমন তেমন, যখন তখন, যেখানে সেখানে ইত্যাদি) বাক্যে যোজনা করিলে তাহার প্রথমাংশ অব্যয় বিশেষণীয় খণ্ডবাক্য (Adverbial clause) সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। বিশেষ্যপদী ছাড়া অন্য দুই প্রকার খণ্ডবাক্যের অবচ্ছেদাংশ অতিরিক্ত বৃত্তিত্বরূপার দ্বিবিধ ভেদমাত্র। এই সকল অবচ্ছেদকের (Differentia) স্বরূপ বুঝিতে হইলে বঙ্গগৌরব রঘুনাথ শিরোমণির 'অবচ্ছেদকত্ব নিরুক্তি-দীধিতি' গ্রন্থের তত্ত্ব জানা আবশ্যক। আরও একটি তথ্য এই যে, কারকরূপের পার্থক্যেই অবচ্ছেদকভিন্নতা জ্ঞানের আবশ্যক করে; বচনভেদের পার্থক্য কেবল শুদ্ধাশুদ্ধিবিবেক আশ্রয় করিয়া আছে এবং সে জন্য—"তার পর যে জাতি আসিল, তাহারা তাম্রাস্ত্রধারী ছিল" বাক্যের শুদ্ধ রূপ "তার পর যে জাতি আসিল, সে জাতির লোকেরা তাম্রাস্ত্রধারী ছিল" হইবে।

বাঙ্গলায় এই সংযোজক সর্বনামের (Relative Pronoun) আরও বৈচিত্র্যময় তথ্য লক্ষ্য করিবার আছে। "সে" শব্দ বাঙ্গলা সর্বনামের বিশেষণ প্রবৃত্তি হেতু যদি বিশেষ্যের পূর্বে বসিয়া অবচ্ছেদক হয়, তবে 'সে' পদের সঙ্কোচক (Restrictive), নচেৎ সর্বনামত্ব রক্ষা করিলে প্রসারক (Continuative) ব্যবহার পায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে—"তুমি যে কথা রটাইয়াছ, তাহা আমি শুনিয়াছি" বাক্যের যে সর্বনাম সংকোচক ব্যবহার পাইয়াছে, কিন্তু "তুমি যে আসিবে, তাহা আমি জানিতাম (অর্থাৎ তুমি আসিবে এবং তাহা আমি জানিতাম)" বাক্যের সংযোজক সর্বনাম প্রসারক ব্যবহার পাইয়াছে। শুধু সর্বনামত্ব রক্ষা বা বিশেষণত্ব প্রাপ্তি লক্ষণ ছাড়া 'যে' সংযোজকের পর 'কমা (comma)' চিহ্ন ব্যবহার দ্বারাও উক্ত সঙ্কোচক ও প্রসারক ভেদ হইতে পারে, তবে সংযোজক সংলগ্ন খণ্ডবাক্যকে নেতিসূচক হইতে হয়; যথা :—তুমি যে কথা বলিবে না, তাহা আমরা জানি।

সুদীর্ঘ আলোচনা ছাড়িয়া "অবর, দক্ষিণ স্ব (পূর্বাদি)" প্রভৃতি অবশিষ্ট সর্বনামগুলির সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। বাঙ্গলায় ইহারা কেহই সর্বনাম নহে; সকলেই বিশেষণ। স্ব পদ দ্বিত্বরূপে অথবা ঈয় বা কীয় প্রত্যয়ান্ত হইয়া বিশেষণ হয়, "সর্ব, নিজ" প্রভৃতি পদের পরে বসিলে বিশেষ্য হইয়া যায়। "স্ব" পদ কোনও প্রকারে বাঙ্গলায় সর্বনাম না হইলেও "স্বয়ম্" (সু+ই বা অয়+অম) অব্যয় পদটি বাঙ্গলায় প্রত্যাবৃত্ত (Reciprocal Pronoun) সর্বনামরূপে ব্যবহার পায়। ইহার ব্যবহার কর্তৃকারক এক বা বহুবচনে সীমাবদ্ধ বটে, কিন্তু যে "নিজ" শব্দের পরিবর্তে ইহা বসে, বিশেষণ হইতে আগত সেই "নিজ" সর্বনামটির সকল বিভক্তিযুক্ত রূপ পাই। অর্থাৎ বাঙ্গলায় এই শ্রেণীর সর্বনাম সংস্কৃত সর্বনামগণ আশ্রয় না করিয়াই অব্যয় ও বিশেষণ হইতে আসিতেছে। "অবর" পদের ব্যবহার বাঙ্গলায় এতদিন বিরল থাকিলেও ভারতের জাতীয় সরকার ইংরাজী Additional অর্থে 'অবর'

শব্দের বিশেষণরূপে প্রয়োগই (যথা :—অবর জেলাশাসক—Additional District Magistrate ; ইত্যাদি) অবধার্য্য করিয়াছেন। "দক্ষিণ" পদ হস্তপদ প্রভৃতি অঙ্গবাচক পদ বা বায়ু বা দিক্‌বাচক শব্দের বিশেষণরূপেই প্রয়োগ পায়। আ-প্রত্যয়ান্ত হইয়া ভিন্ন অর্থে বিশেষ্য হয় বটে, কিন্তু এই শ্রেণীর "উত্তর" পদ রূপের কোনও পরিবর্তন না লইয়া কেবল "প্রতি বাক্য" এই অর্থ পরিবর্তনেই বিশেষ্য হয়। নচেৎ ইহা বাঙ্গলায় বিশেষণ। সর্বাদি বিভাগের "বিশ্ব" পদ বাঙ্গলায় নিত্য বিশেষ্য। অন্যাদি "ইতর" পদও বাংলায় বিশেষণ।

এতদ্ব্যতীত "কতর, কতম, একতর, একতম" প্রভৃতি বহু সর্বনাম পদের উল্লেখ সংস্কৃত ব্যাকরণে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বাঙ্গলায় তাহাদের ব্যবহার নাই। কাজেই বাংলা সর্বনাম তাহাদের উৎপত্তি ও কার্য (Source and Function) বিষয়ে যেমন বৈচিত্র্য-পূর্ণ, তেমনই বিভাগ বিষয়ে সংস্কৃত হইতে একেবারে পৃথক্। এই বিভাগ বিষয়ে একটি আপত্তি উঠিতে পারে যে, একই প্রকারের পদকে (যথা :—কাহারও, কাহাকেও) সর্বনামের দুই বিভাগের মধ্যে ফেলা হইয়াছে ; কেন না, Otto Jesperson তাঁহার The Philosophy of Grammer গ্রন্থে বলিয়াছেন যে—There is however, not the slightest reason for thus····· assigning the same form to two different parts of speach especially as it then becomes necessary to establish the same sub-classes of adjectives (possesive, demonstrative) as are found in pronouns (page 84)। কিন্তু অধ্যাপক মহাশয়ের এই উক্তি সর্বনাম সম্বন্ধে নহে, কেবল বিশেষণ সম্বন্ধেই ; অধিকন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণে একই রূপকে অর্থের বিভেদ লক্ষণে ভিন্ন পদবিভাগে রক্ষা তো আছেই, একই পদের রূপপরিবর্তনকেও ভিন্ন পদবিভাগে ফেলিতে দেখা যায়। 'অন্য ও অন্যতর' পদদ্বয় অন্যাদি সর্বনাম হইলেও 'অন্যতম' পদ বিশেষণ এবং 'এক ও একতর' পদ সর্বাদি হইলেও "একতম" পদ অন্যাদির অন্তর্ভুক্ত। অতএব আমরা বাঙ্গলা সর্বনামের যে বিভাগ নির্দেশ করিতেছি, তাহা Form, Function ও Meaning অনুযায়ী অর্থাৎ ন্যায়সঙ্গত।

বৈদিক অসুর ও দেবতা

পণি ও ইন্দ্র

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

পণিগণ কর্ত্তৃক গো অপহরণ বেদের একটি প্রসিদ্ধ উপাখ্যান। ঋগ বেদসংহিতার নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রে ইহা অবগত হওয়া যায়।—

বীলু চিৎ আরুজৎনুভিঃ গুহাচিৎ ইন্দ্র বহ্নিভিঃ।

অবিন্দ উস্রিয়া অনু॥

এই মন্ত্রের অর্থ লিখিবার পূর্ব্বে সায়ণ আচার্য্য বলিয়াছেন—"অস্তি কিঞ্চিদুপাখ্যানং। পণিভির্দেবলোকাৎ গাবঃ অপহৃতাঃ অন্ধকারে প্রক্ষিপ্তাঃ। তাশ্চ ইন্দ্রো মরুদ্ভিঃ সহ অজয়দিতি।...তদেতদুপাখ্যানমভিপ্রেত্য উচ্যতে।"

এ বিষয়ে এক উপাখ্যান আছে। পণিগণ দেবলোক হইতে গো অপহরণ করিয়া অন্ধকারে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছিল। ইন্দ্র মরুদ্‌গণের সহিত সেই সকল গো জয় করিয়া আনিয়াছিলেন। এই উপাখ্যান (উপাখ্যানগত জ্ঞান) অভিপ্রেত করিয়া এই মন্ত্র উক্ত হইতেছে।

সায়ণভাষ্য।—হে ইন্দ্র! বীলু চিৎ দৃঢ়মপি দুর্গমস্থানং আরুজৎনুভিঃ ভঞ্জদ্ভিঃ বহ্নিভিঃ বোঢ়ৃভিঃ অন্যত্র নেতুং সমর্থৈঃ মরুদ্ভিঃ সহিতস্ত্বং গুহাচিৎ গুহায়ামপি স্থাপিতা উস্রিয়াঃ গাঃ অন্ববিন্দঃ অন্বিষ্য লব্ধবানসি।

ভাষ্যার্থ।—হে ইন্দ্র! দুর্গম ও দৃঢ় স্থানকে ভঙ্গ করিয়া অন্যত্র বহন করিয়া নিতে সমর্থ যে মরুদ্‌গণ, তুমি সেই মরুদ্‌গণের সহিত [মিলিত হইয়া] গুহায় স্থাপিত গোসকলকে অন্বেষণপূর্ব্বক প্রাপ্ত হইয়াছিলে।

এই প্রসঙ্গে সায়ণ আরও বলিয়াছেন,—"পণিভিঃ অসুরৈঃ নিগূঢ়াঃ গা অন্বেষ্টুং সরমাং দেবশুনীং ইন্দ্রেণ প্রহিতাং অযুগ্‌ভিঃ পণয়ো মিত্রীয়ন্তঃ প্রোচুরিতি।" পণি অসুরগণ কর্ত্তৃক নিগূঢ় গোসকলকে অন্বেষণ করিবার জন্য দেবশুনী সরমাকে ইন্দ্র পণিগণের নিকট প্রেরণ করিলে, পণিগণ সরমার সহিত মিত্রতা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিল...ইত্যাদি।

ঋক্‌সংহিতার আর একটি মন্ত্রে দৃষ্টান্তরূপে পণিগণ কর্ত্তৃক গো হরণের বিষয় কথিত হইয়াছে। নিম্নে মন্ত্রটি উদ্ধৃত হইল।—

দাসপত্নীরহিগোপা অতিষ্ঠন্ নিরুদ্ধা আপঃ পণিনেব গাবঃ।

অপাং বিলমপিহিতং যদাসীৎ বৃত্রং জঘন্বান্ অপ তদ্‌ববার॥

সায়ণভাষ্য।—দাসপত্নীঃ। দাসো বিশ্বোপক্ষপণহেতুর্বৃত্রঃ পতিঃ স্বামী যাসাম্ অপাং তা দাসপত্নীঃ। অতএব অহিগোপাঃ অহির্বৃত্রো গোপা রক্ষকো যাসাং তাঃ। গোপনং নাম

স্বচ্ছন্দেন যথা ন প্রবহন্তি তথা নিরোধনম্। এতদেব স্পষ্টীক্রিয়তে আপো নিরুদ্ধা অতিষ্ঠন্ ইতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ পণিনেব গাবঃ। পণিনামকোঽসুরো গা অপহৃত্য বিলে স্থাপয়িত্বা বিলদ্বারমাচ্ছাদ্য যথা নিরুদ্ধবান্ তথেত্যর্থঃ। অপাং যদ্‌বিলং প্রবহণদ্বারং অপিহিতং বৃত্রেণ নিরুদ্ধমাসীৎ তদ্‌বিলং প্রবহণদ্বারং বৃত্রং জঘন্বান্ হতবানিন্দ্রঃ অপববার অপবৃতমকরোৎ। বৃত্রকৃতমপাং নিরোধং পরিহৃতবান্।

ভাষ্যার্থ।—দাস অর্থাৎ বিশ্বোপক্ষপণহেতু বৃত্র যে অপ্‌সকলের স্বামী, দাসপত্নী অর্থে বৃত্রের অধীন সেই অপ্‌সকলকে বুঝিতে হইবে। অতএব সেই অপের অন্য বিশেষণ অহিগোপা। অহিগোপা অর্থে অহিরূপী বৃত্র যাহার রক্ষক। বৃত্রের সেই গোপন বা রক্ষণ কি রকম? অপ্‌সকল যাহাতে স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হইতে না পারে, সেই ভাবে নিরোধ করিয়া রাখা। এই ব্যাপারটিকেই (মন্ত্রে) স্পষ্টীকৃত করা হইতেছে 'অপ্‌সকল নিরুদ্ধ ছিল' এই বাক্যদ্বারা। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত—পণিনামক অসুর গো অপহরণ করিয়া, বিলে স্থাপনপূর্ব্বক বিলদ্বার যেমন নিরুদ্ধ করিয়াছিল, সেইরূপ। অপ্‌সকলের যে বিল অর্থাৎ প্রবহণদ্বার বৃত্রদ্বারা নিরুদ্ধ ছিল, বৃত্রকে হনন করিয়া, সেই দ্বার ইন্দ্র উন্মুক্ত করিয়াছিলেন।

এই প্রবন্ধে পণি অসুরের স্বরূপ নির্ণয় আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু উদ্ধৃত মন্ত্রে এবং সায়ণকৃত মন্ত্রব্যাখ্যায় প্রসঙ্গক্রমে বৃত্রকর্তৃক অপ্‌নিরোধন বিষয়টি উপস্থিত হওয়ায় সংক্ষেপতঃ তাহাই প্রথমে আলোচিত হইতেছে। কেন না, আধুনিক বেদব্যাখ্যায় বিষয়টিকে 'পার্থিব বৃষ্টির নিরোধ' বলিয়া ব্যাখ্যাত করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। অপ্ শব্দের প্রকৃত অর্থ পূর্ব্বে বলিয়াছি।[১] এখানে আরও কিছু বলিতেছি।

আপ্নোতেরাপঃ—আপ্নোতি, প্রাপ্ত হন, এই অর্থে আপ্ ধাতু হইতে অপ্ শব্দের উৎপত্তি। কে কি প্রাপ্ত হন? আত্মা নিজে নিজেকেই জগৎকারণরূপে প্রাপ্ত হন, এই অর্থে বিশ্বের কারণস্বরূপ আত্মার দ্বিতীয় প্রকাশকে 'অপ্' নামে পরিচিত করা হয়। অনির্বচনীয় আত্মা জগৎসৃষ্টির অভিলাষে অনির্বচনীয় স্বরূপ হইতে যখন উত্থিত হন, তখন তাঁহার সেই প্রথম প্রকাশের নাম হয় তেজ। পরিদৃশ্যমান এই যে অনন্ত জগৎ, ইহা সেই তেজের ভিতরে তখন বীজাকারে ফুটিয়া ওঠে। পরবর্ত্তী প্রকাশের নাম অপ্। অপের পৌরাণিক নাম কারণবারি বা কারণসমুদ্র। আত্মরূপ ক্ষেত্রে জগৎকারণরূপ অপ্‌সিঞ্চন দ্বারা তেজোমধ্যগত ঐ জগদ্‌বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ওঠে এবং দৃশ্য বা মন আকারে প্রকাশ পাইয়া আত্মার অন্ন বা ভোগ্যরূপে পরিচিত হয়। মনুসংহিতায় এই কথাই বিবৃত হইয়াছে। যথা—

সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ ॥

১। পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৬১, ১ম সংখ্যা, ১৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্বলোকপিতামহঃ ॥

সেই স্বয়ম্ভূ আত্মা অভিধ্যানপূর্ব্বক বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রথমেই অপ্ সৃষ্টি করিলেন। পরে নিজ (তেজোময়) শরীর হইতে (প্রজাসকলের) বীজ সেই অপ্ সকলের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। বীজসংযুক্ত সেই অপ্ তখন সুবর্ণবর্ণ, সূর্য্যসদৃশ প্রভাময় একটি অণ্ডে পরিণত হইল এবং সর্ব্বলোকপিতামহ স্বয়ং ব্রহ্মা তাহাতে জন্মগ্রহণ করিলেন। মনুসংহিতার এই সৃষ্টিক্রম যে, বেদের তেজ, অপ্ ও অন্ন, এই ত্রিবৃতের অনুসরণে বর্ণিত, তাহা বলাই বাহুল্য।

সুতরাং জগতের (জীবগণও জগৎপদবাচ্য) বীজাবস্থার নাম তেজ, কারণাবস্থার নাম অপ্ এবং সূক্ষ্ম বা মনোময় অবস্থার নাম অন্ন। এখন কথা এই যে, জগতের ঐ আপোময়, কারণময় বা প্রাণময় অবস্থা আমরা দেখিতে পাই না। ইন্দ্র ত বৃষায়মাণ বা বর্ষণশীল আত্মা। তিনি নিরন্তর অপ্ বর্ষণ করিতেছেন; নতুবা জগৎ বাঁচিয়া থাকিত না। কিন্তু ঐ অপ্ বর্ষণ বা জগতের কারণাবস্থাটি আমাদের অগোচর রহিয়াছে কি জন্য? আমাদের অধ্যাত্মে বৃত্রকৃত অপ্ নিরোধন রহিয়াছে বলিয়া। শরীরস্থ যে বিল, নাড়ী বা প্রবহণদ্বার দিয়া স্বচ্ছন্দে অপ্ প্রবাহিত হইলে, অপ্‌কে জগৎকারণরূপে জগন্ময় দেখিতে পাওয়ার কথা, বৃত্র সেই প্রবহণদ্বার নিরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

বৃত্রনিরুদ্ধ হৃদয়স্থ অপ্ বা প্রাণকে এই জন্য বলা হইয়াছে 'দাসপত্নী' ও 'অহিগোপা'। কেন না, এই নিরুদ্ধ অপের স্বামী ও রক্ষক এখন বৃত্রাসুর। স্থূল হইতে সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত, অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন, উভয় অবস্থায় জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়রূপে আত্মার যে ত্রিবিধ অনাত্ম আবরণ বিদ্যমান, তাহারই নাম বৃত্র এবং তদ্দ্বারাই হৃদয়স্থ অপ্ নিরুদ্ধ।

বৃত্রকে 'দাস' বলা হইয়াছে কেন? 'দসু উপক্ষয়ে। দাসয়তীতি দাসো বৃত্রঃ।' আত্মার মহিমা বা স্বরূপধর্ম্মকে উপক্ষীণ করিয়া, তাঁহাকে সে জড় জগতের দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে, এই জন্য বৃত্রের এক নাম দাস। সায়ণ বলেন—'দাসো বিশ্বোপক্ষপণহেতুর্বৃত্রঃ।' কারণ-বিশ্বের উপক্ষপণ, ত্যাগ বা অদর্শনের হেতু হইল বৃত্র। আর তাহার অদর্শনে কার্য্যবিশ্ব বা জড় জগতের অধীনতা অবশ্যম্ভাবী এবং এই অবস্থার নামই বৃত্রের অপ্ নিরোধন।

বৃত্রকে নিহত করিয়া এই নিরোধ ইন্দ্র উন্মুক্ত করিবেন। যিনি প্রিয় অপেক্ষা প্রিয়তম, অন্তর হইতেও অন্তরতম, তিনিই সর্ব্বভূতের আত্মা ইন্দ্র। ঋষিগণ তাঁহার সাযুজ্য লাভ করিয়া বৃত্রকে হনন করিয়াছিলেন। সাযুজ্য লাভের অর্থ সংযুক্ত হওয়া। ইন্দ্রের সহিত যে সংযুক্ত হইতে পারে, তাহার হৃদয়ে ইন্দ্রের ধর্ম্ম বা শক্তি প্রকাশ পায়। ইন্দ্রের ধর্ম্ম কি? জ্ঞেয়, জ্ঞান, জ্ঞাতা বা দৃশ্য, দর্শন, দ্রষ্টা, এই তিন ভূমিতেই আত্মদর্শন। পূর্ব্বে যে মনুষ্য ঐ তিন ভূমিতেই অনাত্মদর্শন করিতেছিল, ইন্দ্রসাযুজ্যলাভে সেই ভূমিত্রয়ে যদি তাহার আত্মদর্শন সিদ্ধ হয়, তবে অনাত্ম আবরণত্রয়রূপী বৃত্রাসুর আর থাকিতে পারে কি? সে মরিয়া যায় বা ইন্দ্রশক্তি দ্বারা নিহত হয়। বৃত্র নিহত হইলে ইন্দ্রশক্তির প্রভাবে হৃদয়স্থ

অপ্‌প্রবহণের দ্বার উন্মুক্ত হয় বা হৃদয় খুলিয়া যায়। তাহার ফলে হয় কি? বৃত্রকৃত নিরোধের জন্য বিন্দু বিন্দু যে সকল অপ্‌ বা প্রাণ, অপ্‌সমুদ্রে অর্থাৎ মহাপ্রাণে মিলিত হইতে পারিতেছিল না, তখন তাহারা—

বাশ্রা ইব ধেনবঃ স্যন্দমানা অঞ্জঃ সমুদ্রমবজগ্মুরাপঃ ॥

হাম্বারব করিয়া ধেনুগণ যেমন বৎসাভিমুখে ধাবিত হয়, বিন্দু বিন্দু অপ্‌সকলও তেমনি ভাবে প্রবাহিত হইয়া অপ্‌সমুদ্রে মিলিত হয়। ইহারই নাম—অহিকে হননপূর্ব্বক ইন্দ্রকর্ত্তৃক পৃথিবীতে অপ্‌সকলকে নিপাতিত করা। যে মনুষ্যের এইরূপ জ্ঞানোদয় হয়, জগৎকে তিনি যে মূর্ত্তিতে দর্শন করেন, উপনিষৎ তাহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং।

এবম্বিধ দর্শনই জগতের কারণাবস্থা দর্শন নামে কথিত হয়।

এইবার মুখ্য বিষয়ে ফিরিয়া আসা যাউক। বলা বাহুল্য যে, অন্যান্য অসুরের ন্যায় পণি অসুরও আবহমানকাল প্রতি জীবে বর্ত্তমান থাকিয়া, স্বকার্য্য সাধনে নিরত রহিয়াছে। পণি শব্দটি পণ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। পণ ধাতুর অর্থ—বিক্রয় করারূপ ব্যবহার। এই অর্থের অনুসরণে যাস্ক বলিয়াছেন—"পণির্বণিগ্‌ভবতি। পণিঃ পণনাদ্‌বণিক্‌ পণ্যং নেনেক্তি।" কিন্তু যাঁহারা জাগতিক পণ্যবিক্রেতা বণিক্‌, গো অপহরণ তাঁহাদের কার্য্য নহে। সুতরাং তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া যাস্ক ঐরূপ অর্থ করিয়াছেন, ইহা মনে হয় না। এই বণিক্‌ তবে কিরূপ বণিক্‌?

পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, ইন্দ্র বর্ষণশীল, দানশীল, বিচ্ছুরণশীল আত্মা। তিনি দিকে দিকে নিজেকে বর্ষণ করিতেছেন। তাঁহার এই বর্ষণের বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। সেই বর্ষণ হইতে আমরা কি পাইয়াছি এবং পাইতেছি? এক একটি পৃথক্‌ পৃথক্‌ আত্মবোধ। সমুদ্রের জল অপার ও অনন্ত। কিন্তু সেই জলই যখন মেঘ হইতে বর্ষিত হয়, তখন সে আর অপার অনন্ত থাকে না; বিন্দু বিন্দু বর্ষিত হয়। ইন্দ্র আত্মাও সেইরূপ অপার ও অনন্ত হইলেও তিনি যখন নিজেকে বর্ষণ করেন, তখন বিন্দু বিন্দু করিয়া বর্ষণ করেন। কেন না, নিজেকে বিন্দু বিন্দু করাই তাঁহার জগৎসৃষ্টি। আমাদের আত্মবোধ সেই বিন্দু আত্মবোধ হইলেও ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহারও দাতৃত্বধর্ম্ম আছে। স্বীয় অঙ্গ হইতে দেবগণকে জ্যোতীরূপে বিকীর্ণ করিয়া আমাদের হৃদয়সিংহাসনে তিনি দাতারূপে সমাসীন এবং সাক্ষাদ্‌ভাবে তাঁহার অঙ্গজ্যোতি দেবগণের নিকট হইতেই আমরা সব পাইয়া থাকি। কিন্তু অসুরগণ যখন দেবগাভী হরণ করিয়া নেয়, দেবগণ যখন স্বাহা ও বষট্‌কাররূপ খাদ্যাভাবে নিষ্প্রভ ও দুর্বল হইয়া পড়েন, আমরা তখন দেবগণকে দেখিতে না পাইয়া অসুরাধীন হই।

দেবগণ অন্তরের জিনিষ এবং অন্তরেই উপলব্ধ হন। অন্তরে দেবগণ জাগিয়া উঠিলে তাঁহাদের সহায়তায় মনুষ্য পরাপ্রকৃতি বা আত্মবোধের দিকে গতিশীল হয়। আর অসুরগণের প্রকাশও অন্তরেই ঘটে এবং তাহার ফলে মনুষ্য, অপরা প্রকৃতি বা অনাত্মবোধের দিকে, পরবোধের দিকে ধাবিত হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আত্মবোধ বা আত্মা হইলেন দাতৃত্বধর্ম্মবিশিষ্ট।

তিনি নিজেতে নিজেকে দান করিয়াই আনন্দ লাভ করেন। প্রতিদানে কিছুই গ্রহণ করেন না। দেবগণের জাগরণে আত্মবোধের দিকে যতই গতি হইতে থাকে, মনুষ্য ততই আত্মার ঐ ধর্ম্ম লাভ করে। পক্ষান্তরে পণি অসুরের প্রাবল্যে মানুষ যখন অপরা প্রকৃতি বা অনাত্মবোধ অর্থাৎ পরবোধের দিকে ধাবিত হয়, তখন সে কাহার ধর্ম্ম লাভ করে? ঐ পণি অসুরের যে আদান-প্রদানময় বণিক্‌ধর্ম্ম, তাহাই লাভ করে। এই অসুর যখন মনুষ্যহৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠে, মানুষ তখন কিরূপ আচরণ করে? তুমি আমাকে কিছু দাও ত আমিও তোমাকে কিছু দিব; তুমি আমাকে ভাল বাসিলে আমিও তোমাকে ভাল বাসিব, এইরূপ বণিক্‌ধর্ম্মের আচরণ করে। পণি অসুরের অভ্যুত্থানে মানুষ কখনও নিঃস্বার্থ দান বা নিঃস্বার্থ ভাবে কাহাকেও ভাল বাসিতে পারে না। কেন না, নিঃস্বার্থ দান ও নিঃস্বার্থ ভালবাসা প্রভৃতি হইল দৈব ধর্ম্ম। দেবগাভী হরণ করিয়া, দেবগণের নির্জীবতা সাধনপূর্ব্বক মনুষ্যহৃদয়ের সেই সকল দৈব ভাব ত সে আগেই ধ্বংস করিয়া রাখিয়াছে।

হৃদয়স্থ অসুরগুহা স্বার্থান্ধকারে এমনই সমাচ্ছন্ন যে, ইন্দ্র সহজে তাহা খুঁজিয়া না পাইয়া দেবগাভীর অন্বেষণার্থ দেবশুনী সরমাকে প্রথমে নিযুক্ত করেন। দেবশুনী শব্দের সাধারণ অর্থ দেবগণের কুক্কুরী। তাত্ত্বিক অর্থ—দেবগণের গতি বা পদক্ষেপ। কেন না, ত্বরিতগতিবাচক শুন ধাতু হইতে শুনী শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। মানুষের অন্তরে অসুরগণ বৃদ্ধির চরম সীমায় উপনীত হইবার পর, পুনরায় যখন তাহাদের পতনকাল উপস্থিত হয়, সেই সময় দেবগণ ধীরে ধীরে মনুষ্যহৃদয়ে পদক্ষেপ করিতে থাকেন। হৃদয়স্থ রমা নাড়ীর মধ্য দিয়া তাঁহাদের ঐরূপ পদক্ষেপ বা গতাগতি হয় বলিয়া, বেদে ঐ দেবপদক্ষেপকে 'দেবশুনী সরমা' নামে বর্ণনা করা হইয়াছে। অসুরগণের বাসস্থান হৃদয়মধ্যস্থ অরমা নাড়ী। এই জন্য যে মানুষ যত বেশী অসুরভাবগ্রস্ত, সে তত অসুখী। কিছুতেই যেন তাহার সুখ নাই। কাজেই অরমানিবাসী পণিগণের নিকট সরমা উপস্থিত হইলে পণিগণ স্বভাবতই তাহার সহিত মিত্রতা করিয়া, নিজেদের মধ্যে তাহাকে রাখিতে যত্ন করে। কেন না, সরমাকে নিকটে পাইলে তাহারা সুখী হয়। কেন সুখী হয়? না, সুখী করাই রমা নাড়ীর ধর্ম্ম। কিন্তু সরমা পণিদের কথা না শুনিয়া, ইন্দ্রের নিকট ফিরিয়া যায় এবং ইন্দ্র তখন মরুদ্‌গণের সহিত মিলিত হইয়া পণিগণের গুহা হইতে দেবগাভীর উদ্ধার সাধন করেন।

বৃত্র, অহি ও বলাসুরের ন্যায় পণি অসুরও ইন্দ্র কর্তৃক নিহত হইয়া থাকে এবং পণির সংহারকালে প্রাণপ্রবাহরূপী মরুদ্‌গণ ইন্দ্রের সহায় হইয়া, ঐ অসুরের স্বার্থসঙ্কীর্ণ জড়তারূপ অন্ধকারময় গুহা ভেদ না করিলে, ইন্দ্র তথা হইতে দেবগাভী উদ্ধার করিতে পারেন না। *কেন না, তৎপূর্ব্বে ঐ গুহা ইন্দ্রপদক্ষেপের অনুপযুক্ত থাকে। দেবগাভী সম্বন্ধে গত সংখ্যা* পরিষৎ-পত্রিকায় আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এখানে পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

৪৪৩। লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-১৮, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। ১০ সংখ্যক পত্র মধ্যদেশে ছিন্ন এবং ১ম পত্রের ১ম পৃষ্ঠায় একখানি আসন ও একটি বৃক্ষ অঙ্কিত। পরিমাণ ১৩৸০×৪৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৭২ সাল। শেষ পৃষ্ঠার কিছু কিছু মুছিয়া গিয়াছে।

আরম্ভ—

৭শ্রীশ্রীহরি শ্রীশ্রীরাম ॥ নম গণেশায় নম ॥

শক্তিশেল আরম্ভ ॥

সারথিরে ডাকিয়া কহেন দশানন।
বানরে মারিয়া মোর কোন প্রয়োজন ॥
চালাইয়া দেহ রথ রামের সাক্ষাতে।
রাম লক্ষ্মণ মারিয়া [বানর] মারিব পশ্চাতে ॥
সারথি চালায় রথ শ্রীরামের পাশে।
দূরে থাকি লঙ্কেশ্বর মন্দ২ হাসে ॥
দূরে হৈতে শ্রীরাম দেখএ লঙ্কেশ্বর।
দূর্ব্বাদলশ্যাম তনু মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর ॥
বস্যাছে কুণ্ডলধারী দক্ষিণে লক্ষ্মণ।
অতিকোপ কর্য্যা ডাক্যা বলে দশানন ॥
আগু হয়্যা দেগু রণ কার নাম রাম।
লঙ্কাপুরীতে মোর তারে বিধি বাম ॥
ছাওালে মারিয়া তার কিসের বীরপোনা।
মোর হাথে পড়িলে তখনি জাবে জানা ॥

শেষ—

শিলে বাটি সাবধানে বিশল্যকরণি।
অমৃত অঙ্গুলে মাখ্যা ভাবে রঘুমণি ॥
ধন্বন্তরি সোঙরিয়া নাকে দিল ঘ্রাণ।
চেতন পাইয়া লক্ষ্মণ ভাই পানে চান ॥
লক্ষ্মণ উঠিয়া বৈসে ঔষধের বলে।
বাহু পসারিয়া [রাম] ভাই নিল কোলে ॥
চুম্বন করিয়া মুখে রাম কহেন কথা।
মোরে ছাড়ি আহা মরি গিয়াছিলে কোথা ॥
গলাগলি করিয়া কান্দেন দুই ভাই।
ধাইল বানর জত আনন্দ বাধাই ॥
উর্দ্ধবাহু নাচে বানর গড়াগড়ি জায়।
লোটায়্যা২ ধরে হনুমানের পায় ॥
দুই ভাই······পবননন্দনে।
পদরজ রঘুনাথ দিলেন··· ॥
বন্দিয়া বাল্মীক ব্যাস কবিচন্দ্রে গায়।
এত [দূরে শক্তি]শেল পালা হইল সায় ॥
সন ১১৭০ সাল মাহ আসাঢ় লিখিতং শ্রীকৃষ্ণ······ ॥

৪৪৪। অঙ্গদ রায়বার।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-১৭, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৸০×৩ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৫২ সাল। পূর্ব্বে ৪১৫ সংখ্যক পুথির বিবরণ দ্রষ্টব্য।

আরম্ভ—

৺৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥

অথ অঙ্গদ রাএর পালা লিক্ষতে ॥
বন্দ গেলা সিন্ধু রামচন্দ্র হইল পার।
বানরে বেড়িল গা লঙ্কার দোয়ার ॥

রাম বলে সুগ্রীব মিতা আর কেনে বিলম্ব।
করেন কেন্নাই রাবণ রাজা যুদ্ধের আরম্ভ ॥
সাগরপার বল্লা তার বড় ছিল আটনি।
সে বল ফুরাল এখন কি বলে তা শুনি ॥
সুগ্রীব বলেন মিতা দিন দুই চারি আর।
জনেক পাঠাইয়া আমি বুঝিব সমাচার ॥

শেষ—

শ্রীরাম বলেন শুন বেলের কুমার।
ভুবনে এ সব কীর্ত্তি রহিল তোমার ॥
শ্রদ্ধা ভক্তি করি এহা শুনে জেই জন।
অন্তকালে পায় সেই প্রভু নারায়ণ ॥
রসিক জনার মন সদাই আনন্দ।
রায়বার রচিলা দ্বিজ কবিচন্দ ॥

ইতি অঙ্গদের রাএবার সোমাপ্ত ॥ পটক শ্রী লোকনাথ পাল সাকিম কল্বানপুর পরগনে খণ্ডঘোষ জথা দিষ্টং [ইত্যাদি] লিখিত° শ্রীলোকনাথ ঘোষ সা° বাদিগাছা পরগনে খণ্ডঘোষ সোন ১২৫২ সাল তারিখ ৩ মাঘ বেলা এক পোহরের মর্দ্ধে সমাপ্ত হইল ইতি এই পুস্তক জে চুরি করিবেক সে বধু কথা হইবেক।

৪৪৫। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৬, ৮-৯, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩৷৷০ × ৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪৮ সাল।

আরম্ভ—

৶৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥

অথ দ্রোপদির বস্ত্রহরণ পালা লিখ্যতে ॥
বৈশম্পায়ন বলে শুন জন্মেজয়।
মহাভারতের কথা সভাপর্ব্বে কয় ॥
রাজসই যজ্ঞ রাজা করিলেন সায়।
মহারাজা যুধিষ্ঠির বসিল সভায় ॥
... ...
ময় দানব নামে পুরি করিয়া নির্ম্মাণ।
শত্রু পক্ষ হইলে দেখে জল স্থলজ্ঞান ॥
সভামধ্যে চলিলেন রাজা দুর্য্যোধন।
স্থলে জল বুদ্ধি করি তুলিল বসন ॥

শেষ—

দুর্য্যোধনের স্ত্রী আদি জত নারী ছিল।
উলঙ্গ হইয়া সভে সভাতলে আইল ॥
... ...
ধন্য২ যুধিষ্ঠির বলে সর্ব্বজন।
তোমাদের বশ কৃষ্ণ দৈবকীনন্দন ॥
দ্রোপদিকে রক্ষা কৈলা দৈবকীনন্দনে।
দ্বারিকা চলিলা কৃষ্ণ সত্যভামা সনে ॥
বৈশম্পায়ন মুনি বলে শুন রাজা জন্মেজয়।
পরের করিলে মন্দ আপনার হয় ॥
... ...
এত বলি জন্মেজয় কান্দিয়া বিকল।
দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় গোবিন্দমঙ্গল ॥

ইতি দ্রোপদির বস্ত্রহরণ পালা সমাপ্ত হইল জানিবেন ইতি পাটক শ্রীঠাকুরদাস দে সাঃ পাত্রগাতি লিখিতং শ্রীকৈলাশচন্দ দাস ঘোসস্য সাঃ সামন্তখণ্ড ইতি সন ১২৪৮ সাল তা° ৪ ফাল্গুন ॥

৪৪৬। অঙ্গদের রায়বার।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৯, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। লিপি পরিষ্কার, কিন্তু বর্ণাশুদ্ধিপূর্ণ। শেষ পত্রের পার্শ্ব ও মধ্যদেশের কিছু অংশ নাই।

পরিমাণ ১৩৷৷০ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৯৫ সাল।

আরম্ভ—

শ্রীরামঃ ॥

বন্দ গেলা সিন্ধু রামচন্দ্র হইলা পার।
বানরে বেড়িল গিয়া লঙ্কার দুয়ার ॥
রাম বোলেন সুগ্রীব মিতা আর কেনে বিলম্ব।
করে না কেনে রাবণ রাজা যুদ্ধের আরম্ভ ॥
সাগরপার বুল্যা তার বড় ছিল আটনি।
সে বোল ফুরায়্যা গেল কি বলে তা শুনি ॥
সুগ্রীব বোলেন মিতা দিন দুই চারি আর।
জনেকে পাঠাঞা দিয়া জানি সমাচার ॥

শেষ—

শ্রীরাম বোলেন বাপু বালির কোঙর।
ভুবনে···কীর্ত্তি রহিল তোমার ॥
আদর করিঞা জে জন শুনে রায়বার।
সুগ্রীবের রাজত্বভার হইবে তাহার ॥
.বাঞ্ছা করিয়া জেবা শুনে রামায়ণ।
সে হয় আমার প্রিয় লক্ষ্মণ সমান ॥
রসিক জনের মনে শ্রবণে আনন্দ।
······রচনা করিলা কবিচন্দ্র ॥

অঙ্গদের রায়বার সমাপ্ত ॥ ইতি তাঃ ৮ শ্রাবন সন ১১৯৫ সাল। লিখিতং শ্রীসিবনাথ চক্রবর্ত্তিশর্ম্মণঃ সাকিম কৃষ্ণপুর পরগনে জুঝারসিংহপুর। মোকাম দোহাল পরগণে সেরপুর ॥ শ্রীরস্তু লেখকে সদা। শ্রীগুরুবে নমঃ ॥

৪৪৭। শক্তিশেলের পালা।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-১৪, সম্পূর্ণ। দুভাঁজ-করা বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৪ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপি-কাল ১২৩৪ সাল।

আরম্ভ—

৭শ্রীশ্রীরামঃ ॥

অথো শক্তিশেলের পালা লিখ্যতে ॥
রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং [ইত্যাদি শ্লোক] ॥
মরিল জতেক সৈন্য শূণ্য হইল পুরী।
অবিরত মোহে কান্দে তা সভার নারী ॥
দিবানিশি মন্দোদরী করএ রোদন।
কোপ করি রণ মাঝে সাজে দশানন ॥
হেন কালে দশাননে কহে মন্দোদরী।
আপনার দোযে মজাইলে লঙ্কাপুরী ॥
কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রজিত আদি জত বীর।
জার রণে দেবাসুর কেহ নহে স্থির ॥
ঘরে বসি থাক নাথ আমি করি মানা।
শ্রীরাম মনুষ্য নহে তাহা গেছে জানা ॥

শেষ—

হনুমান বলে আমি চিনিতে নারিনু।
এত বলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিল পদরেণু ॥
চরণে ধরিয়া বলে আমি অনুগত।
বিকাইনু রাঙ্গা পায় জনমের মত ॥
রাবণে মারিয়া সীতার করহ উদ্ধার।
অযোধ্যায চল সুখি বিভীষণের ধার ॥
লক্ষ্মণ পাইল প্রাণ ডাকে রামজয়।
রাবণ সাজিল রণে কবিচন্দ্র কয় ॥

ইতি সক্তীসেলের পালা সমাপ্ত ॥ জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]। এই পুস্তক শ্রীমুক্তারাম চক্রবর্ত্তির হৈল ॥ লিখিতং শ্রীনন্দকুমার পাল সাং বড়বেল সন ১২৩৪ বার সও চৌত্তীষ সাল তারিখ ২২ বাইসা বৈসাখ।

৪৪৮। অক্রুরাগমন।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৭, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩×৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৩৫ সাল।

আরম্ভ—

৺৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ॥
নম নারায়নায় নম॥ অক্রুরাগমন লিক্ষতে॥
তবে রাজা অক্রুরে আনিল ডাক দিয়া।
রাম কৃষ্ণ দুটি ভাই ঝাট আন গিয়া॥
করিব ধনুর যজ্ঞ করহ গমন।
শুনিয়া অক্রুর হৈল আনন্দিত মন॥
রথ সাজাইয়া অক্রুর চলিল ত্বরায়।
কৃষ্ণ দরশন হব কি ভাগ্য আমায়॥
জবে রামকৃষ্ণরে দেখিব এক ঠাঞি।
রথ হৈতে ভূমিতলে নামিব তথাই॥
রামকৃষ্ণ দেখিয়া করিব যোড়হাথ।
অবশ্য করিব দয়া দেব জগন্নাথ॥

শেষ—

কহ রে পথিক ভাই ধরি তোর পায়।
রথে বসি কত দূর জায় শ্যামরায়॥
এই মত গোপী সব করুণা করেন।
হেথা রামকৃষ্ণ দুহে মথুরা গেলেন॥
দ্বিজ কবিচন্দ্রে কহে পুরাণের সার।
একচিত্তে শুনে জে ধর্ম্ম নাই আর॥
শ্রীভাগবতামৃতকথা কহনে না জায়।
এত দূরে এইখানে পালা হইল সায়॥

ইতি অক্রুরাগমন সায়॥ জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]। ইতি লিখিতং শ্রীসনার্গিরাম মাল সাং রামচন্দ্রপুর পাটক শ্রীসনালীরাম মাল সাথুড়্যা সাং ঐ সন ১২৩৫ সাল তাং ১৪ ফালগুন বেলা আন্দাজি দুই প্রহর তিথি সষ্ঠী মঙ্গলবার সমাপ্ত হইল।

৪৪৯। লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১৫-১৮, অসম্পূর্ণ। দুভাঁজ-করা বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩×৪।০ ইঞ্চি। আদি ও অন্তে খণ্ডিত চারিটি পত্র। লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

ভনিতা—

ব্যাস বাল্মীক পদ সদা করি ধ্যান।
রামলীলা রামায়ণ কবিচন্দ্র গান॥

৪৫০। কুম্ভকর্ণের রায়বার।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৪, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১২ পঙ্ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩।০×৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২৩ সাল।

আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ॥
কুম্ভকর্ণের রায়বার লিখ্যতে॥
নিদ্রা হইতে উঠিয়া বসিলা কুম্ভকর্ণ।
সুবাসিত জল কেহ জোগাইছে পুণ্য॥
কুঙ্কুম কস্তুরি কেহ লেপে সর্ব্বগায়।
কত শত সেনাপতি চামর ঢুলায়॥
দূতমুখে শুনি কথা লঙ্কার অধিপতি।
ভাইকে কহিতে গেলা আপন দুর্গতি॥

রাজাকে দেখিয়া কুম্ভকর্ণ মহাবীর।
সংভ্রমে উঠিয়া তার পদে দিলা শির ॥

শেষ—

অহঙ্কারে মত্ত ভাই না চিনে আপনা।
ইহার লাগিয়া তোমার কাছ ছাড়ে বিভীষণা॥
বিভীষণ যে পথে গেলা সেই পথ মোর।
রল্য হে রাবণ রাজা দণ্ডবৎ মোর ॥
মন দিয়া এই কথা শুনে যেই জন।
তারে কৃপা করেন রাম শ্রীমধুস্থদন ॥
কবিচন্দ্র বলে ভাই শুন আমি বলি।
অকারণে গেল রে লঙ্কার ঠাকুরালি ॥

ইতি কুম্ভকর্ণের রায়বার সমাপ্ত ॥ ইতি সন ১২২৩ সাল তাং ২৮ অগ্রাণ পটক শ্রীগোপাল গোরাঞ্চি ॥ জে নি চুরি করিবেক সে ম্যাগের ঢানি হাতে করা খাবেক ॥

৪৫১। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ৩-৫, অসম্পূর্ণ। পাতলা তুলট কাগজ। মধ্যে ও পার্শ্বে ছ্যাদা। লেখা অস্পষ্ট। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৩×৪॥০ ইঞ্চ। আদি অন্তে খণ্ডিত মাত্র তিনটি পাতা। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। পূর্ব্বে এই নামীয় পুঁথির পরিচয় দ্রষ্টব্য।

ভনিতা—

এত বলি দুর্য্যোধন হাসে খল খল।
দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় গোবিন্দমঙ্গল ॥

৪৫২। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১, ২।২, ৬-৯, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। ২য় পত্রের ১ম পৃষ্ঠা এবং ৩ হইতে ৫ পত্র নাই। পরিমাণ ১৩॥০×৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২১৪ সাল।

আরম্ভ—

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ।

দ্রোপদীর বস্ত্রহরন লিক্ষতে ॥

বৈশম্পায়ন মুনি সভাপর্ব্বে কয়।
শ্রীমহাভারত রাজা শুনে জন্মেজয় ॥
রাজসুই যজ্ঞ রাজা করিলেন সায়।
মহারাজা যুধিষ্ঠির বসিলা সভায় ॥
সহদেব নকুল আদি ভীম ধনঞ্জয়।
সভা করি বসিলেন পাণ্ডবতনয় ॥ ইত্যাদি।

শেষ—

পরক্ষতি পরনিন্দা করে জেই জন।
মরিলে না মুক্ত হয় নরকে গমন ॥
এত বল্যা জন্মেজয় কান্দিয়া বিকল।
দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় গোবিন্দমঙ্গল ॥

ইতি দ্রোপদীর বস্ত্রহরন সমাপ্ত ॥ লিখিতং শ্রীগুরুচরণ দত্ত সাঃ পাত্রসাএর মোজে রঘুনাথপুর এ পুস্তক শ্রীগোকুলচন্দ্র পালের সাঃ নিজগ্রাম গোপীনাথপুর ॥ সন ১২১৪ সাল তারিক ১ কার্ত্তিক রোজ স্থক্রবার ॥

৪৫৩। ভরত উপাখ্যান।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ৩-৭, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩॥০×৪॥০ ইঞ্চি। আদি ও অন্তে খণ্ডিত পাঁচটি পত্র। লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

৩য় পত্রের আরম্ভ—

হরিণ ২ ধ্যানে ভরথ তেজিল প্রাণে
হরিণ হইল সেই বনে।
দারুণ শিশুর শোক কেমনে বাচিল লোক
কবিচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ভনে॥
শুক কহে পরিক্ষিত শুন তার পরে।
ভরত হইল মৃগ ক্ষেত্র কালিঞ্জরে॥
কৃষ্ণপূজাফলে ভরত হল্য জাতিস্মর।
শালগ্রামক্ষেত্রে তেজে মৃগকলেবর॥
আঙ্গির সকল বিপ্র···যজ্ঞেশ্বরে।
জন্ম লভে তার জ্যেষ্ঠ ভা‥র উদরে॥
জ্যেষ্ঠ সুত ভরত হইল মহাশয়।
কনিষ্ঠ তাহার পুত্র তবে জন্মেজয়॥ ইত্যাদি।

৭ম পত্রের শেষ—

এক দেশে আছে এক চণ্ডালের রাজা।
বৎসরান্তে করে রাজা নরবলি পূজা॥
নগরে দেবীর পূজা পড়িল ঘোষণা।
অবিরত বাজে জত মঙ্গল বাজনা॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য দিল জত।
পূজোপকরণ নানা নানাবিধিমত॥
রাণী সঙ্গে পরিবার লয়্যা গেল রাজা।
উচ্ছব দেখিতে আল্য নগরের প্রজা॥

৪০৪। **উদ্ধবসংবাদ।**

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-১০, সম্পূর্ণ। তুলাঁজকরা বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩×৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২১ সাল।

আরম্ভ—

৭ শ্রীশ্রীদুর্গা
অথ উদ্ধবসংবাদ লিক্ষিতে॥
শুক বলে মহারাজা শুন পুনরপি।
গোপীদের মনে পড়ে কত দিন ব্যাপি॥
বৃন্দাবন পাসরিতে নারিল মাধবে।
মনেতে পড়িল কৃষ্ণ বৃন্দাবনভাবে॥
তাহাতে বসিলা কৃষ্ণ উদ্ধব সহিত।
ভাবিতে২ কৃষ্ণ গোপী সব হিত॥
নন্দ যশোদার প্রেম পাসরিতে নারে।
দিবানিশি পড়ে মনে ঝোরএ অন্তরে॥
গোকুলে গোপিনি সঙ্গে জত কৈলা নিলা।
সে সব সোঙরিয়া কৃষ্ণ অচেতন হৈলা॥

শেষ—

শুনিয়া উদ্ধবমুখে এ সকল কথা।
ভাবিতে লাগিলা কৃষ্ণ হেট করি মাথা॥
নন্দ যশোমতীর প্রেম কহিতে না পারি।
কোথায় রহিল মাতা বলেন শ্রীহরি॥
হাহা করি মরে মাতা আমার লাগিয়া।
মলিন হইল দেহ ভাবিয়া২॥
রাধার লাগিয়া মোর ব্রজপুরবাস।
রাধা বিনে হৈল মোর সকলি নৈরাশ॥
এত বলি কৃষ্ণচন্দ্র ভাবে মনে২।
বিদায় হইল উদ্ধব আপন ভবনে॥
ভাবিয়া ব্যাসের পদ কবিচন্দ্র ভনে।
পাইল ব্রজের তত্ত্ব শ্রীমধুসূদনে॥
উদ্ধবসংবাদ পালা শুন সর্ব্বজনে।
হরিধ্বনি করিয়া আনন্দ রহে মনে॥

জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]। পাটক শ্রীজাগাঞি- দাস সরকার। সাং নান্দালি সন ১২২১ সাল তাং ৬ শ্রাবন।

৪৫৫। গোপিকার বস্ত্রহরণ।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৬, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। শেষ পত্রের কতক অংশ ছিন্ন; সে জন্য কিছু লেখা নষ্ট হইয়াছে। পরিমাণ ১০ × ৬॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৭৪ সাল।

আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ ॥

অথ গোপিকার বস্ত্রহরণ লিক্ষতে ॥
শুকদেব বলে রাজা মন দিয়া শুন।
গোবিন্দগুণানুবাদ তোরে কহি শুন ॥
জেন মত পূর্ণমাসী ব্রজকুমারিকা।
কাত্যায়নী ব্রত করে মুক্তিদায়িকা ॥
যথাকালে হবিষ্যান্ন করেন্ ভোজন।
নিশিযোগে করেন কুসুমশয্যায়ন।

…　　…　　…

নিত্য যমুনার জলে সভে করে স্নান।
বালির প্রতিমা চিত্র করিএ নিশ্মাণ ॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি নানা।
ভক্তিভাবে পূজে সভে করএ প্রার্থনা ॥
কাত্যায়নি মহামাই মহাযোগেশ্বরি।
নন্দপুত্রে পতি দেহি নমস্কার করি ॥

ভনিতা—

চক্রবর্ত্তী মুনিরাম　অশেষ গুণের ধাম
তস্য পুত্র কবিচন্দ্রে গায় ॥

শেষ—

এত দূরে গোপীদের বস্ত্রহরণ হৈল সায়।
ধন ধান্য পুত্র হয় জে জন গায়ায় ॥
বস্ত্রহরণ কথা জেই জন শুনে।
লক্ষ্মীর জে কৃপা হয় তাহার আশ্রমে ॥
ইহকালে সুখ হয় পরকালে সর্গ।
হরি হরি বল ভাই শুন বন্ধুবর্গ ॥

ইতি গোপিকার বস্ত্রহরন সমাপ্ত ॥ ইতি সন ১২৭৪ সাল তারিখ ১৮ পৌষ ॥ লিখিতং শ্রীনফরচন্দ্র দাস মিত্র ॥ পঠনার্থে শ্রীগুপিনাথ দে। শ্রীনটবর পাল ৵০ দুই আনায় গোবিদ কোরিলাম।

৪৫৬। রাধার কলঙ্কভঞ্জন।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৫, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১২।০ × ৪॥০ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

আরম্ভ—

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ ॥

রাধার কলঙ্কভঞ্জন লিখ্যতে ॥
রাধার কলঙ্ক গীত করহ শ্রবণ।
রাধার কলঙ্ক কৃষ্ণ করিলা ভঞ্জন ॥
বৃকভানুসুতা বসি বিরল মন্দিরে।
কেহ পাছে জানে বলি কান্দে ধীরে২ ॥
কান্দিতে২ বলে কি করিলে শ্যাম।
তোমার কারণে মোর কলঙ্কিনী হইল নাম ॥
কলঙ্কিনী নাম হৈল তার নাঞি ভয়।
হেন অপযশ যেন যুগে যুগে রয় ॥

ভনিতা—

কবিচন্দ্রে বলে রাধার আর কেহো নাঞি।
রাধা বলে মোরে দেখ্য চান্দ কানাঞি ॥

পঞ্চম পত্রের শেষ—

বৈদ্য বলে যশোমতি আজ্ঞা যদি পাই।
আশীর্ব্বাদ কর মোরে ঘরে চল্যা জাই ॥

যশোদা বলেন বাছা করিলে উপগার।
কিবা ধন দিয়া আমি শুধিব তোমার ধার॥
বৈদ্য বলে যশোমতি এমন কেনে বল।
আমি গো তুমার বটি কেবল ছায়াল॥
এত বলি বৈদ্যরাজ গমন করিল।
বাহির দুয়ারে গিয়া…

৪৫৭। অঙ্গুরীসংবাদ

রচয়িতা—কবিচন্দ্র। পত্র ১-১৭, সম্পূর্ণ। তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৬ পঙ্‌ক্তি লেখা। প্রথম পত্র মধ্যদেশে ছিন্ন। পরিমাণ ৯×৩৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

রামের প্রদত্ত অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিয়া হনূমান্ লঙ্কায় গমনপূর্ব্বক অশোকবনে অবস্থিত সীতার সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসেন, এই ঘটনাটি আলোচ্য পুথিতে 'অঙ্গুরীসংবাদ' নামে বর্ণিত হইয়াছে। পুথিতে মোট ৩টি ভনিতা আছে; একটি কবিচন্দ্রের, দুইটি কৃত্তিবাসের। তিনটি ভনিতাই উদ্ধৃত করিলাম।

আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ॥
অথ অঙ্গুরিসম্বাদ লিখ্যতে॥
রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং [ইত্যাদি শ্লোক]।
পম্পা নদীর কূলেতে বসিয়া তিন জন।
তিন দিগে করেন সীতার অন্বেষণ॥
জটায়ু পক্ষীর মুখে শুনি সমাচার।
রাবণে হরিয়া সীতা লইলা আমার॥
হনুমানে ডাকিয়া কহিছেন নারায়ণ।
মোর বোল রাখহ বাপু পবননন্দন॥
রাবণ হরিয়া নিলা জানকী আমার।
উদ্দেশ আনিএ প্রাণ রাখহ আমার॥
হনুমান্ বলে জাব লঙ্কা জে ভুবনে।
আমারে জনকসুতা চিনিবেন কেনে॥
শুনিয়া আনন্দজলে ভাসি রঘুঅরি।
নিসান দিলেন রাম হাথের অঙ্গুরি॥

ভনিতা—

১। মাথে হাথ দিয়া সীতা করে হায়২।
সেবিয়া বাল্মীকপদ কবিচন্দ্র গায়॥
২। মরণ সার করহ জীবনের ছাড় আস।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলা পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস॥

শেষ—

এহার কারণে বাছা বর দিয়ে আমি।
মোর বরে চারি যুগ অমর হও তুমি॥
দুই হাথ তুলি আমি তোমায় দিলাম বর।
মোর বরে চারি যুগ হইলে অমর॥
বর পেয়ে হনুমানের আনন্দ অপার।
হনুমান্ প্রণাম করি হৈলা আগুসার॥
অমর হইলা বর দিলা রামদাসে।
লঙ্কাকাণ্ড গাইলা পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসে॥
অথ অঙ্গরিসম্বাদ সমাপ্ত হৈল॥

৪৫৮। কলঙ্কভঞ্জন।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৯, অসম্পূর্ণ। ১ম হইতে ৫ম পত্র পর্য্যন্ত দোভাঁজ-করা তুলোট কাগজ এবং ৬ষ্ঠ হইতে ৯ম পত্র জলছাপযুক্ত ইংরাজী কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৫ হইতে ৮ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ৯৸০×৩৷৹ ইঞ্চি। শেষ খণ্ডিত। ১ম পত্রের ১ম পৃষ্ঠায় 'পুস্তক শ্রীমাধবচন্দ্র দাশ' এবং ২য় পৃষ্ঠায় বাম দিকে 'সন ১২২৪ সাল' লেখা।

মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত বা বাশুলীমঙ্গল

(পূর্বানুবৃত্তি)

॥ সুহই রাগ ॥

কনক শ্রীফল কুচ সুবলিত দুই ভুজ
কনক কঙ্কণ শঙ্খ আগে।
মকর কুণ্ডল দোলে শ্রবণ কপোলমূলে
মনোহর রুচি দুই ভাগে ॥
সুরঙ্গ বসন পরি হাসে গজগতি নারী
কনক কলস কক্ষতলে।
অগাধ প্রচুর জল অতিশয় নির্ম্মল
কমলিনী সুরসরোবরে ॥
কমলিনী গো মা সর্ব্বমঙ্গলা
স্বর্গ তেজিয়া ত্রিনয়নী।
কৌতুকে অবতরে দাসীর নন্দনে ছলে
মায়াদহে শক্তিরূপিণী ॥ ধ্রু॥
জলের উপর পড়ি কেহ যায় গড়াগড়ি
লাফ দিয়া উঠে কোন জন।
কনকরচিত পুরী প্রতি ঘরে সুন্দরী
পুরুষ না দেখি একজন ॥
কেহ মাংস কুটে বেচে শূন্য ভর করি নাচে
কেহ গজ করয়ে গরাস।
কেহ পেলে কেহ লোফে মধুকর মধুলোভে
বদনকমলে কার হাস ॥
গজ গিলে উদগরে সহজে প্রকৃতি হরে
যুবতী যুবতী করে কোলে।
অধর পাকিম বিম্ব [৯৩]বদনকমলে চুম্ব
দেখি সাধু পড়ি গেল ভোলে ॥
মধুর কোকিলী স্বরে গীত গায় মনোহরে
ঘাঘর নূপুর করতালে।
সুনাদ মাদল বাজে ঘরে ঘরে প্রতি নাচে
বিপরীত সকল নগরে ॥
বদনকমলে হাসি কুটিল মুকতকেশী
সিন্দুর তিলক ললাটে।
পয়োধরে উয়ে হার কটাক্ষে মূর্চ্ছিত মার
কমলিনী নগর নিকটে ॥
দুই হাথ দিয়া বুকে বিবসন হইয়া নাচে
কজ্জল নয়নসরোজে।
দেখিয়া হৃদয় গুণে আইলাঙ কেমন ক্ষণে
হেট মাথা করে সাধু লাজে ॥
দেখ ভাইয়া কর্ণধার দেশখান কদাচার
যুবতী নগরে মাংস বেচে।
কেহ রান্ধে কেহ ভুঞ্জে মুকুত চিকুরে নাচে
বসন না দেই দুই কুচে ॥
সাক্ষী সর্ব্বজন দুব্বার পাটন
নরপতির চরণকমলে।
কবিচন্দ্র কহে দেবী চরণপঙ্কজ সেবি
নিবেদিব সভার ভিতরে ॥০॥

॥ ছন্দ ॥

তবকী তবক ছোড়ে সিলিদার সিলি।
দুব্বার পাটনে লোকে কর্ণে লাগে তালি ॥
মেঘ নাহি দেখি পুনঃ পুন গরজন।
কথিল পণ্ডিতে নৃপ কহ কি কারণ ॥
শুন হে নৃপতি মনে না ভাব বিস্ময়।
পাটনে আইল কিবা সাধুর তনয় ॥ধ্রু॥
মন্ত্রী মেলিয়া পাচে সুচরিত ভাট।
ঝাঁট জান গিয়া সাধু কবা পরঠাট।

রড় দিয়া বলে ভাট দাণ্ডাইল কূলে।
পরাপর কহ যদি থাকিবে কুশলে ॥
ভাটের বচনে বলে নায়ের নফর।
সুরথ নৃপতি যার বর্দ্ধমানে ঘর ॥
তাহার সাধব এই আস্যাছে পাটন।
বেচি কিনি যদি পাই শীতল বচন ॥
শুন রে বৈদেশী সাধু কহি তোরে মর্ম্ম।
দুর্ম্মুখ নৃপতি বৈসে সাক্ষাতে ধর্ম্ম ॥
তাঁর সম্ভাষণে পরিতোষ পাবে মনে।
সুখে বেচ কিন দ্বিজ কবিচন্দ্র ভনে ॥০॥

॥ ছন্দ ॥

পূজিয়া ত্রিপুরা মায়াদহের পুলিনে।
[৯৪ক] দোলারূঢ় হৈল সাধু নৃপসম্ভাষণে ॥
সুবর্ণ পঞ্জরে শুক গজবেল খাণ্ডা।
অমূল্য রতন লয় ময়মত্ত গণ্ডা ॥
যুগল যুগল শশ গৌল কুরঙ্গ।
স্বর্ণ সারিক শুক ধুকড়িয়া কঙ্ক ॥
চক্র চকোর ঘুঘু পিক্ মৌনরঙ্গ।
কনক চরণ পিঠে নাহি ছাড়ে সঙ্গ ॥
সাধুর হৃদয় বড় বাঢ়িল প্রমোদ।
ডাহুক গণ্ডুক লয় ঘুরন কপোত ॥
কলসে পুরিয়া ঘৃত তৈল লবণ।
মধু মিষ্ট নারিকেল সুরঙ্গ বাগুন ॥
পাট ভোট নেত লয় মৃগমদ গণ্ডা।
ক্ষীরের সন্দেশ চিনি মধু কাকরণ্ডা ॥
তেলেঙ্গা ছাগল খাসী সুঝার গারড়।
পঞ্চ রতন লয় ধবল চামর ॥
নানা সজ্জ লয় সাধুসুত নিরাতঙ্ক।
কনকরচিত গজদন্তের পালঙ্ক ॥
বাঙ্গালী খেলায় পত্তি করে কোলাহল।
দণ্ডি মুহরি শঙ্খ ফুকরে কাহাল ॥
গুড় গুড় দগড় বাজে মধুর কাঁসর।
আগে পাছে ধায় যত পাইক সকল ॥

এক বাঁক দুই বাঁক তিন বাঁক যায়।
কোথা ফুলহাট পড়ে গন্ধ বিকায় ॥
বিবাদে গারড় কেহ কুক্কুট যুঝায়।
সুখীর নন্দন কোথা পায়েরা উড়ায় ॥
দোলারূঢ় কেহ গজ তুরগ রড়ায়।
নানা বাদ্য বাজে কোথা বরকন্যা যায় ॥
কেহ গীত গায় কেহ কোথা দেখে নাট।
দেখিয়া উত্তম জনে স্তুতি করে ভাট ॥
ডাকা চুরি নাহিক কোটাল দুরাচার।
প্রজার পালন দেখি উচিত বিচার ॥
কপালে চন্দন কারো গলে রত্নমাল।
ইড়িক চাপিয়া বুলে নগর্যা ছাওয়াল ॥
কেহ কিনে কেহ বেচে নাহি অবসাদ।
ছাওয়ালে ছাওয়ালে খেলে করিয়া বিবাদ ॥
কেহধিক নহে কেহ নহে হীনবল।
মারামারি করে [৯৪] কেহ পাতিয়া কন্দল ॥
কেহ সাতাচারি খেলে কেহ বুদ্ধিবল।
কেহ পাশা খেলে কেহ খেলে দ্যূতরল ॥
কেহ গেণ্ডু খেলে কেহ কড়ি ভাঁটা টিক।
তরুণ আবাল বৃদ্ধ সকল রসিক ॥
চিনিতে না পারে সাধু সুখী দুঃখী জন।
একরূপ দেখে সব দুর্ব্বার পাটন ॥
দুর্ম্মুখ নৃপতি বৈসে যেন নরভীত।
সুরগুরু সমান পণ্ডিত পুরোহিত ॥
সাধুর তনয় সাধু বুঝে হিতাহিত।
রাজার সভায় গিয়া হৈল উপনীত ॥
নানা সজ্জ দিয়া সাধু রাজার চরণে।
প্রণাম করিয়া বন্দে দ্বিজ পাত্রগণে ॥
আপন আসনে বৈসে নৃপনিদেশনে।
চারিদিগে চাহে সাধু প্রফুল্ল বদনে ॥
কোন জাতি উতপতি কিবা তব নাম।
কাহার নন্দন তুমি ঘর কোন গ্রাম ॥
কাহার সভায় থাক আইলে কি কারণে।
অমৃত সেঁচিল দেহ নৃপতিবচনে ॥

গন্ধবণিক জাতি গুণদত্ত নাম।
ধূসদত্ত পিতা মোর ঘর বর্দ্ধমান ॥
দেশের ঈশ্বর মোর নৃপতি সুরথ।
তাঁহার সভায় সর্ব্বকাল নিরাপদ ॥
ভাণ্ডারী নিবেদে নিত্য চরণে রাজার।
পরিপূর্ণ ছিল দেব রত্নের ভাণ্ডার ॥
চামর চন্দন শঙ্খ মুকুতা প্রবাল।
দিনে দিনে টুটে দ্রব্য নাহিক আপার ॥
এ বোল শুনিঞা রাজা মোরে দিল পান।
তথির কারণে মোর পাটনে পয়ান ॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥০॥

॥ ধানশী ॥

দেখিয়া ভেটের সজ্জ পরিতোষ মনে।
পান ফুল দিল রাজা পরদেশী জনে ॥
দুগ্ধের লড্ডুক পুলি চিনির সন্দেশ।
রান্ধিয়া ভুঞ্জিতে তারে করিল আদেশ ॥
[৯৫ক]চল সাধু কর বাসা আমার নিলয়।
সুখে বেচ কিন যে তোমার মনে লয় ॥ধ্রু॥
সকুল চিথল মৎস্য সন্ধ কবই।
রুহিত পাঠীন মীন ত্রিকণ্ঠ ফলই ॥
তৈল লবণ খাসী ঘৃত দুগ্ধ দধি।
রন্ধন ভোজন সজ্জ দিল নরপতি ॥
রাজার চরণে সাধু করিয়া প্রণতি।
রান্ধিয়া ভুঞ্জিল দিনে সুখে গেল রাতি ॥
পুন দরশন দুহেঁ বসিয়া সভায়।
রাজা সাধু বড় প্রীতি বাড়িল কথায় ॥
সুরথ পৃথিবীনাথ বর্দ্ধমানে ঘর।
দুর্ব্বার পাটনে আমি বসুমতীশ্বর ॥
উভয় দেশের মাঝে ভালমন্দ কি।
কবিচন্দ্র কহে নৃপ বড় পুণ্যে জী ॥০॥

॥ সুই রাগ ॥

রায় কি কহিব আর   দেশ কদাচার
যথি তুমি অধিকারী।
গজ গিলে নারী   শুনিতে না পারি
কিবা রাক্ষসের পুরী ॥
মোর অভিমত   থাকি তব পদ
কমলে করিয়া সেবা।
শুনিল শ্রবণে   দেখিলু নয়নে
যেন পুরন্দর সভা ॥
মায়াদহ জলে   কাঞ্চননগরে
কহি শুন নৃপমণি।
জন্ম সীমন্তিনী   আকৃতি পদ্মিনী
প্রকৃতি শক্তিরূপিণী ॥ধ্রু॥
আছিল রমণী   পূর্ব্বে নাহি জানি
যে কালে না ছিল জল।
দহের উপর   পেলিলে পাথর
কত দিনে যায় তল ॥
কনকের ঘর   রচিত নগর
তথি কি পদ্মিনী জাতি।
সাধুর নন্দন   তুমি অচেতন
স্বপন দেখিলে রাতি ॥
দুই দণ্ডপাত   কহি নরনাথ
এ বোল অসত্য নহে।
নগরে পদ্মিনী   গজ গিলে জানি
দেখাইব মায়াদহে ॥
মাংস কুটি বেচে   শূন্য ভরে নাচে
দেখিলে লাগিব ডর।
শ্মশান ভিতর   মুণ্ড কাটি মোর
যদি মিথ্যা কদুত্তর ॥
সাধুর ভারতী   শুনি নরপতি
সাক্ষী করে জনে জনে।
যদি সত্য হয়   রাজ্য দিব তোয়
বসাইব সিংহাসনে ॥

মিশ্র বিকর্ত্তন সম্ভবকারণ
তুষ্ট যারে ত্রিনয়নী।
হারাবতীসুত মুকুন্দ অদ্ভুত
রচিল মঙ্গলবাণী ॥০॥

॥ পাহিড়া ॥

[২৫]
নৃপ কোপে লাফ দিয়া উঠে চাপিয়া গজের পিঠে
সাধু সনে করিয়া বিবাদ
খাটিল ধবল ছত্র আগে পাছে পাত্র মিত্র
ঘন শিঙ্গা বরঙ্গো নিনাদ।
রাউত মাহুত পতি জিন করে ঘোড়া হাতী
পবন জিনিয়া যার গতি।
গায় দিয়া আঙ্গরেখি কেবল নয়ন দেখি
মাথার টাটুনি নানা ভাঁতি ॥
বীর সাজিল রে দুর্ব্বার পাটনেশ্বর
মায়াদহে দেখিতে পদ্মিনী।
সাধু অসম্ভব্য কহে গজ গিলে মায়াদহে
কনক নগরে সীমন্তিনী ॥
গুড় গুড় দগড় বাজে পাইক সকল নাচে
কোন জন গোঁফে দিই তোলা।
কেহ বহে ধনু শর নেঙ্গা খাণ্ডা করতল
কাহার গলায় রত্নমালা ॥
চন্দন তিলক ভালে নৃপতিনন্দন চলে
কুমতি তাহার জ্যেষ্ঠ ভাই।
রণরঙ্গি হাথে টাঙ্গি খাণ্ডা ফলা শেল সাঙ্গি
পাইক সকলে ধাওয়াধাই ॥
কেহ পেলি খাণ্ডা লোফে মাথায় মুকুট শোভে
কোন জন বহে তরোয়ারি।
হাণ্ডিয়া চামর ঢাল হাথে করি বাঙ্গাল
বড় দেই সমরবেহারী ॥
ঘন পড়ে দাবাসিলি ঢাকিল কিরণমালি
তৃতীয় ভুবন কাঁপে ভয়।
চলিল রাজার ঠাট চল্লিশ দিনের বাট
আগে পাছে গণন না হয় ॥
রত্নমন্দির নায় রাজার কামিনী যায়
সঙ্গে লৈয়া যত পরিজন।
সধবা বিধবা নারী প্রতি নায়ে সারি সারি
আগে পাছে করিল গমন ॥
আগে যায় কতোয়াল খর খণ্ডা বহে ঢাল
লাফ দেই নৃপসন্নিধানে।
তার ভাই মহামূঢ় ময়গল গজারূঢ়
অধিকার যার রাত্রি দিনে ॥
ধাইল তাহার বল ভেরি বাজে অবিরল
কাঁসর মধুর যন্ত্র বেণী।
[২৬ক] শ্রীযুত মুকুন্দ কহে উপনীত মায়াদহে
কোথা গজ নগরপদ্মিনী ॥০॥

॥ সুই রাগ ॥

তোমার পয়ান শুনি পলাইল পদ্মিনী
নগর লুকাইল মায়াদহে।
দেবতা সুরের জায়া আছিল পাতিয়া মায়া
আমার বচন মিথ্যা নহে ॥
অবনীনাথ নিবেদিল তোমার চরণে।
দেখিল আপন আঁখি হয় নয় আছে সাক্ষী
নিবেদিয়া বুঝ তার স্থানে ॥ধ্রু॥
তুমি রাজা পুণ্যবান ভাল মন্দ আছে জ্ঞান
পরাজয় না ভাবিহ মনে।
ঠাকুর সেবকে বাদ অতি অনুচিত নাদ
অক্রোধ নহ কি কারণে ॥
কে তোমার আছে সাক্ষী আনহ সংপ্রতি দেখি
বলুক আমার সন্নিধানে।
যদি সে দেখিয়া থাকে সর্ব্বরাজ্য দিব তোকে
আর বসাইব সিংহাসনে ॥

শুন হে পৃথিবীপাল　　যশমস্ত কর্ণধার
সাক্ষী আমার এই ভাই।
শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে　　চণ্ডী সুপ্রসন্ন জনে
সকল ভুবনে পরাজই ॥০॥

॥ বিভাস ॥

নাবিক ভাই যথোচিত বলহ সভায়।
তোমার বচন শুনি　　দুইজনে হারি জিনি
ছোট বড় নাহিক ইথায় ॥ধ্রু॥
অনায়াসে পুণ্য পাপ　　অর্জনে নরক লাভ
উভয় দেখিয়া সত্যবাণী।
কনক নগরে নারী　　মায়াদহে গিলে করি
দেখিলে কি না দেখিলে তুমি ॥
মায়াদহে হেমপুরে　　যুবতী কুঞ্জর গিলে
সাধু বলে হইয় তুমি সাক্ষী।
গন্ধবণিক জাতি　　কহে শুদ্ধ ভারতী
আপন নয়ানে নাহি দেখি ॥
সাক্ষীর বচন শুনি　　আদেশিল নৃপমণি
সাধুকে করহ লৈয়া বধে।
কবিচন্দ্র কহে শুন　　ডিঙ্গা লোটে যত জন
নৃপতি চাপিয়া গেল রথে ॥০॥

ধর ধর বলে ঘন ঘন শিঙ্গা পড়ে।
ডিঙ্গার উপর কেহ লাফ দিয়া চড়ে ॥
নায়ের নফর যত নাহিক প্রতিভা।
ডিঙ্গা হৈতে পেলে কারে দিয়া টুটি চিপা ॥
আই বাপু [৯৬] রাওয়ারাই হৈল মহাহট্ট।
নারিকেল লুটে কেহ ধোকরার চট্ট ॥
মার মার বলে কেহ কার চুলে ধরে।
ধবল কাপড় কেহ লুটিল তসরে ॥
কেহ চিনি লুটে কেহ তসরের সূতা।
পিপ্পলি পিত্তল কাংস্য লুটিল সুকুতা ॥
ঘোড়া পিড়া লোটে কেহ মূল নাহি যার।
পঞ্চ রতন লোটে রত্নের ভাণ্ডার ॥

ব্যাঘ্র ভল্লুক যত আছিল বানর।
নানারূপ পক্ষগণ ছাগল কুঞ্জর ॥
যুঝার গারড় খাসী তেলঙ্গা ছাগল।
আজ্ঞা দিয়া কোটোয়াল লুটিল সকল ॥
নায়ের নফর যত জল জল চাহে।
জীবনে কাতর বড় বাঙ্গাল পালায়ে ॥
পথে বাগ পাইয়া কেহ কারে মারে কিল।
না মার চরণে পড়োঁ হও ধর্ম্মশীল ॥
সানন্দা আনন্দা গৌরীবর তিন ভাই।
আর যত বাঙ্গাল রহিলা ঠাঞি ঠাঞি ॥
একত্র হইয়া কান্দে পাঁচ সাত জনে।
রমানাথে রক্ষ দেবী কবিচন্দ্র ভনে ॥০॥

॥ ছন্দ ॥

কান্দে রে বাঙ্গাল ভাই বাফই বাফই।
কুক্ষেণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই ॥ধ্রু॥
আর বাঙ্গাল বলে মোর গায় নাহি বল।
আমার জীবনধন এত রে হিন্দল ॥
আর বাঙ্গাল বলে ভাই মিথ্যা কৈলু দ্বন্দ।
পুরুষ সাতের মুই হারানু কাসন্দ ॥
পলায় বাঙ্গাল যত পেলাইয়া সোনা।
হেট মাথা করি রহে কাকতলিমনা ॥
আর বাঙ্গাল বলে ভাই হইনু অনাথ।
সর্ব্বধন হারাইলু হুকুতার পাত ॥
আর বাঙ্গাল বলে মুঞি হইলু হুতাশ।
জীবনে কাতর মুঞি হারালু বাওয়াস ॥
আর বাঙ্গাল বলে রে কহিতে বড় লাজ।
হলদি গুঁড়াগুলি গেল জীয়া কোন কাজ ॥
হলদি হুকুতা পাতা হিন্দল হুক্কই।
মজিল সকল ধন কেমতে কুলাই ॥
আর বাঙ্গাল বলে ভাই এই হৈল গতি।
দুর্ব্বার পাটনে মৃত্যু লিখিয়াছিল বিধি ॥
[৯৭ক] যুবতী যৌবনবতী ছাড়িলু কি রোষে।
আর বাঙ্গাল বলে দুঃখ পাই গ্রহদোষে ॥

ইষ্টমিত্র কুটুম্বে লাগিল মায়া মো।
আর বাঙ্গাল বলে না দেখিল মাগু পো॥
কপর্দ্দক হেতু পরাধীন যেই জন।
আর বাঙ্গাল বলে তার বিফল জনম॥
কেনি বা আইলু ভাই খাইয়া আপনা।
বিপাকে মজিল মোর হুকুতার মনা॥
শিশু সাধু কিছু নাহি বুঝে হিতাহিত।
রাজার সভায় কেনি কহে বিপরীত।
আর বাঙ্গাল বলে যেই জন নাহি বুঝে।
ক্ষিতিতলে মরিলে প্রকৃতি নাহি ঘুচে॥
বাঙ্গালের বচনে সাধুর দ্রবে মন।
সজল নয়নে বলে বিনয় বচন॥
না মার সেবকে শুন প্রহরাষ্টপতি।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী॥০॥

॥ ছন্দ ॥

সাত ডিঙ্গা লুটিল পাইল বহু ধন।
ঢাক ঢোল বরঙ্গো তেঘাই ঘনে ঘন॥
ময়গল শ্রুপ শ্রবণে নিশাপতি।
খগরাজ তুরগে রাউত সেনাপতি॥
মহাহট্ট পদাতি সারথি মহারথী।
রাজার আদেশে চলে বধিতে বিরোধী॥
পরদেশী সাধুর কাঁকাল্যে দিয়া ডোর।
উপনীত শ্মশানে করিল যেন চোর॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী॥০॥

করুণা॥

কোটাল

বাপ গেল দেশান্তর যুগল জননী মোর
অনাথিনী নিবসে মন্দিরে।
ছলিল ত্রিপুরা মোরে যুবতী কুঞ্জর গিলে
মায়াদহ কনকনগরে॥

আমি

থাকিব সেবক হৈয়া তোমার কম্বল বইয়া
যদি রাখ জনকের পুণ্যে।
আমি সাধু ধনবান ভাল মন্দ নাহি জ্ঞান
পশু যেন নিবসে অরণ্যে॥
কোটাল ভাই অক্রোধ নহ কি কারণে।
আদেশে করিলে বধ জানসি পাতক যত
তোমা কে বুঝাব অন্য জনে॥ধ্রু॥
আদেশহ দেশে যাই দেখি মাতা শোন ভাই
মায়ের সতিনী সত্যবতী।
কেহ আগে কেহ পাছে অবশ্য মরণ আছে
শ্মশানে মরিলে [৯৭] নাহি গতি॥
জননী পৃথিবীনাথ কৈল মোরে প্রতিষেধ
আসিবারে দুর্ব্বার পাটন।
ঠেলিল তাঁহার বাক্য তেঞি রাজা প্রতিপক্ষ
বিধি কৈল অকালমরণ॥
নিবেদি করিয়ে সেবা রাখিবে বধিবে কিবা
এক বাক্য বলহ নিশ্চয়।
শুনিঞা তোমার মুখে জলে নিমজ্জিব সুখে
তবে যে তোমার মনে লয়॥
বলে নিশীশ্বর সত্য তুমি নৃপতির বধ্য
রাখিতে আমার কোন বল।
মুকুন্দ আচার্য্য বাণী রমানাথে নারায়ণী
অবিরত করিবে মঙ্গল॥০॥

সুই রাগ॥

কোটাল কহি তোরে এক কথা।
পুণ্য বড় ধন কহে মুনিজন
না কাটিহ মোর মাথা॥ধ্রু॥
যুগ নামে কলি পাপ ইথে বলী
সঙ্কটে ধর্ম্ম বিচার।
আপাত মধুর দেখ যত নর
পশ্চাত না গণে আর॥
মুনিগণ বলে বৃক্ষ না পাকিলে
বৃঙ্কি ফল নাহি ছাড়ে।
না দেখিলে কহে কভু হেন নহে
বাত বিনা পাত নড়ে॥

যত দেখ জন্তু বধ কৈলা কিন্তু
অল্প পাপ বিমোচন।
মানুষ কাটিলে মহাপাপ হয়
যদি নহে দুষ্টজন ॥
জলে ধনালয় আর এক ছয়
নিঞা রাখ মোর জিউ।
মা বাপের পুণ্যে মেলি যত সৈন্যে
আজ্ঞে দেহ ঘরে যাউ ॥
সাধুর ছাওয়াল তেরি প্রাপ্তিকাল
সাহস না ছাড় চিত্তে।
দৈবের লিখন না যায় খণ্ডন
নাহি রাখোঁ কাকুর্ব্বাদে ॥
দানবদলনী হরের গৃহিণী
সঙ্কটে যে জন ভজে।
যদি থাকে দয়া রক্ষিবে বিজয়া
রচিল মুকুন্দ দ্বিজে ॥০॥

॥ ছন্দ ॥

স্নান করিয়া জলে সাধুর কুমার।
জাহ্নবী মৃত্তিকা ভালে ভূষিল কপাল ॥
গলায় তুলসী দিল বৃহদের দাঁত।
বিচারিয়া করিল পবিত্র কুশ হাথ ॥
আচমন করে পূর্ব্বমুখে বৃহি তার।
পুণ্ডরীকনয়ান স্মরয়ে তিনবার ॥
যেমত আছিল বিধি বেদ নিবন্ধন।
দেব ঋষি ভীষ্ম জল প্রত্যক্ষে তর্পণ ॥
পিতৃমাতৃকুল বন্ধু নৃপ গুরুজনে।
খেলার সংহতি যত জন পড়ে মনে ॥
জল দিয়া [৯৮ক] পরিতোষ করিল তর্পণে।
অধোমুখী হইয়া ভাবে সাত পাঁচ মনে ॥
সত্যবতী বিমাতা রুক্মিণী জন্ম ভুরি।
স্মঙরিতে মনে পড়ে আর পানী চেড়ি ॥
কেমন কুখেনে আমি আইলু পাটনে।
অনাথ হইল পুরী আমার মরণে ॥
আপনি পাতকী কি বলিব নারায়ণে।
ভগবতী বলি অর্ঘ্য দিল বিরোচনে ॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥০॥

সুই রাগ ॥

স্নান করিয়া জলে উঠিল গিয়া কূলে
মলিন যেন শশিকলা।
জাহ্নবী মৃত্তিকা ভালে যুগল বসন পরে
গলায় তুলসীর মালা ॥
পাখালি দ্বিচরণ করিল আচমন
মায়ের বোল পড়ে মনে।
বিপত্তিবিনাশিনী বিশাল ত্রিনয়নী
কৈলাস তেজহ স্মরণে ॥
হরি হরি হরি রক্ষ মাহেশ্বরি
সেবকে হও অনুবল।
অধর্ম্মে দহে তনু মিথ্যা মুঞি কহিনু
মরণ ধরিলেক ফল ॥
গন্ধর্ব্ব সরোবরে বকুল তরুতলে
শ্মশানভূমি সন্নিধানে।
দক্ষিণে বহে বাত কোটাল খড়্গ হাথ
অল্প অপরাধে হানে ॥
সারথি তুমি যার মরণ হয়ে তার
এ বড় দেখি বিপরীত।
তেজিয়া সুনগর শ্মশানে অবতর
বিপত্তিকালে কর হিত ॥
শক্তিরূপা ত্রয়ী জননী কৃপাময়ী
সকল জনে কর দয়া।
অভয়া মহামায়া নাম তরুছায়া
বসতি নাম সর্ব্বজয়া ॥
বিশেষে অনুগত সেবকে করে বধ
তোমারে কে বলিব ভাল।
তুঁ হিমাচলসুতা হৃদয়ে নাহি ব্যথা
ত্রিদেব লাজে হব কাল ॥

না জানি তব পদ পূজিব কোন মত
তোমার অগোচর নহে।
শ্রীযুত রমানাথে রক্ষ ভগবতী
শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে॥

মাতা রক্ষ রক্ষ ত ত্রিপুরা।
কোন দোষে বধে দাসীর সুতে
কাতর জীবন মেরা॥
প্রবল চঞ্চল রাজ কোটোয়াল
ঘন গোঁফে দেই তোলা।
দেখি শুষ্ক মুখ কান্দে সর্ব্বলোক
গলায় তুলসীর মালা॥
কোটোয়াল ঘন খড়্গ পুনঃপুন
ছোঁয়ায় শ্রবণমূলে।
বলে ওরে নর সাহস না কর
টানিঞা ধরিল চুলে॥
মলয় পবন ঘূর্ণিত লোচন
ত্রিপুরা চিন্তিল মনে।
মস্তক কন্দর করিল অন্তর
কোটালিয়া সাধুজনে॥
ভগবতী বিনে আন নাহি মনে
শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে।
আসনে কমলা সেবক বৎসলা
টল টল ক্ষণে ক্ষণে॥০॥

॥ সিন্ধুড়া॥

ঝটিতি অমলাবতী কহল রূপসী।
ত্রিভুবনে দুঃখ পায় কোন দাস দাসী॥
আজ্ কেন সখী মোর বিরস হৃদয়।
আতপে বিদরে কেন শুষ্ক জলাশয়॥
আসনে বসিতে আমি করি টল টল।
নয়ানকমলে ক্ষেণে ক্ষেণে খসে জল॥
ভকতবৎসলা [৯৮] সদা অভয়দায়িনী।
সেবক লাগিয়া আমি অনন্তরূপিণী॥
পর্ব্বতনন্দিনী জয়া প্রসিদ্ধ শঙ্করী।
ত্রিভুবনে জানে চারিদশলোকেশ্বরী॥
রণে বনে রাজস্থানে কানন দুর্গমে।
যদি মোরে স্মরে বৃক্ষপতন মরণে॥
অপরাধ বিবাদে নৃপতি যদি কাটে।
আপুনি রক্ষিব তারে বিষম সঙ্কটে॥
চণ্ডীর বচনে সখী ব্রহ্মে দেই মন।
যাহার প্রসাদে প্রকাশিত ত্রিভুবন॥
কঠিনীর রেখা পাতে কৈলাস পর্ব্বতে
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ভগবতীপদে॥০॥

॥ ছন্দ॥

সুমুখী অমলাবতী সেবিয়া ঈশ্বরী।
দেবযোগিগণে দেখে দেবতার পুরী।
প্রথমে গণিল যত অষ্টলোকপাল।
রজনী দিবস গণে নরের বিচার॥
দেবতা দানব প্রেত ভূত নিশাচর।
সরস্বতী গণে যক্ষ পিচাশ কিন্নর॥
রাতির ঈশ্বর কামদেব ঋতুধ্বজ।
অনন্ত হৃদয়ে অষ্ট গণিল দিগ্‌গজ॥
দশ বিশ দেবগণে একাদশ রুদ্র।
আদিত্য দ্বাদশ সপ্ত গণিল সমুদ্র॥
গণে ব্রহ্মা নারায়ণ শিব যমপুর।
অষ্টবসু গণে আর তাহান ঠাকুর॥
সনকাদি মুনিগণে নারদাদি ঋষি।
অরুন্ধতী বসিষ্ঠের যুবতী রূপসী॥
চন্দ্র তারা গ্রহ গণে গগনমণ্ডলে।
কূর্ম্ম বাসুকি নাগ লোক রসাতলে॥
জলজন্তু গণিল কুম্ভীর অবিশাল।
হাঙ্গর মকর গণে মৎস্য ঘড়িয়াল॥
পুণ্যশরীর বলি অমরের নাথ।
হরির কিঙ্কর দৈত্য গণিল প্রহ্লাদ॥
ক্ষিতিতলে তৃণ তরু পশু নদী নদ।
প্রত্যক্ষে গণিল পক্ষ যতেক পর্ব্বত॥

গাণিল অনেক নর দেখিতে না পায়।
সভয় অমলাবতী হৃদয় শুখায় ॥
ধেয়ান করিয়া পুন ব্রহ্মে দেই মন।
প্রসন্ন দেখিতে পায় সকল ভুবন ॥
শুন শুন ভগবতি মোর এক বাক্য।
জ্ঞানলোচনে আমি দেখিল প্রত্যক্ষ ॥
ধুসদত্ত নাম তার দ্বিতীয় রমণী।
তোমার ব্রতের দাসী সুমুখী রুক্মিণী ॥
তাহার নন্দন [৯৯ক] সাধু বুঝে নানা কলা।
পড়িবারে গেল নৃপতির শাস্ত্রশালা ॥
অধ্যাপকপ্রধান পণ্ডিত গৌরীবর।
গালি তারে দিলেক জারজ কদুত্তর ॥
গুরুর বচনে সাধু মনে বাড়ে ক্রোধ।
উপবাসী থাকে সাধু না মানে প্রবোধ ॥
জননী কথিল মিথ্যা কর পরিতাপ।
দুর্ব্বার পাটনে তথা আছে তোর বাপ ॥
মায়ের বচনে সাধু বাপের কারণে।
বহিত্র সাজিয়া যায় দুর্ব্বার পাটনে ॥
মায়াদহে দেখাইলে যুবতী নগরে।
বিবাদ করিল গিয়া নৃপপদতলে ॥
হারিলেক সেই সাধু সাক্ষীর বচনে।
তারে বলি দেই রাজা দক্ষিণ মশানে ॥
জীবনে কাতর সাধু দাসীর নন্দন।
মরণ সময়ে চিন্তে তোমার চরণ ॥
কি বল কি বল ক্রোধে কাঁপে ভগবতী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥০॥

॥ সারঙ্গ রাগ ॥

শুনিঞা সখীর কথা　　সঘনে কাঁপয়ে মাতা
　　দাসীসুতে বধে কোন দোষে।
সিংহ ব্যাঘ্র পিঠে চাপে　　চৌদ্দ ভুবন কাঁপে
　　অষ্টাদশ ভুজ ধরি রোষে ॥ধ্রু॥
ত্রিদেবনগরে রাজা　　সে করে আমার পূজা
　　দেবগণে ক্ষেমি অপরাধ।
আমার দাসীর সুতে　　শ্মশানে দুর্মুখ বধে
　　মানুষ হইয়া করে বাদ ॥
চঞ্চল যুগল নেত্র　　লোমাঞ্চিত সর্ব্বগাত্র
　　ঘর্ম্মজলে পূরিল শরীর।
মহিষ নিশুম্ভ শুম্ভ　　তারেধিক করে দম্ভ
　　দুর্মুখ নৃপতি মহাবীর ॥
ধনুক দুর্জ্জয় শেল　　সুবর্ণ মুদ্গর বেল
　　ডাবুশ কর্পর খর কাতি।
কর যুগে খাণ্ডা ফলা　　গলায় নৃমুণ্ডমালা
　　সাজ সাজ বলে ভগবতী।
গায় দিয়া আঙ্গরেখি　　কেবল নয়ান দেখি
　　[৯৯] করতলে ডাবুশ দোয়াড়।
কমণ্ডলু নাগপাশ　　কুলিশ বিষম ত্রাস
　　শঙ্খ চক্র গদা যমদাড় ॥
উরিল ডামরুসাই　　হাথে অস্ত্র ফলা নাই
　　ঘাটু খাঁটু গুমা ক্ষেত্রপাল।
ত্রিপুরার দুই পায়　　প্রণাম করিয়া কয়
　　শতেক পূরিল আজিকার ॥
জয়শঙ্খ বাজে দণ্ডী　　মেলাই ক্ষেপাই চণ্ডী
　　নন্দী মহাকাল হনুমান।
চাপিয়া মহিষপিঠে　　যম চাহে কোপ দিঠে
　　যমদূত করিল পয়ান ॥
উৎকট বিকট চণ্ড　　হাথেতে কনকদণ্ড
　　পূর্ব্বদিগে ধায় দানাগণ।
পরিয়া বকুলমাল　　ঘন দেই করতাল
　　নাচে গায় হরষিত মন ॥
পশ্চিমে ধায় দানা　　নেকাচোকা দুই জনা
　　পাগল চাঙ্গনা রণমুখী।
দ্বিঘন দ্বিঘন কায়　　উর্দ্ধবাহু করি ধায়
　　উজ্জ্বল দশন ক্ষুদ্র আঁখি ॥
উত্তরে ধায় দানা　　নাম কেদারবানা
　　নিরবধি বলে হান হান।
নেকাচোকা ভেকা ভুলা　　গলায় ওড়ের মালা
　　দাণ্ডায় চণ্ডীর বিদ্যমান ॥

পোড়ানিলা কাণ্ডাগুণা দক্ষিণে চলিল দানা
লোহার মুষল হাথে ডাঙ্গ।
বাজায় বিষম ঢাকি দেবগণে ডাকাডাকি
লাফ দেই দশ বিশ জাঙ্গ॥
ঘাঘর নূপুর ধ্বনি সুবলিত বেণ্ শুনি
উরুমাল বাজে ঝম ঝম।
আনন্দিত মহামায়া সাহুন গাহন ছায়া
আৎসাদিল রবির কিরণ॥
ধর ধর মার মার ঘোরতর অন্ধকার
পেলিয়া দানব অস্ত্র লোফে।
দিনমণি সম করি নয়ন উজ্জ্বল করি
হরিষে চলিতে ক্ষিতিলোকে॥
চারি দিগে ধায় পেতি বদনে জ্বালিয়া বাতি
সচকিত গিরীন্দ্রনন্দিনী।
মুণ্ডহীন কন্ধসার না বুঝি কি অবতার
কিচি কিচি ঘন করে ধ্বনি॥
[১০০ক]প্রেত ভূত পিশাচিনী সভে করে জয়ধ্বনি
শ্মশানে পাতিতে অবতার।
চণ্ডীপদ সরোরুহে শ্রীযুত মুকুন্দ কহে
ত্রিদেবে লাগিল চমৎকার॥০॥

॥ ছন্দ ॥

সুমুখী সমুখে থরথর কাঁপে ডরে।
কথিল অমলাবতী সঙ্কোচে চণ্ডীরে॥
অবশ্য করিবে তুমি সেবকের হিত।
না বলিয়া মহেশে চলিবে অনুচিত॥
এ বোল শুনিঞা বলে মহেশের ঠাঞি।
প্রণতি করিয়া নাথ অবনীকে যাই॥
মহেশের ঠাঞি দেবী করিয়া বিদায়।
অরুণ নয়ানে চায় উনমত্ত কায়॥
চাপিয়া সিংহের পৃষ্ঠে উরিলা কমলা।
জলপূর্ণ কমণ্ডলু হাথে জপমালা॥
ঘন পড়ে ঘন উঠে নাহি পায় খেদ।
অবিরত স্ফুরে যার চারি মুখে বেদ॥
শঙ্খ সারেঙ্গ গদা চক্র ধারিণী।
ত্রিভঙ্গ ললিত তনু গরুড়বাহিনী॥
বারাঙ্গী ত্রিশূল টঙ্গ কুলিশ প্রয়াস।
অজিত নাগের ঘণ্টা অজিত কুশপাশ॥
ধরিয়া উরিল চণ্ডী ক্রোধে পঞ্চমুখী।
তৃতীয় নয়ন ধরে হৃদয় বাসুকি॥
মনসিজ দল নর মনসিজ ভুজে।
বিভূতি মাখিয়া দেহে চাপে বৃষরাজে॥
ছয় মুখ হইয়া উরে চাহে কোপ দিঠে।
শক্তি ধরিয়া হাথে ময়ূরের পিঠে॥
নৃসিংহরূপিণী দেবী করিল প্রয়াণ।
বিকট দশন মুখ বজ্র সমান॥
সহস্র নয়ানে চাহে পরিহরি লাজ।
বজ্র ধরিয়া হাথে চাপে গজরাজ॥
বদনে দশন নাহি ছাড়ে ঘোর ডাক।
অরুণ নয়ানে ফিরে কুমারের চাক॥
দেখিয়া বিকট রূপ কাঁপে সুরপুর।
যতেক দেহের লোম হৈল তাঁর শূল॥
[১০০] অমলা বিমলাবতী বৈসে দুই পাশে
শত শত যোগিনী হইল নাসিকার শ্বাসে॥
কেহ করতালি দেই কেহ পূরে শঙ্খ।
কেহ গীত গায় কেহ বাজায় মৃদঙ্গ॥
পরিয়া বাঘের ছাল কেহ দেই লাফ।
মূলাপ্রায় দন্ত কার মুখে অভিশাপ॥
মুণ্ডে মুণ্ডে খেলে কেহ বস্ত্র পেলি দূরে।
ধাইল কবন্ধগণ জয়শঙ্খ পূরে॥
ধনসিঙ্গা বরঙ্গো তেঘাই পড়ে কাছে।
দগড় বাজায় কেহ নাচে উর্দ্ধ ভুজে॥
কেহ কাট কাট বলে কেহ মার মার।
রবির কিরণ লুকি হৈল অন্ধকার॥
লাফ দিয়া বুলে কেহ কার হাথে যুফি।
ঝুমকি ঘাঘর পায় গায় আঙ্গরেখি॥
তুরগ রড়ায় কেহ কেহ ধরে বাগ।
কনকের টাটুলি মাথায় কারো পাগ॥

মাংসবিরহিত তনু পেটে নাহি আঁত।
কপালে সিন্দুর কার মূলাপ্রায় দাঁত॥
চাপিয়া কুলুপ বুকে হাথে খাণ্ডা ফলা।
বীর ডাক ছাড়ে কার গলে মুণ্ডমালা॥
শঙ্খের কুণ্ডল কানে দাঁত নাহি মুখে।
শূল হাথে করি ধায় অস্থিমালা বুকে॥
দেউটি জ্বালিয়া ফিরে মেলিয়া রসনা।
আকুল চিকুরভার অরুণনয়না॥
শুখানা পুখরি আঁখি দেখি ভয়ঙ্কর।
সুমেরুপর্ব্বত কায় প্রবীণ জঠর॥
কারো হাথে নেজা কারো হাথে তরোয়ারি
ত্রিপুরার অবতারে কাঁপে ত্রিপুরারি॥
বাম হাথে কর্পর ডাহিন হাথে ছুরি।
বিকটদশনা মুখ ত্রিপুরা সুন্দরী॥
কেহ হুলাহুলি দেই কেহ জহ জয়।
দেবতা চিন্তিল মনে অকালে প্রলয়॥
ধনুশর পেলে কেহ কার বাড়ে রাগ।
ত্রিদশনাথের মুখে না নিঃসরে বাক॥
গগনে মুকুট লাগে বিকট দশন।
গলায় [১০১ক] ওড়ের মালা অরুণ নয়ন॥
বিশাললোচনী বলে চতুরষ্টভুজা।
রক্ষিব দাসীর সুতে লব নিজ পূজা॥
কিচি কিচি করে কেহ বলে ধর ধর।
ধক ধক জ্বলে কার বদনে আনল॥
আমি যারে দিল বর তার পুত্র মরে।
উদ্ধার করিব যদি থাকে যমপুরে॥
বধিব দুর্মুখ রাজা ইথে নাহি আন।
সাজ সাজ বলি চণ্ডী করিল প্রয়াণ॥
কনকরচিত জিন করিবর পৃষ্ঠে।
ক্রোধে অষ্টাদশভুজা লাফ দিয়া উঠে॥
প্রণাম করিয়া বলে অমলা রমণী।
সেবকে বধিলে না পাইবে পুষ্প পানি।
অমলাবতীর বোলে বলে ভগবতী।
কেমনে লইব পূজা দেহ অনুমতি॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী॥০॥

॥ সুই রাগ ॥

জননি তেজ অস্ত্র খর খাণ্ডা ফলা।
দেহ দহে কোপানলে কোন কার্য্যে গলে দোলে
সিংহবাহিনী মুণ্ডমালা॥ধ্রু॥
মানুষ দুর্মুখ রাজা তারে অষ্টাদশভুজা
মূর্ত্তি ধর সমুচিত নহে।
তুমি দেবী ভগবতী এতাদৃশ রূপে গতি
বসুমতী ভার নাহি সহে॥
দেবতা দানব যক্ষ সে নহে প্রতিপক্ষ
কোন ছার রাজা। তনয়।
অনেক যতনে সৃষ্টি স'।চি।। পীযূষ দৃষ্টি
অকারণে করহ প্রলয়॥
যোগিনীর রূপ ধর আমার বচনে চল
অবিলম্ব দুর্ব্বার পাটন।
শৃগাল কুক্কুরমাংস যাবত না করে ধ্বংস
রাখ গিয়া দাসীর নন্দন॥
মৃত দাসীসুতে প্রাণ দান লৈয়া সাধ মান
যদি মর্ত্ত্যে লবে পুষ্পজল।
চণ্ডীপদ সরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচিল সরস মঙ্গল॥০॥

॥ পয়ার ॥

সখীর বচনে চণ্ডী হরষিত মতি।
হৃদয় ভাবিল ভাল কথিল যুবতী॥
সাম্যমূর্ত্তি ধরে চণ্ডী জয় নারায়ণী।
দশনবর্জ্জিত মুখ কমলা যোগিনী॥
অতি পক্ক মস্তকে আকুল কেশভার।
রুক্ষিতা জড়িত নাঞি সীমন্ত তাঁহার॥
গলে সিংহনাদ কাঁথা হাতে দ্বাদশ।
সিন্দুর তিলক ভালে গলিত বয়স॥
শঙ্খের কুণ্ডল দোলে শ্রবণের মূলে।
রঙ্গিন চুপড়ি শোভে বাম কক্ষতলে॥

ভিক্ষুক যুবতী বেশ শরীর দুর্ব্বল।
[১০১] তুলসী রাঙ্গন পুষ্প লইল ধবল॥
কুরঙ্গনয়ানী দেবী কুঞ্জরগামিনী।
পরিধান করিল ধবল বস্ত্রখানি॥
ধীরে ধীরে চলে দেবী করে টল টল।
দেখিয়া সাহস হইল দেবতা সকল॥
তেজিয়া ত্রিদেব দেব সেবকবৎসলা।
পৃথিবীমণ্ডলে যান সর্ব্বমঙ্গলা॥
দুর্ব্বার পাটনে চণ্ডী করিল গমন।
পথ মাঝে দরশন তরুণ ব্রাহ্মণ॥
গৌরীদাস নাম চন্দ্রশেখরনন্দন।
বিলম্ব করিয়া কহে কথোপকথন॥
গৌরী সনে দরশন বিধির নির্ব্বন্ধ।
হিমগিরিসুতা পাতে তনয় সম্বন্ধ।
প্রশ্ন করে ভগবতী রাজ্যের কুশল।
নৃপতি নির্ব্বাহ কহ কেমত সকল॥
কোন নৃপ করে এই দেশ উপভোগ।
কি নাম দেশের বাছা কহ উপযোগ॥
দুর্ম্মুখ পৃথিবীপতি দুর্ব্বার পাটন।
অপালন নাহি ধনবান প্রজাগণ॥
নৃপতি মুকুটমণি মহা বলবান।
প্রত্যহে পার্ব্বতী পূজে চিন্তে ভগবান॥
কুশলে থাকিহ তুমি সতত নির্ভয়।
দক্ষিণ শ্মশান পথ বলহ তনয়॥
উত্তর কোণ মুখে চল পথে পাবে সঙ্গী।
ত্রিপথ জাঁতিয়া নৃপতির পায়রা টঙ্গি॥
দক্ষিণ করিয়া টঙ্গি যাবে পূর্ব্বমুখে।
ত্রিপুরামণ্ডপ পথে বৈসে মহাসুখে॥
মণ্ডপ দক্ষিণ দিগে কথ দূরে বন।
দক্ষিণ শ্মশানে রাজা বধে দুষ্টজন॥
বিদায় করিল বিপ্র মধুর বচনে।
উত্তর কোণ মুখে দেবী করিল গমনে॥
টঙ্গির নিকটে শিশু বুলে কুতূহলে।
গেণ্ডু কড়ি ভাঁটা টিক নিত্য নিত্য খেলে
কন্দলে আকুল কেহ করে মহা দম্ভ।
বলাবল দেখে চণ্ডী করিয়া বিলম্ব॥
নানা বাদ্য বাজে ভ্রমে সাধুপুত্র সুখে।
সেবকবৎসলা গৌরী যান পূর্ব্বমুখে॥
এইরূপ সকল [১০২ক] নগর মনোহর।
স্ফটিক ধবল কাচ বিরচিত ঘর॥
প্রতি চালে জলপূর্ণ সুবর্ণ কলস।
নানা রঙ্গে ভ্রমে যুবাল্পবয়স॥
কুক্কুট যুঝায় কেহ বিবাদে গাবড়।
নাট গীত গায় কেহ পাতিয়া চাতর॥
চোকাম খেলায় কেহ করে মহাদর্প।
নয়নগোচর হৈল ত্রিপুরামণ্ডপ॥
স্নান দান করে কেহ নৃপসরোবরে।
ছাগল মহিষে কেহ চণ্ডী পূজা করে॥
কৌতুকিত ভগবতী পাইল আনন্দ।
দক্ষিণ শ্মশানমুখে যান মন্দ মন্দ॥
কাটা গেল গুণদত্ত দাসীর তনয়।
অন্তরে জানিল গৌরী ব্যথিত হৃদয়॥
কোলাহল শুনি ধায় শ্মশান ভিতর।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাকিঙ্কর॥০॥

॥ বিভাস ॥

কোটাল আইনু তোমার সন্নিধান।
কুশলে থাক দুই ভাই পারণার সজ্জ চাই
জঠর পাবকে দহে প্রাণ॥ধ্রু॥
কহি নিজ দুঃখরাশি গয়া গঙ্গা বারাণসী
মথুরা প্রয়াগ গোদাবরী।
কুরুক্ষেত্র হিঙ্গুলাজ নীলাচলে দেবরাট
কালি ছিলাঙ অযোধ্যা নগরী॥
যমুনা নর্ম্মদা নদী হিমালয় ভাগীরথী
সাগরসঙ্গম দ্বারাবতী।
কোণার্ক কার্ত্তিকসেতু তমোলিপ্ত জয়কেতু
পর্য্যটন কৈল বসুমতী॥

আপনার দোষ কহি   স্বামীর কুর্পর নহি
সহিতে না পারি কুভারতী।
ধনে কভু নহি বশ   ভক্তিভাবে পরিতোষ
সর্ব্বকাল আমার প্রকৃতি ॥
ঘর ছাড়ি অভিরোষে   দিন গেল উপবাসে
ধূম্র দেখি নয়ানযুগলে।
দিগ দিগ নাহি জানি   উচ্চরায়ে কর্ণে শুনি
দানভূমি বুঝি কোলাহলে ॥
[১০২] কুঞ্জর তুরগ দৃঢ়   তুরঙ্গম গজারূঢ়
রথ পদাতিক সেনাগণ।
গণিতে নারিল আমি   কাননের মাঝে তুমি
কোন কার্য্য একত্র মিলন ॥
কহি আপনার কাজ   দূরে পরিহরি লাজ
শরীরে তিলেক নাহি বল।
চণ্ডীপদ সরসিজে   শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচিল সরস মঙ্গল ॥০॥

॥ সুই রাগ ॥

সেরেক তণ্ডুল লহ এক চক্র ফল।
কিঞ্চিত লবণ লহ বার্ত্তাকু যুগল ॥
তৃণকাষ্ঠ লৈয়া চল পিঙ্গললোচনা।
বাজারে রন্ধন করি করহ পারণা ॥
ত্রিপুরা কথিল আমি উহা নাঞি চাহি।
পারণার কালে আমি মৎস্য মাংস খাই ॥
ছাগল গারড় দিবি পণ দশ বার।
হরিণ মহিষ গণ্ডা যত দিতে পার ॥
অসংখ্য বোদালি দিবে নব লক্ষ হাঁস।
সরক্ত সহিত দিবি আপনার মাংস ॥
ধর্ম্মবুদ্ধি কোটালিয়া ভয় নাহি মনে।
কাটিয়া পরের বেটা বাঁচিবে কেমনে ॥
রাজ ঐরি কাটি আমি নাহি ধর্ম্মভয়।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাবিজয় ॥০॥

॥ কামোদ রাগ ॥

চল লো যোগিনী   কাহার রমণী
কেমন পুরুষের রামা।
দেখিয়া রূপ তোর   হৃদয়ে লাগে ডর
বারেক কর মোরে ক্ষমা ॥ধ্রু॥
আসুরী খেচরী   রূপসী বিদ্যাধরী
রাক্ষসী দেবতার নারী।
ভ্রমিতে কুতূহলে   অবনীমণ্ডলে
মানুষরূপে অবতরি ॥
ললাটে সিন্দূর-   রেখ প্রচুর
ভূষিত সুপতি ধনু।
চুপড়ি বাম কাখে   লগুড় করে শোভে
পবন ভর করে তনু ॥
তেজিয়া সুনগর   কুটুম্ব সহোদর
শ্মশানে আসি উপনীতা।
মলিন মুখশশী   বদনে নাহি হাসি
বুঝিতে নারি তব কথা ॥
অস্থির উপর   [১০৩ক] চর্ম্ম মাত্র সার
শোণিত আছে কি না জানি।
দেখিল বিপরীত   মাংসবিরহিত
সকল কলেবরখানি ॥
দুর্মুখ ভূপাল   তাহার কটোয়াল
আইলে মোর সন্নিধানে।
বিশেষে ধর্ম্মভয়   কথিল সবিনয়
ভিক্ষার যোগ্য নহে স্থানে ॥
দুঃখিত শিশুজনে   গলিত যৌবনে
উচিত কভু কোপ নহে।
ত্রিপুরাপদস্থল   কমল মধুকর
মুকুন্দ কবিচন্দ্র কহে ॥০॥

॥ গৌরী রাগ ॥

কোটাল জীবন অসার অসার।
ভাল মন্দ যত কিছু রহে চিরকাল ॥
ভুবিম্বগত গিরিনাথ যোগীর নন্দিনী।
ভূতনাথপ্রিয়া হাম ভক্তসহায়িনী ॥
আইলাঙ ভিক্ষার তরে দেখি বিপরীত।
কোন দোষে কাটা গেল সাধু সুচরিত ॥

সদয় হৃদয় মোর যতই বাসনা।
তোর স্থানে আশু হামু করিব যাচনা ॥
জনকের পুণ্যে মোর দেহ মৃতদান।
পরম সন্তোষে তোরে করিব কল্যাণ ॥
জনমিলে পরাধীন হামু দুরাচার।
পাতকী বিষয় বিধি সৃজিল কোটাল ॥
চলল যোগিনী নাহি বুঝ ভাল মন্দ।
ত্রিপুরাচরণে কহে আচার্য্য মুকুন্দ ॥০॥

॥ সুই রাগ ॥

কোটাল তোর দোষ নাহি নরবধে।
নৃপতির আদেশ সাধু প্রমায়ু শেষ
কাটা গেল আপন বিবাদে ॥
লোকে তোরে ঘোষে ধন্য অদুঃখে অর্জ্জিবে পুণ্য
কুমার লইব আমি দান।
ত্রিভু[১০৩]বনে কোন জনে যাচনা না করি ধনে
আজি তোরে দেখি ভাগ্যবান ॥
যোগিনী যোগিনীসুতা মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা
জানি আমি গুরু উপদেশে।
দেখ তুমি পরতেক করি আমি অভিষেক
সাধু জিয়ে প্রকার বিশেষে ॥
পঞ্চকুল ভিক্ষাসিনী ভ্রম তুমি একাকিনী
শ্মশানে আসিয়া উপনীতা।
জানিল যোগীর ঝি তোমারে বলিব কি
বিপরীত কহ তুমি কথা ॥
কোথা হইতে আইল পাপ মন দেই পরিতাপ
মুণ্ড করিয়া বহে কোলে।
কপট রাক্ষসী মায়া মৃতজনে করে দয়া
দেখি শুনি নাহি কোন কালে ॥
তুমি জন পুণ্যবান করিবে সাত্বিক দান
হৃদয় আমার হেন লয়।
চিন্তহ আপন হিত যাচকেরে অনুচিত
মন্দ বল নৃপতির ভয় ॥
ভাল মন্দ বিচারণে রক্ষ তুমি রাজস্থানে
শ্মশানে আসিয়া উপনীত।

কোন কালে না চল বিপথে।
লক্ষ কোটি দেই ধন যদি বলে কুবচন
ফলহীন বলে চারি বেদে ॥
চিকুরবর্জ্জিত মুণ্ড নড়ন দশন তুণ্ড
দুই কাণে শঙ্খের কুণ্ডল।
হাস তুমি খল খল গায় তব নাহি বল
চলিবারে কর টলটল ॥
অস্থিচর্ম্মসার কায়া শুখানা জঠর দেহা
দুই চক্ষু ফিরে নিরন্তর।
দেখিয়া তোমার রূপ হৃদয় বিদরে বুক
প্রাণ মোর করে থরথর ॥
হিতাহিত নাহি জান আমার বচন শুন
[১০৪ক]কলিযুগে দেখ ধর্ম্মপথ।
আমি বাকসিদ্ধা নারী যাহারে কল্যাণ করি
সর্ব্বকাল সেই নিরাপদ ॥
দেব সুর নর যক্ষ যে লঙ্ঘে আমার বাক্য
কভু তার না দেখি মঙ্গল।
চণ্ডীপদ সরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচিল সরস মঙ্গল ॥০॥

॥ সিন্ধুড়া ॥

কোটাল আইলাঙ তোমার সন্নিধানে।
ব্রাহ্মণে না দিনু দান না পূজিনু ভগবান
দুঃখ পাই তথির কারণে ॥
পুরাণ ভারত বেদ পড়িলে না ঘুচে খেদ
পণ্ডিত ছাড়িব অনাদরে।
না থাকিব যত সাধু দুঃখে হারিবেক স্বাদ
ভাঙ্গ মদ পোস্ত ঘরে ঘরে ॥
যেবা সাধুজন হয় পরে ধর্ম্মকথা কয়
আপুনি না চলে কোন কালে।
কুলীন কুৎসিত লীন ধনলোভে বুদ্ধিহীন
গঙ্গাজল মিশাব কূপজলে ॥
যুবতী স্বামীর বোলে না চলিব কোন কালে
পুত্র না পুষিব মায় বাপে।

পাতকে নহিব ভয় রাজা হব নির্দ্দয়
প্রজারে পীড়িব নানা বাধে ॥
পরদার পরবিত্ত তথি অনুগত চিত্ত
নিরন্তর পাপে দিব মতি।
বেদপ্রতিষেধ কর্ম্ম আচার না করে ধর্ম্ম
আপুনি বলিব তব শুদ্ধি ॥
যত তীর্থ ঠাঞি ঠাঞি তথি কাটা যাব গাই
দেবতা ছাড়িব অনাদরে।
যেবা কিছু কর্ম্ম করে সভায় বসিয়া বলে
আমাধিক কে আছে সংসারে॥
ব্রাহ্মণের অন্ন শূদ্র না খাব করিব ছিদ্র
ব্রাহ্মণ করিব কাকুর্ব্বাণী।
তবে কিছু দিয়া ধন তুষিব শূদ্রের মন
পরিতোষে খাব অন্ন পানি ॥
ব্রাহ্মণ বচন কর শূদ্র তার ঈশ্বর
পাঁচিলে না করে যদি কাম।
হোর দেখ পুরোহিত কার্য্যকালে এক ভিত
বোকচা বান্ধিতে আগুয়ান ॥
[১০৪]উত্তমে অধমে মেলি প্রবল হইব কলি
ভক্তি না থাকিব গুরুজনে।
শূদ্র হব পুণ্যবান ব্রাহ্মণে না দিব দান
যুবতী পূজিব নারায়ণে ॥
ব্রাহ্মণী ভজিব শূদ্র তথি জনমিব পুত্র
সেই হব কলির ব্রাহ্মণ।
সাঙ্গানি সহিত ঘর বেহানিকে অনাদর
এই সব কলির কারণ ॥
কিছু নাহি বলি লাজে বলিতে অনেক আছে
এমু সম্বরিয়া আছি মুখ।
শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে উত্তম অধমে জিনে
এই বড় মনে লাগে দুঃখ ॥০॥

॥ ধানশী অথ বিভাস ॥

কোটাল বলে মার রে যোগিনী বলে মার।
শ্মশান ভিতরে হৈল ঘোর অন্ধকার ॥ধ্রু॥
পদাতিক বলে দুঃখ দিলেক যোগিনী।
যোগিনী কোটালমুণ্ড করে টানাটানি ॥
সহিতে না পারি দুইজনে গালাগালি।
বরোঙ্গেতে ঘাই ঘন বাজে রণস্থলি ॥
দুরাচার পাঁচে সৈন্য অবিচারে ধায়।
নেঙ্গা সিলি শেল মারে ত্রিপুরার গায় ॥
কেহ তীর বিন্ধে কেহ হানে অচিরাত।
অতি কোপে ভগবতী পুরে সিংহনাদ ॥
কন্ধে মুণ্ডে জড় করি বসিয়া যোগিনী।
কিচিকিচি করে শিবা গিধিনী সুকিনী ॥
ধক ধক জলে পেতি বদন অবিশাল।
চারি দিগে ধায় দানা না করে বিচার ॥
মন্ত্র জপিয়া চণ্ডী ছাড়ে হুহুঙ্কার।
মৃত সাধুসুতে হয় জীবনসঞ্চার ॥
যোগিনী কোটাল যুদ্ধ শ্মশান ভিতর।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাকিঙ্কর ॥০॥

॥ শ্যামগয়ড়া ॥

শ্মশানে দানবগণ করে অবতার।
হান হান কাট কাট ঘন ধ্বনি
শুনিঞা লাগিল চমৎকার ॥ধ্রু॥
গজ হয় পিঠে বীরবর উঠে
ধানুকী ফলাকার পাশে।
সন্ধান পুরিয়া রহিল পদাতি
ধাইল যুঝিবার আশে ॥
নখরাঙ্কিত ভ্রূ চঞ্চল ক্রোষ্টি
কেশরী নিকটে রোষে।
জলধি [১০৫ক] শুষিতে উঠিল পতাকী
তাহা দেখি ত্রিপুরা হাসে ॥
গজ কর মুত্থার কম্পিত রিপুদল
মাহুত ধরিল নেঙ্গা।
রাউত প্রেত ভূত হানাহানি অদ্ভুত
ধানুকী রিপু করে বেঙ্গা ॥
সারথি হাথী রথী রাউত মাহুতপতি
পড়িয়া রুধিরে ভাসে।

ঘন ঘন পড়ে সিলি পায় পায় উড়ে ধূলি
ভেদ নাহি বসুধাকাশে ॥
হাথে করি দ্বাদশ যোগিনী দশ বিশ
উরিলা সমরের মাঝে।
ত্রিপুরা নট গুরু ত্রিদেব ডমরু
ডিণ্ডিম শবদে বাজে ॥
দেখিয়া যোগিনী পলায় আপুনি
চারি চারি প্রহরের নাথ।
শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে ত্রিপুরাচরণে
সাধুসুত গণে পরমাদ ॥০॥

শুন গো ঈশ্বরী বৃদ্ধের বচন আমার।
পলাইয়া গেলে প্রাণ রহে চিরকাল ॥
পড়িল সকল সৈন্য পালায় কোটাল।
যাবত না হয় শ্রুতিগোচর রাজার ॥
মহাবল বসুমতীপতির কুমার।
বিষম সঙ্কট দেখি চিন্ত প্রতিকার ॥
ভুবনবিখ্যাত জয়া সেবকবৎসলা।
যোগিনী বাশুলী তুমি সর্ব্বমঙ্গলা ॥
কোটী কোটী হাথী ঘোড়া অগণিত রথ।
সাজিলে দুর্ম্মদ পলাইতে নাহি পথ ॥
নাহি দেখি ধনু শর নেঞ্জা খাণ্ডা ফলা।
একাকিনী জবাফুল নয়ান বিশালা ॥
সহজে অবলা গো ঠেলিলে যায় প্রাণ।
যতনে সংহরে রাজা রাজার সংগ্রাম ॥
দাসীর নন্দন পুত্র না করিহ ডর।
দেবাসুর তৃণ কোন ছার নরেশ্বর ॥
প্রবোধিলা সাধুসুতে রুধিরাকাঙ্ক্ষিণী।
শ্মশানে মুকুন্দ কহে রহিল ভবানী ॥০॥

[ক্রমশঃ]

৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।